Peace

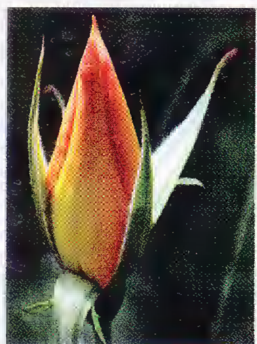
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদর্শের আলোকে

Enjoy Your Life

জীবনকে উপভোগ করুন

ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান আল-আরিফী






اِسْتَمْتِعْ بِحَيَاتِكَ

Enjoy your life

মূল

শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আল-আরিফী

অনুবাদক

কাজী মুহাম্মদ হানিফ
উস্তাযুল হাদীস ওয়াল আদব
আল জামিয়াতুল আরাবিয়্যাহ মারকাজুল উলুম

পরিবেশনায়



পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট,
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০।

Enjoy your life

জীবনকে উপভোগ করুন

প্রকাশক

মাকতাবা বাইতুস্‌সালাম

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

 ০২-৯৫৭১০৯২, ০১৭১৫-৭৬৮২০৯,০১৯১১-০০৫৭৯৫

প্রকাশকাল : অক্টোবর : ২০১৪ ইং

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা।

ISB NO. 978-984-8885-47-5

অনুবাদকের কথা

দৃষ্টিভঙ্গি বদলান, জীবন বদলে যাবে

কয়েক বছর আগে মুফতি তকি উসমানি সাহেব বাংলাদেশে এসে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন :

"দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিন, জীবন বদলে যাবে।"

বস্তুত : জীবনকে বদলে দিতে হলে তথা জীবনে সুখ, শান্তি, ও কাঙ্ক্ষিত সমৃদ্ধি লাভ করতে হলে আমাদেরকে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। জীবনের পথ পরিক্রমা কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এতে রয়েছে চড়াই-উৎরাই ও বাধা-বিপত্তি। জীবনের এ দুর্গম পথে চলতে গিয়ে বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হলে আমরা সেই অবস্থাকে কিভাবে গ্রহণ করব তা নির্ভর করে আমাদের মানসিকতার উপর। যারা সব বিষয়ে ইতিবাচক চিন্তা করেন তারা বাধা-বিপত্তিকে সাফল্যের সোপান হিসেবে গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে যারা নেতিবাচক চিন্তা করেন তাদের কাছে যে কোন বাধা-ই বিরাট প্রতিবন্ধক। তাই ইতিবাচক মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ কখনো আটকে থাকে না। তারা স্থিরভাবে লক্ষ্যপানে এগিয়ে যায়। ইতিবাচক মানসিকতাসম্পন্ন মানুষের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তারা আত্মবিশ্বাসী, ধৈর্যশীল, নিরহঙ্কার ও দয়াপ্রবণ। তারা নিজেদের সম্পর্কে যেমন ইতিবাচক ধারণা রাখেন তেমনি অন্যদের সম্পর্কেও তাদের ধারণা ইতিবাচক। তদুপরি সব কাজেই তারা ইতিবাচক ফল প্রত্যাশা করেন। তবে এ ইতিবাচক মনোভাব কারো কারো মধ্যে সহজাত স্বভাব ও প্রবৃত্তির মতো থাকে। তবে বেশিরভাগ মানুষকে তা অনুশীলন করে অর্জন করতে হয়। কেননা মানুষের স্বভাব পরিবর্তনের পরিপন্থী। পরিবর্তন অস্বস্তিকর।

কিন্তু এ পরিবর্তন কষ্টকর ও বিরক্তিকর হলেও এর ফলাফল খুবই মিষ্ট। দার্শনিক এরিস্টটল বলেছিলেন : 'শিক্ষার শেকড় তিতা হলেও এর ফল খুবই মিষ্টি।' তাই মনোভাবকে ইতিবাচক ধারায় পরিবর্তন করে কিভাবে জীবনে সুখি হওয়া যায় এ প্রশ্নের উত্তর যুগে যুগে অনেক গবেষক খুঁজে ফিরেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রচুর বই পত্রও লিখিত হয়েছে। এ বিষয়ে ডেল কার্নেগির লেখা বইগুলো ব্যাপকভাবে পঠিত ও সমাদৃত। কিন্তু তার লেখাগুলো ওহির (ঐশী জ্ঞান) আলোকে আলোকিত ছিল না বিধায় তা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। এমনকি ডেল কার্নেগি নিজেও তা থেকে চূড়ান্ত উপকৃত হতে পারেননি। কারণ, তিনি নিজেই আত্মহত্যার মাধ্যমে জীবনাবসান করেছেন।

এ প্রসঙ্গে সমকালিন আরেকজন লেখকের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন শিবখেরা। তার লেখা "You can win" আন্তর্জাতিক বেস্ট সেলারের তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করে আছে। কিন্তু তাদের লেখা বইগুলোতে কেবল সফলতা অর্জন, প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ, ইহলৌকিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভের কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু পারলৌকিক মুক্তিলাভ এবং সদাচরণকে এবাদত হিসবে গ্রহণ করার চেতনা তাদের বইগুলোতে নেই। থাকারও কথা নয়। কারণ তাদের বইগুলো বৈষয়িক শিক্ষা ও বস্তুগত অভিজ্ঞতার আলোকে লিখিত। সেগুলোতে ওহীলব্ধ জ্ঞানের আলোকছটা নেই। বুদ্ধিগত বৈষয়িক শিক্ষা আমাদের জানার পরিধিকে বিস্তৃত করে, কিন্তু ওহীলব্ধ মূল্যবোধের শিক্ষা আমাদের হৃদয়-জগত ও মনোবৃত্তিকে সমৃদ্ধ করে। যে শিক্ষা হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে ও তাতে সুকুমারবৃত্তি জাগ্রত করে সে শিক্ষারই আজ বড় প্রয়োজন। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শান্তি ও কল্যাণের আকর সে শিক্ষাই রয়েছে ওহীলব্ধ শিক্ষা তথা কোরআন ও সুন্নাহতে। এটা শুধু আমার কিংবা মুসলমানদের কথা নয়। ন্যায়পরায়ণ অমুসলিম গবেষকরাও অকুণ্ঠচিত্তে এর স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিখ্যাত অমুসলিম সাহিত্যিক ও দার্শনিক জর্জ বার্নার্ড শ বলেন :

I believe that if a man like Muhammad were to assume the dictatorship of the modern world he would succeed in solving its much needed peace and happiness...

If any religion has the chance to ruling over England nay Europe within next hundred years it can only be Islam. It is only religion which appears to me to posses the assimilating capacity to the changing phase of existence which can make its appeal to every age.

"আমার বিশ্বাস, মোহাম্মদ ﷺ-এর মতো একজন মানুষকে যদি বর্তমান বিশ্বের ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহলে তিনি সমস্ত সমস্যার সমাধান করে বিশ্ববাসীর কাঙ্ক্ষিত সুখ ও শান্তি ফিরিয়ে দিতে পারবেন।...."

"আমি মোহাম্মদের ﷺ ধর্মবিশ্বাস নিয়ে এ মর্মে ভবিষ্যদ্বানী করছি যে, এটা আগামী দিনের ইউরোপেও সেভাবে গ্রহণযোগ্য হবে, যেভাবে বর্তমান ইউরোপে তা গৃহীত হচ্ছে। কোনো ধর্ম বিশ্বাসের যদি শুধু ইংল্যান্ড নয় সারা ইউরোপকে শাসন করার সুযোগ থাকে তাহলে একমাত্র ইসলামেরই সেই ক্ষমতা আছে।..."

ইসলামের রীতিনীতি ও আচার-আচরণ কৌশল সম্পর্কে সম্যক অবগতি লাভ করে ও ইসলাম সম্পর্কে ভালোভাবে জেনেই তারা এ ধরনের মন্তব্য করেছেন।

কিন্তু আমরা নিজেরা এ সম্পর্কে অজ্ঞ। নিজের সম্পদ আজ পরের ঘরে। এ সম্পর্কে নওমুসলিম জনৈক মার্কিন মহিলার বক্তব্য দেখুন। তিনি বলেন :

The Muslim of today do not know the real meaning of Islam and The work life example and precepts of their prophet. Most of the today Muslims are living in gross ignorance of the true teachings of Islam.

"বর্তমান যুগের মুসলমানরা ইসলামের সঠিক অর্থ এবং তাদের নবী ﷺ-এর কাজকর্ম ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে জানে না। তাদের অধিকাংশই ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে পরিপূর্ণ অজ্ঞতায় নিমজ্জিত।"

আমরা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতায় নিমজ্জিত থাকলেও কিন্তু পাশ্চাত্যের বহু গবেষক ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা করে যাচ্ছেন। তারা দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছেন। তাই এখনি সময় ইসলামের দিকে পরিপূর্ণরূপে ফিরে আসার। হৃদয় ও মন দিয়ে ইসলামকে অনুধাবন করার। ইসলামের শিক্ষাসমূহ নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে আদর্শ মুসলিম হিসেবে নিজেকে তুলে ধরার। তাহলে আমাদের এ আদর্শ জীবন অনেক বড় দাওয়াত হয়ে উঠবে। অমুসলিমরা আমাদের চরিত্র ও আচরণ দেখে ইসলাম গ্রহণ করবে। তবে এর জন্য আমাদের আচরণ কৌশলকে ইতিবাচক ধারায় পরিবর্তন করতে হবে। আমাদের মনোভাবকে করতে হবে পরিশীলিত। কিন্তু এটা কিভাবে করব? এ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কেউ পড়েন ডেল কার্নেগির রচনাবলি, কেউ পড়েন শিবখেরার বইপত্র আবার কেউ পড়েন লুৎফর রহমানের প্রবন্ধমালা। কিন্তু সৌদি আরবের বিশিষ্ট গবেষক ডক্টর আব্দুর রহমান আল আরিফির লেখা জীবনকে উপভোগ করুন (মূল আরবি গ্রন্থ : اِسْتَمْتِعْ بِحَيَاتِكَ) গ্রন্থটি এ বিষয়ে অনন্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কেননা এ গ্রন্থটির মূল উপজীব্য হলো শ্রেষ্ঠ মানব রাসূল ﷺ-এর সীরাত ও উম্মাহর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের জীবনাচার। এর প্রতিটি পরতে পরতে মিশে আছে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ ﷺ-এর আদর্শ জীবনের উত্তম নমুনা। এর ছাচে যদি আমরা আমাদের জীবনকে গড়তে পারি তাহলে আমাদের জীবনও হবে উত্তম আদর্শ। বাস্তব জীবনে আমরা হব সুখি ও সমৃদ্ধশালী।

সুখ কী? অনেকেই মনে করেন টাকা হলেই বুঝি সুখি হওয়া যায়। তাই তারা অর্থের পেছনে ছুটে বেড়ান। কিন্তু টাকার মধ্যে যে সুখ নেই তা স্বীকার করেছেন অনেক কোটিপতি। তেমনি একজন জ্যাক মা। এই চাইনিজ ধনকুবেরের বর্তমান (অক্টোবর ২০১৪) সম্পদের আর্থিক মূল্য প্রায় দুই

হাজার ৩৯০ কোটি মার্কিন ডলার। তিনি বলেছেন : "বড় লোক হওয়া মানেই সুখি হওয়া নয়। (দি ইন্ডিপেনডেন্ট নিউজ)

তাহলে সুখ কোথায় পাব? এর জবাবই দিয়েছেন রাসূলে আরাবি মুহাম্মদ ﷺ তিনি বলেছেন : اَلْغِنَى غِنَى النَّفس 'মনের সুখই আসল সুখ।' আর এ সুখ লাভ করতে হলে আপনার মনকে ইতিবাচক মানসিকতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে হবে। কেননা মেঘ ও রোদ এ দুয়ের সমন্বয়ে তৈরি হয় রংধনু। আমাদের জীবনও আবর্তিত হয় সুখ-দুখ, আনন্দ-বেদনা ও আশা-নিরাশার দোলাচলে। আমরা আমাদের নিয়তি বদলাতে পারবো না তা ঠিক, কিন্তু, নিয়তিকে মেনে সুখি হওয়ার প্রক্রিয়া তো অনুশীলন করতে পারব।

বক্ষমান এ গ্রন্থটি আপনাকে এ পথে চলার শক্তি যোগাবে। স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপনের পথে আপনি এ গ্রন্থ থেকে অনেক রসদ পাবেন। এ বইয়ের বিষয়বস্তুগুলো আত্মস্থ করে অনুশীলন করতে পারলে আপনার জীবন বদলে যাবে। এ বই পড়ে ব্যক্তিগত ও দাম্পত্য জীবনে আমি নিজে যারপর নাই উপকৃত হয়েছি। যারা এর প্রুফ দেখেছেন তারাও সীমাহীন মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন। যদি বইটি ভালো লাগে, এর অনুবাদ ও মর্ম আপনার হৃদয় ছুঁয়ে যায় তাহলে আপনার ভালো লাগার অনুভূতি ০১৯১৪২৮৪৭৩০ নম্বরে এম,এম,এস বা ভয়েসকলের মাধ্যমে জানাতে পারেন।

অনুবাদ প্রসঙ্গে দুটি কথা

আমার সৌদি প্রবাসী বন্ধু মাওলানা আব্দুল হান্নান কয়েক বছর আগে আমাকে মূল আরবি কিতাবটি উপহার দিয়েছিলেন। পড়তে গিয়ে খুব অভিভূত হলাম। অনুবাদের ইচ্ছা জাগলো। শুরু করলাম অনুবাদ। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে কাজ থমকে গেল। অন্যান্য কাজের চাপে তা চাপা পড়ে রইল দীর্ঘদিন। শেষ পর্যন্ত প্রকাশক মহোদয়ের চূড়ান্ত চাপে বাধ্য হয়ে অন্যান্য কাজ স্থগিত রেখে এর অনুবাদ শেষ করলাম। মূল আরবী গ্রন্থটির অনেক জায়গা এমন রয়েছে যার ভাব উদ্ধার করা খুব জটিল কাজ। তাই অনুবাদ করতে গিয়ে আমি এর ইংরেজি ও ফার্সী সংস্করণের সহযোগিতা নিয়েছি। বিশেষ করে জাহেলি ও জাহেলি-উত্তর যুগের কবিতাসমূহ অনুবাদে ফার্সি সংস্করণটি আমার খুব কাজে লেগেছে। চেষ্টা করেছি সর্বাঙ্গ সুন্দর করতে। তারপরও ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। পাঠকের দৃষ্টিতে ভুলত্রুটি ধরা পড়লে আমাকে জানানোর জন্য অনুরোধ রইল।

কাজী মুহাম্মদ হানিফ

Contents

সূচীপত্র

Contents

Contents

Contents

১. এ বই কাদের জন্য

একদিন আমার মোবাইলে একটি ম্যাসেজ এলো। তাতে লেখা ছিল: 'শায়েখ, আত্মহত্যা করা কী?' ম্যাসেজটি পেয়ে আমি প্রেরককে ফোন করলাম। অপর প্রান্ত থেকে এক যুবকের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। তাকে আমি আমার পরিচয় দিয়ে বললাম, আমি তোমার একটি ম্যাসেজ পেয়েছি। কিন্তু আমি তোমার প্রশ্নটি বুঝতে পারি নি। প্রশ্নটি একটু বুঝিয়ে বল। আমার কথা শুনে সে বিরক্তি ও উষ্মা প্রকাশ করে বললো, 'আমার প্রশ্ন' তো একেবারে পরিষ্কার। আমি জানতে চাই আত্মহত্যা করা কী?

অনাকাঙ্ক্ষিত উত্তর দিয়ে আমি তাকে অপ্রস্তুত করে দিতে চাইলাম। তাই একটু হেসে বললাম, 'মোস্তাহাব।' আমার এ জবাব শুনে সে একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তাই সে উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞেস করল, কী বললেন? আমি প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম, আচ্ছা, তুমি কিভাবে আত্মহত্যা করবে, আমি যদি তোমার সাথে সে বিষয়ে আলোচনা করি তাহলে কেমন হয়?

যুবকটি চুপ করে রইল। আমি তখন বললাম, তুমি কেন আত্মহত্যা করতে চাচ্ছ? এবার যুবকটি মুখ খুললো, 'আমি বেকার। কোনো চাকরি পাচ্ছি না। বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন কেউ আমাকে ভালোবাসে না। আমি সমাজের বোঝা। বাস্তব জীবনে আমি চরম ব্যর্থ। কোথাও সফলতার মুখ দেখছি না।...' এভাবে যুবকটি বিরতিহীনভাবে তার ব্যর্থতা ও হতাশার নানা কাহিনী আমাকে বলতে লাগল। সহজাত মেধা, প্রতিভা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে আত্মোন্নয়নে তার অক্ষমতার কাহিনী সে আমাকে শোনাতে লাগল।

বর্তমানে অধিকাংশ লোক এ সমস্যায় ভুগছে।

কেন আমাদের অনেকে হীনমন্যতায় ভোগে? কেন আমরা নিজেকে তুচ্ছ মনে করি। মান-মর্যাদার শীর্ষে উপনীত ব্যক্তিদের দিকে তাকিয়ে অনেকে ভাবে 'তাদের জন্য ওখানে পৌঁছা সম্ভব হলেও আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।' এটা হীনমন্যতা ছাড়া আর কিছু নয়। এটা পরিত্যাগ করতে হবে। বড় হওয়ার কল্পনা ও উদ্যম মানুষকে বড় করে তোলে।

আরবের এক কবি বলেন-

পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করতে যার বুক কাঁপে,
আজীবন তাকে ভূ-গহ্বরেই থাকতে হবে।

আপনি কি জানেন এ বই কিংবা আত্মোন্নয়নমূলক অন্য যেকোনো বই পড়ে কার কোনো লাভ হবে না? সে হলো ঐ হতভাগা ব্যক্তি যে নিজের ভুল-ত্রুটির সামনে আত্মসমর্পণ করে এবং নিজের সীমিত সক্ষমতা ও দক্ষতা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। সে বলে, 'এটা আমার সহজাত দুর্বলতা। এটা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। আমার পক্ষে এটা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। সবাই আমাকে এমনই জানে। আমি কখনো খালেদের মতো বক্তৃতা করতে পারব না। আহমদের মতো প্রাণবন্ত থাকা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। আর জিয়াদের মতো সবার কাছে জনপ্রিয় হওয়া তো অকল্পনীয় ব্যাপার।' যারা এধরনের মনোভাব পোষণ করে স্থবির হয়ে থাকতে চায় এ বই পড়ে তাদের কোনো লাভ হবে না।

অতিশয় এক বৃদ্ধের সঙ্গে একবার এক মজলিসে বসা ছিলাম। সে মজলিসের অধিকাংশই ছিল সাধারণ মানুষ। সে বৃদ্ধ তার পাশের এক লোকের সাথে কথা বলছিল। সবার চেয়ে বয়স্ক বলে সেখানে তাকে অন্যদের চাইতে একটু বেশি সম্মান দেয়া হয়েছিল। এছাড়া তার আর কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল বলে আমার জানা নেই। আমি সেখানে কিছুক্ষণ আলোচনা করলাম। প্রসঙ্গক্রমে শায়খ আব্দুল আযিয বিন বাযের একটি ফতোয়ার কথা আলোচিত হলো। আলোচনার শেষে সে বৃদ্ধ গর্বের সঙ্গে আমাকে বললো: আমি শায়খ বিন বাযের সতীর্থ ছিলাম। চল্লিশ বছর আগে মসজিদে আমি আর শায়খ বিন বায শায়খ মুহাম্মদ বিন ইবরাহীমের দরসে বসতাম। আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম গর্বে তার বুক ফুলে উঠেছে। তার চোখে-মুখে খুশির আভা। কারণ তিনি কিছুদিনের জন্য হলেও একজন সফল মানুষের সংস্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছেন।

আমি মনে মনে বললাম, আপনি কেন শায়খ বিন বাযের মতো সফল হতে পারলেন না? আপনারা তো একই পথের পথিক ছিলেন। শায়খ বিন বায তো গন্তব্যে পৌঁছতে পেরেছিলেন। গেলেন, আপনি কেন পারলেন না?

শায়খ বিন বাযের ইন্তেকালে সারা পৃথিবী কেঁদেছিল। তাকে হারিয়ে সবাই আপনজন হারানোর মতো শোকাহত হয়েছিল। কিন্তু আপনিও একদিন মৃত্যুবরণ করবেন তখন কী হবে? আপনার জন্য কয়জন কাঁদবে?

'অমুক মহান ব্যক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, তার সঙ্গে আমার আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। তিনি আমাকে অনেক আদর করতেন।' এমন কথা আমরা অনেক সময় খুব গর্বের সাথে বলে থাকি। কিন্তু আসলে এটা গর্বের বিষয় নয়। তিনি যেমন সফলতার সর্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করেছিলেন তেমন সফলতার নাগাল পাওয়া আসল গর্বের বিষয়।

তাই আপনিও উদ্যমী হোন। সফলতার রাজমুকুট ছিনিয়ে আনতে এখনই দৃঢ় সংকল্প করুন। পণ করুন আপনার মেধা ও প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে আত্মোন্নয়নে সচেষ্ট হবেন। নিজেকে সফল ভাবুন। চেহারার মলিনতাকে সুন্দর হাসি দিয়ে বদলে ফেলুন। দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হোন। কৃপণতার পরিবর্তে উদারনীতি গ্রহণ করুন। রাগ ছেড়ে সহনশীলতার চর্চা করুন। দুর্যোগকে আনন্দের উপকরণ বানিয়ে নিন। ঈমানকে অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করুন। সারকথা আপনার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে ফেলুন, আপনার জীবন অবশ্যই বদলে যাবে।

জীবনকে উপভোগ করুন। আপনার জীবন এতো সংক্ষিপ্ত যে, দুশ্চিন্তা করে তা নষ্ট করার কোনো অবকাশ নেই। তাই দুশ্চিন্তামুক্ত আনন্দময় জীবন উপভোগ করুন। কিন্তু কিভাবে? আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্যই বক্ষমান এ গ্রন্থের জন্ম। তাহলে আসুন আল্লাহর নামে আমরা একসাথে চলতে শুরু করি। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের দিকে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

সঙ্গে থাকুন...

সাহসী কে? বুকে আছে যার উন্নত মনোবল, সুউচ্চ হিম্মত আর ইস্পাতকঠিন দৃঢ় সংকল্প। আর আছে, নিজের মেধা ও প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে আত্মোন্নয়নের দুর্নিবার মনোবৃত্তি।



২. এ বই থেকে আমরা কী শিখবো

সুখ-দুঃখের অনুভূতির ক্ষেত্রে মানুষের প্রবণতা প্রায় অভিন্ন। সম্পদ লাভ করলে, পদোন্নতি পেলে কিংবা রোগমুক্তির ফলে মানুষ খুশি হয়। মানুষ আরো খুশি হয় যদি দুনিয়ার সবকিছু তার অনুকূলে থাকে অথবা তার সব সাধ-অভিলাষ পূরণ হয়।

পক্ষান্তরে এ মানুষ-ই যদি অস্বচ্ছলতার শিকার হয়, অপদস্থ হয় কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন তার কষ্ট লাগে। বেদনায় নীল হয়ে যায়। এটাই মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি। কিন্তু চেষ্টা করলে এ প্রকৃতিকে কিছুটা পরিবর্তন করা যায়। তখন মানুষ সুখের মতো দুঃখেও হাসতে পারে। আমরা এখানে এমন কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই যেগুলোর মাধ্যমে আমরা সবসময় আনন্দময় থাকব। কষ্টগুলোকে জয় করে জীবনকে সুখময় করতে সক্ষম হব।

মানবজীবনের রূঢ় বাস্তবতা হলো, এখানে আনন্দের সাথে থাকবে বেদনা, আর হাসির সাথে জড়িয়ে থাকবে কান্না। দুঃখের সাথে সুখ আর সুখের পরে আসবে দুঃখ। অনেকটা দিনরাতের বিবর্তনের মতোই এদের আবর্তন চলতে থাকবে। তাই মানসিকভাবে সুখ পেতে হলে প্রথমে এ বাস্তবতাটিকে মেনে নিতে হবে। তাই ছোটো-খাটো বিষয়ে আমরা কেন অতিরিক্ত টেনশন করব? কেন তুচ্ছ কোনো ঘটনাকে বড় করে দেখে নিজের দুঃখকে বাড়িয়ে তুলব?

তবে বাস্তবতা হলো, দুশ্চিন্তা করতে হয় না, বরং তা অনুমতি ছাড়াই আপনার মনের দরজা দিয়ে অনুপ্রবেশ করে আপনাকে কাবু করে ফেলতে চায়। তাই এতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। কেননা দুশ্চিন্তার খোলা দরজাগুলো বন্ধ করার হাজার হাজার উপায় রয়েছে।

এ গ্রন্থে আমরা সে উপায়গুলো নিয়েই কথা বলব। মনের খোলা দরজাগুলো বন্ধ করে দুশ্চিন্তাকে কীভাবে হটাতে হয়, সে কথাই আমরা এ গ্রন্থে পড়ব।

এখানে ভিন্ন একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করতে চাই। আমরা অনেক মানুষকে দেখি, সবাই তাদেরকে ভালোবাসে। তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করে কিংবা তাদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দবোধ করে। আপনি কি তাদের মতো হতে চান না?

আপনি কেন সবসময় অন্যের প্রতি মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়ে থাকবেন? আপনি চেষ্টা করলে তো অন্যকে মুগ্ধ ও আপনার প্রতি আকৃষ্ট করতে পারেন। কীভাবে নিজেকে আকর্ষণীয় ও মুগ্ধকর করা যায়- এ গ্রন্থে আমরা সে আলোচনা-ই করব।

আপনার চাচাতো ভাই যখন কথা বলে তখন সবাই চুপ থাকে, মনোযোগ দিয়ে তার কথা শোনে, কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করে। কিন্তু আপনি যখন কথা বলেন তখন কেউ হয়তো চলে যায় নয়তো অন্য কোনো কথা বা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

এর কারণ কী? জ্ঞান-বুদ্ধি, শিক্ষা-দীক্ষা, পদ-পদবী সবক্ষেত্রে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও কেন সবাই তার কথা শুনে মুগ্ধ হয় আর আপনার কথা শুনতে বিরক্তিবোধ করে?

আমি একজন বাবার কথা জানি, যাকে দেখলে তার সন্তানেরা আনন্দিত হয়। সবসময় তার কাছে কাছে থাকে। তাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে। অথচ আরেকজন বাবার অবস্থা এমন যে, তিনি সন্তানদের কাছে ডাকেন অথচ তারা বিভিন্ন অজুহাতে তার কাছ থেকে দূরে সরে থাকে। এমনটা কেন হয়? দু'জনই তো পিতা। তারপরও কেন এতো পার্থক্য?

কীভাবে মানুষের মন জয় করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়, আমরা এ গ্রন্থে সেসব জীবনঘনি'আচার-আচরণ সম্পর্কে জানব।

আমরা জানতে চেষ্টা করব কীভাবে মানুষকে আপন করে নিতে হয়, কীভাবে সব ধরনের মানুষের সঙ্গে চলতে হয়, তাদের মাঝে প্রভাব ফেলতে হয়, তাদের ভুল-ত্রুটি এড়িয়ে যেতে হয়।

আমরা এ বইয়ের মাধ্যমে আরো জানব দুর্নীতি ও অসচ্চরিত্রের লোকদের সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করতে হয়। তাদেরকে কীভাবে প্রভাবিত করতে হয়। এছাড়া আরো অনেক কিছু শিখতে পারব। আমাদের এ পথে আপনাকে স্বাগতম।

একটি কথা...

অন্যরা কী ভালোবাসে শুধু তা জানার মধ্যে কোনো সফলতা নেই;
বরং আচরণ দক্ষতাকে উন্নত করে
অন্যের ভালোবাসা লাভ করার মধ্যেই রয়েছে সফলতা।



৩. কেন আচরণগত দক্ষতা অর্জন করব?

একবার আমি ধর্মীয় আলোচনা করার জন্য দারিদ্র-পীড়িত একটি অঞ্চলে গিয়েছিলাম। অন্য এলাকা থেকে একজন শিক্ষকও সেখানে এসেছিলেন। আলোচনা শেষে আমার কাছে এসে তিনি বললেন, 'আমারা চাই আপনি আমাদের কিছু ছাত্রের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করবেন।' আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'স্কুল তো সরকারি! সেখানে বিনামূল্যে শিক্ষাব্যবস্থা রয়েছে। তা সত্ত্বেও আপনি এ ধরনের আবেদন করছেন কেন?'

তিনি বললেন, 'স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ ফ্রী তা ঠিক। তবে এখান থেকে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যায়, বস্তুত তাদের জন্যই আমাদের এ আবেদন।'

আমি বললাম, 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও তো সরকারি। তাছাড়া ভার্সিটিতে তো ছাত্রদের শিক্ষাবৃত্তিও দেয়া হয়।'

তিনি বললেন, আমি আপনাকে ব্যাপারটি খুলে বলছি।

আমি বললাম, 'ঠিক আছে বলুন।'

তিনি বললেন, আমাদের এখান থেকে যেসব ছাত্র মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তাদের শতকরা হার কমপক্ষে ৯৯%। তাদের পর্যাপ্ত মেধা ও প্রতিভা থাকে। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ইসলামিক স্টাডিজ, কম্পিউটার ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তারা যখন গ্রামের বাইরে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে চায় তখন তাদের পিতা বাধা দিয়ে বলেন, 'যতটুকু শিখেছ, তাতেই চলবে আর পড়াশোনা করার দরকার নেই। এখন বাড়িতে থেকে আমার সঙ্গে বকরি চরাও। আমার কাজে সাহায্য কর।'

এ কথা শুনে আমি নিজের অজান্তেই চিৎকার করে উঠলাম- 'বকরি চরানো!'

শিক্ষক মহোদয় বললেন, 'হ্যাঁ, বকরি চরানো। তখন অসহায় ছাত্রটি নিরুপায় হয়ে বাবার কথামতো বকরি চরাতে শুরু করে দেয়। এভাবে সম্ভাবনাময় যোগ্যতা ও প্রতিভার অকাল মৃত্যু ঘটে। বছরের পর বছর

এভাবে রাখালি করে ছেলেটির জীবন কেটে যায়। একসময় বিয়ে করে সংসারি হয়। তারও সন্তান হয়। তখন সে নিজেও তাদের সঙ্গে অনুরূপ আচরণ করে। তার ছেলেরাও বকরি চরায়। এভাবে সুপ্ত প্রতিভাগুলো সুপ্তই থেকে যায়।'

'এর সমাধান কী?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'এ সমস্যার সমাধানস্বরূপ আমরা ছাত্রের বাবাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে ছেলের পরিবর্তে একজন শ্রমিককে বকরি চরানোর জন্য নিয়োগ করি। ছেলের পরিবর্তে সে শ্রমিক বকরি চরায় । সে শ্রমিকের বেতন-ভাতা আমরা বহন করি। এতে সে ছেলেটি উচ্চতর পড়াশোনা করে নিজের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে। শিক্ষা শেষ করা পর্যন্ত ছাত্রটির সার্বিক ব্যয়ভার আমরা বহন করি ।'

এরপর শিক্ষক মহোদয় মাথানিচু করে বললেন, 'আমরা কোনো সুপ্ত প্রতিভাকে বকরি চরিয়ে নষ্ট হতে দিতে পারি না। এটা জাতির জন্য ক্ষতিকর।'

পরবর্তীতে আমি তার কথা নিয়ে চিন্তা করলাম। কখনো কারো প্রতিভা ও যোগ্যতাকে নষ্ট হতে দেয়া যায় না। প্রতিভা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়েই আমরা সাফল্যের শীর্ষে উপনীত হই। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, শিক্ষা-দীক্ষা, ভাষণ-বক্তৃতা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, জনপ্রিয়তা অর্জন ইত্যাদি যে কোনো শাখায় যারা সফল আপনি লক্ষ্য করলে দেখবেন, তারা সবাই নিজের সহজাত যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে সফলতা লাভ করেছেন। এমনকি একজন সফল স্বামী কিংবা সফল স্ত্রী অথবা সফল পিতা কিংবা একজন অন্তরঙ্গ প্রতিবেশী ও ঘনি'সহকর্মী হতে হলেও সচেতন বা অবচেতনভাবে সুন্দর ও সহনশীল আচরণগত দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সফলতার চূড়া স্পর্শ করতে হয়।

সুন্দর ও সহনশীল আচরণগত দক্ষতা অনেকের মাঝে সহজাতভাবে থাকে। আবার অনেককে তা শিখে তৎপর চর্চা করে সফলতা অর্জন করতে হয়।

আমরা এ গ্রন্থে সফল মানুষদের জীবনকথা ও অভিজ্ঞতা আলোচনা করব। তাদের অনুসৃত পথ ও পদ্ধতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করব। গভীরভাবে খতিয়ে দেখব, তারা কীভাবে সফল হয়েছেন। দেখা যাক তাদের সে পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করে আমরাও সফল হতে পারি কি-না।

কিছুদিন আগে আমি বর্তমান বিশ্বের অন্যতম ধনকুবের শায়খ সোলায়মান আর-রাজেহীর একটি সাক্ষাৎকার পড়েছি। তিনি ছিলেন চিন্তা-চেতনা এবং নীতি -আদর্শে পাহাড়ের ন্যায় অবিচল।

তিনি বিলিয়ন ডলারের মালিক। হাজার হাজার একর জমির স্বত্বাধিকারী। এছাড়া তিনি শত শত মসজিদ নির্মাণ করেছেন। অসংখ্য এতিম তার ভরণ-পোষণে প্রতিপালিত হচ্ছে। বলতে পারেন, সফল মানুষদের একজন তিনি।

কিন্তু আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে তার অবস্থান কোথায় ছিল? তখন তিনি ছিলেন সাধারণ একজন মানুষ। দিন এনে দিন খেতেন। কোনো কোনো দিন তাও পেতেন না।

সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, খাবারের জন্য তিনি মানুষের ঘর ঝাড়ু দিয়েছেন। দোকানে বা ব্যাংকে দিনরাত একাধারে কাজ করেছেন।

এরপর তিনি কপর্দকশূন্যতার সে অতল গহ্বর থেকে বেরিয়ে কীভাবে বিপুল অর্থ উপার্জন করে সফলতার শীর্ষচূড়ায় উন্নীত হলেন, কীভাবে জীবনসংগ্রামে বিজয় লাভ করলেন, সে কথা বলেছেন।

আমি রাজেহী সাহেবের কর্মপদ্ধতি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছি। তার মতো যোগ্যতা আমাদের অনেকেরই রয়েছে। তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করে সফল হয়েছেন আমাদের অনেকের পক্ষেই তা কাজে লাগিয়ে সফল হওয়া সম্ভব। তবে এর জন্য প্রয়োজন কঠোর অধ্যবসায়, সীমাহীন চেষ্টা-সাধনা ও অদম্য মনোবাসনা।

আচরণগত দক্ষতাকে সমৃদ্ধ করার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পেছনে আমার উদ্দীপক কী ছিল সে বিষয়ে আরেকটি কথা না বললেই নয়। আমাদের অনেকের মধ্যেই নতুন কিছু করার যোগ্যতা আছে। আছে বিস্ময়কর প্রতিভা। কিন্তু যে জিনিসটা নেই তা হলো সুপ্ত সে যোগ্যতা ও প্রতিভাকে উপলব্ধি করার মতো অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টি। নেই তা বিকশিত করার যথাযথ প্রয়াস। তাছাড়া সুপ্ত প্রতিভার পরিচর্যা করার মতো আন্তরিক লোকের অভাব তো বলাই বাহুল্য। অনেকের মধ্যে ভালো বক্তৃতা করার মতো যোগ্যতা থাকে, কারো মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন নতুন

আইডিয়ার উন্মেষ অথবা সাধারণ জ্ঞানের স্ফুরণ ঘটে। কিন্তু সেগুলোর যথাযথ পরিচর্যা করার মতো লোকের অনেক অভাব।

অনেকে তো নিজের মধ্যে এসব গুণ ও প্রতিভার উপস্থিতি নিজেই অনুভব করতে ও তা বিকশিত করতে সক্ষম হন। কেউ কেউ নিজের শিক্ষক, সহপাঠী, সহকর্মী বা শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর সহায়তায় তা করে থাকেন। কিন্তু তাদের সংখ্যা তো অতি নগন্য। বস্তুত অনেকের প্রতিভা তার বুকের মধ্যে সমাহিত থেকে যায় আর কারো কারো প্রতিভা তো আঁতুড় ঘরেই মারা যায়।

এর ফলে জাতি অনেক সফল নেতা, অনলবর্ষী বক্তা, বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ আলেমের সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। সফল স্বামী অথবা আদর্শ পিতা লাভে ব্যর্থ হয়।

এ গ্রন্থে আমরা কিছু অনন্য আচরণগত দক্ষতা নিয়ে আলোচনা করব। সেগুলো যদি আপনার মধ্যে থাকে তাহলে এর মাধ্যমে তা নতুন করে মনের পর্দায় ভেসে উঠবে। আর যদি না থাকে তাহলে তা অনুশীলন করে এগিয়ে যাবেন। তাহলে আসুন, শুরু করা যাক।

একটি চিন্তা...

যখন পাহাড়ে চড়বেন তখন
পাথরখণ্ডের পরিবর্তে সর্বোচ্চ শৃঙ্গের প্রতি দৃষ্টি দিন।
লাফালাফি না করে দৃঢ়পদে এগিয়ে চলুন। আপনি স্খলিত হবেন না।
সফলতা আপনার পদচুম্বন করবেই।



৪. আপনার ব্যক্তিত্ব বিকশিত করুন

সবার ব্যক্তিত্বের বিকাশ একরকম নয়। অনেকে তো এমন যে, এ ক্ষেত্রে তার কোনো উন্নতিই নেই। চলছে তো চলছেই। এ রকম বিশ বছরের কোনো যুবকের সাথে আপনি কিছুক্ষণ বসলে দেখবেন তার নির্দিষ্ট লাইফ স্টাইল, বাচনভঙ্গি ও চিন্তাধারা রয়েছে। দশ বছর পর আবার তাকে দেখুন। দেখবেন, তার সার্বিক অবস্থা আগের মতোই রয়ে গেছে। তার কোনো উন্নতিই হয় নি।

তবে এমন অনেক যুবকের দেখাও আপনি পাবেন, যাদের ব্যক্তিত্ব প্রতিদিনই বিকশিত হচ্ছে। আগের দিনের চেয়ে পরের দিন তার ব্যক্তিত্ব উল্লেখযোগ্য হারে উন্নত হচ্ছে; বরং বলা যায় প্রতি মুহূর্তেই সে আত্মোন্নয়নের ধাপ অতিক্রম করে চলছে। এমন কেন হয়? বিষয়টি নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

মনে করুন, দু'জন ব্যক্তি নিয়মিত টিভি চ্যানেল দেখে। এদের একজন এমনসব প্রোগ্রাম দেখে যেগুলো তার চিন্তাশক্তিকে সমৃদ্ধ করে ও মেধার বিকাশে সহায়ক হয় এবং জ্ঞানগর্ভ সংলাপ ও টকশো থেকে অন্যদের অভিজ্ঞতাসমূহকে জেনে তা নিজের জীবনে কাজে লাগায়। এর মাধ্যমে সে চমৎকার বিশ্লেষণী ক্ষমতা, ভাষাগত দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বিতর্কের কলা-কৌশল আয়ত্ত করতে পারে। অপরপক্ষে দ্বিতীয়জন শুধু প্রেমকাহিনীনির্ভর নাটক, সিরিজ, আবেগপূর্ণ চলচ্চিত্র ও এ্যাকশনধর্মী ছায়াছবি দেখে সময় কাটায়।

পাঁচ-দশ বছর পর দু'জনের চিন্তাধারা ও ব্যক্তিত্ব কেমন হবে? দু'জনের মধ্যে কার আত্মশক্তি বেশি সমৃদ্ধ হবে? জেনারেল নলেজের দক্ষতা, বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের পরিধি, অপরকে প্রভাবিত করার যোগ্যতা ও প্রতিকূল পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর সফলতার ক্ষেত্রে উভয়ের সক্ষমতা কি এক রকম হবে? কখনো নয়; বরং এসব ক্ষেত্রে প্রথমজনের দক্ষতা ও যোগ্যতা হবে দ্বিতীয়জনের তুলনায় অনেক বেশি ও ভিন্নধর্মী। দু'জনের কথাবার্তার ঢং ও উদ্ধৃতি দেয়ার পদ্ধতিও হবে ভিন্নরকম । প্রথমজন কুরআন, হাদিস, সঠিক তথ্য ও পরিসংখ্যানের মাধ্যমে উদ্ধৃতি দেবে। আর

অপর দিকে দ্বিতীয় জন অভিনেতা ও নায়ক-নায়িকাদের সংলাপ ও গানের কলি দিয়ে উদ্ধৃতি দেবে।

এ ধরনের একজন ব্যক্তি একদিন আমার সঙ্গে কথা বলার সময় হঠাৎ বললো, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'হে বান্দা! তুমি চেষ্টা কর। আমিও তোমার সঙ্গে চেষ্টা করব'।

আমি তাকে সতর্ক করে দিয়ে বললাম, 'ভাইজান, আপনি এটা কী বলছেন! এটা তো কুরআনের আয়াত তথা আল্লাহর কথা নয়।'

আমার কথা শুনে লোকটার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। সে একেবারে থ বনে গেল। পরবর্তীতে তার কথাটির উৎস নিয়ে আমি অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম। আমার অনুসন্ধানে বেরিয়ে এলো যে, এটা ছিল মিশরীয় একটি প্রবাদ বাক্য। যা কোনো ধারাবাহিক নাটক থেকে শুনে তার মনে গেঁথে গেছে। বস্তুত যে পাত্রে যা থাকে তা থেকে তাই ঝরে।

আরেকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য, পত্র-পত্রিকা তো অনেকেই পড়েন কিন্তু কয়জন পাঠক এমন আছেন যারা উপকারী সংবাদ, তথ্যবহুল ফিচার ও সম্পাদকীয় কলাম পড়েন, যা তাদের আত্মবিকাশ, দক্ষতাবৃদ্ধি ও প্রজ্ঞার উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে। এ ধরনের পাঠকের সংখ্যা খুবই কম। অথচ খেলার খবর ও বিনোদনের পাতা পড়ার মতো লোকের অভাব নেই। এ কারণেই পত্র-পত্রিকাগুলোতে বর্তমানে খেলার খবর ও বিনোদনের পাতার কলেবর বাড়ানোর প্রতিযোগিতা চলছে।

শুধু যে পত্র-পত্রিকা পাঠের ব্যাপারে এ মনোভাব বিরাজ করছে তা নয়; বরং আমাদের বিভিন্ন আলোচনার আসরগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আমাদের সময় কাটানোর ক্ষেত্রগুলোতেও অনুরূপ অবস্থা বিরাজমান। সব জায়গায় আমরা অহেতুক বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকি।

আপনি যদি 'লেজ' না হয়ে 'মাথা' হতে চান, জীবনে বড় কিছু করতে চান তাহলে জীবনের প্রতি মুহূর্তে আপনাকে আত্মবিকাশে মনোযোগী হতে হবে। নিজের যোগ্যতা ও প্রতিভা বিকাশে সহায়ক এমন কাজ করতে হবে। এজন্য আপনাকে প্রচুর অনুশীলন করতে হবে।

আবদুল্লাহ নামে এক উদ্যমী ব্যক্তি ছিল। কিন্তু তার মধ্যে অভিজ্ঞতার কিছুটা ঘাটতি ছিল। একদিন সে জোহরের নামায পড়ার জন্য মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। নামাযের প্রতি তার ছিল প্রচণ্ড আগ্রহ। দ্বীনের প্রতি সীমাহীন অনুরাগ তাকে মসজিদের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। পাছে জামাত মিস হয়ে যায় কি-না এ আশঙ্কায় সে দ্রুত হাঁটছিল। কিন্তু মসজিদে যাওয়ার পথে সে একজন লোককে দেখলো, লোকটি খেজুর গাছের ওপর বসে খেজুরের কাঁদি ঠিক করছে। ভাবখানা দেখে মনে হচ্ছিল যে, সে আযান শুনে নি কিংবা নামায পড়ার কোনো গরজ অনুভব করছে না। এটা দেখে তো আবদুল্লাহ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। সে ঝাঁঝালো স্বরে বললো, 'এ বেটা! নামাযের জন্য তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে আয়।' লোকটি শান্তভাবে উত্তর দিল, 'ঠিক আছে ভাই, আসছি।'

আবদুল্লাহ বললো, 'তাড়াতাড়ি কর। বেটা গাধা কোথাকার!'

গাধা শব্দটি শোনার সাথে সাথে লোকটির মাথায় রক্ত উঠে গেল। সে রাগে খেজুরের গাছ থেকে একটি শাখা কেটে নিয়ে বললো 'কী বললে আমি গাধা? একটু দাঁড়াও তোমার বারোটা বাজিয়ে দেব।'

অবস্থা খারাপ দেখে লোকটি যেন তাকে চিনতে না পারে তাই সে রুমাল দিয়ে চেহারা ঢেকে মসজিদের দিকে দৌড় দিল। এদিকে লোকটি গাছ থেকে নেমে আবদুল্লাহকে না পেয়ে বাড়ি চলে গেল এবং নামায পড়ে কিছুটা শান্ত হলো। হালকা বিশ্রাম নিয়ে অবশিষ্ট কাজ শেষ করার জন্য আবার গাছে চড়লো।

আসরের সময় আবদুল্লাহ নামায পড়তে বের হলো। লোকটিও আগের মতই গাছের ওপর বসে কাজ করছিল। আব্দুল্লাহ এবার দাওয়াতের রীতি পরিবর্তন করে ফেললো। সে লোকটিকে সালাম দিয়ে বললো, 'ভাইজান! কেমন আছেন?'

লোকটি বললো, 'আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি।'

এরপর আবদুল্লাহ জিজ্ঞেস করলো, 'এবছর খেজুর কেমন হয়েছে?'

লোকটি বললো, 'আলহামদুলিল্লাহ, ভালো হয়েছে।'

Contents

এর জবাবে আবদুল্লাহ লোকটির জন্য দোয়া করলো- 'আল্লাহ আপনাকে তৌফিক দান করুন। আপনার ফল ও ফসলে বরকত দান করুন। আপনার রিযিক বাড়িয়ে দিন। আপনার পরিশ্রমের উত্তম প্রতিদান দান করুন। আপনার সন্তানদেরকেও অনুরূপ দান করুন।' আবদুল্লাহর দোয়া শুনে লোকটি খুশি হয়ে আমিন আমিন বলতে লাগলো। এরপর তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো।

এরপর আব্দুল্লাহ বললো, মনে হচ্ছে, কাজের ব্যস্ততার কারণে আসরের আযান শুনতে পান নি। আসরের আযান তো হয়ে গেছে। একামতের সময়ও হয়ে গেছে। এখন একটু কাজে বিরতি দিয়ে নামাযটা পড়ে নিন। নামাযের পর অবশিষ্ট কাজ শেষ করতে পারবেন। আল্লাহ আপনার শরীর সুস্থ রাখুন।'

লোকটি খুশি হয়ে বললো, ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ।'

এরপর সে আস্তে আস্তে গাছ থেকে নামলো। নীচে নেমে সে আবদুল্লাহর সঙ্গে করমর্দন করলো। এরপর বললো, 'এমন চমৎকার ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তবে জোহরের সময় যে লোকটার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল তাকে ধরতে পারলে বুঝিয়ে দিতাম, গাধা কে?!'

ফলাফল...

আপনি অন্যদের সাথে যেমন আচরণ করবেন,
অন্যরাও আপনার সাথে তেমন আচরণ করবে।



৫. পড়ে যাওয়া দুধের জন্য কাঁদা অনর্থক

মানুষের গায়ের রং ও দৈহিক কাঠামো যেমন পরিবর্তন সম্ভব নয়। তেমনি অনেকে মনে করেন, মানুষ যে প্রবৃত্তি ও মানসিকতা নিয়ে বেড়ে ওঠে এর পরিবর্তনও কখনো সম্ভব নয়। অথচ মেধাবীরা মনে করেন, মানসিকতার পরিবর্তন সম্ভবত কাপড় পরিবর্তনের চেয়েও সহজ।

মানুষের মানসিকতা ও অভ্যাস মাটিতে পড়ে যাওয়া দুধের মতো নয় যে, তা আর তোলা সম্ভব নয়; বরং যথাযথভাবে অনুশীলন করলে আমরা নিজেদের প্রবৃত্তি ও মানসিকতা পাল্টে ফেলতে পারি। শুধু তাই নয়, যথাযথ প্রক্রিয়ায় কখনো কখনো মানুষের চিন্তা-চেতনাও পরিবর্তন করা যায়।

ইবনে হাযম (রহ.) 'তওকুল হামামাহ' নামক গ্রন্থে লিখেছেন- স্পেনে একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিল। সেখানকার আরো চারজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে তার প্রতিযোগিতা ছিল। এক পর্যায়ে তারা তার প্রতি বিদ্বেষী হয়ে উঠলো এবং তাকে চরমভাবে নাজেহাল করার ষড়যন্ত্র করলো।

একদিন সকালে সে ব্যবসায়ী তার দোকানে যাচ্ছিল। তার পরনে ছিল সাদা জুব্বা আর মাথায় ছিল সাদা পাগড়ি। পথিমধ্যে সে চারজনের একজনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলো। সে তার সঙ্গে সালাম বিনিময় করে পাগড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনার হলুদ পাগড়িটা তো বেশ চমৎকার!'

ব্যবসায়ী বললো, 'আরে! তুমি অন্ধ হয়ে গেলে নাকি? সাদা পাগড়িকে হলুদ পাগড়ি বলছ কেন?'

লোকটি বললো, 'আপনি ভুল করছেন। পাগড়িটি আসলে হলুদ। তবে হলুদ হলেও আপনাকে বেশ চমৎকার লাগছে।'

ব্যবসায়ী আর বেশি কথা না বলে সামনের দিকে হাঁটতে লাগল। একটু অগ্রসর না হতেই ঐ চারজনের আরেকজন এসে সালাম দিয়ে তার পাগড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, 'মাশাআল্লাহ! আপনি তো আজ চমৎকার পোশাক পরেছেন। পোশাকটি আপনাকে খুব মানিয়েছে। বিশেষ করে এ সবুজ পাগড়িটিতে আপনাকে অন্যরকম লাগছে।'

ব্যবসায়ী তখন নিজের পাগড়ির দিকে তাকিয়ে ভালোভাবে দেখে নিশ্চিত হয়ে বললো, 'আপনি ভুল দেখছেন। আমার পাগড়িটি সবুজ নয় সাদা।'

সে বললো, 'না না, এটা সাদা নয় আমি হলফ করে বলছি এটা সবুজ । তবে সবুজ হলেও চিন্তার কারণ নেই । এটা বেশ সুন্দর ।'

এরপর সে ব্যবসায়ী চিৎকার করে বললো, আমার পাগড়ি সবুজ নয় সাদা । এটা বলতে বলতে সে তার পাগড়ির বিভিন্ন অংশ নাড়াচাড়া করে দেখতে লাগল । পিঠের ওপর থেকে পাগড়ির প্রান্তদেশ টেনে নিয়ে ভালোভাবে দেখলো । নাহ, সাদা-ই তো দেখা যাচ্ছে । এরপর সে সোজা তার দোকানের সামনে গিয়ে তালা খোলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল এর মধ্যেই তৃতীয়জন এসে বললো, 'আজকের পোশাকটা তো আপনাকে বেশ ভালো লাগছে । বিশেষ করে আপনার এ নীল পাগড়িটার জুড়ি মেলা ভার ।'

ব্যবসায়ী তখন নিজের পাগড়ির দিকে আরেকবার তাকিয়ে বললো, 'ভাই! আমার পাগড়ির রঙ তো সাদা ।' লোকটি বললো, 'আপনি ভুল করছেন । আপনার পাগড়ির রঙ নীল । তবে এটা সুন্দর মানিয়েছে আপনাকে । এ নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না ।' এ কথা বলে সে চলে গেল ।

এদিকে সে একা-একা বলে চললো, 'আমার পাগড়ি সাদা । আমার পাগড়ি সাদা ।' বারবার সে পাগড়িটি নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগল । ব্যবসায়ী কোনোভাবেই তার দৃষ্টি পাগড়িটি থেকে সরাতে পারছিল না ।

এর মধ্যেই চতুর্থজন এসে বললো, 'মাশাআল্লাহ! আপনাকে অভিনন্দন । এ লাল পাগড়িটি আপনি কোত্থেকে কিনেছেন?'

এটা শুনে সে ক্ষিপ্ত হয়ে বললো, 'আরে ভাই! কী আবোল-তাবোল বকছেন? আমার পাগড়ি তো নীল ।'

'না, এ তো দেখছি লাল ।'

ব্যবসায়ী তখন চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলো আর বলতে লাগল, 'আমার পাগড়ি সাদা । না, আমার পাগড়ি লাল ।' একটু পরে সে আবার বললো, 'আমার পাগড়ি সবুজ । না, বরং এটা নীল । না না, এটা তো কালো ।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে সে হাসতে শুরু করলো । এরপর কাঁদতে লাগল । এরপর সে হঠাৎ লম্ফঝম্ফ দিতে লাগল ।

ইবনে হাযম বলেন, পরবর্তীতে আমি দেখেছি এ ব্যবসায়ী স্পেনের অলি-গলিতে পাগল হয়ে ঘুরছে আর ছোট ছোট বাচ্চারা তার দিকে পাথর ছুঁড়ে মারছে ।'

এ চারজন যদি তাদের দুরভিসন্ধিমূলক কূটকৌশল দিয়ে একজন মানুষের প্রকৃতি পরিবর্তন করে দিতে পারে, তার বিবেক-বুদ্ধি বিকৃত করে দিতে পারে তাহলে আপনি কেন ওহীর আলোয় আলোকিত ও নববী পাঠশালায় চর্চিত আচরণ দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে মানুষের মনের গতি আল্লাহর দাসত্বের দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারবেন না?

সফলতা অর্জন করতে হলে নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতার সর্বোত্তম ব্যবহার করুন।

যদি বলেন, 'না, আমি পারব না।'

আমি বলব, 'কমপক্ষে চেষ্টা তো করুন।'

যদি বলেন, 'কীভাবে চেষ্টা করতে হয় তা আমি জানি না।'

আমি বলব, 'তাহলে আগে শিখুন।'

নবী করীম  তো বলেছেন,

إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ.

অর্থ: জ্ঞান লাভ হয় কেবল শেখার মাধ্যমে। আর সহনশীলতা অর্জিত হয় অধ্যবসায়ের মাধ্যমে।

(আল মুজামুল কাবীর, তাবারানী; ১৬২৯৬, শুআবুল ঈমান, বাইহাকী: ১০৩৩৩)

দৃষ্টিভঙ্গি...

দুঃসাহসীরা নিজেদের দক্ষতার উন্নতি করতে গিয়ে নিজের সক্ষমতাকেও ছাড়িয়ে যায়।

কখনো কখনো অন্যের দক্ষতা বাড়িয়ে দেয় কিংবা পাল্টে দেয়।

◈◈◈

৬. আপনি হবেন অনন্য...

অনেক লোক এমন আছে যে, তারা কথা বলতে শুরু করলে একটু যেতে না যেতেই তাদের এ কথোপকথন তর্কের রূপ নেয়। আবার এমন অনেক লোক আছে যে, তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বললেও তাদের কথা চলতে থাকে স্বাভাবিক গতিতে ও হাসিমুখে। মূলত কথা বলার দক্ষতা ও যোগ্যতার পার্থক্যের কারণেই এমনটি হয়ে থাকে।

দু'জন বক্তা মসজিদে একই বিষয়ে কথা বলছেন। কিন্তু একজনের কথা বলার সময় লোকজন হয়তো ঘুমাতে থাকে, নয়তো তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আবার কেউ কেউ কিছুক্ষণ এদিক সেদিক তাকিয়ে উঠে চলে যায় কিংবা মসজিদের জায়নামায নিয়ে খেলায় মত্ত হয়ে পড়ে। অথচ অপরজনের বয়ানের সময় দেখা যায়, শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তার আলোচনা শোনে। অপলক দৃষ্টিতে বক্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। শতভাগ মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে । এমন কেন হয়? কেন একজনের আলোচনার সময় থাকে পিনপতন নীরবতা, অপলক দৃষ্টি, নিবিড় মনোযোগ আর অপরজনের আলোচনার সময় নড়াচড়া, কথাবার্তা কিংবা মোবাইলে ম্যাসেজ পাঠে মগ্নতা? বস্তুতঃ কথা বলার যে বিশেষ কলা-কৌশল রয়েছে তা প্রয়োগের পার্থক্যের কারণেই এমনটি হয়ে থাকে।

কোনো কোনো শিক্ষকের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যখন তিনি মাদরাসার করিডোর দিয়ে হাঁটেন তখন ছাত্ররা গভীর উৎসাহ নিয়ে একের পর একজন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। কেউ মোসাফাহা করে। কেউ পরামর্শ চায়। আবার কেউ কোনো প্রশ্নের উত্তর জানতে চায়। তিনি নিজ কামরায় বসে ছাত্রদের আসার অনুমতি দিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো কামরা ভরে যায়। সবাই তার কাছে একটু বসতে ভালোবাসে।

অথচ অনেক শিক্ষক এমনো আছেন যে, তিনি আসলে কেউ তার সাক্ষাতে এগিয়ে আসে না। হাঁটেন তো একা একা। মসজিদ থেকে বের হন একা। কেউ হাসিমুখে এগিয়ে এসে তাকে সালাম করে না। পরামর্শ চাইতেও কেউ আসে না। কেউ তার কাছে কোনো অভিযোগও নিয়ে আসে না। সকাল থেকে সন্ধ্যা আর রাত থেকে ভোর পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টা কামরা খুলে বসে থাকলেও কেউ তার কাছে আসে না। তার কাছে একটু বসতে চায় না। কেন এমন হয়?

মানুষের সঙ্গে আচরণগত দক্ষতার পার্থক্যের কারণেই এমন হয়ে থাকে।

অনেক লোক এমন আছে যাকে দেখলে সবাই আনন্দিত হয়। সবাই কামনা করে, তিনি যেন তার পাশেই বসেন। অথচ অনেক লোক এমন আছে যিনি আসলে কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় না। কেউ তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায় না। কেউ তার সাথে করমর্দন করলেও তা হয় নিরস ভঙ্গিতে। কেউ তাকে বসার জায়গা করে দেয় না কিংবা নিজের পাশে বসার জন্য ডাকেও না।

কেন এমন হয়?

মানুষকে আপন করে নেয়া এবং অন্যদের মাঝে প্রভাব বিস্তার করার যোগ্যতার তারতম্যের কারণেই এমন হয়ে থাকে।

একজন পিতা বাড়িতে প্রবেশ করার সাথে সাথে তার সন্তানেরা খুশিতে তার দিকে দৌড়ে আসে। আরেকজন পিতা বাড়িতে আসলে সন্তানদের মধ্যে কোনো অনুভূতি বা ভাবাবেগ জন্মে না। তারা দৌড়ে এসে তার কাছে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। সন্তানের সঙ্গে আচরণ গত কৌশলের পার্থক্যের কারণেই এমন হয়।

মানুষের সঙ্গে আচার-আচরণ, লেনদেন ও সকলকে আপন করে নেয়ার যোগ্যতা সবার এক রকম নয়। কেউ কেউ তো প্রথম পরিচয়ের সাথে সাথে অন্যকে আপন করে নিতে পারে। অবশ্য সবাই তা পারে না। তবে মানুষকে আপন করে তাদের হৃদয় জয় করা আপনি যত কঠিন কাজ বলে মনে করেন বাস্তবে তা তত কঠিন নয়।

আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমি দেখেছি, সহজ কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করে বেশিরভাগ মানুষেরই মন জয় করা সম্ভব। তবে শর্ত হলো, সে পদ্ধতিগুলো প্রথমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করতে হবে। এরপর যথাযথভাবে সেগুলোকে প্রয়োগ করতে হবে। এর ফলে আমাদের অজান্তেই অন্যরা আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। এ ব্যাপারে আমার জীবনের একটি বাস্তব ঘটনা আপনার কাজে লাগতে পারে।

প্রায় তের বছর যাবৎ একটি সামরিক কলেজের মসজিদে আমি ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব পালন করছি। মসজিদে যাওয়ার পথে একটি গেট আছে। একজন নিরাপত্তা কর্মী সেখানে দায়িত্ব পালন করেন। তার দায়িত্ব ছিল গেট খোলা ও বন্ধ করা। গেট দিয়ে প্রবেশ করার সময় ও বের হওয়ার সময় সবসময় তাকে দেখে আমি মুচকি হাসতাম এবং সালাম করতাম। কিন্তু এক সময় আমার ব্যস্ততা অনেক বেড়ে গেল। এ কারণে তখন আমি আমার মুঠোফোন অনেক সময় সাইলেন্ট করে রাখতাম। ফলে আমার মুঠোফোনে অসংখ্য এসএমএস ও মিস্‌ডকল উঠে থাকত। মসজিদ থেকে ফেরার পথে গাড়িতে বসে আমি সেগুলো পড়তাম। এ কারণে সে সময় তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দেয়া বা সালাম করা সম্ভব হয় নি।

কিন্তু দারোয়ান বেচারা গেট খুলে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত। একদিন হঠাৎ বের হওয়ার সময় আমাকে থামিয়ে সে বললো, 'শায়খ! আপনি কি কোনো কারণে আমার প্রতি রাগ করেছেন?'

আমি বললাম, 'না তো! কী জন্য?'

সে বললো, 'আপনি আগে যখন প্রবেশ করতেন তখন আমাকে হাসিমুখে সালাম দিতেন। অথচ এখন বের হওয়ার সময় হাসিও দেন না, সালামও দেন না।'

দারোয়ান ছিল সাদাসিধা প্রকৃতির মানুষ। আমার আচরণের কারণে নিজের অজান্তেই সে আমাকে ভালোবেসে ফেলেছিল। তাই আমার কাছ থেকে আগের মতো আচরণ না পেয়ে সে দুঃখিত হয়েছিল। আমি তার কাছে দুঃখ প্রকাশ করে আমার ব্যস্ততার কারণ বুঝিয়ে বললাম।

সেদিন বুঝলাম, মানুষকে আপন করে নেয়ার দক্ষতাগুলো যখন আমাদের সহজাত গুণে পরিণত হয়, তখন আমরা অমনোযোগী থাকলেও অন্যরা সেগুলো গভীরভাবে লক্ষ্য করে।

আলোকপাত...

সম্পদ অর্জন করতে গিয়ে সম্পর্ক নষ্ট করবেন না,
সম্পর্কের পথ ধরেই সম্পদ লাভ হয়।



৭. আপনার প্রিয়তম ব্যক্তি কে

আচার-আচরণে ও কথাবার্তায় প্রত্যেককে যদি এ কথা অনুভব করাতে পারেন যে, সে আপনার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ তাহলে বলা যাবে, আপনি আচরণগত দক্ষতা ব্যবহারে সবচেয়ে পারদর্শী।

আপনি আপনার মায়ের সঙ্গে সুন্দর ও আবেগঘন আচরণ করুন। অকৃত্রিম ভালোবাসায় তাকে সিক্ত করুন। তিনি যেন মনে করেন, এরকম ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ আপনি আর কারো সঙ্গে করেন না। এমন সুন্দর আচরণ আর কখনো কারো সাথে করেন নি।

অনুরূপ আচরণ করুন আপনার বাবার সঙ্গে, স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে, বন্ধু-বান্ধবসহ সবার সঙ্গে। এমনকি যাদের সঙ্গে জীবনে মাত্র একবার দেখা হয়েছে। যেমন কোনো দোকানের সেলসম্যান কিংবা পেট্রোল পাম্পের কর্মচারীর সঙ্গেও।

আপনি যদি প্রত্যেককে এ কথা বুঝাতে পারেন যে, সে আপনার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ তাহলে তারা সবাই ভাববে, আপনি তাদের সবচেয় প্রিয় মানুষ। আমাদের রাসূল এ ক্ষেত্রেও ছিলেন আদর্শস্থানীয়।

সীরাতে নববীতে এর উত্তম নমুনা রয়েছে। রাসূল ﷺ সবার সঙ্গে সর্বোচ্চ সুন্দর ব্যবহার করতেন। হাসিমুখে কথা বলতেন। এমন আচরণ করতেন যে, সবাই মনে করতো আমিই রাসূল ﷺ-এর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। ফলে প্রত্যেকেই রাসূল ﷺ-কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন।

আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন আরবের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের একজন। জ্ঞান-বুদ্ধি, মেধা ও দক্ষতায় তার সমকক্ষ ব্যক্তি আরবে কমই ছিল। গোটা আরবে চারজন ব্যক্তিকে এরূপ গুণধর ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হতো। আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম।

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি লক্ষ্য করলেন, কোথাও সাক্ষাৎ হলে আল্লাহর রাসূল তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসেন। মজলিসে উপস্থিত হলে রাসূল তার আগমনে আনন্দ প্রকাশ করেন। সবসময় হাসিমুখে তার সঙ্গে কথা বলেন এবং সবচেয়ে সুন্দর অভিধায় তাকে ডাকেন। এমন আচরণ দেখে আমর রাযি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মনে হলো, তিনিই হয়তো রাসূলের সবচেয়ে প্রিয়

মানুষ। এ বিষয়ে সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্য একদিন তিনি রাসূলকে প্রশ্ন করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কে?'

রাসূল : 'আয়েশা'।

আমর : 'আমি জানতে চাচ্ছিলাম- পুরুষদের মধ্যে আপনার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে?'

রাসূল : 'আয়েশার পিতা আবূ বকর সিদ্দীক'।

আমর : 'তারপর?'

রাসূল : 'ওমর ইবনুল খাত্তাব'।

আমর : 'তারপর?'

রাসূল এবার ইসলাম গ্রহণ ও দ্বীনের জন্য জুলুম ও নিপীড়নের শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে যারা অগ্রসর ছিলেন এক একজন করে এমন কয়েকজনের নাম বললেন।

আমর রাযি, বলেন, 'আমার নাম সবার শেষে বলেন কি-না, এ ভয়ে আমি আর প্রশ্ন না করে নীরব হয়ে গেলাম।'

লক্ষ্য করে দেখুন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন মধুর আচরণের মাধ্যমে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মন জয় করে নিয়েছিলেন যে, তিনি মনে করছিলেন তিনিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ।

রাসূল এভাবেই প্রত্যেককে তার মর্যাদা অনুযায়ী অবস্থান দিতেন; বরং তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজনে নিজের কাজ ছেড়ে দিয়ে তার কথা শুনতে থাকতেন।

যখন ইসলামের বিজয় শুরু হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন গোত্রে পাঠাতে লাগলেন। প্রয়োজনে কোথাও কোথাও সেনাদলও পাঠানো হতো। এরই ধারাবাহিকতায় রাসূল 'তাঈ' গোত্রের উদ্দেশ্যে সাহাবিদের একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করলেন। আদি বিন হাতেম ছিলেন 'তাঈ' গোত্রের সরদার। যুদ্ধের ভয়ে তিনি পালিয়ে গেলেন। দেশ ছেড়ে পালিয়ে শামে গিয়ে রোমানদের কাছে আশ্রয় নিলেন।

মুসলিম সেনাদল 'তাঈ' গোত্রের এলাকায় পৌঁছে প্রায় বিনা বাধায় তা জয় করে নিলেন। কারণ তাদের নেতৃত্ব দেয়ার মতো না কোনো সরদার ছিল' না সুগঠিত কোনো সেনাবাহিনী ছিল।

মুসলমানগণ যুদ্ধের সময়ও বিজিতদের সঙ্গে সদাচরণ করতেন। এ যুদ্ধে মুসলমানদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল আদি গোত্রের লোকদের ষড়যন্ত্র বন্ধ করা এবং তাদের সামনে মুসলমানদের ক্ষমতা প্রদর্শন করা।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাদের কয়েকজনকে বন্দী করা হলো। এদের মধ্যে আদি বিন হাতেমের বোনও ছিল। বন্দীদের সবাইকে মদিনায় নিয়ে আসা হলো। আদি'র পালিয়ে যাওয়ার সংবাদ রাসূলকে দেয়া হলে তিনি আশ্চর্য হলেন। একজন নেতা কীভাবে নিজের লোকদেরকে ছেড়ে পালিয়ে গেল?

আদির কাছে যাওয়ার বা তাকে ফিরিয়ে আনার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাছাড়া শামে পালিয়ে গিয়ে আদি সেখানে শান্তিতে ছিল না। অবশেষে সে নিজ দেশে ফিরে এলো। এরপর রাসূলের সাথে সমঝোতা বা সন্ধি করার উদ্দেশ্যে মদিনায় এসে রাসূলের দরবারে উপস্থিত হলো।

মদিনায় যাওয়ার ঘটনা আদি নিজেই বর্ণনা করেছেন।

'রাসূলুল্লাহ ﷺ একসময় আমার সবচেয়ে অপ্রিয় মানুষ ছিলেন। কারণ আমি ছিলাম খৃষ্টান। রাসূল ﷺ কর্তৃক ইসলামের দাওয়াত শুনে আমার মনে তার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হলো। পালিয়ে শামে গিয়ে রোমের কাইজারের কাছে আশ্রয় নিলাম। কিন্তু শামের দিনগুলো আমার ভালো লাগল না।

তাই মনে মনে ভাবলাম, এখানে না থেকে মুহাম্মদের কাছে ফিরে যাই। মিথ্যাবাদী হলে তিনি আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবেন না। আর বাস্তবেই তিনি যদি সত্যবাদী হন তাহলে তার কাছে যেতে তো কোনো অসুবিধা নেই।

মদিনায় পৌঁছলে লোকেরা আমাকে দেখে বলাবলি করতে লাগল, 'ঐ দেখ আদি বিন হাতেম! ঐ দেখ আদি বিন হাতেম।'

আমি আমার মতো করে হাটতে হাটতে রাসূলের ﷺ কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

রাসূল ﷺ আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি আদি বিন হাতেম?'

আমি বললাম, 'জ্বী, আমি আদি বিন হাতেম।'

নবী করীম ﷺ আদির আগমনে আনন্দিত হলেন। তাকে অভিনন্দন জানালেন। যদিও তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু, রণাঙ্গন থেকে পলায়নকারী এবং খৃষ্টান দেশে আশ্রয় গ্রহণকারী। তবুও হাসিমুখে তাকে বরণ করে নিলেন। তার হাত ধরে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। আদি রাসূলের পাশে পাশে চলতে লাগলেন। তার কাছে মনে হচ্ছিল, তারা উভয়ই তো সমান। রাসূল হলেন মদিনা ও তার আশপাশের অঞ্চলের রাজা। আর তিনি তাঈ-উপত্যকা ও তার আশেপাশের অধিপতি।

রাসূল ﷺ প্রতিষ্ঠিত ঐশী ধর্ম ইসলামের ওপর। আর তিনিও আসমানি ধর্ম খৃষ্টবাদের ওপর।

মুহাম্মদের ﷺ কাছে আছে আসমানি গ্রন্থ 'আল কুরআন', তার কাছেও আছে আসমানি কিতাব 'ইনজীল'।

তাই আদি মনে মনে ভাবলেন, শক্তি ও সৈন্য-সামন্ত ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

তাদের চলার পথে তিনটি ঘটনা ঘটলো।

তারা উভয়ে হাঁটছিলেন। পথিমধ্যে একজন মহিলা তাদের সামনে এলো। রাসূলকে ﷺ দেখামাত্র মহিলা চিৎকার করে বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথে আমার একটু কথা আছে।' রাসূল আদি বিন হাতেমের হাত ছেড়ে দিয়ে মহিলার কাছে গেলেন। কী হয়েছে জানতে চাইলেন। মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনলেন।

আদি বিন হাতেম জীবনে বহু রাজা-বাদশাহর আচরণ দেখেছেন। কিন্তু এমন আচরণ কখনো দেখেন নি। তাই তিনি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন এরপর ভাবলেন, 'এমন চরিত্র কখনো রাজা-বাদশাদের হতে পারে না। এটা তো নববী চরিত্র! এ চরিত্র তো আম্বিয়ায়ে কিরামের!' মহিলার কথা শেষ হলে রাসূল আদি বিন হাতেমের কাছে ফিরে এলেন এবং উভয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলেন। কিছুদূর না যেতেই তাদের দেখা হলো আরেক ব্যক্তির সঙ্গে।

কী বললো সে ব্যক্তি?

সে যদি বলত, 'আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে অনেক সম্পদ আছে। আমি সেগুলো দান করার জন্য দরিদ্র মানুষ খুঁজছি।' কিংবা বলত, 'আমার বাগানে ও শষ্য-খেতে অনেক ফল-ফসল হয়েছে। আমি সেগুলো কী করতে পারি?'

সে যদি এমন কিছু বলত, তাহলে আদি মুসলমানদের সচ্ছলতা ও মুসলমানদের স্বনির্ভরতা উপলব্ধি করতো ।

কিন্তু লোকটি বললো, 'আল্লাহর রাসূল! আমি ক্ষুধার্ত, খাবারের মতো কিছু নেই।'

লোকটি ছিল সীমাহীন দরিদ্র। ছেলে-মেয়েদের ক্ষুধা নিবারণের মতো কোনো খাবার তার কাছে নেই। আশপাশে যেসব মুসলমান আছে তারাও কোনো মতে দিনাতিপাত করছে। তাকে সাহায্য করার মতো সামর্থ্য তাদেরও নেই ।

রাসূল তাকে সান্ত্বনা দিলেন।

এরপর আবার তারা হাঁটতে শুরু করলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর আরেকজন লোক আসল। সে বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের চারদিকে অনেক শত্রু। আমরা মদিনার বাইরে নিরাপদে বের হতে পারি না। মদিনা থেকে বের হলেই চোর-ডাকাত ও কাফেররা আমাদের ওপর হামলা করে।'

রাসূল তার কথা শুনলেন। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে আবার হাঁটতে লাগলেন।

আদি বিন হাতেম এ বিষয়গুলো নিয়ে এবার ভাবতে লাগলেন। তার অর্থ-কড়ির অভাব নেই , তিনি নিজে তো যথেষ্ট মান-মর্যাদার অধিকারী। তার কোনো শত্রু ওৎ পেতে বসে নেই।...

অবশেষে উভয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। রাসূলের ঘরে প্রবেশ করে আদি বিন হাতেম দেখলেন, সেখানে বসার মতো একটাই গদি আছে। রাসূল সেটা সম্মানস্বরূপ আদির দিকে এগিয়ে দিলেন।

আদি বিন হাতেম সেটা রাসূলকে দিয়ে বললেন, 'না, না, আপনি এতে বসুন।'

রাসূল বললেন, 'না, বরং তুমিই বস।'

শেষে আদি বিন হাতেম তাতে বসলেন।

রাসূল ইসলাম ও আদি বিন হাতেমের মধ্যকার দূরত্ব দূর করতে শুরু করলেন।

রাসূল বললেন, 'আদি! তুমি ইসলাম গ্রহণ করে নাও। তাহলে নিরাপত্তা পাবে।'

আদি বললেন, 'আমি তো একটা ধর্ম অনুসরণ করছি।'

রাসূল বললেন, 'আদি! তুমি কোনো ধর্ম অনুসরন করছ তা আমি তোমার চেয়ে ভালো জানি' আদি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'আপনি আমার ধর্ম সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশি জানেন?!'

রাসূল ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ, আমি তোমার চেয়ে বেশি জানি।'

আদি! তুমি কি 'রুকূসিয়া' ফেরকার অন্তর্ভুক্ত নও?'

'রুকূসিয়া' হলো খৃস্টধর্মের একটি শাখা। অগ্নিপূজারীদের ধর্মের সঙ্গে এর কিছুটা মিল আছে।

দেখুন, রাসূল তাদের ধর্মের অভ্যন্তরীণ সে বিশেষ শাখা সম্পর্কেও জানেন। এ জন্য তিনি বলেন নি যে, 'তুমি তো খৃষ্টান;' বরং তার ধর্মের আরো গভীরে গিয়ে বললেন, 'তুমি তো রুকূসিয়া ফেরকাভুক্ত।'

মনে করুন, ইউরোপের কারো সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হলো। সে আপনাকে বললো, 'তুমি খৃস্টান হয়ে যাও।' আপনি বললেন, 'আমি তো একটি দ্বীন অনুসরণ করে চলছি।'

প্রত্যুত্তরে সে আপনাকে এ কথা বললো না যে, 'হ্যাঁ, আমি জানি তুমি মুসলমান।' অথবা 'আমি জানি তুমি সুন্নী।'

বরং সে বললো, 'হ্যাঁ, তুমি তো শাফিঈ বা হাম্বলী মাজহাবের অনুসারী।'

তার কথা শুনে আপনি অবশ্যই বুঝবেন, আপনার দ্বীন সম্পর্কে সে অনেক কিছুই জানে।

এ দক্ষতাটিই আদির সঙ্গে প্রয়োগ করেছিলেন রাসূল আল্লাহর। তিনি আদিকে বললেন, 'তুমি কি রুকূসিয়া ফেরকাভুক্ত নও?'

আদি বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন।'

রাসূল বললেন, 'তুমি যখন দলবল নিয়ে কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর তখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক চতুর্থাংশ নিজে রেখে দাও। তাই না?'

আদি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি এমনই করি।'

রাসূল বললেন, 'এটা তো তোমার ধর্মমতে বৈধ নয়।'

এ কথা শুনে আদি লজ্জিত হয়ে বললো, 'হ্যাঁ, আপনি যথাযথ বলেছেন।'

রাসূল এবার আদিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'ইসলাম গ্রহণ করতে তোমার বাধা কোথায়, তা আমি জানি। তুমি মনে কর, দুর্বল, অসহায় ও দরিদ্র লোকেরাই ইসলাম গ্রহণ করেছে। আরবের প্রভাবশালীরা তো এই ধর্ম গ্রহণ করেনি; বরং তারা একে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। আমি কিভাবে তা গ্রহণ করি?'...'আদি! তুমি কখনো (ইরাকের) হিরায় গিয়েছ? আদি বললেন, 'আমি হিরার নাম শুনেছি। তবে কখনো যাই নি।'

রাসূল বললেন, 'কসম সেই সত্তার, যার হাতে আমার জীবন! এই দ্বীন একদিন পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। একজন নারী সেদিন সুদূর হিরা থেকে একা একা সফর করে বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে। মাহরাম ছাড়া তার কোনো দেহরক্ষী থাকবে না।'

কোনো দেহরক্ষীর সহায়তা ছাড়াই কেবল মাহরাম নিয়ে সে সুদূর হিরা থেকে এসে হজ্জ করে যাবে। দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে বহু শহর-বন্দর অতিক্রম করে মক্কায় পৌঁছে যাবে। তখন তার প্রতি হাত বাড়ানোর বা তার ওপর জুলুম করার অথবা তার সম্পদ কেড়ে নেয়ার সাহস কারো থাকবে না।

তখন মুসলমানরা থাকবে ঐক্যবদ্ধ। ফলে কোনো মুসলমানের প্রতি অন্য কেউ চোখ তুলে তাকানোর সাহসও পাবে না।

আদি বিন হাতেম রাসূলের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। কল্পনায় দেখতে লাগলেন দৃশ্যটি। একজন নারী সুদূর হিরা থেকে মক্কা নগরীতে পৌঁছল। অথচ তার কোনো দেহরক্ষী নেই। তার মানে নারীটি এ উপদ্বীপের উত্তর প্রান্ত তথা আদির গোত্রের পাশ দিয়ে পাহাড়ি এলাকা অতিক্রম করছে। আদি আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলেন, মরুভূমির ত্রাস তাঈ গোত্রের দুর্ধর্ষ যুবকরা তখন কোথায় থাকবে ? সে তাদেরকে অতিক্রম করে কীভাবে আসবে?

এরপর রাসূল বললেন, 'আদি! শোনো, শুধু তাই নয়, মুসলমানরা একদিন কিসরা ইবনে হুরমুযের রাজকোষও দখল করে নেবে।'

আদি ইবনে হাতেম ছানাভরা চোখে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইবনে হুরমুযের রাজকোষ?!'

রাসূল বললেন, 'হ্যাঁ, কিসরা ইবনে হুরমুযের রাজকোষ। মুসলমানগণ তার ধনভাণ্ডার দখল করবে এবং তার সমস্ত সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করবে।'

রাসূল ﷺ আরো বললেন, 'তুমি যদি বেঁচে থাক তাহলে একদিন তুমি দেখবে, ধনীরা হাতভরে সোনারূপা নিয়ে পথে পথে ঘুরবে। কিন্তু সদকা গ্রহণের মতো একজন গরিব মুসলমানও খুঁজে পাবে না।'

মানুষের ধন-সম্পদ তখন এত বেশি হবে যে, দরিদ্র মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে।

রাসূল এরপর আদিকে উপদেশ দিতে লাগলেন। আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে তাকে বললেন, 'সেদিন কিছু লোক মহান আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। তাদের মাঝে কোনো দোভাষী থাকবে না। সে তার ডান দিকে তাকাবে, কিন্তু জাহান্নাম ছাড়া কিছুই দেখবে না। বাম দিকে তাকাবে কিন্তু হায়! সেখানেও দেখবে জাহান্নামের লেলিহান শিখা।'

আদি বিন হাতেম নীরবে চিন্তা করতে লাগলেন।

হঠাৎ রাসূল তাকে চমকে দিয়ে বললেন, 'আদি! কালেমা তাইয়্যেবা পাঠ করে মুসলমান হতে তোমার বাধা কোথায়? তুমি কি আল্লাহর চেয়ে মহান কোনো প্রভুর কথা জান?'

আদি নির্দ্বিধায় বলে উঠল, 'আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।'

আদি বিন হাতেমের ইসলাম গ্রহণে রাসূল যারপরনাই খুশি হলেন। তার পবিত্র চেহারা মোবারকে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল।

জীবন সায়াহ্নে একদিন আদি বিন হাতেম রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি সে নারীকে দেখেছি, যে সুদূর হিরা নগরী থেকে একটি উটের পিঠে চড়ে একাকী পবিত্র মক্কা নগরী সফর করেছে।' আর কিসরা বিন হুরমুযের রাজকোষ যারা হস্তগত করেছিল আমি তাদেরও সাথে ছিলাম। আল্লাহর কসম!

তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটিও সত্য প্রমাণিত হবে। কেননা, তিনি তো আল্লাহর সত্য নবী।'

গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, আদির প্রতি রাসূলের আচরণ কত অমায়িক ছিল। কী মায়া আর ভালোবাসা দিয়ে নবী করীম ﷺ আদিকে বরণ করে নিয়েছিলেন। আর আদিও কিভাবে হৃদয় দিয়ে তা অনুভব করেছিলেন।

রাসূলের এ হৃদয়কাড়া আচরণ আদিকে ইসলাম গ্রহণ করতে কিভাবে আকর্ষণ করেছিল?

এমন ভালোবাসা, এমন আন্তরিকতা আমরাও যদি উজাড় করে দিতে পারি, তাহলে আমরাও অন্যদের মন জয় করতে পারব।

আমরাও পারব মানবতাকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনতে। পারব হাজার হাজার 'আদি...' তৈরি করতে।

একটু চিন্তা করে দেখুন...

কোমলতা ও উন্নত আচরণগত দক্ষতা প্রয়োগ করে
আমরাও পৌঁছতে পারি অভীষ্ট লক্ষ্যে।



৮. উপভোগ করুন আপনার আচরণগত দক্ষতা

উন্নত আচরণগত দক্ষতার সুফল শুধু পরকালে পাওয়া যাবে এমন নয়; বরং এর ফলাফল আপনি বাস্তব জীবনে এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে উপভোগ করতে পারবেন। এর মাধ্যমেই আপনি জীবনের প্রকৃত আনন্দ ও সুখ অনুভব করতে সক্ষম হবেন । তাই এ দক্ষতাকে উপভোগ করতে শিখুন। সব শ্রেণি ও পেশার মানুষের সঙ্গে এর অনুশীলন করুন। বড়-ছোট, ধনী-গরিব, আত্মীয় ও অনাত্মীয় নির্বিশেষে সবার সঙ্গে এ দক্ষতার চর্চা করুন। অন্যের ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে কিংবা তাদের ভালোবাসা লাভ করতে অথবা তাদের সংশোধনের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ করুন।

হ্যাঁ, অন্যের সংশোধনের জন্য প্রয়োজন আচরণগত দক্ষতার যথার্থ ও সুষ্ঠু ব্যবহার।

আলী বিন জাহাম ছিলেন একজন স্বভাবকবি। কিন্তু তিনি ছিলেন বেদুঈন। সভ্য জগতের রীতি-নীতি কিছুই তার জানা ছিল না। সে শুধু জানত মরুভূমির যাযাবরদের জীবন-জীবিকা ও আবেগ-অনুভূতির কথা।

সমকালিন খলিফা মুতাওয়াক্কিল ছিলেন একজন প্রতাপশালী শাসক। তার ইচ্ছা আর মর্জি অনুযায়ী চলতো সবকিছু।

বেদুঈন কবি আলী বিন জাহম একদিন বাগদাদ শহরে উপস্থিত হলেন। কেউ একজন তাকে জানালো, 'সাহিত্যপূর্ণ ছন্দে খলিফার প্রশংসা করতে পারলে তার দরবারে বিশেষ মর্যাদা লাভ করা যায় এবং প্রচুর উপহার-উপঢৌকন পাওয়া যায়।'

এ কথা শুনে আলী খুব খুশি হলেন। আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে খলিফার প্রাসাদের দিকে রওয়ানা করলেন। দরবারে প্রবেশ করে দেখলেন, বহু কবি, সাহিত্যিক, জ্ঞানী ও গুণী সেখানে উপস্থিত। তারা কবিতার মাধ্যমে বাদশাহর প্রশংসা করছে আর বহু মূল্যবান উপহার উপঢৌকন গ্রহণ করছে। আলী যথারীতি দরবারে আসন গ্রহণ করে কবিতার মাধ্যমে খলিফার প্রশংসা করতে লাগলেন।

তার সে প্রশংসাসূচক কবিতার প্রথম চরণগুলো ছিল নিম্নরূপ-

অনুরাগের মান রক্ষার ক্ষেত্রে আপনি কুকুরের ন্যায়!
আর দুর্যোগ দুর্বিপাকে ষাড়ের মত অবিচল!
আপনি বিশাল এক বালতির ন্যায়,
যার মাধ্যমে নিবারণ হয় সবার পিপাসা ।

অন্যান্য কবিরা যেখানে বাদশাহকে তুলনা করেছেন চন্দ্র, সূর্য ও পাহাড়ের সঙ্গে, সেখানে আলী বিন জাহম যাযাবর জীবনের প্রথা অনুযায়ী তার কবিতায় বাদশাহকে তুলনা করতে লাগলেন কুকুর, ষাড় ও বালতির সঙ্গে।

খলিফা তার কবিতা শুনে প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়লেন। প্রহরীরা উত্তেজিত হয়ে পড়ল। জল্লাদ তরবারি খাপমুক্ত করলো। তাকে হত্যা করতে সবাই প্রস্তুত হলো।

কিন্তু খলিফা হঠাৎ শান্ত হয়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, আলী বিন জাহম তার নিন্দা করতে চান নি। যাযাবর জীবনের স্বভাব প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি এভাবে তুলনা করেছেন।

খলিফা তার এ দুর্বলতা পাল্টে দিতে চাইলেন। তিনি তাকে এক মনোরম প্রাসাদে পৌঁছিয়ে দিতে বললেন। যেখানে সকাল সন্ধ্যা রাজ্যের সব রূপসী দাসীরা ভোগ বিলাসের যাবতীয় সামগ্রী নিয়ে তার সেবায় নিয়োজিত থাকবে।

আলী বিন জাহম রাজপ্রাসাদে বসবাস করে ভোগবিলাসের সাথে জীবন উপভোগ করতে লাগলেন। আরামদায়ক মখমলের সোফায় হেলান দিয়ে, কোমল গালিচায় শরীর এলিয়ে দিয়ে বিখ্যাত সব কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গে গল্প করে দিন কাটাতে লাগলেন। এভাবে কেটে গেল সাতটি মাস।

এরপর একদিন খলিফা রাত্রিকালিন গল্পের আসর জমালেন। আলী বিন জাহমকে ডাকা হলো। আলী উপস্থিত হলেন। খলিফা বললেন, 'আলী! আমাকে কবিতা আবৃত্তি করে শোনাও।'

খলিফার নির্দেশে তিনি প্রশংসাসূচক কবিতা রচনা করতে শুরু করলেন।

তবে এবার তার কবিতার প্রথম শ্লোকগুলো ছিল নিম্নরূপ-

রুসাফা আর জিসরের (সেতুর) মধ্যবর্তী এলাকার প্রেয়সীর
ডাগর ডাগর মায়াবী চোখগুলো ,
জানা-অজানা কত পথে আমার দিকে
ভালোবাসার মায়াবান ছুড়েছে ।
সে মায়ার বানে বিদ্ধ হয়ে আমার বিস্মৃত
প্রেমের স্মৃতিগুলো আবার জেগে উঠেছে।
হায়! আমার হৃদয়! হায়!
তুষের আগুনের ন্যায় ধিক ধিক করে জ্বলছে।

এখানে কবি আলী ইবনে জাহম সেকালের আরবি কবিতার প্রচলিত নিয়ম অনুসারে স্তুতিমূলক কবিতা শুরু করার আগে একটি স্মৃতিচারণমূলক ভূমিকা দিয়ে তার কাব্যগাথা শুরু করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি ভাব ও আবেগের মিশ্রনে শ্রোতাদেরকে এক ভিন্ন জগতে নিয়ে গেছেন। এরপর তিনি খলিফাকে একে একে চন্দ্র-সূর্য, তারকা ও তরবারির সঙ্গে তুলনা করে কবিতা রচনা করেছেন।

প্রিয় পাঠক লক্ষ্য করে দেখুন, কীভাবে খলিফা আলী বিন জাহমের কবিস্বভাব পরিবর্তন করতে সক্ষম হলেন। আমাদের বন্ধু-বান্ধব ও সন্তান-সন্ততির স্বভাব ও আচর-আচরণে আমরা কত বিব্রত হই। কিন্তু আমরা কি কখনো চেষ্টা করেছি তাদের সেই স্বভাব পরিবর্তন করতে?

তবে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিজেকে বদলে ফেলার চেষ্টা করা। নিজের দুর্বলতাগুলো ধীরে ধীরে দূর করার চেষ্টা করুন। নিজে বদলে যান অপরকে বদলে দিন। দুঃখকে হাসিতে রূপান্তর করুন। গোস্বাকে সহনশীলতায় এবং কার্পণ্যকে দানশীলতায় পরিবর্তন করুন। এটা খুব কঠিন কাজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন শুধু দৃঢ় সংকল্প আর অবিরাম অনুশীলন। তাই এখনি উদ্যমী হোন। কার্যকরী উদ্যোগ নিন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন চরিত অধ্যয়ন করলে আমরা দেখতে পাই মানুষের সঙ্গে তিনি কত অমায়িক আচরণ করেছেন। চরিত্রের সুরভি দিয়ে তিনি মানুষের অন্তর কীভাবে জয় করে নিয়েছেন। তিনি সুন্দর চরিত্রের অভিনয় করেন নি। তিনি কখনো এমন করেন নি যে, বাইরের মানুষের

সঙ্গে সুন্দর আচরণ করেছেন, ধৈর্য দেখিয়েছেন আর ঘরে গিয়ে রাগ দেখিয়েছেন।

কিংবা অন্য সবার সঙ্গে ছিলেন হাস্যোজ্জ্বল আর নিজের ঘরে এসে হয়েছেন ম্রিয়মান।

বরং তিনি সবসময় সর্বক্ষেত্রে সবার সঙ্গে সেরা আচরণটিই করেছেন। তার আচরণে ছিল না কোনো কৃত্রিমতা। তার চরিত্র ছিল অকৃত্রিম, সরল ও অমায়িক। চাশত ও তাহাজ্জুদের নামাযের মতই মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণকেও তিনি ইবাদত মনে করতেন। মুচকি হাসিকে তিনি আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জনের মাধ্যমে মনে করতেন। নম্র ব্যবহারকে তিনি মনে করতেন ইবাদত। ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণকে তিনি গণ্য করতেন নেক আমল হিসেবে।

সদাচরণকে কেউ ইবাদত মনে করলে সর্বাবস্থায় সে তা বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকে। যুদ্ধ, শান্তি, ক্ষুধা, তৃপ্তি, সুস্থতা , অসুস্থতা , আনন্দ-বেদনা, লাভ-ক্ষতি কোনো অবস্থায়ই সে সদাচরণ বর্জন করে না।

অনেক স্ত্রী নিজেদের ঘরে বসে অন্যদের কাছে নিজের স্বামীদের উদারতা, দানশীলতা ও সদাচরণের মত মহৎ গুণাবলির কথা শোনেন। কিন্তু তারা বাড়িতে এর কিছুই দেখেন না; বরং ঘরে সে উদার স্বামীর ব্যবহার থাকে অনুদার, মেজাজ থাকে রুক্ষ, হৃদয় থাকে সংকীর্ণ, চেহারা হয়ে যায় মলিন। কোমলমতি স্ত্রীদের প্রতি তারা হয়ে যায় নির্দয়, পাষাণ, ঝগড়াটে, হিসেবি ও খোটাদানকারী।

অথচ ঘরের ভেতরে রাসূলের আচরণ কেমন ছিল? তিনি নিজেই তা বলেছেন-

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِه وَانَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.

অর্থ, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম। আর পরিবারের সঙ্গে সদাচরণের ক্ষেত্রে আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।

(সুনানে তিরমিযীঃ ৩৮৩০, সুনানে ইবনে মাজাঃ ১৯৬৭)

এবার দেখুন, কেমন ছিল পরিবারের সঙ্গে রাসূলের আচরণ?

আসওয়াদ বিন ইয়াজিদ (রহ.) বলেন, 'আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়িতে কীরূপ আচরণ করতেন?'

তিনি উত্তরে বললেন, 'পরিবারের বিভিন্ন কাজ-কর্মে সাহায্য করতেন । নামাযের সময় হলে অযু করে নামাযের জন্য বের হয়ে যেতেন ।'

মা বাবার সঙ্গেও সবসময় সুন্দর আচরণ করতে হবে। অনেকেই অন্যদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে, হাসোজ্জ্বল চেহারায় কথা বলে এবং বন্ধুত্বসুলভ ব্যবহার করে। কিন্তু বাবা-মা ও স্ত্রী-সন্তানের মতো যারা নিকটাত্মীয়, যারা উত্তম আচরণ পাওয়ার অধিক হকদার, তাদের সঙ্গে অশোভনীয় আচরণ করে ।

যে তার স্ত্রী, সন্তান, মা, বাবা ও অধীনস্থ লোকজনের সঙ্গে তথা ঘরে-বাইরে সবার সঙ্গে উত্তম আচরণ করে সে-ই উত্তম ।

একদিন আবূ লায়লা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলের কাছে বসা ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ রাসূলের নাতি হাসান বা হুসাইন রাসূলের কাছে চলে এলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আদর করে কোলে বসালেন ।

একটু পরেই সে রাসূলের কোলে পেশাব করে দিল!

আবূ লায়লা বলেন, আমি দেখলাম, রাসূলের কোল থেকে পেশাব গড়িয়ে পড়ছে। আমি দ্রুত রাসূলের কোল থেকে তাকে নিতে হাত বাড়ালাম ।

রাসূল বললেন, 'আমার প্রিয় সন্তান'কে আমার কোলেই থাকতে দাও। তাকে তোমরা ভয় দেখিও না ।'

পেশাব করা শেষ হলে রাসূল পানি আনতে বললেন এবং নিজ হাতেই কোলে পানি ঢেলে দিলেন। (আহমদ ও তাবরানি)

কী চমৎকার নববী আখলাক! উত্তম আখলাক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বাস্তবায়ন করেছিলেন এবং অন্যদেরকেও তার প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। এ কারণেই ছোট-বড় তথা আবাল-বৃদ্ধবনিতা সবাইর হৃদয় তিনি জয় করে নিয়েছিলেন ।

সিদ্ধান্ত...

অন্ধকারকে গালি না দিয়ে

প্রদীপটি মেরামত করে নাও ।



৯. গরিব-দুঃখীদের সঙ্গে কেমন আচরণ করবেন?

বর্তমানে আমাদের আচরণ কমার্শিয়াল হয়ে গেছে। ব্যবসায়ীদের মতো সব কিছুতেই আমরা লাভ খুঁজি। আমাদের সদাচরণ যেন কেবল ধনীদের জন্যই। ধনীদের সঙ্গে কথা বলার সময় আমাদের মুখ থেকে হাসি ঝরে। ধনীদের বড় বড় অন্যায়ও আমাদের দৃষ্টিতে তুচ্ছ মনে হয় এমনকি দেখেও না দেখার ভান করি। ওভারলুক করার চেষ্টা করি।

পক্ষান্তরে গরিব লোকদের সঙ্গে আমাদের আচরণ স্বাভাবিকের চেয়ে কঠিন। তাদের হাসির কথা শুনলেও আমাদের মুখে হাসি আসে না। গরিবরা তুচ্ছ কোনো অপরাধ করলেও তা আমাদের দৃষ্টিতে অনেক বড় হয়ে ধরা দেয়। শোনামাত্রই সমালোচনার ঝড় ওঠে ।

কিন্তু রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আচরণ ধনী-গরিব সবার প্রতি ছিল একরকম।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যাহির বিন হারাম নামক জনৈক বেদুঈন সাহাবী ছিলেন। তিনি কখনো মরু এলাকা থেকে মদিনায় এলে রাসূলের জন্য পনির বা ঘি হাদিয়া নিয়ে আসতেন। ফিরে যাবার সময় রাসূলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে খেজুর ইত্যাদি হাদিয়া দিয়ে দিতেন। রাসূল তাকে খুব ভালোবাসতেন। তার সম্পর্কে বলতেন-

إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوْهُ.

'যাহির আমাদের মরুপ্রান্তর, আর আমরা তার শহর।'

যাহির রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখতে তেমন সুশ্রী ছিলেন না।

একদিন তিনি মরু এলাকা থেকে রাসূলের কাছে এলেন। কিন্তু রাসূলকে বাড়িতে পেলেন না। তার সঙ্গে কিছু পণ্যদ্রব্য ছিল। বিক্রির জন্য সেগুলো নিয়ে তিনি বাজারে চলে গেলেন।

এদিকে রাসূল বাড়ি ফিরে যাহিরের কথা জানতে পেরে তার খোঁজে নিজেই বের হয়ে পড়লেন। বাজারে গিয়ে দেখলেন, যাহির একমনে তার পণ্যদ্রব্য বিক্রি করছে। তার শরীর থেকে ঘাম ঝরছে। সে ঘামে শরীরের কাপড়-চোপড় ভিজে জবজব করছে। গ্রাম্য লোকদের কাপড়-চোপড়ের মতোই

তার কাপড় থেকে ঘামের গন্ধ ভেসে আসছে। রাসূল তাকে দেখছিলেন। কিন্তু সে রাসূলকে দেখতে পেল না।

রাসূল ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে তাকে পেছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরলেন।

যাহির চমকে ওঠলেন। তিনি বুঝতে পারলেন না, কে তাকে এভাবে ধরেছে।

তিনি ঘাবড়ে গিয়ে বলে উঠলেন, 'আমাকে ছেড়ে দিন বলছি। কে আপনি?'

রাসূল ﷺ নিশ্চুপ থাকলেন।

যাহির নিজেকে ছাড়াতে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। হঠাৎ পেছনের দিকে ফিরে তাকালেন। রাসূলকে একপলক দেখেই তার হৃদয়রাজ্যে প্রশান্তির ঢেউ খেলে গেল।

এরপর তিনি নিজের পিঠটিকে রাসূলের পবিত্র বুকের সঙ্গে মিলিয়ে রাখলেন। রাসূল যাহিরের সঙ্গে আরেকটু রসিকতা করতে চাইলেন। তিনি জোরে জোরে বলতে লাগলেন, 'এ গোলামটিকে কে কিনবে? কে কিনবে এ গোলামটিকে?'

রাসূলের কথা শুনে যাহির নিজেকে নিয়ে একটু ভাবল । চোখ বন্ধ করে যাহির দেখতে পেল সে একজন গরিব ও গ্রাম্য বেদুঈন। ধন দৌলত বলতে কিছু নেই। চেহারায়ও নেই কোনো শ্রী। তাই নিজেকে খুব মূল্যহীন মনে হলো তার।

এরপর তিনি বলে ওঠলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! এ গোলামটাকে তো অনেক সস্তায় বিক্রি করতে হবে।'

রাসূল বললেন-

لَكِنْ عِنْدَ اللهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ أَنْتَ عِنْدَ اللهِ غَالٍ.

'কিন্তু আল্লাহর কাছে তো তুমি সস্তা নও। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে তুমি অনেক মূল্যবান।' (ইবনে হিব্বান)

এমন আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ পেলে গরিব-দুঃখীদের মন রাসূলের জন্য যদি পাগল হয়ে যায় তাহলে এতে আশ্চর্যের কী আছে?

অনেক গরিব মানুষ আছেন, যারা ধনীদের কাছে টাকা পয়সা না পেলে কোনো অভিযোগ করে না। কিন্তু তাদের কাছে সুন্দর আচরণ ও মানবিক ব্যবহার না পেলে তাদের ক্ষোভের অন্ত থাকে না।

একটু চিন্তা করে দেখুন...

কয়জন গরিব মানুষ দেখে আপনি মুচকি হেসে তাকে বরণ করে নিয়েছেন?

কয়জন গরিব মানুষকে মূল্যায়ন করেছেন?

তাহলে তো সে রাতের নির্জন মুহূর্তে আপনার জন্য তার হাতদুটো তুলে দোয়া করত।

আপনার জন্য আসমানী রহমত কামনা করে মহান প্রভুর দরবারে রোদন করত।

এলোমেলো চুল, জীর্ণ দেহ আর ছিন্ন বস্ত্রের এমন অনেক মানুষ আছেন দুনিয়ার মানুষের কাছে তাদের কোনো মূল্য না থাকলেও আল্লাহর কাছে তারা অনেক মূল্যবান। তারা আল্লাহর নামে শপথ করে কিছু বলে ফেললে আল্লাহ অবশ্যই তা পূর্ণ করে দেন। তাই এধরনের গরিব ও দুর্বল মানুষদের সঙ্গে সবসময় হাস্যোজ্জ্বল থাকুন।

এক ঝলক...

কোনো গরিব ব্যক্তির প্রতি আপনার এক টুকরা মধুর হাসি
আল্লাহর কাছে আপনার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হতে পারে।



১০. নারীর সঙ্গে আপনার আচরণ যেমন হবে

আমার দাদা উদাহরণ দিতে গিয়ে প্রায়ই একটি আরবি প্রবাদ বাক্য বলতেন, 'কেউ যদি নিজের ছাগীর আবেগ না বোঝে তাহলে ছাগী নিজেই তার সঙ্গী খুঁজে নেয়।' অর্থাৎ স্বামী যদি স্ত্রীর আবেগ অনুভূতি বুঝতে চেষ্টা না করে এবং তার জৈবিক চাহিদা না মেটায় তাহলে সে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

নারী-পুরুষকে ছাগল ও ছাগীর সঙ্গে তুলনা করা এ প্রবাদ বাক্যের উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ মাফ করুন। নারী তো পুরুষেরই অর্ধাঙ্গিনী। জীবনের সহযাত্রী।

নারী পুরুষ কেউ কারো চেয়ে খাটো নয়। পুরুষকে যদি আল্লাহ তায়ালা দিয়ে থাকেন দৈহিক শক্তি, তাহলে নারীকে দান করেছেন প্রবল আবেগ-অনুভূতি। ইতিহাসের কত রাজা-বাদশাহ, বীর-বাহাদুরকে আমরা দেখেছি, নারীর আবেগ-উচ্ছ্বাসের কাছে হার মেনেছে তাদের সব শৌর্য-বীর্য ও বুদ্ধি-সামর্থ্য।

নারীর সঙ্গে আচার-আচরণের কৌশলও আয়ত্ত করতে হয়। নারীর মন জয় করার চাবিকাঠি অর্জন করতে হবে। আর নারীর মন জয়ের সে চাবিটি হলো আবেগ। বস্তুতঃ আবেগ দিয়েই নারীকে কুপোকাত করতে হয়।

রাসূল আমাদেরকে নারীর সাথে সদাচরণ করতে আদেশ করেছেন। তার আবেগ ও অনুভূতির মূল্যায়ন করতে বলেছেন। এর মাধ্যমে আপনার জীবন হবে শান্তিময়। ঘর হবে সুখের ঠিকানা।

রাসূল পিতাকে তার কন্যাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার আদেশ করেছেন। রাসূল বলেছেন-

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَا وَهُوَ وَضَمَّ اَصَابِعَهُ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি 'সাবালক হওয়া পর্যন্ত দু'টি কন্যা সন্তানকে লালন-পালন করবে, হাশরের মাঠে আমি ও সে এভাবে থাকব। এ কথা বলে রাসূল হাতের দুটি আঙ্গুল একত্র করে দেখালেন।' (সহীহ মুসলিম: ৪৭৬৫)

নারীর ব্যাপারে সন্তানদেরকেও রাসূল এমন নির্দেশ দিয়েছেন।

জনৈক ব্যক্তি রাসূলকে একদিন জিজ্ঞস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সদাচরণ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার কে?

রাসূল বললেন, 'তোমার মা।'

লোকটি বললো, 'তারপর?'

'তোমার মা।'

'তারপর?'

'তোমার মা।'

এভাবে তিনবার বলার পর চতুর্থবার রাসূল বললেন, 'তারপর তোমার বাবা।'

শুধু এতটুকুই নয়, স্বামীকেও তিনি স্ত্রীর সঙ্গে সুন্দর আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি স্ত্রীর সঙ্গে রাগারাগি করে কিংবা দুর্ব্যবহার করে, রাসূল ﷺ তার নিন্দা করেছেন।

বিদায় হজ্জের দিন। রাসূল ﷺ জীবনের শেষ খুতবা দিচ্ছেন। রাসূলের সামনে উপস্থিত লক্ষাধিক সাহাবী। সাদা, কালো, ছেলে, বুড়ো, ধনী-গরিব সবাই উৎকর্ণ হয়ে আছে।

রাসূল ﷺ সবার সামনে সরবে বললেন-

اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ . لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ
شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ . اِلَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ . فَاِنْ فَعَلْنَ
فَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَمُبَرِّحٍ . فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ
فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا . اِنَّ لَكُمْ مِنْ نِّسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ
عَلَيْكُمْ حَقًّا . فَاَمَّا حَقُّكُمْ عَلٰى نِسَائِكُمْ ، فَلَا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ
تَكْرَهُوْنَ . وَلَا يَاْذَنَّ فِىْ بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ . اَلَا ، وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ
اَنْ تُحْسِنُوْا اِلَيْهِنَّ فِىْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ .

অর্থ : 'হে লোকসকল! তোমরা নারীদের সঙ্গে সদাচারণের ব্যাপারে আমার অন্তিম উপদেশ গ্রহণ কর। কেননা, তারা তোমাদের নিকট

আবদ্ধ। তোমরা তাদের ব্যাপারে কোনো মালিকানা রাখো না। তবে তারা কোনো প্রকাশ্য অশ্লীল কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হলে ভিন্নকথা। যদি তারা প্রকাশ্যে কোনো অশ্লীল কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের বিছানা আলাদা করে দাও এবং তাদেরকে অল্প প্রহার কর। যদি তারা তোমাদের আনুগত্য স্বীকার করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পন্থা অবলম্বন করতে যেও না। নিশ্চয় তাদের উপর তোমাদের কিছু হক, রয়েছে এবং তাদেরও তোমাদের উপর রয়েছে কিছু হক। তোমাদের অধিকার তোমাদের স্ত্রীদের উপর হলো তারা তোমাদের বিছানায় কাউকে জায়গা দিবে না যাকে, তোমরা অপছন্দ কর। তোমাদের ঘরে এমন কাউকে প্রবেশ করতে দিবে না যাদের প্রবেশ করাটা তোমাদের নিকট সন্তোষজনক নয়। তোমরা জেনে রাখ, তাদের অধিকার তোমাদের উপর হলো তোমরা তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করবে তাদের খাওয়া দাওয়া ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে। (সহীহ মুসলিম: ২৬৭১, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৮৫১)

একদিন নবীপত্নীগণের কাছে কিছু মহিলা এলো। তারা তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ করলো। রাসূল এ কথা শুনে সাহাবীদের ডেকে বললেন-

لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ...

'মুহাম্মদের পরিবারের কাছে অনেক মহিলা এসে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। জেনে রাখ, যারা স্ত্রীদের সঙ্গে অসদাচরণ করে তারা ভালো লোক নয়।'

তিনি আরো বলেছেন-

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.

অর্থ : 'তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো সে ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর কাছে সবচেয়ে ভালো। স্ত্রীদের সঙ্গে সদাচরণের ক্ষেত্রে আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো।' (সুনানে তিরমিযী: ৩৮৩০, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৯৬৭)

ইসলাম নারীকে এত মর্যাদা দিয়েছে যে, একজন নারীর মান রক্ষার্থে বিশাল যুদ্ধ হয়েছে। অনেক বীর বাহাদুর তাদের জীবন বিসর্জন দিয়েছে। রক্তের বন্যা বয়ে গেছে।

মদিনায় কিছু ইহুদিও বসবাস করত। এ জন্য তারা মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিল। পর্দার বিধান অবতীর্ণ হলে তারা মনে মনে ক্ষুব্ধ হলো। মুসলিম রমণীরা পর্দা করুক এটা তাদের কাছে ভালো লাগছিল না। তাই তারা মুসলিম নারীদের মাঝে বিশৃঙ্খলা ও বেপর্দার মনোভাব সৃষ্টি করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তারা তাতে ব্যর্থ হলো।

একদিন জনৈক মুসলিম নারী বনু কায়নুকার বাজারে গেলেন। তিনি ছিলেন পর্দাবৃত। বাজারে গিয়ে তিনি এক ইহুদি স্বর্ণকারের দোকানে বসলেন। সে নারীর হিজাব এবং তার চারিত্রিক নিষ্কলুষতা দেখে ইহুদিদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হলো। তারা তার মুখমণ্ডল এক নজর দেখার জন্য ছটফট করতে লাগল। তাকে স্পর্শ করতে এবং তাকে নিয়ে 'আদিম খেলায়' মেতে ওঠার চিন্তায় তারা বিভোর হয়ে গেল।

ইসলামপূর্ব যুগে নারীদের সাথে তারা যে ধরনের আচরণ করত, এ মুসলিম রমণীর সঙ্গেও তারা তাই করতে চাইল।

তারা তার চেহারা উন্মোচন করতে পীড়াপীড়ি করলো এবং হিজাব খুলে ফেলার জন্য তাকে ফুসলাতে লাগল। কিন্তু নারীটি চেহারা খুলতে অস্বীকার করলো। সে ইহুদি সুযোগে তার পেছন দিক থেকে তার কাপড়ের নিচের অংশ পিঠের ওপর ঝুলে পড়া ওড়নার অংশবিশেষের সঙ্গে বেঁধে দিল।

মহিলা যখন যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল, তখন তার কাপড়ের পেছন দিক থেকে কিছু অংশ ওপরে উঠে গেল এবং শরীরের কিছু অঙ্গ উন্মোচিত হয়ে পড়ল। এ অবস্থা দেখে ইহুদিরা হাসতে লাগল। মহিলা সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল। লজ্জায় সে আড়ষ্ট হয়ে গেল। সে মনে মনে কামনা করছিল, 'এরা যদি আমার পর্দায় আঘাত না করে আমাকে হত্যা করে ফেলত তাহলে ভালো হতো।'

জনৈক মুসলমান বিষয়টি লক্ষ্য করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তরবারি বের করে সে স্বর্ণকার ইহুদিকে শেষ করে দিলেন। এঘটনা দেখে সঙ্গী ইহুদিরা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। তারা সবাই মিলে তাকে হত্যা করে ফেললো।

রাসূল যখন জানলেন ইহুদিরা চুক্তি ভঙ্গ করে একজন মুসলিম রমণীর সম্ভ্রমহানি করেছে তখন তিনি ইহুদিদের এলাকা অবরোধ করলেন।

অবরুদ্ধ থাকার পর তারা আত্মসমর্পণ করলো এবং তাদের ব্যাপারে রাসূলের যেকোনো সিদ্ধান্ত মেনে নিতে সম্মত হলো।

রাসূল যখন তাদেরকে শাস্তি দিতে চাইলেন তখন মুসলিম নামধারী শয়তানের এক চেলা বাধা হয়ে দাঁড়াল। তার কাছে একজন মুসলিম নারীর ইজ্জতের কোনো মূল্য নেই। নারীর মান রক্ষার কোনো খেয়াল তার নেই। উদর ও যৌনাঙ্গের কামনা – বাসনা চরিতার্থ করাই তার জীবনের মূল লক্ষ্য।

সে ছিল মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই । সে দাবি তুলল, 'আমার মিত্র ইহুদিদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।'

জাহেলী যুগে এ ইহুদিরা তার সহযোগী ছিল। রাসূল তার এ দাবি মানতে অস্বীকার করলেন। যারা সবসময় মুসলমানদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়ানোর দুরভিসন্ধি আঁটতে থাকে, তাদের ক্ষমা করার সুপারিশ সে কিভাবে করলো? আর রাসূল ﷺ এ দাবি কিভাবে মানবেন?

কিন্তু মুনাফিক নাছোড়বান্দা। রাসূলকে আবারও সে বললো, 'হে মুহাম্মদ! এদের সাথে সদ্ব্যবহার করুন।'

রাসূল এবারও মুসলমানদের মান সম্মান নারীদের আত্মমর্যাদাবোধের কথা চিন্তা করে আবদুল্লাহ বিন উবাইর আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন।

মুনাফিক সরদার তখন রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। সে রাসূলের লৌহবর্মের ভেতর হাত ঢুকিয়ে টানাটানি করতে লাগল আর বলতে লাগল, 'আমার মিত্রদের প্রতি সদাচরণ করুন। আমার মিত্রদের প্রতি সদাচরণ করুন।'

রাসূল রাগান্বিত হলেন। এরপর সজোরে বললেন, 'আমাকে ছেড়ে দাও।' কিন্তু নির্লজ্জ মুনাফিক সরদার তা সত্ত্বেও ইহুদিদেরকে বাঁচাতে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। অবশেষে চোখলজ্জায় দয়ার নবী বললেন, 'ঠিক আছে, তাদের ব্যাপারে তোমার কথাই থকল।'

রাসূল প্রাণদণ্ড থেকে তাদের মুক্তি দিলেন। তবে পবিত্র ভূমি মদিনা থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করলেন। তাদেরকে এলাকা ত্যাগের নির্দেশ দিলেন।

একজন নারীর মান রক্ষার জন্য প্রয়োজনে এর চেয়েও কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দ্বিধা করা যাবে না।

খাওলা বিনতে সা'লাবাহ ছিলেন পূণ্যবতী এক মহিলা সাহাবী।

তার স্বামী আওস বিন সামেত ছিলেন খুব বৃদ্ধ। একটু এদিক সেদিক হলেই তিনি রেগে যেতেন। একদিন তিনি গোত্রীয় বৈঠক থেকে ফিরে খাওলার কাছে এসে তাকে একটা কাজ করতে বললেন। কিন্তু খাওলা কাজটি করতে অস্বীকার করলো। এতে উভয়ের মাঝে ঝগড়া বেঁধে গেল।

ঝগড়ার একপর্যায়ে আওস প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বললেন, 'তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো!' এ কথা বলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

জাহেলী যুগে কেউ একথা বললে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যেতো। কিন্তু এ ব্যাপারে ইসলামের বিধান কী-খাওলা তা জানতো না।

আওস ঘরে ফিরে লক্ষ্য করলেন, খাওলা তার থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলছেন। একপর্যায়ে খাওলা তাকে বললেন, 'কসম সে সত্তার, যার হাতে খাওলার প্রাণ! তুমি যা বলার তা তো বলেই ফেলেছ। এ ব্যাপারে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বিধান কী তা না জেনে তুমি আমার কাছে আসতে পারবে না।'

এরপর খাওলা রাসূলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। রাসূলের কাছে গিয়ে স্বামীর বক্তব্য তুলে ধরলেন। এরপর স্বামীর পক্ষ থেকে যেসব দুর্ব্যবহার ও অসদাচরণের শিকার হতেন তা জানালেন।

রাসূল সবকিছু শুনে তাকে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিয়ে বললেন, 'হে খাওলা! সে তোমার চাচাতো ভাই এবং একজন বৃদ্ধ মানুষ। তার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর।'

রাসূলের কথা শুনে খাওলা অশ্রুসজল চোখে বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল! যৌবনকালে সে আমাকে বিয়ে করেছে। আমার যৌবন তার হাতে নিঃশেষ হয়েছে। তার সন্তান ধারণের জন্য আমার উদর নিবেদিত হয়েছে। এখন আমার জীবন যৌবন যখন শেষ, সন্তান ধারণের ক্ষমতা আর নেই তখন সে আমাকে তালাক (যিহার) দিল?!'

'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছেই অভিযোগ করছি।'

রাসূল এ সম্পর্কিত বিধান জানতে ওহীর অপেক্ষা করছিলেন। খাওলা তখনো রাসূলের কাছে উপস্থিত। ইতোমধ্যে জিবরাঈল (আ.) উপস্থিত হলেন। আলোচ্য সমস্যার সমাধান নিয়ে তিনি এসেছেন।

রাসূল খাওলাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'খাওলা! তোমার স্বামী ও তোমার ঘটনার সমাধান নিয়ে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।' এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন-

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ.

অর্থ : '(হে নবী!) আল্লাহ সে নারীর কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর ব্যাপারে আপনার সঙ্গে বাদানুবাদ এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ আপনাদের কথোপকথন শুনছেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।' (সূরা মুজাদালাহ: ১)

এভাবে সুরা মুজাদালার শুরু হতে শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করে খাওলাকে বললেন,

'তোমার স্বামীকে বলে দাও সে যেন একটি গোলাম আজাদ করে দেয়।'

খাওলা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! তার তো কোনো গোলাম নেই।'

রাসূল ﷺ: 'তাহলে তাকে লাগাতার দুই মাস রোযা রাখতে বল।'

খাওলা : 'সে তো অতিশয় বৃদ্ধ। এভাবে রোযা রাখার সামর্থ্যও তার নেই।'

রাসূল ﷺ: 'তাহলে তাকে বল, সে যেন সত্তরজন মিসকিনকে এক ওয়াসক করে খেজুর দিয়ে দেয়।'

খাওলা : 'তার কাছে খেজুরও নেই।'

রাসূল ﷺ: 'তাহলে আমি এক ঝুড়ি খেজুর দিয়ে তাকে সাহায্য করব।'

খাওলা : 'তাহলে আমিও তাকে এক ঝুড়ি খেজুর দেব।'

রাসূল বললেন, 'বেশ ভালো। যাও, তার পক্ষ থেকে এগুলো দান করে দাও। আর তার সঙ্গে সদাচরণ কর।' (আহমদ ও আবূ দাউদ)

সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ তার রাসূলকে সকলের সঙ্গে কোমলতা ও সহনশীলতা প্রদর্শনের মতো চারিত্রিক গুণ দান করেছিলেন। এমনকি মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানেও তিনি ছিলেন আন্তরিক ও উদার।

আমি নিজেও আমার স্ত্রী-কন্যাদের সঙ্গে কোমল ও আবেগী আচরণ করে দেখেছি। এর আগেও করেছি মা ও বোনের সঙ্গে। আমি এর কার্যকর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব উপলব্ধি করেছি। এসব আচরণ কৌশলের অনুশীলন ছাড়া কেউ এর প্রভাব উপলব্ধি করতে পারবে না।

এ আলোচনার শেষ পর্যায়ে একটি বাস্তব সত্য বলছি, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই নারীকে সম্মান করে। আর ইতর ও নিম্ন শ্রেণির লোকেরাই নারীকে অবমাননা করে।

একটু থামুন...

স্বামীর দরিদ্রতা, চেহারার শ্রীহীনতা ও
নানামুখি ব্যস্ততা স্ত্রী মেনে নিতে পারে
কিন্তু স্বামীর অসদাচরণ ও রূঢ় ব্যবহার
সে কখনো মানতে পারে না ।



১১. কেমন আচরণ করবেন ছোটদের সাথে

শৈশবের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ বেদনার কত স্মৃতি এখনো আমাদের মনের এ্যালবামে গভীরভাবে অঙ্কিত হয়ে আছে! ভুলতে চাইলেও তা ভোলা যায় না। নিজের অজান্তে সময়ে অসময়ে তা হৃদয়ের বদ্ধ দুয়ার খুলে উঁকি দেয়। আমরা হারিয়ে যাই সেই সুদূর অতীতে। যেখানে আনন্দ আর বেদনা পরস্পরে মিশে তৈরি করে রেখেছে এক চমৎকার আবহ।

তাহলে আসুন কল্পনার পাখায় ভর করে আপনার শৈশবের দিনগুলোতে একটু ঘুরে আসি। দেখবেন সেখানে পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে নানান স্মৃতি। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না আর আনন্দ-বেদনার কি অনুপম মিশেল! একটু রোমন্থন করলেই আপনার চোখের সামনে ভেসে ওঠবে কোনো পুরস্কার প্রাপ্তির স্মৃতি, বিশেষ কোনো সফলতার স্বীকৃতিস্বরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাকে তা দেয়া হয়েছিল। মনে পড়বে বড় কোনো অনুষ্ঠানে কেউ আপনার প্রশংসা করেছিল সেই সুখস্মৃতির কথা।

ওগুলো এমন স্মৃতি, যা আপনার মনের গভীরে এমনভাবে গেথে রয়েছে যা আপনি চেষ্টা করলেও মুছতে পারবেন না।

এর পাশাপাশি এমন কিছু দুঃখময় স্মৃতিও আমাদেরকে তাড়া করে ফেরে যা আমাদের শৈশবে ঘটেছিল। শিক্ষকের প্রহার, সহপাঠীদের সঙ্গে ঝগড়া, পরিবারের কারো পক্ষ থেকে অপমান-লাঞ্ছনায় জর্জরিত হওয়া, সৎ মায়ের প্রতিহিংসামূলক আচরণের শিকার হওয়া ইত্যাদি।

ছোটদের সঙ্গে একটু ভালো ব্যবহার, একটু কোমল আচরণের ফলে শুধু ছোটরাই নয়, তাদের বাবা-মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও প্রভাবিত হন এবং তাদের সবার হৃদয় জয় করা সহজ হয়ে যায়।

প্রাথমিক স্তরে যারা শিক্ষকতা করেন তাদের অনেকেরই এ অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, ছোট ছোট ছাত্রদের বাবা-মায়েরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের প্রশংসা করেন। তাদের সন্তানদেরকে তারা খুব ভালোবাসেন এ জন্য তারাও তাদেরকে খুব ভালোবাসেন। কখনো কখনো তারা তাদের ভালোবাসার এ অনুভূতি আন্তরিক সাক্ষাৎ, হাদিয়া বা পত্র পাঠানোর মাধ্যমেও ব্যক্ত করে থাকেন। তাই ছোটদের সাথে হাসিমুখে কথা বলা, তাদের হৃদয় জয় করা এবং তাদের সঙ্গে কোমল আচরণ করতে ভুলবেন না।

একদিন আমি এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছোট ছোট ছাত্রদের উদ্দেশ্যে নামায সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। আলোচনার এক পর্যায়ে আমি তাদেরকে নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি হাদিস বলতে বললাম। একজন বললো, রাসূল ﷺ বলেছেন-

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

অর্থ : 'ঈমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্য হলো নামায।' (সহিহ মুসলিম: ১১৬)

তার উত্তরে আমি এত বেশি খুশি হলাম যে, আমার হাতের ঘড়িটি খুলে তাকে দিয়ে দিলাম। ঘড়িটি ছিল খুবই সাধারণ মানের। শ্রমিকেরা সাধারণত যে ধরনের ঘড়ি ব্যবহার করে অনেকটাই সে রকম।

আমার সে দিনের আচরণে ছেলেটি খুব অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এরপর সে পড়া-শোনায় আরো বেশি মনোযোগী হলো এবং কুরআন শরিফের হিফজের গুরুত্ব অনুধাবন করে তাতে মনোযোগ দিলো। কয়েক বছর পর একদিন এক মসজিদে নামায পড়তে গিয়ে দেখি সেদিনের ছোট্ট সে ছেলেটিই এখন এ মসজিদের ইমাম। এখন অবশ্য সে পরিপূর্ণ যুবক। ইতোমধ্যে সে শরিয়া অনুষদ থেকে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেছে। ইমামতির পাশাপাশি বর্তমানে সে বিচার বিভাগেও কাজ করে। তাকে আমি প্রথমে চিনতে পারি নি। সে আমাকে তার পরিচয় দিয়ে সে ঘটনাটির কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল।

দেখুন, সামান্য একটি উপহার তার মনে কী গভীর প্রভাব ফেলেছে এবং তার জীবনের মোড় কিভাবে ঘুরিয়ে দিয়েছে।

আরেকবার আমি একটি ওলিমার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলাম। সুন্দর চেহারার এক যুবক আমাকে খুবই আন্তরিকতার সাথে সালাম দিল। এরপর অনেক আগে তার সঙ্গে ঘটে যাওয়া একটি চমৎকার ঘটনা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল। তার শৈশবে আমি একবার তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলাম। তখনকার সে ঘটনাটি আজও তার মনে গেথে আছে।

অনেক সময় দেখবেন, মসজিদ থেকে বের হয়ে ছোট ছোট ছেলেরা বাবার হাত ধরে টেনে একজন লোকের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। বাবা সে লোককে

সালাম করে এবং এ কথা জানায় যে, তার ছেলে তাকে অত্যন্ত ভালোবাসে। এর কারণ এটাই যে, লোকটি ছোটদের সঙ্গে ভালো ও সুন্দর ব্যবহার করে। বড় বড় অনুষ্ঠানেও এ ধরণের ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়।

আমি অকপটে স্বীকার করছি, ব্যক্তিগতভাবে আমি ছোটদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিই। তাদের শিশুসুলভ মিষ্টি কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনি। যদিও তাদের অধিকাংশ কথাবার্তাই সাধারণত বেদরকারি হয়ে থাকে। কখনো কখনো তাদের মা-বাবার প্রতি সম্মানার্থে এবং তাদের মন জয় করতে তাদের প্রতি একটু বেশি মনোযোগ দিয়ে থাকি।

আমার এক বন্ধুর সঙ্গে প্রায়ই আমি সাক্ষাৎ করতাম। সে বন্ধুর ছোট একটি ছেলে ছিল। তার সাথেও সাক্ষাৎ হত। আমি সে ছোট ছেলেটির সাথে খুব স্নেহপূর্ণ আচরণ করতাম। আমার বন্ধুটি তার ছেলেকে নিয়ে হঠাৎ একদিন একটি বড় অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে দেখা করলো। বন্ধুটি আমাকে সালাম দিয়ে বললো, বন্ধু! বল তো, তুমি আমার ছেলেকে কী যাদু করেছ!

কয়েকদিন আগে ওর শিক্ষক ক্লাসের প্রত্যেককে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। ভবিষ্যতে কে কী হতে চায় তা জানতে চাইলেন। একজন বললো, সে ডাক্তার হবে। আরেকজন বললো, সে ইঞ্জিনিয়ার হবে। আর আমার ছেলে বললো, আমি মুহাম্মদ আরিফী হবো! কী আশ্চর্য উত্তর!

ছোটদের সঙ্গে মানুষের আচরণ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। আপনি দেখবেন, বড় কোনো মজলিসে যখন কেউ সবার সঙ্গে মোসাফাহা করে, পেছনে পেছনে তার সন্তানও তার দেখাদেখি সকলের সঙ্গে মোসাফাহ করতে থাকে। তখন কেউ কেউ কেবল বাবার সঙ্গেই মোসাফাহ করে। ছোট সন্তানের প্রতি গুরুত্বই দেয় না। কেউ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাতের সামান্য একটু অংশ বাড়িয়ে দিয়ে কোনোমতে করমর্দন করে। কিন্তু কিছু লোককে দেখতে পাবেন তারা তার সঙ্গেও হাসিমুখে মোসাফাহ করছেন। কেউ কেউ তাকে একটু বাড়তি আনন্দ দিচ্ছেন। তারা তাকে লক্ষ করে বলছেন, 'এই যে দুষ্ট খোকা, কেমন আছ?' ছোট ছেলেটির অন্তরে এ লোকটির প্রতি একটি ভিন্ন ধরনের ভালবাসা তৈরি হয়। কেবল তার অন্তরেই নয়, তার বাবা-মার অন্তরেও লোকটির প্রতি ভালোবাসা জন্ম নেয়।

আদর্শ অভিভাবক রাসূল ﷺ-এর আচরণও ছোটদের সঙ্গে ছিল কোমল ও অনুকরণীয়। আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ছোট একটি ভাই ছিল। রাসূল ﷺ তার সঙ্গে রসিকতা করতেন। রাসূল ﷺ তাকে 'আবূ ওমায়ের' বলে ডাকতেন । আবূ ওমায়েরের ছোট্ট একটি পাখি ছিল। পাখিটি নিয়ে আবূ ওমায়ের খেলা করত। একদিন হঠাৎ পাখিটি মারা গেল। তার সঙ্গে দেখা হলে রাসূল ﷺ রসিকতা করে তাকে বলতেন, 'হে আবূ ওমায়ের! গেল কোথায় নুগায়ের?!' আল্লাহর রাসূল 'নুগায়ের' বলে সে পাখিটিকে বুঝিয়েছিলেন।।

এভাবে রাসূল ﷺ ছোটদের সঙ্গেও স্নেহপূর্ণ আচরণ করতেন। তাদের সঙ্গে নির্মল রসিকতা করতেন। তিনি উম্মে সালমার মেয়ে যয়নাবের সঙ্গেও মজা করতেন। তাকে আদর করে যুওয়াইনিব বলে ডাকতেন।

রাসূল ﷺ খেলায় মগ্ন শিশুদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে সালাম দিতেন। আনসারদের এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময়ও তাদের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে সালাম দিতেন। তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতেন।

রাসূল যখন যুদ্ধ থেকে ফিরে আসতেন তখন ছোট ছোট শিশুরা তাকে অভ্যর্থনা জানাতে ঘর থেকে বের হয়ে আসত। তারা রাসূলের সাথে উটের ওপর ওঠত। তারা রাসূলের পাশে বসত আর আনন্দে নেচে ওঠতো।

মুসলমানরা মুতার যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন। মুজাহিদ বাহিনী মদিনার একেবারে কাছাকাছি এলে রাসূল ﷺ লোকজন নিয়ে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে আসলেন। মদিনার শিশুরাও তাদের সাথে যোগ দিতে লাগল। আল্লাহর রাসূল শিশুদেরকে দেখে সাথীদেরকে বললেন, 'তোমরা এদেরকে তোমাদের উটে উঠিয়ে নাও। আর জাফরের ছেলেকে আমার কাছে দাও।' জাফরের ছেলে আবদুল্লাহকে রাসূলের কাছে দিয়ে আসা হলো। আল্লাহর রাসূল তাকে কোলে তুলে নিলেন এবং নিজের সামনে বসালেন।

রাসূল ﷺ একদিন অজু করছিলেন। পাঁচ বছরের ছোট্ট শিশু মাহমুদ বিন রবী আল্লাহর রাসূলের সামনে আসল। রাসূল ﷺ মুখে পানি নিয়ে সে পানি মাহমুদের চেহারায় ছিটিয়ে দিলেন। এভাবেই রাসূল মাহমুদের সাথে মজা করছিলেন। আর মাহমুদও তা উপভোগ করছিল। (বুখারি)

রাসূল ﷺ সাধারণত সবার সঙ্গে হাসি-খুশি থাকতেন। সদাচরণের মাধ্যমে মানুষের মনে আনন্দ দিতেন। তার সংস্পর্শ ও আচরণ কারো কাছে বিব্রতকর মনে হতো না।

একদিন জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে একটি উট চাইল। উটে চড়ে জিহাদে কিংবা দূরে কোথাও সফরে যাবে। তিনি তার সঙ্গে একটু রসিকতা করে বললেন, 'আমি তোমাকে একটি উষ্ট্রীর বাচ্চা দেব।'

লোকটি বিস্মিত হলো। সে উটের বাচ্চার ওপর কিভাবে চড়বে? উষ্ট্রীর বাচ্চা তো কাউকে বহন করতে পারবে না।

সে বললো, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! উষ্ট্রীর বাচ্চা দিয়ে আমি কী করব!'

রাসূল বললেন, 'আরে মিঞা! বড় উটও তো কোনো না কোনো উষ্ট্রীর বাচ্চাই হয়ে থাকে।!' এ ব্যাখ্যা শুনে লোকটির বিস্ময় কেটে গেল। আল্লাহর রাসূলের নির্মল রসিকতায় সে মুগ্ধ হলো।

একদিন আল্লাহর রাসূল রসিকতা করে আনাসকে বললেন, 'এই যে দু'কানওয়ালা!'

আরেকদিন জনৈক মহিলা আল্লাহর রাসূলের কাছে নিজের স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ নিয়ে এলো। রাসূল ﷺ তাকে বললেন, 'তোমার স্বামী কি সে লোকটি, যার চোখে সাদা?!'

আল্লাহর রাসূলের কথা শুনে মহিলা ভয় পেয়ে গেল। সে ভাবল, তার স্বামী হয়তো অন্ধ হয়ে গেছে। কারণ আল্লাহ তাআলা তো ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বলেছেন, 'দুঃখ-বেদনায় কাঁদতে কাঁদতে তার দুচোখ সাদা হয়ে গেছে।' অর্থাৎ তার দুচোখ অন্ধ হয়ে গেছে।

মহিলাটি ভয়ে অস্থির হয়ে দ্রুত তার স্বামীর কাছে ফিরে এলো এবং ভালো করে তার চোখ দেখতে লাগল!

স্বামী তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে? তুমি এভাবে আমার চোখ দেখছ কেন?'

স্ত্রী বললো, 'আল্লাহর রাসূল বলেছেন, তোমার চোখ নাকি সাদা!'

তখন স্বামী বললো, 'আরে বোকা মেয়ে! আল্লাহর রাসূল বোঝাতে চেয়েছেন যে, চোখের সাদা অংশ কালো অংশের চেয়ে পরিমাণে বেশি!'

অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের চোখের কিছু অংশ কালো, কিছু অংশ সাদা। তবে সাদা অংশই বেশি ।

রাসূলের সঙ্গে কেউ রসিকতা করলে তিনি তা উপভোগ করতেন এবং মুচকি হেসে তার জবাব দিতেন।

একবার রাসূল ﷺ -এর স্ত্রীগণ অধিক খোরপোষ দাবি করায় রাসূল আপন স্ত্রীগণের প্রতি কিছুটা অসন্তুষ্ট হলেন। এমন সময় ওমর রাদিআল্লাহু আনহু উপস্থিত হলেন। ওমর বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আমাদের কোরাইশ বংশের লোকদের স্ত্রীরা সবসময় আমাদের অনুগত থাকত। কেউ অতিরিক্ত খোরপোষ চাইলে আমরা তার ঘাড় মটকে দিতাম। কিন্তু হিজরতের পর মদীনায় এসে দেখতে পেলাম, এখানকার মহিলারা পুরুষদেরকে পরিচালনা করে। তাদের দেখা-দেখি আমাদের মহিলারাও এমন হয়ে গেছে। তারাও এখন আমাদের উপর ছড়ি ঘোরাতে শুরু করেছে।'

ওমরের কথা শুনে আল্লাহর রাসূল না হেসে পারলেন না। ওমরও কথার পিঠে কথা বলতে লাগলেন। রাসূল ﷺ তার কথার সঙ্গে হাসতে লাগলেন। ওমরও রাসূল ﷺ-এর হাসি মনভরে উপভোগ করলেন।

আপনি অনেক হাদিসে পড়েছেন, আল্লাহর রাসূল অনেক সময় এতো বেশি হেসেছেন যে, তাঁর দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত দেখা গেছে। বস্তুত: রাসূল ﷺ সবার সঙ্গে হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন। মজলিসের সবাই তাকে মনেপ্রাণে ভালোবাসতেন।

আমরাও যদি সবার সঙ্গে এমন আচরণ করতে পারি তাহলে আমরাও জীবনের স্বাদ অনুভব করতে সক্ষম হব।

একটি চিন্তা...

শিশুরা হলো নরম কাদামাটির ন্যায়।

আমরা তাদের সঙ্গে যেমন আচরণ করব তারাও সেভাবে বেড়ে ওঠবে।



১২. অধীনস্থদের সঙ্গে আপনার আচরণ

রাসূল ﷺ দাস-দাসী ও অধীনস্থদের মনও যেভাবে দরকার সেভাবে জয় করে নিতেন। যেভাবে কথা বললে তারা খুশি হবে তাদের সাথে সেভাবে কথা বলতেন। তাদের মনোভাব ও আবেগ অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করতেন।

যতদিন চাচা আবূ তালেব বেঁচে ছিলেন। ততদিন রাসূল মোটামুটি নিরাপদ ছিলেন। কিন্তু চাচা আবূ তালেবের মৃত্যুর পর কোরাইশরা রাসূলকে নিপীড়ন করার সীমা ছাড়িয়ে গেল। তাই রাসূল ﷺ তায়েফে গেলেন। রাসূল মনে করেছিলেন, সাকীফ গোত্র তাকে সাহায্য করবে। তিনি যে দীন নিয়ে এসেছেন তারা তা গ্রহণ করবে। এ আশায় বুক বেঁধে তিনি একাই তায়েফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

যথাসময়ে তিনি তায়েফে পৌঁছলেন। সেখানকার সাকিফ গোত্রের বড় বড় তিনজন নেতার সাথে তিনি সাক্ষাৎ করলেন । তারা ছিল সহোদর ভাই। একজনের নাম আবদে ইয়ালীল, অন্যজনের নাম মাসুদ, আর তৃতীয়জনের নাম হাবীব। তাদের পিতা ছিল আমর বিন ওমায়ের।

রাসূল ﷺ তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিলেন। ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন। আর মক্কার যেসব লোক তার বিরোধীতা করছে তাদের বিরুদ্ধে রাসূলকে সাহায্য করার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তারা কঠোর ভাষায় রাসূল ﷺ -এর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলো।

একজন বললো, 'আল্লাহ যদি তোমাকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়ে থাকেন তাহলে আমি কাবার গিলাফ ছিঁড়ে ফেলব।'

অন্যজন বললো, 'আল্লাহ কি তোমাকে ছাড়া নবী বানানোর মতো আর কাউকে পান নি?'

তৃতীয়জন দার্শনিকের ভঙ্গিতে বললো, 'আমি তোমার সঙ্গে কথাই বলব না। কারণ তুমি যদি সত্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল হয়ে থাক তাহলে তোমার কথার জবাব দেয়া আমার জন্য বিপজ্জনক! আর যদি তুমি মিথ্যা বলে থাক তাহলে তো তোমার সঙ্গে আমার কথা বলার কোনো প্রয়োজনই নেই।'

তাদের এ অনাকাঙ্ক্ষিত উত্তর শুনে রাসূল তাদের কাছ থেকে চলে এলেন। তিনি সাকীফ গোত্রের কাছ থেকে কল্যাণকর কিছু পাওয়ার আশা ছেড়ে দিলেন। তবে তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, তায়েফবাসীর এ প্রত্যাখানের সংবাদ জানতে পারলে কোরাইশরা আরো দুঃসাহসী হয়ে উঠবে। তারা আগের চেয়ে বেশি উৎপীড়ন করবে। তাই তিনি তাদেরকে বললেন, 'তোমরা আমার কথা না মান কিংবা আমার সহযোগিতা না কর তাতে আপাতত দুঃখ নেই, কিন্তু আমি যে তোমাদের কাছে এসেছিলাম তা কাউকে জানিয়ে দিয়ো না। এটা গোপন রেখ।'

কিন্তু তারা তা মানল না; বরং রাসূল ﷺ-কে নিপীড়ন করার জন্য তারা নিজেদের কিছু ক্রীতদাস ও নির্বোধ লোককে তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিল। তারা তাকে গালি দিতে লাগল, চিৎকার করে তাকে বিদ্রুপ করতে লাগল। তাদের এই চেঁচামেচিতে রাসূলের আশপাশে অনেক মানুষ জড়ো হয়ে গেল।

এভাবে উপহাস করতে করতে তারা তাকে রাবীয়ার পুত্র ওতবা ও শায়বার একটি বাগান পর্যন্ত নিয়ে গেল। এরপর তারা চলে গেল। ওতবা ও শায়বা তখন বাগানেই ছিল। রাসূল ﷺ সে বাগানে প্রবেশ করে একটি আঙুর গাছের ছায়ায় হেলান দিয়ে বসে পড়লেন।

ওতবা ও শায়বা রাসূলকে দেখতে পেলো। তায়েফবাসীদের পক্ষ থেকে তিনি যে নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন তাও তারা দেখেছিল। এটা দেখে তাদের অন্তরে রাসূলের প্রতি মায়া লাগল।

তারা তাদের এক খৃস্টান গোলাম আদ্দাসকে ডেকে বললো, 'গাছ থেকে এক থোকা আঙুর পেড়ে তশতরিতে রেখে গাছের নীচে হেলান দিয়ে বসে থাকা ঐ লোকটিকে খেতে দিয়ে এসো।'

আদ্দাস আঙুর নিয়ে আল্লাহর রাসূলের সামনে রেখে বললো, 'নিন, এখান থেকে খান।'

আল্লাহর রাসূল হাত বাড়িয়ে 'বিসমিল্লাহ' বলে খেতে লাগলেন।

আদ্দাস বললো, 'আল্লাহর শপথ! আপনি যে শব্দটি উচ্চারণ করলেন তা তো এ অঞ্চলের কারো মুখে শুনি নি।'

রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আদ্দাস! তোমার আসল বাড়ি কোথায়? তুমি কোনো ধর্মের অনুসারী?'

সে বললো, 'আমি খৃষ্টধর্মের অনুসারী আর আমার বাড়ি নীনওয়ায়।'

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি কি আল্লাহর প্রিয় বান্দা ইউনুস বিন মাত্তার এলাকার লোক?'

আদ্দাস বললো, 'ইউনুস ইবনে মাত্তাকে আপনি চেনেন?'

রাসূল ﷺ বললেন, 'তিনি আমার ভাই। তিনি নবী ছিলেন। আমিও নবী।'

এ কথা শুনে আদ্দাস রাসূলের কপালে ও হাতে-পায়ে চুমু খেতে লাগল। ওতবা এবং শায়বা এ দৃশ্য দেখে একে অপরকে বলতে লাগল, 'মুহাম্মদ আমাদের গোলামের মাথাটাও নষ্ট করে দিল!'

এরপর আদ্দাস তার মালিকের কাছে ফিরে এল। তার চেহারায় রাসূল ﷺ-এর দর্শন ও কথোপকথনের বিশেষ দ্যুতি চকচক করছিল। তার মালিক তাকে বললো, 'কী ব্যাপার, আদ্দাস! তুমি লোকটার কপালে ও হাতে-পায়ে চুমু খেলে কেন?'

আদ্দাস বললো, 'মনিব আমার! পৃথিবীতে এই লোকটির চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই। তিনি আমাকে এমন তথ্য দিয়েছেন, যা কোনো নবী ছাড়া অন্য কেউ বলতে পারেন না।'

এ কথা শুনে তার মনিব বললো, 'আদ্দাস! যাই হোক তুমি! সাবধান থেকো। সে যেন তোমাকে তোমার ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে না পারে। তোমার ধর্ম তো তার ধর্মের চেয়ে অনেক ভাল।'

প্রিয় পাঠক, শ্রেণি, পেশা ও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার সঙ্গে আমাদের আচরণকে আমরা কি সবচেয়ে সুন্দর করতে পারি না?

এক পলক...

মানুষকে মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখুন।
মানুষের সঙ্গে একজন মানুষ হিসেবেই আচরণ করুন।
ধর্ম-বর্ণ, বংশ-গোত্র ও পেশা-পদবীর প্রতি লক্ষ করবেন না।



১৩. বিরোধীদের সাথে

রাসূল ﷺ কাফেরদের সঙ্গেও ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতেন। ইসলামের দিকে দাওয়াত ও মানবাত্মার পরিশুদ্ধি করতে গিয়েও তাদের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা , গালি গালাজ ও নিপীড়ন হাসিমুখে সহ্য করতেন। তাদের সব ধরনের অসদাচরণ তিনি এড়িয়ে যেতেন।

এমন হবে না বা কেন? আল্লাহ তাআলা তো তার সম্পর্কেই বলেছেন, 'আমি তোমাকে জগতসমূহের জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।'

তাই তিনি শুধু মুমিনদের জন্যই রহমত নন; বরং সমস্ত জগতের জন্য ও জগদ্বাসীর জন্য রহমত। ইহুদিদের অবস্থা চিন্তা করে দেখুন। তারা আল্লাহর রাসূলের নিন্দা করেছে, তার সঙ্গে শত্রুতামূলক আচরণ করেছে। কিন্তু তবুও তিনি তাদের সঙ্গে সর্বোত্তম আচরণ করেছেন।

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, ইহুদিরা একদিন আল্লাহর রাসূলের ঘরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। তখন তারা বললো 'আসসা-মু আলাইকুম'। (অর্থাৎ 'আপনার মৃত্যু হোক!')

আল্লাহর রাসূল তখন এর জবাবে বললেন, 'ওয়া আলাইকুম' । অর্থাৎ আমার নয়, তোমাদের। কিন্তু আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা তাদের কথা শুনে রাগ হজম করতে পারলেন না। তিনি বললেন, 'আসসা-মু আলাইকুম (তোমাদের মৃত্যু হোক), আল্লাহ তোমাদের অভিশপ্ত করুন এবং তোমাদের ওপর গজব আপতিত করুন।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'আয়েশা! একটু থামো। সবার সঙ্গে নরম ও কোমল আচরণ করবে। কঠোরতা ও অশ্লীল আচরণ থেকে বিরত থাকবে।'

আয়েশা বললেন, 'তারা কী বলেছে তা কি আপনি শোনেন নি?'

রাসূল ﷺ বললেন, "তাদের কথার উত্তরে আমি কী বলেছি তা কি তুমি শোনো নি? আমি তাদের কথা তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছি। (অর্থাৎ তোমাদের জন্য সে দোয়াই কবুল হোক, যা তোমরা আমার জন্য করেছ।) আমার দোয়া আল্লাহ কবুল করবেন, আর তাদের দোয়া কবুল হবে না। গালির জবাবে গালি দেয়ার কী দরকার? আল্লাহ কি বলেন নি, 'আপনি মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলুন'?"

একদিনের ঘটনা: রাসূল ﷺ সাহাবীগণসহ কোনো এক জিহাদে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে তারা গাছ-গাছালিতে পরিপূর্ণ একটি উপত্যকায় অবতরণ করলেন। সাহাবীগণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন গাছের নীচে ঘুমিয়ে পড়লেন। রাসূল ﷺ ও একটি গাছের ডালের সঙ্গে নিজের তরবারি বেঁধে গাছের নীচে চাদর বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

এদিকে জনৈক মুশরিক মুসলিম বাহিনীকে দূর থেকে গোপনে অনুসরণ করছিল। রাসূল ﷺ-কে একাকী ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ঘুমাতে দেখে সে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এল। গাছের ডাল থেকে তরবারিটি হাতে নিল। এরপর সে চিৎকার করে বললো, 'হে মুহাম্মদ! আজ তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?'

আল্লাহর রাসূল ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। শিয়রে উন্মুক্ত তরবারি হাতে শত্রু দন্ডায়মান। তরবারির ফলা থেকে মৃত্যুর ঝলক ছড়িয়ে পড়ছে। আল্লাহর রাসূল একাকী। শরীরে কোনো বর্ম নেই, পরনে কেবল একটি লুঙ্গি। সঙ্গী-সাথিরা সবাই দূরে, বিক্ষিপ্ত ও ঘুমে অচেতন।

মুশরিক লোকটি তার আরাধ্য জয়ের উল্লাসে ও শক্তির উন্মাদনায় বারবার বলছিল, 'আজ তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?'

কিন্তু এমন ভয়ানক পরিস্থিতিতেও আল্লাহর রাসূল শান্ত ও অবিচল কণ্ঠে শুধু একটি শব্দ উচ্চারণ করলেন, 'আল্লাহ'।

আল্লাহর রাসূলের এ উচ্চারণে কী অসীম শক্তি নিহিত ছিল তা কে জানে? এ শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মুশরিক লোকটির সর্বাঙ্গে কম্পন সৃষ্টি হলো। ভয়ে তার হাত থেকে তরবারিটি পড়ে গেল।

রাসূল ﷺ উঠে দাঁড়ালেন এবং তরবারিটি হাতে তুলে নিলেন। পাল্টে গেল দৃশ্যপট। রাসূলের হাতে তরবারি। মুশরিক লোকটি এখন নিরস্ত্র।

রাসূল ﷺ অত্যন্ত শান্তকণ্ঠে বললেন, 'এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?'

এ কথা শুনতেই লোকটির চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। সে থরথর করে কাঁপতে লাগল। মৃত্যুর শীতল বাতাস যেন তার ঘাড়ের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হতে লাগল। উপায়ন্তর না দেখে রাসূলের কাছে ক্ষমা চাইতে

লাগল। কাতর স্বরে বললো, 'আপনার হাত থেকে আমাকে বাঁচানোর মতো কেউ নেই। আমার প্রতি দয়া করুন। আমার মতো অধম নয়; বরং উত্তম আচরণ করুন।'

রাসূল বললেন, তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করবে?'

সে বললো, 'না। তবে যারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আমি তাদের সঙ্গী হব না।'

আল্লাহর রাসূল তাকে ক্ষমা করে দিলেন। তার সঙ্গে উত্তম আচরণ করলেন। তাকে মুক্তি দিয়ে সসম্মানে বিদায় জানালেন।

লোকটি ছিল নিজ গোত্রের প্রধান। গোত্রে ফিরে গিয়ে সে আলোচ্য ঘটনাটি সবাইকে শোনাল। এরপর গোত্রের সবাইকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাল। তার আহ্বানে গোত্রের সবাই মুসলমান হয়ে গেল।

এভাবে সুন্দর আচরণের মাধ্যমে আপনিও পারেন মানুষের হৃদয় জয় করতে। চরম শত্রুকেও পারেন বন্ধুতে রূপান্তর করতে। ভেঙ্গে দিতে পারেন দুশমনির মজবুত দেয়াল।

রাসূল ﷺ ছিলেন সর্বোত্তম আখলাকের অধিকারী। এ আখলাকের মাধ্যমেই তিনি মানুষের হৃদয়-মন জয় করেছেন। হেদায়েতের পথ দেখিয়েছেন। দূর করেছেন হৃদয় থেকে কুফরির অমানিশা ।

রাসূল ﷺ যখন প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন তখন কুরাইশের লোকেরা তার মোকাবেলায় সব ধরনের উপায় ও পন্থা অবলম্বন করলো। রাসূল ﷺ-এর দাওয়াতি মিশনও দ্রুত ছড়িয়ে পড়া ইসলামের গতি কীভাবে রোধ করা যায় তা নিয়ে তাদের বয়োঃজ্যে'ও প্রবীণরা পরামর্শ সভা ডাকল।

সবার মধ্যে যিনি সবচেয়ে প্রবীণ তিনি বললেন, 'মোহাম্মদের এ মিশনের পেছনে কী লুকিয়ে আছে তা খুঁজে বের করতে হবে। তার আসল উদ্দেশ্য কী তা আমাদের জানতে হবে। এ জন্য যাদুবিদ্যা, জ্যোর্তিবিদ্যা ও কাব্যশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এমন একজন লোক খুঁজে বের করে তাকে মোহাম্মদের কাছে পাঠাও। সে তার কাছ থেকে তার আসল উদ্দেশ্য বের করে নিয়ে আসবে। এরপর আমরা আমাদের করণীয় ঠিক করব। একে রোধ করতে

না পারলে আমাদের সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমাদের নেতৃত্ব, আমাদের পরিবার ও আমাদের সমাজ সব ধ্বংস হয়ে যাবে।'

সবাই সমস্বরে বললো, 'এটা সবচেয়ে সুন্দর প্রস্তাব। এর বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে ওতবা বিন রবিয়ার চেয়ে যোগ্য আর কেউ নেই।'

তখন সবাই মিলে ওতবাকে বললো, 'ওতবা! তুমিই এ কাজের যোগ্য। তুমিই যাও। দেখ, সে কী বলে। ওতবা ছিল ধৈর্যশীল, বিচক্ষণ ও নেতৃস্থানীয় লোক। সে বললো, 'তোমরা আসলে কী চাও? তোমরা কি চাও যে, আমি বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন দিয়ে তাকে নিবৃত করতে চেষ্টা করব?'

তারা বললো, 'হ্যাঁ, আবূল ওলিদ আমরা এমনটাই চাচ্ছি।'

ওতবা রাসূল ﷺ-এর কাছে গেল। রাসূল ﷺ তখন শান্তভাবে বসে ছিলেন। ওতবা রাসূলের কাছে গিয়ে বসল। এরপর প্রথমেই বললো, 'মুহাম্মাদ! তুমি উত্তম না তোমার পিতা আবদুল্লাহ উত্তম?'

আল্লাহর রাসূল কোনো জবাব দিলেন না। বাবার সম্মানার্থে চুপ থকলেন।

ওতবা এরপর বললো, 'মুহাম্মদ! তুমি উত্তম না আবদুল মুত্তালিব উত্তম?'

রাসূল ﷺ এবারও চুপ থাকলেন। আবদুল মুত্তালিবের সম্মান রক্ষার্থে কোনো কথা বললেন না।

এরপর ওতবা বললো, 'তুমি যদি মনে কর এরা তোমার চেয়ে উত্তম তাহলে তো তোমারও তাদের অনুসরণ করা উচিত। তারা তো মূর্তিরই উপাসনা করতো। অথচ তুমি মূর্তির নিন্দাবাদ করছো। আর যদি মনে কর তুমি তাদের চেয়ে উত্তম তাহলে তা স্পষ্ট করে বল।

রাসূল ﷺ কোনো জবাব দেয়ার আগেই ওতবা খুব উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল 'আল্লাহর কসম! আমি কোনো জাতির সন্তানকে তোমার চেয়ে দুর্ভাগা ও অপয়া দেখি নি। তুমি আমাদের ঐক্য বিনষ্ট করেছ। আমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছ। আমাদের ধর্মকে কলুষিত করেছ। পুরো আরবে আমাদের মানহানি করেছ। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে যে, কোরাইশদের মাঝে একজন যাদুকরের আর্বিভাব ঘটেছে। কোরাইশইদের মাঝে একজন গণকের উদ্ভব হয়েছে। আমাদের এ অবস্থার চূড়ান্ত পরিণতি হলো,

একদিন আমরা সবাই একে অন্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাব এবং ভ্রাতৃঘাতি লড়াই করতে করতে সবাই একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাব।'

কথাগুলো বলতে বলতে ওতবা ক্রোধে ফেটে পড়ছিল। রাগে ক্ষোভে তার চেহারা আগুনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। কিন্তু আল্লাহর রাসূল দিঘির জলের ন্যায় শান্ত হয়ে বসে নীরবে ও মনোযাগ সহকারে তার সব কথা শুনতে লাগলেন।

এরপর ওতবা রাসূলকে দাওয়াতের মিশন থেকে নিবৃত করতে একে একে বিভিন্ন লোভনীয় প্রস্তাব পেশ করতে লাগল।

সে বললো, 'মুহাম্মদ! তুমি যা করেছ, এগুলো যদি সম্পদ লাভের জন্য হয়ে থাকে তাহলে আমাদের কথা কোনো, আমরা তোমাকে এত বিপুল পরিমাণে সম্পদ সংগ্রহ করে দেব যে, তুমিই হবে কুরাইশের সবচেয়ে বড় ধনী।'

'তোমার মনে যদি নেতৃত্বের বাসনা জেগে থাকে, তাহলে বল। আমরা তোমাকে পুরো আরবের নেতা বানিয়ে দেব। তোমার কথায় সবাই উঠবে আর বসবে।'

'সম্পদ বা নেতৃত্ব যদি তোমার কাম্য না হয়ে থাকে তাহলে তোমার আরাধ্য বস্তুটা কী? অপরূপ সুন্দরী কোনো নারী? নিঃসঙ্কোচে তাও বলতে পারো। কোরাইশদের যে নারীকেই তুমি পেতে চাও তাকেই পাবে। তুমি যদি বল অপরূপা সুন্দরী নারী দেখে তোমাকে দশটি বিয়ে করিয়ে দেব।'

তুমি যদি মনে কর এগুলো কিছুই তোমার কাম্য নয়; বরং তুমি যা করছ তা কোনো বদ জ্বিন বা ক্ষতিকর কোনো অশরীরি সত্ত্বার প্রভাবে হচ্ছে, যা তুমি নিজে নিজে দূর করতে পারছ না তাহলে তাও বল। আমরা আরবের শ্রে'কবিরাজ খুঁজে বের করে এর চিকিৎসা করব। এজন্য যত টাকা দরকার আমরা সব ব্যবস্থা করব।'

ওতবা এভাবে অশালীন ভাষায় কথা বলতে লাগল এবং একের পর এক রাসূলকে বিভিন্ন ধরনের লোভ দেখাতে লাগল। রাসূল ﷺ শান্তভাবে তার কথা শুনে যাচ্ছিলেন। অর্থ-সম্পদ, নেতৃত্ব-ক্ষমতা, সুন্দরী নারী, জিনের তদবির তার এসব লোভনীয় প্রস্তাবপূর্ণ বক্তব্য শেষ হলো।

দীর্ঘসময় কথা বলে একসময় ওতবা থামল। কাঙ্ক্ষিত উত্তরের অপেক্ষায় সে অধীর অপেক্ষায় প্রহর গুনতে লাগল। এক একটি মুহূর্ত তার কাছে অনেক দীর্ঘ।

রাসূল ﷺ তার দিকে মাথা উঁচু করে তাকালেন। শান্ত স্বরে বললেন, 'ওতবা! তোমার কথা কি শেষ হয়েছে?'

ওতবা সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত রাসূলে আরাবির এ সৌজন্যবোধ ও ভদ্রতায় একটুও বিস্মিত হলো না। শুধু সংক্ষেপে বললো, 'হ্যাঁ'।

রাসূল ﷺ বললেন, 'তাহলে আমার কথা শোনো।'

সে বললো, 'ঠিক আছে, আমি শুনছি।'

রাসূল ﷺ বলতে শুরু করলেন। তবে একটি কথাও নিজ থেকে বললেন না। পাঠ করতে লাগলেন কুরআনে কারীম থেকে-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ...وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا...

অর্থ : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ...মানুষকে সুন্দর কথা বলুন...।
(সূরা বাকারা : আয়াত-৮৩)

রাসূল ﷺ তিলাওয়াত করে যাচ্ছেন আর ওতবা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনছে। একসময় ওতবা হাত পা ছেড়ে মাটিতে বসে পড়ল। সে পেছনে হাত নিয়ে মাটিতে ভর দিয়ে শুনতে লাগল রাসূলের তিলাওয়াত। তার শরীর দুলে উঠল। হৃদয় নড়ে উঠল। মনের রাজ্যে বয়ে গেল তুমুল ঝড়। রাসূল ﷺ একমনে নিবিষ্ট চিত্তে তিলাওয়াত করে যাচ্ছেন। এভাবে তিলাওয়াত করতে করতে তিনি পৌঁছলেন এ আয়াতে-

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ.

'তারা যদি আপনার কথা প্রত্যাখ্যান করে তাহলে বলুন, আমি তোমাদেরকে বজ্রপাতের ভীতি প্রদর্শন করছি, যেমন বজ্রপাত হয়েছিল আদ ও সমুদ সম্প্রদায়ের ওপর।' (সূরা হা মীম সাজদা: ১৩)

কঠিন আজাবের এ সতর্কবাণী শুনে ওতবা ঘাবড়ে গেল এবং রাসূল ﷺ-এর মুখের ওপর হাত রাখল, যেন তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করে দেন। কিন্তু

তিনি তিলাওয়াত করতে থাকলেন। তিলাওয়াত করতে করতে তিনি সিজদার আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে সিজদা করলেন।

সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে তিনি ওতবার দিকে তাকালেন। বললেন, 'ওতবা! তুমি কি আমার তিলাওয়াত শুনেছ?'

সে বললো, 'হ্যাঁ, শুনেছি।'

'এবার তুমি কী করবে ভেবে দেখ।'

ওতবা উঠে তার দলবলের কাছে গেল। তারাও অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তার আগমনের পথ চেয়েছিল। ওতবা তাদের কাছে পৌঁছতেই একজন আরেকজনকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'আল্লাহর কসম! এ ওতবা তো সে ওতবা নয়। তার চেহারায় পরিবর্তনের আবহ দেখা যাচ্ছে।'

ওতবা কাছে এসে বসল। তারা বললো, 'কী ব্যাপার! কী করে এলে?'

ওতবা বললো, 'আল্লাহর কসম! আমি মুহাম্মাদের কাছে এমন কিছু শুনেছি, যা জীবনে কখনো শুনি নি। আল্লাহর কসম! এগুলো না কবিতা না যাদু না গণকবিদ্যা।'

'হে কুরাইশের নেতৃবৃন্দ! তোমরা আমার কথা শুন। সে যা করছে, তাকে তা করতে দাও। সে যা বলছে, তা অবশ্যই বড় কোনো কিছু হবে।'

'সে আমার সামনে বেশ কিছু আয়াত তিলাওয়াত করলো। সে পড়ল,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . حٰمٓ ۚ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ . بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا .

অর্থ : 'হা-মীম। এটি পরম করুণাময় অতি দয়ালু সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব। এটি এমন কিতাব, যার আয়াতগুলোকে আলাদা আলাদা করে করে বর্ণনা করা হয়েছে। আরবি কুরআন বুঝতে পারে এমন সম্প্রদায়ের জন্য। মানুষকে সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী।... এক পর্যায়ে পড়ল,

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ .

অর্থ : 'তারা যদি আপনার কথা প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তাদেরকে বলুন, আমি তোমাদেরকে বজ্রপাতের ভীতি প্রদর্শন করছি, যেমন বজ্রপাত হয়েছিল আদ ও সামুদ সম্প্রদায়ের ওপর।'

তখন আমি তার মুখ চেপে ধরলাম এবং আত্মীয়তার শপথ দিয়ে তাকে সামনে তিলাওয়াত বন্ধ করতে বললাম। আর তোমরা তো জান, মুহাম্মদ যখন কিছু বলে ফেলে তখন তার ব্যতিক্রম হয় না। তাই আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে, তোমাদের ওপর আজাব নেমে আসে কি-না।'

এরপর ওতবা একটু নীরব রইল। সে ভাবনার সাগরে ডুবে গেল। বৈঠকের লোকেরা গভীর দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল।

ভাবনার জগত থেকে ফিরে এসে ওতবা বললো, 'আল্লাহর শপথ! মুহাম্মদের কথায় এক ধরনের মধু আছে। তার কথায় এক রকমের রসও আছে। তার কথায় থাকে উপকারী ফলের সমাহার। আর গোড়ায় থাকে সুমিষ্ট পানির প্রস্রবণ। কথার আসরে সে থাকে সবার ওপরে। তার ওপরে যাওয়া কখনো সম্ভব নয়। সে প্রতিপক্ষের সবকিছু ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। সে যা বলছে, এরূপ কথা কোনো মানুষ বলতে পারে না।'

তারা বললো, 'ওতবা! তুমি যা শুনেছ, তা তো কবিতা।'

ওতবা বললো, 'আল্লাহর কসম! তোমরা এখানে যারা আছ, তাদের কেউ আমার চেয়ে কবিতা সম্পর্কে বেশি জান না। কবিতার অন্তঃমিল এবং ছন্দের কলকব্জার ব্যাপারে আমার চেয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ এখানে কেউ নেই। এমনকি জ্বিনদের কবিতা সম্পর্কেও আমার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ এখানে কেউ নেই। আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ যা বলেছে সেগুলো এর কোনোটির সঙ্গেই সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।'

ওতবা রাসূল ﷺ-এর ব্যাপারে তাদের সঙ্গে বাদানুবাদ করতে লাগল। ওতবা ইসলাম গ্রহণ করে নি ঠিক, তবে ইসলামের প্রতি তার মন ঝুঁকে গিয়েছিল। ইসলামের প্রতি তার ভালোলাগা সৃষ্টি হয়েছিল।

একটু ভাবুন। উত্তম ও মাধুর্যপূর্ণ আচরণের এবং উন্নত ব্যবহারের প্রভাব কত গভীর। অথচ ওতবা ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের চরম দুশমন।

আরেক দিনের ঘটনা। কুরাইশের লোকেরা সমবেত হয়ে হুসাইন বিন মুনযির খোযায়ীকে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে কথা বলার জন্য পাঠালো। সে ছিল প্রসিদ্ধ সাহাবী ইমরান বিন হুসাইনের পিতা।

আবূ ইমরান রাসূল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করলো। রাসূলকে ঘিরে সাহাবায়ে কেরাম বসে আছেন। আবূ ইমরান রাসূলের সাথে কথা বলতে শুরু করলো। তার কথায় নতুনত্ব ছিল না। সে তাই বললো, যা কোরাইশরা সবসময় বলতো। 'তুমি আমাদের গোত্রীয় সংহতি নষ্ট করেছ। আমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছ। আমাদের পরিবারগুলো ধ্বংস করে দিয়েছ।...'

আল্লাহর রাসূল ﷺ মনোযোগের সঙ্গে তার কথা শুনলেন। সে যখন তার কথা শেষ করলো তখন রাসূল ﷺ নরম সুরে বললেন, 'আবূ ইমরান! তোমার কথা কি শেষ হয়েছে?'

সে বললো, 'হ্যাঁ'।

রাসূল ﷺ বললেন, 'এবার তাহলে আমি যা জিজ্ঞেস করি, তার উত্তর দাও।

আবূ ইমরান বললো, 'ঠিক আছে, বলুন আমি শুনছি।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি প্রতিদিন কতজন মাবুদের ইবাদত কর?'

: 'সাতজনের। পৃথিবীতে আছেন ছয়জন, আর আকাশে আছেন একজন'!

: 'আচ্ছা, এদের মধ্যে কাকে ভয় কর এবং ভালোবাস?

: 'যিনি আকাশে আছেন কেবল তাকে!'

:'হুসাইন! তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর তাহলে আমি তোমাকে এমন দু'টি বাক্য শেখাব, যা সবসময় তোমার জন্য উপকার বয়ে আনবে।'

আল্লাহর রাসূলের এই কথা শুনে হুসাইন আর দেরি করলো না। সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করলো। ইসলাম গ্রহণ করেই সে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে সে বাক্য দু'টি শিখিয়ে দিন।'

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, তুমি সবসময় বলবে-

اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِيْ رُشْدِيْ وَاَعِذْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ.

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সৎ পথের দিশা দিন এবং আমাকে আমার রিপুর অকল্যাণ থেকে রক্ষা করুন।'

আহ! কী চমৎকার ছিল তাঁর আচরণ! কি অমায়িক ছিল তার ব্যবহার। কাফেরদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে এবং তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করার ক্ষেত্রে এর বিকল্প নেই।

জনৈক মুসলিম যুবক পড়াশোনা করতে জার্মানিতে গিয়েছিল। সেখানে সে একটি ফ্ল্যাটে ভাড়ায় থাকত। তার পাশের ফ্ল্যাটেই থাকত একজন জার্মান যুবক। দু'জনের মাঝে তেমন সম্পর্ক ছিল না। একজন আরেকজনের প্রতিবেশী, শুধু এতটুকু সম্পর্কই ছিল।

জার্মান যুবকটি একদিন কোথাও সফরে গেল। হকার এসে প্রতিদিন তার দরজার সামনে পত্রিকা দিয়ে যেত। প্রতিবেশী মুসলিম যুবক একদিন দেখলো, তার সামনের ফ্ল্যাটের দরজার সামনে অনেক পত্রিকা জমা হয়ে আছে। খোঁজ নিয়ে সে জানতে পারল, তার প্রতিবেশী যুবক কোথাও সফরে গেছে। তখন সে পত্রিকাগুলো তার নিজের ড্রয়ারে সংরক্ষণ করে রাখল। প্রতিদিন সে পত্রিকা সংগ্রহ করে সেগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে রেখে দিত ।

দু' তিন মাস পর জার্মান যুবকটি ফিরে এল। মুসলিম যুবকটি এর অপেক্ষায়ই ছিল। সে সুযোগমতো গিয়ে তাকে সালাম দিল এবং নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করায় তাকে অভিনন্দন জানাল। এরপর তাকে পত্রিকাগুলো দিয়ে বললো, 'আমার মনে হয় আপনি কোনো প্রবন্ধ নিয়মিত পড়েন অথবা পত্রিকার কোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। আপনার প্রবন্ধ পাঠ বা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ যেন ব্যাহত না হয় তাই আমি এগুলো সংরক্ষণ করে রেখেছি।

তার এ কাজ দেখে সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি এর জন্য কোনো বিনিময় বা প্রতিদান চান?'

সে বললো, 'না, না। কোনো বিনিময়ের জন্য আমি এ কাজ করি নি। আমাদের ধর্মই আমাদেরকে প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচরণ করার শিক্ষা দেয়। আপনি আমার প্রতিবেশী। আপনার সঙ্গে সদাচরণ করা আমার নৈতিক দায়িত্ব।'

এভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সে তার সঙ্গে সদাচরণ করে যেতে লাগল। একসময় সে জার্মান যুবক ইসলাম গ্রহণ করলো।

প্রিয় পাঠক! আল্লাহর কসম, এভাবেই জীবনকে উপভোগ করতে হয়। ভোগে সুখ নেই, ত্যাগেই রয়েছে প্রকৃত সুখ। আপনার আচরণ যদি সুন্দর করেন তাহলে আপনার জীবন হবে উপভোগ্য ও সুখময়। উপলব্ধি করতে চেষ্টা করুন, ডানদিকের সংখ্যার মতো আপনারও মূল্য আছে। আপনি সবকাজ আল্লাহর ইবাদত হিসেবে করবেন। এমনকি মানুষের সঙ্গে আপনার আচরণকেও যদি আপনি আপনার ইবাদতেরই অংশ মনে করেন তাহলে তাতেও আপনি পাবেন সীমাহীন প্রতিদান।

অমুসলিমদের একটি বড় অংশ কোনো কোনো মুসলমানদের অনৈতিক আচরণের কারণে ইসলাম থেকে দূরে সরে রয়েছে। মুসলমানরা কখনো তাদের অমুসলিম কর্মচারীর ওপর অত্যাচার করে, কখনো লেনদেনের ক্ষেত্রে তাদেরকে ধোঁকা দেয়, আবার কখনো কাফের প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়।

তাই আসুন, আজ থেকে জীবনের পথচলা নতুন করে শুরু করি। চারিত্রিক মাধুর্যতা দিয়ে অমুসলিমদের হৃদয় মন জয় করতে চেষ্টা করি।

আলোকচ্ছটা...

শুধু কথা নয় যার আচরণ মানুষকে আকৃষ্ট করে সেই তো শ্রে'দাঈ।



১৪. পশু-পাখির প্রতিও সদয় হোন!

অমায়িক ব্যবহার কারো অভ্যাসে পরিণত হলে তা সাধারণত দূর হয় না। তা তার প্রকৃতির অংশ হয়ে যায়। সে সব সময় সবার সঙ্গে নম্র, ভদ্র, বিনয়ী ও স্নেহশীল আচরণ করে। জীব-জন্তু এমনকি জড় পদার্থের সঙ্গেও তার আচরণ হয় কোমল ও বিনম্র।

আল্লাহর রাসূল একবার সাহাবায়ে কেরামসহ সফরে ছিলেন। পথিমধ্যে তারা এক জায়গায় যাত্রাবিরতি করলেন। রাসূল ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলেন। সাহাবায়ে কেরামও যার যার প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নিচ্ছিলেন। জনৈক সাহাবি দুটি ছানাসহ একটি রেডস্টার্ট পাখি দেখলেন। তিনি সখেরবশে ছানাদুটিকে ধরে নিয়ে এলেন।

এদিকে মা পাখিটা তার কাছে চলে এলো। পাখিটি তাদের চারপাশে ঘুরঘুর করে ডানা ঝাপটাচ্ছিল। ইতোমধ্যে রাসূল ﷺ ফিরে এলেন। তিনি পাখিটার এ অবস্থা দেখে সে সাহাবীদেরকে বললেন, 'ছানা দু'টি আটকে রেখে মা পাখিটাকে কে কষ্ট দিচ্ছে? এক্ষুণি ছানা দু'টিকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দাও।'

আরেকবার আল্লাহর রাসূল দেখলেন, পিপীলিকার একটি ঢিবি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

তিনি বললেন, 'কে এটি পুড়িয়েছে?'

একজন সাহাবী বললেন, 'আমি, হে আল্লাহর রাসূল!'

রাসূল খুব রাগ করলেন। তিনি বললেন, 'আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়ার অধিকার কেবল তার, যিনি আগুনের স্রষ্টা।'

চতুষ্পদ জন্তুর প্রতিও তিনি ছিলেন উদার ও সদয়। তিনি ওযু করার সময় তার কাছে কোনো বিড়াল এলে তিনি পানির পাত্রটি বিড়ালের সামনে ঝুঁকিয়ে দিতেন। বিড়ালটি পানি পান করলে পরে অবশিষ্ট পানি দিয়ে ওযু শেষ করতেন।

এক দিনের ঘটনা। রাসূল কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন, মাটিতে একটি বকরি শুইয়ে রেখে বকরিটার ঘাড়ে পা দিয়ে

চেপে ধরে রেখেছে, অন্যদিকে জবাই করার জন্য ছুরি ধার দিচ্ছে। এদিকে বকরীটি সকাতর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

এ অবস্থা দেখে রাসূল খুব রাগ করে বললেন, 'তুমি কি বকরিটিকে দু'বার মারতে চাও? শোয়ানোর আগে ছুরিটা ধার দিলে না কেন?'

একদিন রাসূল দু'জন ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন, তারা উভয়ে নিজেদের উটের ওপর বসে বসে কথা বলেছে। এ অবস্থা দেখে উট দু'টির প্রতি রাসূলের খুব দয়া হলো। তাই তিনি কোনো পশুকে চেয়ারস্বরূপ ব্যবহার করতে নিষেধ করলেন।

অর্থাৎ প্রয়োজনের সময় উটের ওপর অবশ্যই আরোহণ করবে। তবে প্রয়োজন শেষ হলে নেমে যাবে। পশুটিকে আরাম করতে দেবে। আল্লাহর রাসূল পশুর কপালে বা চেহারায় দাগ দিতেও নিষেধ করেছেন।

রাসূলের 'আযবা' নামক একটি উষ্ট্রী ছিল। এটি মুসলমানদের উটের পালের সাথে মদিনার উপকণ্ঠে বিচরণ করছিল। একবার মুশরিকদের একটি দল এ উটের পালের ওপর হামলা করে সেগুলো নিয়ে গেল। উটের পালের সাথে একজন মুসলিম নারীকেও তারা বন্দী করে নিয়ে গেল।

যাওয়ার পথে বিশ্রামের জন্য একস্থানে থেমে উটগুলো মাঠে ছেড়ে দিয়ে তারা ঘুমিয়ে পড়ল। এদিকে রাত যখন গভীর হলো তখন সে মুসলিম নারী পলায়নের প্রস্তুতি নিলেন। তিনি আরোহণের জন্য একটি উটের দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু কাছে আসা মাত্রই উটটি জোরে চেঁচিয়ে উঠল। ভাগ্য ভালো মুশরিকদের সবাই ছিল গভীর ঘুমে মগ্ন। উটের চেঁচামেচিতে তাদের কেউ জাগল না। এরপর মহিলা খুব সাবধানে অন্য একটি উটের কাছে গেলেন। কিন্তু সেটিও চিৎকার করে উঠল।

এভাবে একে একে তিনি প্রতিটি উটের কাছে গেলেন। কিন্তু সবগুলোই ডাকাডাকি করলো। শেষ পর্যন্ত তিনি আযবা নামক উটনীটির কাছে এসে দেখলেন, সেটি খুব নম্র ও শান্ত। এটি কোনো চিৎকার করছে না।

মুসলিম মহিলা তাতে আরোহন করে মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। উষ্ট্রীটিও খুব দ্রুতগতিতে ছুটে চলল। বিপজ্জনক এলাকা পার হয়ে মদিনার কাছাকাছি আসতেই মহিলা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ল।

Contents

আনন্দের আতিশয্যে সে বলে ফেলল, 'হে আল্লাহ! আমি মানত করছি, আমি যদি এ উটের পিঠে চড়ে পরিপূর্ণ মুক্ত হতে পারি তাহলে তোমার জন্য একে জবাই করব!'

মহিলা মদিনায় পৌঁছল। লোকজন রাসূলের উষ্ট্রীটিকে দেখে চিনে ফেলল। মহিলা তার বাড়িতে পৌঁছল। এদিকে লোকজন উষ্ট্রী নিয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে উপস্থিত হলো। অপরদিকে মহিলাও জবাই করার জন্য উষ্ট্রীটিকে খুঁজতে লাগল। খবর পেয়ে তিনিও রাসূলের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। রাসূলকে জানালেন, তিনি এটাকে কোরবানী করার মানত করেছেন।

এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল বললেন, 'এ কেমন প্রতিদান! এর মাধ্যমে আল্লাহ তোমাকে মুক্তি দিলেন, আর বিনিময়ে তুমি একেই জবাই করতে চাচ্ছ? কী নিকৃষ্ট প্রতিদান তুমি দিতে চেয়েছ!'

এরপর রাসূল বললেন, 'আল্লাহর অবাধ্যতা হয় এমন মানত পূরণ করা যায় না। অনুরূপভাবে তুমি যার মালিক নও তার ব্যাপারে কোনো মান্নত করলেও তা পূরণ করতে হয় না।'

আল্লাহ তায়ালা আপনার মধ্যে নম্রতা, ভদ্রতা , কোমলতা, উদারতা ও মানবিকতা ইত্যাদি যে সহজাত গুণাবলি দিয়েছেন এগুলোকে সবসময় চর্চা করুন। এ গুণাবলিকে সর্বক্ষেত্রে ও সবার সঙ্গে প্রয়োগ করে আপনি হয়ে উঠুন অনন্য। শুধু মানুষ নয় প্রাণীকুল ও জীবজন্তুর সাথেও এগুলোর অনুশীলন করুন। গাছপালা ও তরু-লতাও যেন আপনার সদাচরণ ও স্নেহের পরশ থেকে বঞ্চিত না হয়।

রাসূল ﷺ জুমার দিন মসজিদে স্থাপিত একটি খেজুর গাছে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। একদিন জনৈক আনসারী মহিলা বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আমার এক কাঠমিস্ত্রি ক্রীতদাস আছে। অনুমতি দিলে তাকে দিয়ে আপনার জন্য একটি মিম্বর বানিয়ে দেব।'

রাসূল বললেন, 'ঠিক আছে, বানিয়ে দাও।'

মহিলা সাহাবী রাসূলের জন্য একটি কাঠের মিম্বর তৈরি করালেন। মিম্বরটি যথারীতি মসজিদে স্থাপন করা হলো।

জুমার দিন। আল্লাহর রাসূল সে মিম্বরে আরোহণ করলেন। তাঁর মিম্বরে বসতে না বসতেই খেজুর গাছের কাণ্ডটি ষাঁড়ের ন্যায় সজোরে চিৎকার করে উঠল। মনে হচ্ছিল এখনই তা ফেটে পড়বে। তার কান্নার আওয়াজে পুরো মসজিদ যেন কেঁপে উঠল।

অবশেষে তিনি মিম্বর থেকে নেমে গাছটিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তখন ক্রন্দনরত খেজুর কাণ্ডটি শিশুর ন্যায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে এক পর্যায়ে শান্ত হলো।

রাসূল  বলেছেন, 'যার হাতে আমার প্রাণ সে সত্তার কসম! আমি যদি গাছটিকে বুকে জড়িয়ে না ধরতাম তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত সেটি এভাবে কাঁদতে থাকত।'

ইঙ্গিত...

আল্লাহ মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বানিয়েছেন।

কিন্তু অন্য প্রাণিকে পীড়ন করার অধিকার তাকে দেন নি।

◈◈◈

১৫. মানুষের মন জয়ের শত পদ্ধতি

প্রত্যেকেই তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভের জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে থাকে। সম্পদের জন্য যে লালায়িত সে তা অর্জনের নিমিত্তে ও সমৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন রকমের কলাকৌশল ব্যবহার করে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে।

স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো দর্শকদের মন জয় করার জন্য আধুনিক বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও নতুন নতুন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে। অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ও সঞ্চালকদেরকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যাতে তারা দর্শকদেরকে আকৃষ্ট করে তাদেরকে অনুষ্ঠান দেখতে আগ্রহী করতে পারেন। একই কথা প্রিন্টমিডিয়া ও বেতারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

অনুরূপভাবে পণ্য বা সেবার উৎপাদকরা (প্রোডাক্ট প্রোমোটরদের মাধ্যমে) ক্রেতাদের মন জয় করার জন্য কতরকম পদ্ধতি অবলম্বন করে।

যেসব কলাকৌশলের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নতি করা যায় সেসব কলাকৌশল জানতে এবং সেগুলোকে কাজে লাগাতে সবার মধ্যেই কমবেশি আগ্রহ দেখা যায়।

মানুষের হৃদয় জয় করার অনেক পদ্ধতি ও কলাকৌশল রয়েছে।

মনে করুন, আপনি একটি মজলিসে উপস্থিত হলেন। সেখানে প্রায় চল্লিশজন মানুষ রয়েছেন। আপনি তাদের সঙ্গে মোসাফাহা করতে লাগলেন। প্রথমে একজনকে সালাম করে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। সে কোনো মতে হাতের অংশবিশেষ এগিয়ে দিয়ে শীতল কণ্ঠে বললো, 'স্বাগতম! স্বাগতম!'

আপনি দ্বিতীয়জনের কাছে গেলেন। সে পাশের একজনের সঙ্গে কথা বলছিল। আপনার সালাম শুনে সে হতচকিত কণ্ঠে সালামের জবাব দিল এবং আপনার দিকে না তাকিয়েই হাত বাড়িয়ে দিল।

তৃতীয়জন তার মোবাইল ফোনে কথা বলছিল। আপনি সালাম দেয়ায় সে হাত বাড়িয়ে দিল। কোনো মতে দায়সারা গোছের মোসাফাহা করলো বটে তবে সৌজন্যতাস্বরূপ কিছু বললো না, এমনকি আপনার প্রতি কোনো আগ্রহও দেখাল না। আর চতুর্থজন আপনাকে আসতে দেখেই সালাম

দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেল। চোখে চোখ পড়তেই হাসিমুখে আপনার সঙ্গে কথা বললো। হৃদয়ের উষ্ণতা ঢেলে দিয়ে আপনার সাথে মোসাফাহা করলো। আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করতে পেরে সে বেশ আনন্দিত হয়েছে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে এটা প্রকাশ করলো। অথচ আপনিও তাকে চেনেন না, আর সেও আপনাকে চেনে না।

এভাবে আপনি সকলের সঙ্গে সালাম ও মুসাফাহাপর্ব শেষ করলেন। এখন বলুন তো, এ চারজন লোকের মধ্যে কার প্রতি আপনার আকর্ষণ সৃষ্টি হবে? নিশ্চয় চতুর্থ লোকটির প্রতি আপনি অন্য রকম আকর্ষণবোধ করবেন। অথচ আপনি তাকে চেনেন না। তার নামও জানেন না, সে কোথায় কাজ করে, কী তার পেশা কিছুই জানেন না। তা সত্ত্বেও সে আপনার হৃদয়রাজ্য জয় করে ফেলেছে। আর এটা সে কোনো টাকা পয়সা কিংবা বড় কেনো পদের ক্ষমতার দাপটে করে নি। করে নি বংশমর্যাদার বলে। সে আপনার হৃদয়রাজ্য জয় করেছে কেবল কৌশলী আচরণের মাধ্যমে।

এতে প্রতীয়মান হলো, শক্তি, সম্পদ, সৌন্দর্য ও পেশার বড়ত্ব দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করা যায় না। বস্তুতঃ মানুষের হৃদয় এর চেয়েও অনেক সহজে জয় করা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও খুব কম মানুষই অন্যের হৃদয় জয় করতে পারে।

আমার মনে আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এক ছাত্র মারাত্মক মানসিক রোগে আক্রান্ত ছিল। তার পিতা একজন উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। আমিও তার ছেলের চিকিৎসার জন্য সাহায্য করেছি।

আমি মাঝে মাঝে তাদের বাড়িতে বেড়াতে যেতাম। বাড়িটি দেখতে ছিল রাজপ্রাসাদের মতো। তার পিতার বৈঠকখানায় সবসময় মেহমানদের এত ভিড় থাকত যে, সামান্য ফাঁকা জায়গাও থাকত না। তার প্রতি মানুষের এতো ভালোবাসা ও আগ্রহ দেখে আমি খুব অবাক হতাম।

অনেক বছর পর। একদিন তার বাড়িতে গেলাম। তখন তিনি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন।

আমি তার সে বৈঠকখানায় প্রবেশ করলাম। কামরাটির দিকে তাকালাম। কামরাটির বর্তমান অবস্থা দেখে আমি আশ্চর্য হলাম। সেখানে পঞ্চাশটির অধিক চেয়ার পড়ে আছে। কিন্তু কামরায় কেউ নেই। বৃদ্ধ সেখানে একাকী বসে বসে টিভিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখছেন। একজন সেবক তাকে চা-কফি দিয়ে যাচ্ছে। আমি সেখানে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ বসলাম।

বের হওয়ার পর আমি ভাবতে লাগলাম, তিনি যখন চাকুরীতে ছিলেন তখন তার কেমন অবস্থা ছিল আর বর্তমানে তার অবস্থা কী? আগে কেন মানুষ তার কাছে আসত? কেন তারা তাকে ভালোবাসতো? এখন তাকে কেন সেরূপ ভালোবাসে না? কেন তার বৈঠকখানায় আগের মতো ভিড় নেই?

আমি বুঝতে পারলাম, তিনি সদাচরণ এবং অমায়িক ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়রাজ্যকে জয় করতে পারেন নি। মানুষ তার কাছে আসত তার পদমর্যাদার কারণে, তার চাকরির ক্ষমতা ও প্রভাবের কারণে। ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক গুণের কারণে নয়। আজ যেহেতু তার চাকরি নেই তাই তার সে ক্ষমতাও নেই। তাই আর আগের মতো উপচেপড়া সে ভিড়ও নেই।

আপনি মানুষের সঙ্গে এমন ব্যবহার করুন, যেন তারা ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে ভালোবাসে। তারা যেন আপনার কথা, আপনার হাসি, আপনার বিনম্র আচরণে মুগ্ধ হয়ে আপনাকে ভালোবাসে।

তারা যেন আপনাকে ভালোবাসে অন্যের দোষ দেখেও তা পাশকেটে যাওয়ার মহৎ গুণের কারণে এবং অন্যের বিপদে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দেয়ার মানসিকতার জন্য। তাদের আন্তরিকতা ও ভালোবাসা যেন আপনার পদমর্যাদা ও অর্থের কারণে না হয়; বরং তা যেন হয় আপনার প্রতি তাদের হৃদয়ের ভালোবাসার কারণে। যে ব্যক্তি তার স্ত্রী-সন্তানকে অর্থ-সম্পদ, খাবার-দাবারসহ সব চাহিদা পূরণ করে, সে হয়তো তাদের উদরতুষ্টি লাভ করতে পারে কিন্তু তাদের হৃদয়ের ভালোবাসা লাভ করতে পারে না। যে তার স্ত্রী-সন্তানকে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ দেয়, কিন্তু তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারও করে, সে তাদেরকে আর্থিকভাবে খুশি করতে পারলেও তাদের মনের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না।

যদি আপনি দেখেন, বিপদে পড়ে কোনো যুবক তার বন্ধু বা মসজিদের ইমাম কিংবা তার কোনো শিক্ষকের শরণাপন্ন হয়েছে কিন্তু নিজের বাবাকে জানায় নি তাহলে এতে আশ্চর্য হবেন না । কারণ, তার বাবা তার হৃদয়কে জয় করতে পারে নি, ভাঙতে পারেনি তার ও সন্তানের মাঝে বিদ্যমান অদৃশ্য দেয়াল। অথচ তার বন্ধু কিংবা কোনো শিক্ষক তার হৃদয়রাজ্য অবলীলায় জয় করে ফেলেছে। অনেক সময় মারাত্মক দুশমনও হৃদয় জয় করে ফেলতে পারে। তবে এর জন্য দরকার হৃদয়কাড়া আচরণগত দক্ষতা আর মানুষকে আপন করে নেয়ার সুন্দর কৌশল।

আরেকটি বিষয় ভেবে দেখুন। কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন, তারা যখন কোনো মজলিসে উপস্থিত হয়ে বসার জন্য জায়গা খুঁজতে থাকে তখন উপস্থিত লোকদের মাঝে একধরনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। সবাই তাকে ডাকতে থাকে, সবাই তাকে নিজের পাশে বসতে অনুরোধ করে। বলুন তো এমনটি কেন হয়? কেন তার প্রতি সকলের এত আগ্রহ! কেন সবাই তার পাশে বসতে চায়?

আপনাকে হয়তো নৈশভোজের জন্য কোনো ক্যাফেতে দাওয়াত দেয়া হলো। ক্যাফের নিয়ম হলো, প্রত্যেক নিজ চাহিদা মতো ডিশ থেকে নিজ নিজ প্লেটে খাবার নিয়ে নেবে। তারপর ডিম্বাকৃতির কোনো একটি টেবিলে বসে খাবে। সেখানে আপনি হয়তো দেখে থাকবেন যে, কেউ নিজের প্লেট পূর্ণ করার আগেই অনেকে তাকে ইশারা করে বলতে থাকে, 'এ যে এখানে ফাঁকা জায়গা আছে, এখানে বসুন।' প্রত্যেকেই চায়, সে তার সঙ্গে বসুক।

কিন্তু অন্য একজন তার প্লেট পূর্ণ করে এদিকে সেদিক তাকাচ্ছে অথচ কেউ তাকে ডাকছে না। কেউ তার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করছে না। সে একাকী কোনো একটি টেবিলে গিয়ে বসে খেয়ে নিচ্ছে।

প্রথমজনের প্রতি মানুষের এত আগ্রহ, অথচ দ্বিতীয়জনের প্রতি কোনো আগ্রহ নেই। এর কারণ কী? কিছু মানুষ এমনও আছেন যে, তারা যেখানেই থাকুক না কেন, তাদের প্রতি অন্যদের মনের টান অনুভূত হতে থাকে। যেন তাদের হাতে বিশেষ চুম্বক আছে, যেটি দিয়ে দূর থেকেও তারা অন্যদের হৃদয়-মন আকর্ষণ করে থাকে।

এরা কিভাবে অন্যদের হৃদয় জয় করলেন?

বস্তুত এটা হলো বুদ্ধিবৃত্তিক এমন কিছু কলাকৌশল যার মাধ্যমে একজন মানুষ অন্য মানুষের হৃদয়কে জয় করতে পারে। করতে পারে মানুষের ভালোবাসা অর্জন।

সিদ্ধান্ত

অন্যের হৃদয় জয় করার এবং তাদের ভালোবাসা অর্জনের ক্ষমতা আমাদের জীবনকে করতে পারে আরো সুখময়, প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য।



১৬. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বিশুদ্ধ নিয়তে কাজ করুন

অনেক বছর যাবত আমি কিছু মানুষের আচরণ খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি। কিন্তু কখনো তাদেরকে একটু মুচকি হাসতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এমনকি হাসির কোনো কথা শুনেও তাদের মুখে হাসির সামান্যতম রেখাও ফুটে ওঠে নি। কারো সঙ্গে কথা বলার সময় আবেগের সাথে একটু হেসেছে, এমনটাও দেখি নি। তাদেরকে দেখে আমার মনে হয়েছে, তারা এভাবেই বড় হয়েছে। এর বিপরীত কিছু করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু আমার এ ধারণা পাল্টে গেল। আমি আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, নির্দিষ্ট কিছু মানুষের সঙ্গে তাদের আচরণ ভিন্নধর্মী ও প্রাণোচ্ছল। ধনী ও বড় বড় পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিদের সঙ্গে তারা মুচকি হেসে ও কোমল স্বরে কথা বলে। বস্তুত তারা এটা করছে কিছু পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য। এটা যদি তারা পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য না করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করত তাহলে তারা পরকালে বিপুল সওয়াব ও প্রতিদানের অধিকারী হতে পারত। কিন্তু এটা না করার কারণে তারা তাদের এ সুন্দর আচরণের পরকালীন প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

মুমিন ব্যক্তির সদাচরণ তো ইবাদত। আর তা হবে কেবল আল্লাহর জন্য। এর মাধ্যমে সে আল্লাহর নিকট হতে মহা পুরস্কার লাভ করবে। এটা কোনো পদ বা সম্পদ লাভের হীন উদ্দেশ্যে, মানুষের প্রশংসা লাভের আশায় কিংবা কোনো সুন্দরী নারীকে বিবাহ করার অভিপ্রায় নিয়ে করা যাবে না। তা করতে হবে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালবাসা লাভের মহান উদ্দেশ্যে। আল্লাহ যেন তাকে ভালবাসেন এবং তাকে মানুষের মধ্যে প্রিয় করে দেন। আসল কথা হলো, সদাচরণকে যে ইবাদত মনে করে, সে ধনী-গরিব, ম্যানেজার আর পিয়ন সবার সঙ্গেই সমান ও সুন্দর আচরণ করে।

মনে করুন, আপনি শহরের রাজপথ ধরে হেটে চলছেন। সে রাজপথ ঝাড়ু দিচ্ছে এক জীর্ণ-শীর্ণ ঝাড়ুদার। সে আপনাকে দেখার সাথে সাথে আবেগ নিয়ে তার হাতদুটো বাড়িয়ে দিল আপনার সঙ্গে মোসাফার জন্য। আরেকদিন আপনি উচ্চপদস্থ কোনো কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করতে

গেলেন। সেও মোসাফার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। উভয়ের প্রতি অপনার মনোযোগ, অনুভূতি, আপনার মুখের হাসি ও অঙ্গভঙ্গি কি সমান হবে? আমার জানা নেই।

তবে উভয়ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর মনোযোগ, অনুভূতি ও মুখের হাসি এক রকম ছিল। আপনি যাকে তুচ্ছ মনে করছেন, হতে পারে সে আল্লাহর কাছে অনেক দামী। পদ ও পদবীর কারণে যাদের সঙ্গে আপনি কোমল আচরণ করছেন, তাদের হাজারজনের চেয়েও এ সাধারণ মানুষটি আল্লাহর কাছে অনেক বেশি প্রিয় হতে পারে। আপনি জানেন না, আপনার কাছে যিনি তুচ্ছ, আল্লাহর কাছে হয়তো তার মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে।

রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কাছের ব্যক্তি হবে সে, যার আখলাক সবচেয়ে সুন্দর।' (সুনামে তিরমিযী: ১৯৪১)

রাসূল ﷺ আশাজ বিন আবদে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেছিলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পছন্দ করেন, এমন দুটি গুণ তোমার মধ্যে আছে।'

আল্লাহর রাসূলের কথা শুনে আশাজ বিন আবদে কায়েস আনন্দচিত্তে জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহর রাসূল! সে গুণ দু'টি কী কী?'

রাসূল ﷺ বললেন, 'কর্মে স্থিরতা ও আচরণে সহনশীলতা।'

(সহীহ মুসলিম: ২৪, সুনানে তিরমিযী: ১৯৩৪)

রাসূল ﷺ-কে একদিন সর্বশ্রে'পুণ্যের কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। রাসূল ﷺ বললেন, 'সর্বশ্রে'পুণ্য ও নেক কাজ হলো মানুষের সঙ্গে সদাচরণ ও সুন্দর ব্যবহার।' (সুনানে তিরমিযী: ২৩১১, সহীত মুসলিম: ৪৬৩২)

একদিন রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কী কারণে মানুষ জান্নাতে বেশি প্রবেশ করবে? তিনি বললেন, আল্লাহর ভয় ও সুন্দর ব্যবহার।

(সুনানে তিরমিযী: ১৯২৭, মুসনাদে আহমদ: ৯৩১৯)

তিনি আরো বলেছেন, 'পূর্ণ ঈমানদার সে ব্যক্তি, যার আচরণ সুন্দর ও বিনম্র। যে অন্যের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করে, অন্যরাও তার সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করে। আর তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, যার সঙ্গে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলাফেরা করতে পারে না এবং সেও অন্যের কাছে যেতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না।' (সুনামে তিরমিযী: ১০৮২, আল মুজামুস সগীর:৬০৬)

রাসূল ﷺ 'বলেন, কিয়ামতের দিন আমলের পাল্লায় কোনো আমল সদাচরণের মতো ভারী হবে না। (সুনানে তিরমিযী: ১৯২৫)

তিনি আরো বলেছেন, 'একজন ইবাদতকারী রাত জেগে ইবাদত করে এবং সারাদিন রোযা রেখে যে মর্যাদা অর্জন করতে পারে, উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে একজন মানুষ সে মর্যাদায় উন্নীত হতে পারে।'

(সুনানে তিরমিযী: ১৯২৬, সুনানে আবূ দাউদ: ৪১৬৫)

যে সদাচরণ রপ্ত করতে পারে সে ইহকাল পরকাল উভয় জগতে লাভবান হতে পারে।

উম্মে সালামার সে ঘটনাটি এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। একদিন তিনি রাসূলের সঙ্গে বসে ছিলেন। এ সময় পরকাল ও পরকালের নিয়ামতসমূহের কথা আলোচনা করা হলে তিনি আল্লাহর রাসূলকে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুনিয়াতে কোনো মহিলার দু'জন স্বামী থাকল মৃত্যুর পর তাদের সবাই জান্নাতবাসী হলে সে মহিলা জান্নাতে কার সঙ্গে থাকবে?'

আল্লাহর রাসূল কী উত্তর দিলেন?

যে স্বামী রাত জেগে ইবাদত করত, তার সঙ্গে?

যে বেশি বেশি রোযা রাখত, তার সঙ্গে?

ইলম ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে অগ্রসর ছিল, তার সঙ্গে?

না, আল্লাহর রাসূল এগুলোর কোনোটিই বললেন না।

আল্লাহর রাসূল বললেন, 'যার আচার-আচরণ বেশি সুন্দর ছিল তার সঙ্গে থাকবে।' এ কথা শুনে উম্মে সালামা খুব বিস্মিত হলেন।

রাসূল তার এ বিস্ময়ভাব চোখ দেখে বললেন, 'উম্মে সালামা! উত্তম ব্যবহারের মধ্যে তো দুনিয়া ও আখিরাতের সব কল্যাণ নিহিত।'

বস্তুতঃ সদাচরণ ও উত্তম ব্যবহারের মধ্যেই উভয় জগতের কল্যাণ রয়েছে। ইহকালিন কল্যাণ হলো মানুষ তাকে ভালবাসে। আর পরকালের কল্যাণ হলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সীমাহীন প্রতিদান।

একজন মানুষ যতই নেক আমল করুক, তার আচরণ যদি সুন্দর ও মার্জিত না হয় তাহলে সব আমল অকেজো হয়ে যেতে পারে।

একদিন রাসূলের কাছে জনৈক মহিলার আলোচনা করতে গিয়ে বলা হলো, 'সে রোযা রাখে। বহু নামায আদায় করে। দান-সদকাও অনেক করে। তবে কথাবার্তা ও আচার আচরণে সে প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়।'

রাসূল ﷺ এ কথা শুনে বললেন, 'সে তো জাহান্নামী।'

সকল ভাল গুণের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ ছিলেন সর্বোত্তম আদর্শের প্রতীক। দয়া ও দানশীলতায়, বীরত্ব ও সাহসিকতায়, ধৈর্য ও সহনশীলতায় তার তুলনা তিনি নিজেই। সততা লাজুকতা ও শালীনতায় তিনি ছিলেন ঘরের কোণের পর্দাবৃত কুমারী নারীর চেয়েও বেশি লাজুক, ভদ্রতা, বিশ্বস্ততা ও অতিথি পরায়ণতায় তিনি ছিলেন সর্বোত্তম আদর্শ। তাই মুমিনদের আগে কাফেররা, নেককারদের আগে বদকারেরাই এর সাক্ষ্য দিচ্ছে।

প্রথম যেদিন রাসূলের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হলো, এ গুরুভার নিয়ে রাসূল বিচলিত হয়ে পড়লেন। দায়িত্ববোধের চাপে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সেদিন খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা বলেছিলেন, 'আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আপনাকে কখনো অপদস্থ ও ব্যর্থ করবেন না।'

এর কারণ কী? খাদিজা নিজেই দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে এর কারণ বলছেন, 'আপনি তো আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন। এতিম-অসহায়দের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। নিঃস্বদের ভরণপোষণ। অতিথিদের আপ্যায়ন করেন। সত্যের দুর্যোগে সদা এগিয়ে যান। সদা সত্য কথা বলেন। আমানত রক্ষা করেন।'

আর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা রাসূলের প্রশংসায় যে শাশ্বত বাণী অবতীর্ণ করেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত আমরা তিলাওয়াত করছি–

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.

অর্থ : 'নিশ্চয় তুমি সমুন্নত চরিত্রের অধিকারী।' (সূরা কলাম : আয়াত-৪)

রাসূল ﷺ-এর চরিত্র ছিল কুরআনের প্রতিচ্ছবি। কুরআনের প্রতিটি আদেশ নিষেধ মূর্ত হয়ে উঠেছিল তার আচরণে ও কথাবার্তায়।

তিনি পাঠ করেছেন কুরআনের এ আয়াত-

وَاَحۡسِنُوۡا ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الۡمُحۡسِنِيۡنَ.

অর্থ : 'তোমরা সদাচরণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ সদাচরণকারীদের পছন্দ করেন।' (সূরা বাকারা:১৯৫)

সাথে সাথে তিনি ভাল ব্যবহার করেছেন সবার সঙ্গে। ছোট-বড়, ধনী-গরিব, ইতর-ভদ্র তথা সকল পেশা ও শ্রেণির মানুষের সঙ্গে সর্বোত্তম ব্যবহার করেছেন।

তিনি শুনেছেন কুদরতি প্রত্যাদেশ-

فَاعۡفُوۡا وَاصۡفَحُوۡا حَتّٰى يَاۡتِىَ اللّٰهُ بِاَمۡرِهٖ.

অর্থ : 'তোমরা ক্ষমা কর এবং অন্যের অসদাচরণকে উপেক্ষা কর।'

(সূরা বাকারা : আয়াত-১০৯)

সাথে সাথে তিনি ক্ষমা করেছেন অন্যকে, মাফ করেছেন অন্যদের সকল অসদাচরণকে।

তিনি তিলাওয়াত করেছেন-

ثُمَّ تَوَلَّيۡتُمۡ اِلَّا قَلِيۡلًا مِّنۡكُمۡ وَاَنۡتُمۡ مُّعۡرِضُوۡنَ.

অর্থ : 'তোমরা মানুষের সঙ্গে ভাল কথা বল।' তখন তিনিও সর্বোত্তম ভাষায় মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন। (সূরা বাকারা: ৮৩)

আল্লাহর রাসূল আমাদের সব সময়ের আদর্শ। রাসূল ﷺ-এর জীবনাদর্শের প্রতি একটু লক্ষ করুন। খেয়াল করে দেখুন, রাসূল মানুষের সঙ্গে কেমন আচরণ করতেন। তিনি কীভাবে মানুষের ভুল সংশোধন করতেন। কীভাবে অন্যদের অশোভন আচরণ সহ্য করতেন। কীভাবে অন্যের শান্তির জন্য নিজে কষ্ট করতেন। মানুষকে কল্যাণের পথে ডাকতে কীভাবে পরিশ্রম করতেন।

আজ তিনি একজন অসহায় ব্যক্তির প্রয়োজন পুরা করার জন্য চেষ্টা করছেন। আগামীকাল বিবাদমান দুই দলের মধ্যে সমঝোতা করছেন। আরেকদিন কাফেরদেরকে শান্তির পথে দাওয়াত দিচ্ছেন। এভাবেই

দিনের পর রাত এসেছে। যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্য এসেছে। অস্থি-মজ্জা দুর্বল হয়েছে। তিনি জীবন সায়াহ্নে উপনীত হয়েছেন।

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা, রাসূলের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,'বার্ধক্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় (নফল) নামায বসে পড়তেন।'

কেন? আমরা কি ধারণা করতে পারি কেন এমন হয়েছিল?

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা-এর কারণ বলেছেন, মানবতার কল্যাণ কামণায় তিনি নিজেকে একেবারে নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন। জীবন যৌবন সব শেষ করে দিয়েছিলেন।

মানুষের আত্মিক কামনা ও ইচ্ছাশক্তি যখন অনেক বড় হয় তখন তা পূর্ণ করতে গিয়ে তার দেহ অক্ষম দুর্বল হয়ে পড়ে।

উন্নত চরিত্র লাভের ক্ষেত্রে রাসূল এতো আগ্রহী ছিলেন যে, তিনি দোয়ায় বলতেন-

اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ.

'হে আল্লাহ ! আপনি আমার বাহ্যিক অবয়বকে যেমন সুন্দর করছেন, তেমনই আমার চরিত্রকে সুন্দর করুন ।' (মুসনাদে আহমদ:৩৬৩২)

তিনি আরো দোয়া করতেন-

اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَنْتَ رَبِّيْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ وَاهْدِنِيْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ.

অর্থ : 'হে আল্লাহ ! আপনি ছাড়া আমার কোনো রব নেই। আমি আপনার গোলাম। আমি আমার উপর জুলুম করেছি। আমার গুনাহের স্বীকৃতি দিচ্ছি। আপনি আমার যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দিন। আপনি ছাড়া কেউ গুনাহ মাফ করতে পারবে না। আপনি আমাকে উত্তম আচরণের দিশা দিন। আপনি ছাড়া কেউ উত্তম আচরণের দিশা দিতে পারে না। আমাকে অসদাচরণ থেকে দূরে রাখতে। আপনি ছাড়া কেউ অসদাচরণ থেকে দূরে থাকতে পারে না। (মুসনাদে আহমদ:৭৬৪)

মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবার সাথে আচরণের ক্ষেত্রে রাসূলের আদর্শ অনুসরণের বিকল্প নেই। মুসলমানের সাথে সুন্দর আচরণ করতে হবে তার হৃদয় জয় করার জন্য এবং তাকে ভাল আমলের দিকে দাওয়াত দেয়ার জন্য। আর অমুসলিমের সাথে ভাল ব্যবহার করলে সে ইসলামের প্রকৃত রূপ ও তাৎপর্য বুঝে ইসলাম গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

ইঙ্গিত ...

নিয়তকে পরিশুদ্ধ করুন।

তাহলে মানুষের সঙ্গে আপনার আচরণও ইবাদতে পরিণত হবে।

আর এর মাধ্যমে আপনি লাভ করবেন আল্লাহর নৈকট্যের কাঙ্ক্ষিত স্তর।



১৭. রুচি দেখে লুচি দিন

প্রকৃতিগতভাবেই কিছু বিষয়ে সব মানুষ একমত হয়ে থাকে। সবাই এগুলো ভালবাসে বা এগুলো পেলে খুশি হয়। আবার কিছু জিনিস এমন আছে যেগুলো অপছন্দ করার ব্যাপারে সবাই একমত। কেউ এগুলো পছন্দ করে না। আবার কিছু কিছু বিষয় এমন রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে মানুষের রুচিতে পার্থক্য দেখা যায়। কেউ কেউ তা পছন্দ করলেও অন্য কারো কারো কাছে তা বিরক্তিকর মনে হয়।

হাসিঝরা মুখ সবাই পছন্দ করে। মলিন বা রাশভারী চেহারা কেউ পছন্দ করে না। কিন্তু হাস্য রকিসতা? কেউ খুব পছন্দ করলেও অনেকের কাছে তা বিরক্তির কারণ বলে মনে হতে পারে। অনেক লোক এমন আছেন, যারা অন্যদের সাথে মিলেমিশে চলতে ভালবাসেন। আবার অনেক লোক আছেন আত্মকেন্দ্রিক। তারা একা থাকতে পছন্দ করেন। কেউ ভালবাসে আড্ডা, কথাবার্তা ও গল্পগুজবে ডুবে থাকতে আবার কেউ ভালবাসে নিজেকে নিয়েই মগ্ন থাকতে।

স্বভাবের এ ভিন্নতার কারণে প্রত্যেকেই সাধারণত এমন ব্যক্তির সঙ্গে চলতে সাচ্ছন্দ্যবোধ করে, যার আচরণ তার স্বভাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বস্তুতঃ মন ও রুচির মিল না হলে একসাথে শান্তিতে বসবাস করা যায় না।

কথিত আছে, জনৈক ব্যক্তি একদিন একটি বাজপাখি ও একটি কাককে পাশাপাশি উড়তে দেখলো। পাখির রাজা বাজকে একটা কাকের সাথে উড়তে দেখে লোকটি বেশ অবাক হলো। সে মনে মনে ভাবল, এদের মধ্যে নিশ্চয় কোনো বিষয়ে মিল আছে বলেই এরা একত্র হতে পেরেছে। সে পাখি দুটির প্রতি লক্ষ্য রাখতে লাগল। একসময় পাখি দুটি উড়তে উড়তে ক্লান্ত হয়ে মাটিতে নেমে এলো। লোকটি কাছে গিয়ে দেখলো, পাখি দুটি ল্যাঙড়া।

এজন্য প্রত্যেকের রুচি ও মেজাজ বুঝে আচরণ করা উচিত। মনে করুন, কারো পিতা নীরবতা ভালবাসেন, বেশি কথাবার্তা তার ভাল লাগে না। তাহলে বাবার সঙ্গে কথা বলার সময় বিষয়টির প্রতি ছেলের খেয়াল রাখা উচিত । তাহলে বাবা সন্তুষ্ট হবেন। সে কাছে আসলে বাবা খুশি হবেন।

Contents

স্ত্রী যদি বুঝতে পারে, তার স্বামী রসিকতা পছন্দ করেন তাহলে সে তার সঙ্গে রসিকতা করতে পারে। নতুবা তা থেকে বিরত থাকবে। সহকর্মী, প্রতিবেশী তথা সবার ক্ষেত্রে রুচি ও স্বভাব বুঝে আচরণ করার এ কৌশল অবলম্বন করা দরকার। সব মানুষের স্বভাব ও রুচি, পছন্দ ও অপছন্দ এক নয়। মানুষের স্বভাব ও রুচির ভিন্নতার কোনো সীমারেখা নেই।

এক বৃদ্ধ ভদ্রমহিলার কথা আমি জানি। তিনি আমার এক বন্ধুর মা। ছেলেদের মধ্যে একজনকে তিনি খুব ভালবাসতেন। তার খুব বেশি প্রশংসা করতেন। এ ছেলে দেখা করতে আসলে বা তার সাথে কথা বললে তিনি খুব খুশি হতেন। অন্য ছেলেরাও মায়ের সঙ্গে সদাচরণ করত। তবু বৃদ্ধা তার ঐ ছেলের প্রতি বেশি অনুরাগী ছিল।

আমি এর তাৎপর্য ও রহস্যটা উদঘাটন করতে উদ্যোগী হলাম। একদিন আমার বন্ধুটির কাছে এ সম্পর্কে জানতে চাইলাম। সে আমাকে বললো, 'আসল কারণ হলো আমার ভাইয়েরা মায়ের রুচি ও মেজাজ বোঝে না। তাই তাদের উপস্থিতি মায়ের কাছে বিরক্তিকর ও ভারী মনে হয়।'

আমি একটু রসিকতা করে বললাম, 'আচ্ছা! তাহলে আপনিই কি কেবল আপনার মায়ের রুচি ও মেজাজ বুঝতে পেরেছেন!'

সে হেসে বললো, হ্যাঁ। আমি এর রহস্যটা তোমাকে বলছি। আমার আম্মাও অন্যান্য বৃদ্ধাদের মত মেয়েলি বিষয়ে কথা বলতে ও শুনতে পছন্দ করেন। যেমন মনে করেন, আমাদের পাড়ার কোনো মেয়ের বিয়ে হলো? তার স্বামী কেমন? অমুকের কয় সন্তান? তাদের মধ্যে বড় কে? তাদের প্রথম সন্তানের নাম কী? কার তালাক হলো? সে এখন কোথায় থাকে? এ জাতীয় আরো অনেক কথা যেগুলো আমরা অপ্রয়োজনীয় মনে করলেও আম্মা বারবার বলে ও শুনে আনন্দ পান। তার কাছে এসব বিষয়ের সংবাদ ও তথ্য অনেক দামী। কারণ এগুলো তো আমরা বই পত্র, অডিও সিডি বা ইন্টারনেট কোথাও পাব না!'

আমি মায়ের কাছে গেলে এসব প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলি। মা খুশি হয়ে আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেন যেন এসব তথ্য তিনিই প্রথম আমাকে সরবরাহ করছেন। গল্প করতে করতে মা খুশিতে আটখানা হয়ে যান। তার মনের কথাগুলো আমার কাছে উজাড় করে দেন। আমিও একজন

ভাল শ্রোতার অভিনয় করি। কিন্তু আমার ভাইয়েরা এসব মেয়েলি আলোচনা শুনতে বিব্রত বোধ করে। তারা মায়ের সঙ্গে এমন সব বিষয় নিয়ে কথা বলতে যায় যা তার ভাল লাগে না। তাই মা তাদের সাথে কথা বলতে পছন্দ করনে না। এ জন্য মা আমাকে পেলে খুশী হন। এটাই হলো গূঢ় রহস্য।'

আপনিও যদি কারো পছন্দ ও অপছন্দের বিষয়গুলো জেনে নিতে পারেন এবং তার স্বভাব ও রুচিবোধ বুঝতে পারেন তাহলে আপনার জন্য তার মন জয় করা একদম সহজ হয়ে যাবে। মানুষের সঙ্গে রাসূলের আচরণ নিয়ে কেউ চিন্তা করলে সহজেই বুঝতে পারবে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকের রুচি ও প্রকৃতি জেনে তার সঙ্গে সেভাবে আচরণ করতেন। এমনকি স্ত্রীগণের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রেও তা লক্ষ্য রাখতেন।

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা একটু চপল স্বভাবের ছিলেন। এ জন্য রাসূল তার সঙ্গে একটু বেশি রসিকতা করতেন। এক সফরে আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা রাসূলের সঙ্গে ছিলেন। ফেরার পথে কাফেলা যখন মদিনার কাছা-কাছি পৌছল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য সাহাবীদের বললেন, 'তোমরা আগে চলে যাও।'

রাসূলের আদেশে সবাই আগে চলে গেল। রাসূলের সাথে শুধু আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে গেলেন। তিনি ছিলেন অল্পবয়সী এক প্রাণচঞ্চল কিশোরী। রাসূল মজা করার জন্য বললেন, 'আয়েশা! চলো, আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতায় নামি!' আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা সাথে সাথে রাজি হয়ে গেলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে দৌড়াতে শুরু করলেন। একপর্যায়ে তিনি রাসূলকে পেছনে ফেলে সামনে চলে গেলেন।

অনেক দিন পরের কথা। এক সফরে তিনি রাসূলের সঙ্গী হলেন। তখন আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা-এর বয়স কিছু বেড়েছে। শরীরও যথেষ্ট ভারী হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবারও সঙ্গীদের বললেন, 'তোমরা আগে চলে যাও।'

সবাই সামনে চলে গেল। রাসূল আয়েশাকে বললেন, 'এসো, আজ আবার তোমার সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা হবে!' সেদিনের মতো আজও আয়েশা দৌড়াল। কিন্তু আজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশাকে পেছনে ফেলে আগে চলে গেলেন। এরপর রসিকতা করে তার দুই কাঁধের মাঝে হাত রেখে বললেন, 'আয়েশা!' এটা সেদিনের বিনিময়।'

অন্যদিকে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সঙ্গে রাসূলের আচরণ ছিল অন্যরকম। কারণ, বয়সে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেয়ে পনেরো বছরের বড় ছিলেন।

সাহাবীদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রেও তিনি তাদের স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। তাই তিনি আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে সে আচরণ করেন নি যে আচরণ খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে করেছেন। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছেন, তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে সেরূপ ব্যবহার করেন নি। আর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে রাসূলের আচরণ ছিল একেবারে স্বতন্ত্র। তাকে এমন অনেক কাজে সমর্থন করতেন, যা অন্য কারো ক্ষেত্রে করতেন না। এমন অনেক কিছু তার ওপর অর্পণ করতেন, যা অন্য কারো ওপর অর্পন করতেন না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন। ইতোমধ্যে তিনি জানতে পারলেন, কোরাইশরাও অনেক লোকবল নিয়ে এগিয়ে আসছে। কিন্তু কোরাইশদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যাদেরকে রণাঙ্গনে আসতে বাধ্য করা হয়েছে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছা তাদের নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমি জানতে পেরেছি, বনু হাশেম ও অন্যান্য গোত্রের কিছু কিছু লোক অনিচ্ছা সত্ত্বেও রণাঙ্গনে আসতে বাধ্য হয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছা তাদের নেই। সুতরাং বনু হাশেমের কেউ তোমাদের সামনে পড়ে গেলে তাকে যেন হত্যা না করা হয়। আবূল বুখতারী বিন হিশামকে কেউ যদি দেখে তাহলে তাকে যেন হত্যা না করে। আব্বাস বিন আব্দুল মোত্তালিবকেও কেউ যেন হত্যা না করে। কেননা, সেও অনিচ্ছা সত্ত্বেও ময়দানে আসতে বাধ্য হয়েছে।'

আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি যেন কোরাইশদের সঙ্গে থেকে তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম ও সিদ্ধান্তসমূহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অবগত করাতে পারেন এ কারণে বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন। এ জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রাখতে চাচ্ছিলেন। আবার কোনো মুসলমান যেন তাকে হত্যা না করে সে বিষয়টিও নিশ্চিত করলেন।

বদর যুদ্ধ ছিল মুসলমান ও কাফের কোরাইশদের মধ্যে সংঘটিত প্রথম যুদ্ধ। মুসলমানরা ছিল অপ্রস্তুত। দ্বীনের জন্য মুসলমানরা হাতিয়ার নিয়ে মুখোমুখি হতে যাচ্ছে নিজের পিতা, পুত্র কিংবা কোনো আত্মীয়ের বিরুদ্ধে। এ চরম মুহূর্তে রাসূল বিশেষ কিছু লোককে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

ওতবা বিন রাবিয়া ছিল কোরাইশদের অন্যতম নেতা ও বদর যুদ্ধে কাফের বাহিনীর অন্যতম সেনানায়ক। তার পুত্র হোযায়ফা বিন ওতবা মুসলমান। আবূ হোযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হঠাৎ বলে ফেললেন, 'আমরা আমাদের পিতা, পুত্র ও ভাইদেরকে হত্যা করব আর আব্বাসকে ছেড়ে দেব! আমার সামনে যদি সে পড়ে তাহলে তাকে আমি ছাড়ব না।

তার একথাগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কানে গেল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকালেন। তার চারপাশে তিনশত বীরযোদ্ধা। কিন্তু রাসূলের দৃষ্টি বিশেষভাবে ওমরের ওপর পড়ল। তিনি অন্য কারো দিকে না তাকিয়ে বললেন, 'আবূ হাফস ! আল্লাহর রাসূলের চাচার চেহারায় তরবারি দ্বারা আঘাত করা হবে?'

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সেদিনই প্রথম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 'আবূ হাফস' উপনামে সম্বোধন করলেন।'

ওমর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইঙ্গিত বুঝতে পারলেন। তিনি জানতেন, তারা এখন যুদ্ধের ময়দানে। সেনাপতির সিদ্ধান্তের বিরোধিতাকারীর সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে সামান্য শিথীলতারও কোনো সুযোগ নেই । সঙ্গে সঙ্গে ওমর একটি দৃঢ় সমাধানের পথ বেছে নিলেন। তিনি হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি তরবারি দিয়ে ওর মাথা উড়িয়ে দিই।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরকে নিষেধ করলেন। তিনি অনুভব করলেন, ওমরের এ হুঙ্কার পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য যথেষ্ট।

আবূ হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু ভাল মানুষ ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি বলতেন, 'সেদিন আমি যে কথা বলেছিলাম তার কারণে আমি আজও নিজেকে নিরাপদ মনে করি না। আর আমি ততদিন ভীত সন্ত্রস্ত থাকব যতদিন

না শাহাদাত লাভের মাধ্যমে আমার এ অপরাধের কাফফারা হয়ে যায়।' আল্লাহ তাআলা তার আশংকা দূর করেছেন। তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন।

এ হলেন ওমর। রাসূল ভালভাবেই জানতেন, কোনো ধরনের কাজের দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করতে হবে। বিষয়টি রাজস্ব আদায় করা, বিবাদমান দু'দলের মধ্যে মীমাংসা করা কিংবা কোনো অজ্ঞ ব্যক্তিকে শিক্ষা প্রদান করার মতো ছিল না; বরং এটি ছিল রণাঙ্গনের একটি কঠিন সিদ্ধান্তের বিষয়। এক্ষেত্রে প্রভাব ও দৃঢ়তার অধিকারী ব্যক্তির দরকার ছিল। এজন্য রাসূল ওমরকেই এ কাজের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। পরামর্শ স্বরূপে তার কাছে জানতে চেয়েছিলেন: "আবূ হাফস ! আল্লাহর রাসূলের চাচার চেহারায় তরবারি দ্বারা আঘাত করা হবে?'

আরেকটি ঘটনা। রাসূল ﷺ খায়বারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। সামান্য প্রতিরোধের পর খায়বারের ইহুদিরা রাসূলের সঙ্গে সন্ধি করলো। রাসূল ﷺ খায়বারে প্রবেশ করলেন। রাসূল শর্ত দিলেন, 'ইহুদিদের কেউ কোনো সহায়-সম্পদ, সোনা-রূপা, ধন-দৌলত লুকাতে পারবে না। সবকিছু উপস্থিত করতে হবে। এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ যে সিদ্ধান্ত দেবেন তা সবাই নির্দ্বিধায় মেনে নেবে। তবে কেউ যদি কিছু লুকিয়ে রাখে তাহলে মুসলমানগণ সন্ধিচুক্তি মানতে বাধ্য নয়।'

হুয়াই বিন আখতাব ছিল ইহুদিদের অন্যতম সরদার। নির্বাসিত হয়ে মদিনা থেকে খায়বারে আসার সময় সে ছাগলের চামড়া সেলাই করে থলে বানিয়ে তাতে স্বর্ণ রূপা ও অলঙ্কারাদি নিয়ে এসেছিল। এসব মাল রেখেই হুয়াই মারা যায়। কিন্তু ইহুদিরা সেগুলো লুকিয়ে রাখল। হুয়াই এর চাচাকে রাসূল ﷺ বললেন, 'বনু নযীর থেকে হুয়াই যা নিয়ে এসেছিল, তা কোথায়?'

হুয়াই এর চাচা বললো, 'যুদ্ধ ও পারিবারিক ব্যয়ের খাতে খরচ হয়ে গেছে।'

রাসূল ﷺ ভেবে দেখলেন, হুয়াই বিপুল পরিমাণে সম্পদ এনেছিল। আর সে তো মারা গেছে অল্প কিছুদিন আগে। ইহুদিরা মদিনা থেকে আসার পর খায়বারে কোনো যুদ্ধবিগ্রহও হয় নি। এতো বিশাল ধনভাণ্ডার এতো তাড়াতাড়ি শেষ হওয়ার কথা নয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'তোমরা মদিনা থেকে এসেছ বেশি দিন হয় নি। আর সম্পদ তো সামান্য পরিমাণে নয় যে এতো দ্রুত শেষ হয়ে যাবে।

হুয়াই এর চাচা জবাব দিল, 'বিশ্বাস করুন, সব শেষ হয়ে গেছে। কিছুই নেই।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট বুঝে ফেললেন, লোকটি মিথ্যা বলছে। রাসূল সাহাবীদের দিকে তাকালেন। বহুসংখ্যক সাহাবী সেখানে উপস্থিত। সবাই তার ইঙ্গিতের অপেক্ষায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাইর বিন আওয়ামকে নির্বাচন করলেন। বললেন, 'যুবাইর! বেটা এমনিতে কিছু বলবে না, একটু শাস্তির প্রয়োজন। যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে রুদ্র মূর্তি ধারণ করে এগিয়ে গেলেন।

যুবাইরের ভয়ানক রূপ দেখে ইহুদি ভয়ে কাঁপতে লাগল। সে বুঝতে পারল, সত্য না বলে উপায় নেই। অনন্যোপায় হয়ে সে বললো, 'হুয়াইকে প্রায়ই দেখতাম, ঐ ধ্বংসস্তুপের কাছে আসা যাওয়া করত।' সাহাবীরা সেখানে তল্লাশি চালালেন। অবশেষে বেরিয়ে এলো হুয়াই এর গুপ্তধন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে এমন ক্ষেত্রেই ব্যবহার করতেন। ধনুক তার হাতেই সাজে যে এর সঠিক ব্যবহার জানে।

সাহাবায়ে কিরামও পারস্পরিক আচরণের ক্ষেত্রে এ নীতিরই অনুসরণ করে চলতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। রোগযন্ত্রণায় নামাযের ইমামত করতে পারছেন না। এ অবস্থায় তিনি সাহাবীদের বললেন, 'তোমরা আবূ বকরকে নামাযের ইমামত করতে বল।'

আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তো ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ, তাছাড়া তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একনিষ্ঠ সঙ্গী, নবুওয়ত পূর্ব ও পরবর্তী উভয় যুগের পরম বন্ধু, নবী-পত্নী আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর পিতা। তাই রাসূলের রোগ যন্ত্রণা আবূ বকর সিদ্দীকের জন্য ছিল পাহাড়ের চেয়ে ভারী।

রাসূল যখন আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ইমামত করার নির্দেশ পাঠালেন, তখন উপস্থিত সাহাবীদের কেউ কেউ বললেন, আবূ বকর তো কোমল স্বভাবের মানুষ। তিনি আপনার স্থানে দাঁড়ালে বিশেষ করে বর্তমান অবস্থায় আবেগ ও কান্নার ভারে নামায পড়াতে পারবেন না।'

কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আদেশের মাধ্যমে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করতে চাচ্ছিলেন যে, তার ইন্তেকালের পর খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার অধিক উপযুক্ত ব্যক্তি কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই আবার আদেশ করলেন, 'তোমরা আবূ বকরকে নামাযের ইমামত করতে বল।' অবশেষে আবূ বকর নামায পড়ালেন। স্বভাবগত কোমলতা থাকা সত্ত্বেও তিনি সঠিকভাবেই আপন দায়িত্ব পালন করলেন।

কোমল স্বভাবের হলেও আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ব্যক্তিত্ব যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল। তার কোমল স্বভাবের ভেতরে সময়মতো গর্জে ওঠার বিশেষ গুণ সুপ্ত ছিল। তার সারা জীবনের সহযাত্রী ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিষয়টি বহুবার খেয়াল করেছেন।

ইতিহাসের পাতায় একটু নজর দিয়ে দেখুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ বনু সাঈদার আঙিনায় সমবেত হয়েছেন। এখন মুসলিম জাহানের খলিফা কে হবে তা নির্ধারণ করা হবে। ওমর রাযি আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ সেখানে হাজির হলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা বনু সাইদার প্রাঙ্গনে উপস্থিত হই। সেখানে গিয়ে দেখি একজন আনসারী সাহাবী বক্তব্য দিচ্ছেন। তিনি বললেন, '...আমরা আল্লাহ তাআলার (দ্বীনের) সাহায্যকারী দল ও ইসলামের অগ্রসেনা। আমাদের মুহাজির ভাইয়েরা! আপনারা হলেন আমাদের সাহায্যকারী দল। আপনাদের কেউ কেউ আমাদের শেকড় উপড়ে ফেলতে চায় এবং খেলাফতের দায়িত্ব ছিনিয়ে নিতে চায়।'

সে তার বক্তব্য শেষ করলে আমি কিছু বলতে চাইলাম। আমি মনে মনে সময়োপযোগী কিছু কথা সাজিয়ে নিলাম। বলার আগে আবূ বকরের মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করলাম । তবে আমি তাকে কিছুটা উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ দেখতে পেলাম। আবূ বকর আমার মনোভাব বুঝতে পেরে আমাকে বললেন, 'ওমর ! একটু থাম।' আমি থেমে গেলাম। আমি তাকে আর

উত্তেজিত করলাম না। এরপর তিনি বক্তব্য রাখলেন। নিঃসন্দেহে তিনি আমার চেয়ে জ্ঞানী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। আমি অনেক ভেবে-চিন্তে যে কথাগুলো বলার প্রস্তুতি নিয়েছিলাম, তিনি সে কথাগুলো বললেন। কিংবা তার চেয়েও উত্তম ও অধিক প্রভাব সৃষ্টিকারী কথা বলে থামলেন।

আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বক্তব্যে বললেন, 'হে আনসারী ভাইয়েরা! আপনারা আপনাদেরে যেসব গুণাবলি ও ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন, নিঃসন্দেহে আপনারা তার যোগ্য। তবে আরবরা জানে যে, নেতৃত্বের গুণ কোরাইশদের মাঝেই আছে। তাছাড়া আরবের গোত্রসমূহের মধ্যে বংশের বিবেচনায় কোরাইশরা সবচেয়ে কুলিন এবং তাদের আবাসস্থল আরবের কেন্দ্রভূমিতে। আমি তাদের মধ্যে থেকে দুজন ব্যক্তিকে পেশ করছি। আপনারা তাদের যে কারো হাতে বায়াত গ্রহণ করে নিন।'

তিনি তখন আমার ও আবূ ওবায়দা ইবনুল জাররার মাঝেখানে বসা ছিলেন। কথা শেষ করেই তিনি আমাদের হাত তুলে ধরলেন। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বক্তব্যের শেষের এ কথাটি ছাড়া সবই আমার ভাল লেগেছিল। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জীবিত থাকা অবস্থায় খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার চেয়ে মরে যাওয়া আমার কাছে বেশি প্রিয়।

আবূ বকরের প্রস্তাবনার পর পুরো বৈঠকে পিনপতন নীরবতা বিরাজ করলো। এর মধ্যে নীরবতা ভেঙ্গে জনৈক আনসারী সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি ভারসাম্যপূর্ণ একটি মত পেশ করছি এবং এর পেছনে আমার প্রভাবশালী গোত্র রয়েছে, যারা একে সমর্থন করে। হে কোরাইশ সম্প্রদায়! আমাদের মধ্যে হতে একজন নেতা নির্ধারিত হোক আর তোমাদের মধ্য হতে একজন নেতা নির্বাচিত হোক।'

ওমর বলেন, তার এ প্রস্তাবের পর চারদিকে এত বেশি কোলাহল ও চেঁচামেচি শুরু হলো যে, আমি মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করলাম। তাই আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'আবূ বকর ! আপনি হাত বাড়িয়ে দিন। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। সর্বপ্রথম আমি তার হাতে বায়াত গ্রহণ করলাম। এরপর মুহাজিরগণ বায়াত গ্রহণ করলেন। তারপর আনসারগণও একে একে তার হাতে বায়াত গ্রহণ করলো।

মোটকথা, প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ের দরজা খোলার একটি চাবি আছে। সে চাবি দিয়ে আপনি তার হৃদয়ে প্রবেশ করে তার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন। তুমিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ বিষয়টি লক্ষ্য করে থাকবে। তুমি নিশ্চয় অনেক সময় তোমার সহকর্মীকে বলতে শুনে থাকবে, 'আরে! স্যারকে বশ করার 'চাবি' হলো অমুক। দরকার হলে তার মাধ্যমেই স্যারকে বশে আনবে। সে স্যারকে ম্যানেজ করতে পারবে।'

আপনি কোনো আচরণ কৌশলের চাবি দিয়ে মানুষের হৃদয়রাজ্য জয় করেছেন না? কারো লেজুড়বৃত্তি না করে শীর্ষস্থান দখল করুন। আপনি হবেন অনন্য, আপনি হবেন স্বতন্ত্র। আপনার মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তান প্রত্যেকের হৃদয়ের চাবি খুঁজে বের করুন। কর্মক্ষেত্রেও আপনার উর্দ্ধতন কর্মকর্তার ও অফিস কলিগদের হৃদয়রাজ্যে প্রবেশের চাবিটি খুঁজে বের করুন।

কারো হৃদয় জয়ের চাবিটি খুঁজে পেলে তাকে সঠিক ও কার্যকরী পন্থায় উপদেশ দিতে পারবেন। আর সেও নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ করবে। কারণ নিজের ভুলের উপলব্ধি ও অন্যের মাধ্যমে নিজেকে সংশোধন করার ক্ষেত্রে সবার রুচি ও মেজাজ একরকম নয়।

রাসূলের জীবনচরিত দেখুন। রাসূল ﷺ একদিন সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে কথা বলছিলেন। হঠাৎ অপরিচিত এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো। সে মজলিসে বসার পরিবর্তে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। এরপর সোজা মসজিদের এক কোণায় চলে গেল এবং লুঙ্গি উঠাতে লাগল!

সবাই চমকে উঠল। মসজিদের ভেতরে লোকটা কী করবে?

সবাই অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটা লুঙ্গির অগ্রভাগ উচু করে নিশ্চিন্তে বসে মসজিদে পেশাব করে দিল! তার এ কাণ্ড দেখে সাহাবায়ে কিরাম ক্রোধে ফেটে পড়লেন। কেউ কেউ তার দিকে দৌড়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু রাসূল সবাইকে শান্ত করলেন। সবাইকে বললেন, 'তাকে বাধা দিয়ো না! তাকে বাধা দিয়ো না! তাকে তার কাজ শেষ করতে দাও!'

সাহাবায়ে কিরাম লোকটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। আর লোকটি নিশ্চিন্তে পেশাব করে গেল। সাহাবীদের এসব প্রতিক্রিয়ার কিছুই হয়তো তার কর্ণগোচর হয় নি।

মসজিদে পেশাব করার মতো স্পর্শকাতর ও বিব্রতকর দৃশ্য রাসূল ﷺ চুপ করে দেখছেন। আর সাহাবীদের শান্ত করছেন! আহ! কি চমৎকার ধৈর্যের উদাহরণ! সহনশীলতার কী উত্তম নমুনা!

বেদুঈন লোকটি পেশাব শেষ করলো। এরপর ধীরে সুস্থে লুঙ্গি ঠিক করলো। রাসূল ﷺ তাকে কোমল স্বরে ডেকে কাছে এনে বসালেন। এরপর খুব নরম স্বরে বললেন, 'মসজিদ এ জাতীয় কাজের জন্য তৈরি করা হয় না। মসজিদ তো শুধু নামায ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্য।'

একদম সংক্ষিপ্ত নসিহত করলেন। লোকটি রাসূলের কথা বুঝল। এরপর চলে গেল। নামাযের সময় হলে লোকটি সবার সঙ্গে জামাতে শরীক হলো। রাসূল ﷺ নামায পড়ালেন। নামাযের মধ্যে রুকু থেকে ওঠার সময় রাসূল ﷺ 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' (যে আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তা শোনে) পড়লেন।

মুকতাদীগণ বললো, 'রাব্বানা লাকাল হামদ' (হে আমাদের প্রতিপালক! সকল প্রশংসা আপনার জন্যই।)' কিন্তু সে বেদুঈন সাহাবী এর সঙ্গে আরো যোগ করলো, 'হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রতি ও মুহাম্মদের প্রতি দয়া করুন। আপনি আমাদের সঙ্গে আর কাউকে দয়া করবেন না!'

রাসূল ﷺ-এর কানে তার এ বাক্য পৌঁছল। নামায শেষ করে তিনি সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কথা কে বলেছে?' সবাই বেদুঈন সাহাবীর দিকে ইশারা করলো। রাসূল ﷺ তাকে কাছে ডাকলেন। রাসূলের কোমল আচরণ তার হৃদয়ে রাসূলের প্রতি এমন ভালবাসা সৃষ্টি করেছিল যে, সে দোয়া করছিল, আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া যেন কেবল সে এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ লাভ করেন। অন্য কেউ যেন তা না পায়। পাছে আবার তাদের ভাগে কম পড়ে যায়। রাসূল ﷺ তাকে শিক্ষা দেয়ার জন্য বললেন, 'তুমি তো একটি বিস্তৃত বিষয়কে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছ।' অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার রহমত তো সবাইকে পরিবেষ্টন করে

আছে আর সেটাকে তুমি আমার ও তোমার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছ। এমন আর কখনো কর না।

দেখুন, আল্লাহর রাসূল কীভাবে কোমল আচরণের মাধ্যমে লোকটির হৃদয় জয় করে ফেললেন। তিনি জানতেন, একজন বেদুঈনের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হবে। গ্রাম থেকে আসা এক সাদা-সিধে বেদুঈনের জ্ঞানের পরিধি তো আবূ বকর, ওমর কিংবা মুআয ও আম্মারের মতো নয়। তাই তাকে অন্যদের মতো জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা যাবে না।

আপনি চাইলে মুয়াবিয়া বিন হাকাম এর ঘটনা থেকেও শিক্ষা নিতে পারেন। তিনি ছিলেন একজন সাধারণ সাহাবী। তিনি মদিনায় থাকতেন না বিধায় রাসূলের সার্বক্ষণিক সাহচর্যও লাভ করেন নি। তার কিছু বকরি ছিল। বকরি চরানোর স্বার্থে সবুজ ঘাসের খোঁজে তিনি বিশাল মরুতে ঘুরে বেড়াতেন।

একদিন তিনি মদিনার মসজিদে উপস্থিত হলেন। রাসূল ﷺ সাহাবীদের সঙ্গে হাঁচি দেয়ার বিধান সম্পর্কে আলোচনা করছেন। রাসূল ﷺ সাহাবীদেরকে শেখালেন, 'কোনো মুসলমান হাঁচি দিলে সে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলবে। আর যে তা শুনবে সে উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে।'

মুয়াবিয়া বিষয়টি মুখস্থ করে নিজ কাজে চলে গেলেন। কিছুদিন পর তিনি কোনো এক প্রয়োজনে আবার মদিনায় এলেন। মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে দেখলেন, রাসূল ﷺ সাহাবীদেরকে নিয়ে নামায পড়ছেন। তিনিও নামাযে শরিক হলেন। নামাযের মধ্যে মুসল্লীদের কেউ একজন হাঁচি দিল। সঙ্গে সঙ্গে মুয়াবিয়ার মনে পড়ল, তিনি আল্লাহর রাসূলের কাছে শিখেছিলেন, মুসলমানের হাঁচির জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলতে হয়। হাঁচিদাতা 'আলহামদু লিল্লাহ' না বলতেই মুয়াবিয়া সজোরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে উঠল!

মুসল্লীরা চমকে উঠল। অনেকে বিরক্তিভাব নিয়ে আড়চোখে তার দিকে তাকাল। সকলের বিরক্তিভাবে লক্ষ্য করে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমাদের কী হলো? তোমরা আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছ কেন?'

মুসল্লীদের কেউ কেউ উরুর ওপর হাত মেরে শব্দ করে তাকে চুপ থাকার জন্য ইঙ্গিত করলো। ইঙ্গিত বুঝে মুয়াবিয়া চুপ করলেন। নামায শেষে রাসূল ﷺ মুসল্লীদের দিকে ফিরলেন। মুসল্লীদের শোরগোল ও একজনের কথার আওয়াজ রাসূলের কানে পৌঁছেছিল। কিন্তু এ নতুন কণ্ঠের সঙ্গে রাসূল ﷺ আগ থেকে পরিচিত ছিলেন না। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'নামাযের মধ্যে কে কথা বললো?'

সবাই মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দিকে ইঙ্গিত করলো। রাসূল তাকে কাছে ডাকলেন। তিনি ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেলেন। তিনি সবার নামাযে বিঘ্ন ঘটিয়েছেন, নামাযের একাগ্রতায় বাধা সৃষ্টি করেছেন। রাসূল এখন তাকে কী বলবেন। এ ভয়ে সে অস্থির।

কিন্তু রাসূল ﷺ তাকে এমনভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি বলতে বাধ্য হলেন যে, 'আমার পিতা-মাতা আল্লাহর রাসূলের জন্য কোরবান হোক! আল্লাহর কসম! আমি জীবনে এর আগে বা পরে রাসূল ﷺ-এর চেয়ে শ্রে'ও কোমলপ্রাণের কোনো শিক্ষক দেখি নি। আল্লাহর কসম ! তিনি আমাকে প্রহার করেন নি, ভর্ৎসনাও করেন নি এমনকি তিরস্কারও করেন নি।'

রাসূল শুধু বলেছেন, 'মুয়াবিয়া! নামাযের মধ্যে কথা বলা যায় না। নামাযে তো কেবল তাসবিহ, তাকবির ও কুরআন তিলাওয়াত করতে হয়।' শুধু এতটুকুই বললেন। কত সংক্ষিপ্ত অথচ মোক্ষম উপদেশ।

মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বিষয়টি বুঝতে পারলেন। রাসূলের এতটুকু কথায় তার মন স্থির হয়ে গেল। রাসূলের উদারতায় সে গলে গেল। রাসূলের প্রতি সে দুর্বল হয়ে পড়ল। তিনি রাসূলকে নিজের ব্যক্তিগত বিভিন্ন প্রশ্ন করতে লাগলেন।

তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! কিছুদিন আগেও আমরা মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলাম। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইসলামের আলোতে আলোকিত করেছেন। আমাদের মধ্যে অনেকে জ্যোতিষীর কাছে যায় । তারা তাদের কাছে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে চায়।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি তাদের কাছে যেয়ো না।'

তুমি একজন মুসলমান আর মুসলমান মাত্রই এ কথা বিশ্বাস করে যে, ভবিষ্যতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। তাই তাদের কাছে যাওয়া তোমার জন্য সমীচীন নয়। এরপর মুয়াবিয়া বললেন, 'আমাদের মধ্যে অনেকে শুভ-অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করে।' বিভিন্ন লক্ষণ দেখে শুভ অশুভ নির্ণয় করে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এ জাতীয় নির্ণয় ও ফাল গণনা কল্পনাবিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। বাস্তবে এর কোনো প্রভাব কিংবা ক্ষমতা নেই।'

লাভ-ক্ষতির ক্ষেত্রে এগুলোর কোনো ভূমিকা নেই। এগুলো কারো কোনো লাভ বা ক্ষতি করতে পারে না। লাভ-ক্ষতির ক্ষমতা কেবল আল্লাহর হাতে।

মসজিদে পেশাব করা এক বেদুইন এবং নামাযে কথা বলা এক ব্যক্তির সঙ্গে এই হলো রাসূলের আচরণ। ব্যক্তি হিসেবে তাদের সাথে এ আচরণই ছিল স্থান, কাল ও পাত্র উপযোগী। কারণ এ ধরনের অশিক্ষিত মানুষের ভুল হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার।

কিন্তু মুআয বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন রাসূলের কাছের একজন সাহাবী এবং ইলম অন্বেষণে অনেক অগ্রসর। তাই তার সাথে রাসূলের আচরণ ও তার ভুল সংশোধনের পদ্ধতি অন্যদের তুলনায় ভিন্ন ছিল।

মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পেছনে এশার নামায পড়তেন। এরপর নিজ লোকালয়ে গিয়ে এলাকাবাসীদের এশার নামাযের ইমামত করতেন। দ্বিতীয়বারের এ নামায মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্য নফল এবং অন্যদের জন্য ফরয হিসেবে গণ্য হতো।

একরাতের ঘটনা। মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু এলাকায় এসে তাকবির দিয়ে এশার নামাযের ইমামত শুরু করলেন। ইতোমধ্যে এক যুবক এসে নামাযে শরিক হলো। মুআয সূরা ফাতিহা শেষ করলেন। এরপর মুআয সূরা বাকারা শুরু করলেন!

সে সময় লোকেরা সারাদিন ক্ষেত খামারে কাজ করত, পশু চরাত, এরপর এশার নামায পড়তে না পড়তেই শুয়ে পড়ত।

যুবকটি নামাযে দাঁড়িয়ে আছে, আর মুআয কিরাত পড়েই যাচ্ছেন। যুবকটি আর স্থির থাকতে পারলেন না। একপর্যায়ে সে জামাত ছেড়ে দিয়ে একা একা নামায শেষ করে বাড়ি চলে গেল। নামায শেষ হলে মুসল্লীদের একজন মুআযকে বললো, 'মুআয! অমুক তো আমাদের সঙ্গে নামাযে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আপনার দীর্ঘ কিরাতের কারণে নামায ছেড়ে চলে গেছে।'

এ কথা শুনে মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তার মধ্যে নেফাক ও কপটতা আছে। আমি অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তার বিষয়টি জানাব।'

যুবকটির কানে মুআযের এ মন্তব্য পৌঁছলে সে বললো, 'আমিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যাব। মুআযের বিষয়টি রাসূলকে জানাব। উভয়ে রাসূলের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। মুআয রাযি যুবকটির আচরণ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানালেন। যুবকটি আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললো, 'আল্লাহর রাসূল! তিনি দীর্ঘসময় আপনার কাছে থাকার পর আমাদের এখানে আসেন। এরপর লম্বা লম্বা কিরাত দিয়ে নামায পড়ান। আল্লাহর কসম! মুআয নামায যেভাবে দীর্ঘ করেন, তাতে তো আমরা জামাতে এশার নামায পড়তেই যাব না।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআযকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি নামাযে কী কিরাত পড়ে থাক?' মুআয সূরা বাকারাসহ বিভিন্ন বড় বড় সুরার নাম বলতে লাগলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারলেন মুআযের লম্বা লম্বা কিরাত মানুষকে জামাত থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। নয়তো নামায কেন তাদের জন্য ভারী হবে!

বিষয়টি বুঝতে পেরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব রেগে গেলেন। তিনি মুআযকে লক্ষ করে বললেন, 'মুআয! তুমি কি মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাও?' তোমার এ কাজ তো মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। আর পরিণামে তারা দ্বীন থেকে বিমুখ হয়ে যাবে।

'তুমি সূরা তারিক, সূরা বুরূজ, সূরা শামস, সূরা লাইল এর মতো সূরাগুলো পড়বে।' এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকটির দিকে তাকিয়ে কোমল স্বরে জানতে চাইলেন, 'বেটা! তুমি নামায কীভাবে পড়?'

যুবকটি বললো, 'আমি সুরা ফাহিতা দিয়ে নামায শুরু করি। নামায শেষে আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করি, জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাই।' এ সময়ে

যুবকটির স্মরণ হলো, সে আল্লাহর রাসূল ও মুআযকে দীর্ঘ সময় ধরে দোয়া করতে দেখে। তাই সে বললো, 'আমি বুঝি না, আপনি ও মুআয এতো দীর্ঘ সময় ধরে বিড়বিড় করে কী দোয়া করেন? আমি তো এত দীর্ঘ সময় ধরে দোয়া করতে পারি না।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি যে জান্নাত-জাহান্নাম সংক্রান্ত দোয়া কর, আমি ও মুআয সে দোয়াই করি।

মুআয নেফাকের অপবাদ দেয়ায় যুবকটি খুব ব্যথা পেয়েছিল। তাই সে বললো, 'যেদিন কোনো শত্রু আক্রমণ করবে, সেদিন মুআয জানতে পারবে আমি কী করব।'

জিহাদের ময়দানেই মুআযের কাছে আমার ঈমানের বিষয়টি স্পষ্ট হবে। সেদিন সে বুঝতে পারবে, কাকে সে নেফাকের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল।

কিছুদিন পরই এক যুদ্ধে এ যুবক বীর বিক্রমে জিহাদ করে শাহাদাতবরণ করেন। রাসূল ﷺ এ খবর শোনার পর মুআযকে বললেন, 'তোমার সে বাদী যুবক যাকে তুমি মুনাফিক বলেছিলে, কী করেছে শুনেছ?'

মুআয রাযি বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ সত্য বলেছেন, আর আমি মিথ্যা বলেছি। তিনি তো আল্লাহর পথে শাহাদাতবরণ করেছেন।'

বস্তুতঃ মানুষের রুচি, স্বভাব ও সামাজিক অবস্থানের ভিন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। দেখুন, ব্যক্তি বিশেষে রাসূল ﷺ-এর আচরণ কেমন বৈচিত্রময় ছিল।

এবার দেখুন রাসূলের গৃহে লালিত আদরের পোষ্যপুত্র ওসামা বিন যায়েদের সঙ্গে রাসূলের আচরণ কেমন ছিল।

রাসূল ﷺ একবার জুহাইনা গোত্রের শাখা গোত্র 'আল হুরাকা'এর বিরুদ্ধে সাহাবীদের একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। ওসামা বিন যায়েদও এ বাহিনীতে ছিলেন।

খুব ভোরে যুদ্ধ শুরু হলো। মুসলমানরা বিজয় লাভ করলেন। শত্রুবাহিনীর যোদ্ধারা পালাতে লাগল। শত্রুবাহিনীর এক যোদ্ধা সহযোদ্ধাদের পরাজিত হতে দেখে অস্ত্র ফেলে পলায়নে উদ্যত হলো। ওসামা ও একজন

আনসারী সাহাবী তার পিছু নিলেন। তাদেরকে দেখে লোকটি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াতে লাগল। তারাও পিছু পিছু ধাওয়া করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে লোকটি একটি গাছের পেছনে আত্মগোপন করলো। ওসামা ও আনসারী সাহাবী তাকে ঘেরাও করে তরবারি উঁচিয়ে ধরলেন। দু'দিক থেকে মাথার ওপর উদ্যত চকচকে দুটি তরবারির আলোকিত রেখায় সে যেন মৃত্যুর অন্ধকার ছায়া দেখতে পেল। ভয়ে তার গলা শুকিয়ে গেল। তারপরও গলা থেকে থুথু এনে তা দিয়ে শুষ্ক জিহ্বাকে কোনো রকমে ভিজিয়ে সে বারবার বলতে লাগল, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসূল।'

আনসারী সাহাবী ও ওসামা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। লোকটি কি আসলেই ইসলাম গ্রহণ করেছে, নাকি এটি আত্মরক্ষার কৌশল?

যুদ্ধের ময়দান। জীবন মৃত্যুর খেলা। সবকিছু এলোমেলো। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মানুষের ছিন্ন-ভিন্ন দেহ। কর্তিত হাত-পা। চারপাশে আহত ও নিহতদের রক্তের বন্যা। আহতদের আর্তচিৎকার। মুমূর্ষুদের গোঙ্গানি।

চোখের সামনে শত্রু। উভয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যে কোনো সময় গায়ে বিঁধতে পারে লক্ষ্যভেদি কিংবা লক্ষ্যভ্রষ্ট তীর।

তখন ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার মতো সুযোগ ছিল না। আনসারী সাহাবী আঘাত না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তরবারি গুটিয়ে নিলেন। কিন্তু ওসামা মনে করলেন, এটা শত্রুর একটা কৌশল মাত্র। তাই তরবারির আঘাতে তিনি লোকটিকে হত্যা করে ফেললেন।

মুজাহিদ বাহিনী মদিনায় ফিরে এলো। সবার হৃদয়ে বইছে বিজয়ানন্দের তুমুল হিল্লোল।

ওসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ﷺ-এর কাছে বিজয়বার্তা নিয়ে আসলেন। যুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা তাকে শোনাতে লাগলেন। রাসূল ﷺ আনন্দচিত্তে মুসলমানদের যুদ্ধজয়ের কাহিনী শুনছিলেন। একসময় সে লোকটির কথা এল।

গল্পের শেষে ওসামা যখন বললেন 'তারপর আমি তাকে হত্যা করলাম' তখন সঙ্গে সঙ্গে রাসূলের চেহারার রং পাল্টে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'লোকটি কালেমা শাহাদাত পড়া সত্ত্বেও তুমি তাকে হত্যা করলে?!'

ওসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! সে তো মন থেকে কালেমা পড়ে নি। সে তো পড়েছিল অস্ত্রের মুখে, জীবন বাঁচাতে।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন,'হায়! তুমি কী করলে! লোকটি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে?, তুমি কেন তার বুক ফেড়ে দেখলে না সে কি আত্মরক্ষার্থে কালিমা পড়েছিল না বাস্তবেই কালেমা পড়েছিল?!'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দিকে তাকিয়ে বারবার বলছিলেন, 'লোকটি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে?' লোকটি কালিমা পড়া সত্ত্বেও তাকে মেরে ফেললে?! কিয়ামতের দিন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যখন তোমার বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করবে তখন তুমি কী করবে?'

রাসূল বারবার ওসামাকে এ কথা বলছিলেন। ওসামা বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবর্ণ চেহারা দেখে আমি আন্তরিকভাবে কামনা করছিলাম যদি আমি আগে মুসলমান না হয়ে সেদিনই মুসলমান হতাম! তাহলে তো আর এ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতাম না।

মন্তব্য...

আচরণের ক্ষেত্রে সবাইকে একরকম ভাববেন না।

মানুষের স্বভাব-চরিত্র আকাশের রঙের চেয়েও বৈচিত্র্যময়।



১৮. স্থান-কাল-পাত্রভেদে কথা বলুন

আগের আলোচনার পরই যে প্রসঙ্গটি আসে তা হলো- মানুষের সঙ্গে কথা বলার পদ্ধতি ও ব্যক্তি হিসেবে আলোচ্য বিষয়ের ভিন্নতা। আপনি যখন কারো সঙ্গে কথা বলবেন তখন তার মনন ও রুচি উপযোগী প্রসঙ্গ টানুন। এটা মানুষের সহজাত প্রকৃতির দাবিও বটে।

যুবকের সঙ্গে আপনার কথাবার্তা আর বৃদ্ধের সঙ্গে আলোচনা কখনো এক রকম হবে না। অনুরূপভাবে একজন অজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে সেভাবে কথা বলবেন না, যেভাবে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে বলবেন। স্ত্রী ও বোনের সঙ্গে আলাপচারিতার ধরনও অবশ্যই ভিন্ন হবে।

আমি এ কথা বলতে চাচ্ছি না যে, আলোচনাই সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে হবে। বোনকে যে ঘটনা বলা যাবে তা স্ত্রীকে বলা যাবে না! যুবকের সঙ্গে যে আলোচনা করেছেন তা কোনো বৃদ্ধ শুনতে পারবে না!

না, আমি এরূপ বোঝাতে চাচ্ছি না; বরং ভিন্নতা বলতে আমি যা বোঝাতে চাচ্ছি তা হলো, ঘটনাটি উপস্থাপনের ধরন ও আঙ্গিকে একটু পার্থক্য করা। তবে ক্ষেত্রবিশেষ পুরো কাঠামোটাকেই পাল্টে দিতে হয়। একটি উদাহরণ দিলে আশা করি বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। মনে করুন, আপনার দাদা আথবা ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে আপনাদের বাসায় আশির উর্ধ্বে বয়স এমন কয়েকজন মেহমান এলেন। আপনি যদি তাদের সঙ্গে হাসতে হাসতে বন্ধুদের সঙ্গে ভ্রমণে যাওয়ার গল্প বলতে শুরু করেন তাহলে কেমন হবে? অথবা ফুটবল খেলার গল্প শুরু করে বললেন, অমুক টুর্নামেন্টে খেলোয়ার কীভাবে গোল দিল। কে মাথায় বল রেখে পরে হাঁটু দিয়ে কিক করলো। তাহলে এটা ব্যক্তি ও পরিবেশের উপযোগী আলোচনা হবে না।

অনুরূপভাবে বাচ্চাদের সঙ্গে গল্প করার সময় যদি দাম্পত্য জীবনের বিষয় কিংবা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা শুরু করেন তাহলে কেমন হবে?

আমার মনে হয় এ বিষয়গুলো যে স্থান-কাল-পাত্রের প্রতিকূল তাতে আমরা সবাই একমত হব।

Contents

মানুষকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মাধ্যম হলো, যে ব্যক্তি যে প্রসঙ্গ ভালবাসে, তার সঙ্গে সে প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলা। কোনো ভদ্রলোকের যদি স্বনামধন্য কোনো পুত্র থাকে তাহলে তার কাছে তার পুত্রের ক্যারিয়ার সম্পর্কে জানতে চাইবেন। কারণ ভদ্রলোক অবশ্যই তার ছেলের ক্যারিয়ার নিয়ে গর্ববোধ করেন। আর এ কারণেই তিনি তার ব্যাপারে আলোচনা করতে পছন্দ করবেন।

মনে করুন আপনার পরিচিত কোনো দোকানদার দোকান খোলার পর কিছু বেচাকেনা করেছেন। বেশ লাভও হয়েছে। এ মুহূর্তে আপনি তার কাছে গেলেন। তখন আপনি বেচাকেনা কেমন হচ্ছে, দোকানে ক্রেতাদের উপস্থিতি কেমন? এসব বিষয় জানতে চাইবেন। কেননা, এ জাতীয় আলোচনা তখন তার ভাল লাগবে। আর এর ফলে সে আপনাকে দেখলে খুশী হবে, আপনার সঙ্গে কথা বলতে তার ভাল লাগবে।

আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও এ বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখতেন। তাই যুবক-বৃদ্ধ, নারী ও শিশুর সাথে তার কথা বলার ধরন হতো ভিন্ন ভিন্ন।

জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রাসূলের এক যুবক সাহাবী। মা বেঁচে নেই। নয় বোন রেখে ওহুদ যুদ্ধে তার পিতাও শহীদ হয়েছেন। তাই সহোদর নয় বোনের দায়িত্ব তার ওপর এসে পড়েছে।

এদিকে বাবা বিশাল ঋণের বোঝা রেখে গেছেন । যা তাকেই পরিশোধ করতে হবে। যৌবনের শুরুতে এমন বহুমুখী চাপে জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন উদ্বিগ্ন। তার মাথায় সবসময় শুধু দুশ্চিন্তা ঘুরপাক খেত। ঋণ পরিশোধের চিন্তা, বোনদের ভরণ-পোষণ ও বিবাহের চিন্তা। সকাল-বিকাল পাওনাদারদের আনাগোনা ও ঋণ পরিশোধের দাবি। এমন এক যুবকের সাথে রাসূলের আচরণ দেখুন।

যাতুর রিকা অভিযান শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় ফিরে আসছেন। সঙ্গে জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন। তার বাহন ছিল জীর্ণ-শীর্ন একটি উট। নিজেরই যার চলতে কষ্ট হয়। যাত্রী বহন করা তো আরো কষ্টসাধ্য। উৎকৃষ্টমানের উট কেনার মতো অর্থ জাবেরের ছিল না। উটের ধীর গতির কারণে তিনি কাফেলার একেবারে পেছনে পড়ে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বাহিনীর

পেছনে পেছনে চলছিলেন। তিনি জাবেরকে দেখতে পেলেন। সঙ্গে তার জীর্ণ-শীর্ণ উটটিও তার নজর এড়াল না।

রাসূল ﷺ তার কাছে এসে বললেন, 'জাবের! তুমি এতো পেছনে পড়ে গেলে কেন?' জাবের বললেন, 'এই উটটির কারণে আমি পেছনে পড়ে গেছি।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'উটটিকে বসাও।'

জাবের উটকে বসাল। রাসূল ﷺ ও নিজের উটকে বসিয়ে জাবেরকে বললেন, 'তোমার লাঠিটি আমাকে দাও অথবা আমার জন্য গাছ থেকে একটি ডাল কেটে আন।'

জাবের রাসূল ﷺ-এর দিকে নিজের লাঠি এগিয়ে দিলেন। জাবেরের উটটি মাটিতে দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে বসে ছিল। রাসূল ﷺ উটটির দিকে এগিয়ে গেলেন । তিনি উটটিকে লাঠি দিয়ে একটু আঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে উটটি দাড়িয়ে নতুন উদ্যমে চলতে লাগল। জাবের দৌড়ে উটটির পিঠে চেপে বসলেন।

রাসূল ﷺ ও জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু একসঙ্গে চলছেন। এখন জাবেরের মন খুব ভাল। তার উটটি নতুন শক্তি ও উদ্যম ফিরে পেয়েছে। রাসূল জাবেরের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলতে চাইলেন।

এখানে লক্ষণীয় হলো, জাবেরের সঙ্গে রাসূল কোনো প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন? জাবের তখন সবেমাত্র যৌবনে পা দিয়েছে। যৌবনের মৌবনে সে এক নতুন ভ্রমর। এ বয়সে সাধারণত যুবকদের মাথায় বিয়ে-শাদী ও আত্মপ্রতিষ্ঠার চিন্তাই বেশি ঘুরপাক খায়। তাই রাসূল ﷺ বললেন, 'জাবের! তুমি বিয়ে করেছ?'

জাবের উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ'।

রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, 'কুমারী না বিধবা?'

'বিধবা'। জাবের বললেন।

অবিবাহিত এক তাগড়া যুবক তার জীবনের প্রথম বিয়ে একজন বিধবাকে করেছে শুনে রাসূল ﷺ খুব অবাক হলেন। তিনি জাবেরকে স্নেহের স্বরে

বললেন, 'কুমারী মেয়ে বিয়ে করলে না কেন? তাহলে তো সেও তোমার সাথে মজা করত আর তুমিও তার সাথে মজা করতে।'

জাবের রাযি বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আমার বাবা আমার নয় বোন রেখে ওহুদের যুদ্ধে ইন্তেকাল করেছেন। আমি ছাড়া তাদের দেখা-শোনা করার মত আর কেউ নেই। তাই আমি তাদের বয়সী কোনো যুবতীকে বিয়ে করা সমীচীন মনে করি নি। কারণ এর ফলে তার সঙ্গে তাদের বনি বনা না হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই আমি তাদের চেয়ে বয়স্ক এক নারীকে বিয়ে করেছি, যাতে সে তাদেরকে মায়ের মতো মায়া-মমতা দিয়ে আগলে রাখতে পারে।'

রাসূল ﷺ-এর সামনে তখন ছিল এমন এক আত্মত্যাগী যুবক যে নিজের বোনদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে যৌবনের ভোগ-বিলাস বিসর্জন দিয়েছে। তাই তিনি তাকে যুবকদের রুচি ও প্রকৃতির অনুকূল কিছু কথা বলে তাকে আনন্দ দিতে চাইলেন।

রাসূল তাকে বললেন, 'আমরা মদিনার কাছা-কাছি পৌঁছে সিরারে[১] যাত্রাবিরতি করব। আমাদের আগমন সংবাদ যখন তোমার স্ত্রী শুনবে, তখন সে তোমার জন্য খাট সাজিয়ে রাখবে।'

যদিও তুমি বিধবা বিয়ে করেছ, কিন্তু সে তো তোমার জন্য নববধু। তাই সে তোমার আগমনে আনন্দিত হবে এবং তোমার আরামের জন্য বিছানা প্রস্তুত করে রাখবে।

রাসূলের মুখে খাটের কথা শুনে জাবেরের নিজের দরিদ্রতার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল! আমাদের ঘরে তো কোনো খাট নেই।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'ইনশাআল্লাহ! তোমাদের ঘরে অতিসত্বর খাট আসবে।'

উভয়ে আবার পথ চলতে লাগলেন। রাসূল ﷺ জাবেরকে কিছু অর্থ-কড়ি দিতে চাইলেন। তিনি বললেন, 'জাবের!'

সঙ্গে সঙ্গে জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, 'আমি উপস্থিত, ইয়া রাসূলাল্লাহ!'

---

১. মদিনা থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম

রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি কি তোমার উটটি আমার কাছে বিক্রি করবে?'

জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ﷺ-এর এ প্রস্তাবে একটু চিন্তায় পড়ে গেলেন। এই উটটিই তার একমাত্র সম্বল। দুর্বল হলেও সেটি এখন তেজি ও সবল হয়ে গেছে। কিন্তু প্রস্তাব দিয়েছেন স্বয়ং রাসূল ﷺ। জাবের বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আপনিই বলুন, এর দাম কত দেবেন?'

'এক দেরহাম।' রাসূল ﷺ বললেন।

আমার ঠক হয়ে যাবে।' জাবের বললেন,

'তাহলে দুই দেরহাম।' রাসূল বললেন।

'তাহলেও ঠক হবে।' জাবের বললেন।

এভাবে দাম বাড়াতে বাড়াতে চল্লিশ দিরহাম পর্যন্ত পৌঁছল। আরবের তৎকালিন পরিমাপ হিসেবে ৪০ দেরহামে এক উকিয়া সমপরিমাণ স্বর্ণ হয়ে থাকে। জাবের বললেন, 'ঠিক আছে। আমি রাজি। তবে আমার একটি শর্ত আছে। আমি এই মুহূর্তে উটটি হস্তান্তর করতে পারব না। এর ওপর চড়ে আমি মদিনা পর্যন্ত যাব। এরপর তা হস্তান্তর করব।'

রাসূল বললেন, 'ঠিক আছে।'

সবাই যথাসময়ে মদিনায় পৌঁছলেন। জাবের নিজের বাড়িতে গিয়ে উটের পিঠ থেকে মালপাত্র নামালেন। এরপর রাসূলের সঙ্গে নামায পড়ার জন্য মসজিদে এলেন। মসজিদের কাছেই উটটিকে বেঁধে রাখলেন ।

নামায শেষে রাসূল ﷺ যখন বের হলেন, জাবের বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! এই যে নিন আপনার উট।' রাসূল ﷺ উটটি বুঝে নিলেন। এরপর বেলালকে বললেন, 'বেলাল! জাবেরকে এক উকিয়া দিয়ে দাও। কিছু বাড়িয়ে দিও।'বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ﷺ-এর আদেশ অনুযায়ী মেপে এক উকিয়ার চেয়ে কিছু বেশি জাবেরকে দিয়ে দিলেন। জাবের দিরহামগুলো হাতে নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে করতে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবছিলেন, দেরহামগুলো দিয়ে কী করবেন? একটা উট কিনবেন? নাকি বাড়ির জন্য কিছু আসবাবপত্র কিনবেন? নাকি...? তার ভাবনায় ছেদ পড়লো। বেলাল তাকে ডাকছে।

এদিকে রাসূল ﷺ বেলালকে বললেন, 'বেলাল! উটটি নিয়ে তুমি জাবেরকে আমার পক্ষ থেকে হাদিয়াস্বরূপ দিয়ে দাও।'বেলাল সঙ্গে সঙ্গে উট নিয়ে জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে উট নিয়ে আসতে দেখে অবাক হলেন। মনে মনে আশঙ্কা করলেন, রাসূল ﷺ কি তাহলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল করে দিলেন? বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু- এর পাশে এসে বললেন, 'জাবের! তোমার উট তুমি নিয়ে নাও। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন,'কেন? ব্যাপার কী?'

বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'রাসূল ﷺ আমাকে বলেছেন, আমি যেন উটটা তোমাকে দিয়ে দিই। আর দেরহামগুলোও ফিরিয়ে না নিই।'

বেলালের কথা শুনে জাবের রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি উট নেবেন না?'

রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি কি মনে কর আমি এত অল্প দামে উটটি নেয়ার জন্য তোমার সঙ্গে কষা-কষি করেছি? বরং আমি অনুমান করতে চেয়েছিলাম, এ মুহূর্তে কী পরিমাণ অর্থে তোমার প্রয়োজন পূরণ হতে পারে।'

আহ! কত উত্তম চরিত্র!

রাসূল ﷺ যুবকদের সঙ্গে তাদের মানসিকতা বুঝে কথা বলতেন। আর যখন তাদেরকে কোনো কিছু দান করতে চাইতেন তখন তা স্নেহ ও ভালবাসার আবরণে আবৃত করে দিতেন।

রাসূলের পাশে একদিন এক সাহাবী বসা ছিলেন। তার নাম ছিল জুলাইবীব। তিনি ছিলেন একজন উত্তম ও নওজোয়ান সাহাবী। কিন্তু তিনি ছিলেন নিঃস্ব, অসহায় ও দেখতে কিছুটা কদাকার। সেদিন রাসূল ﷺ তার সঙ্গে কিছু কথা বলছিলেন। আসুন একটু দেখি একজন অবিবাহিত যুবক সাহাবীর সঙ্গে রাসূল ﷺ-এর আলোচনার বিষয়বস্তু কী ছিল?

রাসূল তার সঙ্গে আরবের কুলজি বা কুষ্ঠিনামা নিয়ে আলোচনা করছিলেন? কোনোটি সম্ভ্রান্ত বংশ, আর কোনোটি সাধারণ বংশ? না কি তার সঙ্গে বাজার ও ক্রয়-বিক্রয়ের নানা বিধি-বিধান নিয়ে আলোচনা করছিলেন? না, এ জাতীয় কোনো বিষয় নিয়ে রাসূল ﷺ তার সঙ্গে আলোচনা করেন নি।

রাসূল তার সঙ্গে আলোচনার জন্য এক ভিন্ন প্রসঙ্গ নির্বাচন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গটিই তার জন্য অন্য যে কোনো প্রসঙ্গ থেকে বেশি উপযোগী। রাসূল ﷺ তার সঙ্গে বিয়ে নিয়ে আলোচনা করছিলেন। পৃথিবীতে এমন কোনো যুবক নেই, যার কাছে এ প্রসঙ্গটি ভাল লাগে না।

যাই হোক, রাসূল ﷺ তাকে বিয়ে করার কথা বললেন। জুলাইবীব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'সমাজে তো আমি অচল, এ সমাজের চোখে আমার কোনো মূল্য নেই।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'কিন্তু আল্লাহর কাছে তো তুমি অচল নও।'

এরপর থেকে রাসূল ﷺ জুলাইবীবকে একটি ভাল পাত্রী দেখে বিয়ে দেয়ার সুযোগের অপেক্ষায় থাকলেন। একদিন জনৈক আনসারী সাহাবী রাসূল ﷺ-এর কাছে তার বিধবা মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলো। তার অভিপ্রায় ছিল, রাসূল ﷺ যেন তাকে বিয়ে করেন।

রাসূল ﷺ বললেন, 'আমি তোমার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছি।' সাহাবী বললেন, 'অবশ্যই, অবশ্যই।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'তবে আমার নিজের জন্য নয়।'

সাহাবী জানতে চাইলেন, 'তাহলে কার জন্য ?

রাসূল ﷺ বললেন, জুলাইবীবের জন্য।'

আনসারী সাহাবী একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'জুলাইবীব? তাহলে মেয়ের মায়ের সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে হবে।'

এ কথা বলে তিনি ফিরে গেলেন। বাড়িতে এসে স্ত্রীকে বললেন, 'রাসূল ﷺ তোমার মেয়ের ব্যাপারে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন।'

স্ত্রী বললো, 'এ তো মহা আনন্দের সংবাদ। তুমি রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও।'

'রাসূল নিজের জন্য প্রস্তাব পাঠান নি।' আনসারি সাহাবী বললো।

'তবে কার জন্য?'

'রাসূল ﷺ তাকে জুলাইবীবের সঙ্গে বিয়ে দিতে চান।'

তখন তার স্ত্রী বললো, 'এমন নিঃস্ব ফকিরের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব! দেখতেও তো সে সুন্দর নয়। জুলাইবীবের সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে দেব না। তাছাড়া আমরা এরচেয়ে ভাল প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছি।

মেয়ের বাবা চিন্তায় পড়ে গেলেন। রাসূলকে গিয়ে কী বলবেন? যাই হোক সাত পাঁচ ভেবে তিনি যখন রাসূল ﷺ-এর কাছে আসার জন্য অগ্রসর হলেন তখন ঘরের ভেতর থেকে মেয়ে জানতে চাইল, 'আপনাদের কাছে কে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন।'

তারা বললেন, 'রাসূল ﷺ।'

মেয়েটি বললো, 'আপনারা রাসূল ﷺ-এর প্রস্তাব ফিরিয়ে দিতে চাইছেন? আমাকে রাসূল ﷺ-এর সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দিন। তিনি কখনোই আমার জন্য ক্ষতিকর কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না।'

মেয়ের কথায় বাবা খুব খুশি হলেন। মাও তা মেনে নিলেন। বাবার দুশ্চিন্তা দূর হলো। মেয়ের বাবা নিশ্চিন্তে রাসূল ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললেন, 'আমার মেয়ের দায়িত্ব আপনার ওপর অর্পণ করলাম। আপনি চাইলে তাকে জুলাইবীবের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারেন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই।' রাসূল ﷺ তাকে জুলাইবীবের সঙ্গে বিয়ে দিলেন এবং তাদের জন্য দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ ! তাদের ওপর তুমি অজস্র কল্যাণ বর্ষণ কর এবং তাদের জীবনকে তুমি দুঃখময় কর না।'

কিছুদিন পর রাসূল ﷺ এক গযওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। জুলাইবীবও রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন। যুদ্ধ শেষে সবাই সঙ্গীদের তালাশ করতে লাগলেন। কারো কারো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি কাউকে খুঁজে পাচ্ছ না?' সাহাবীরা বললেন, 'আমরা অমুক অমুককে খুঁজে পাচ্ছি না।'

রাসূল ﷺ কিছু সময় চুপ থেকে আবার বললেন, 'তোমরা কার সন্ধান পাচ্ছো না?' তারা বললো, 'আমরা অমুক অমুকের সন্ধান পাচ্ছি না।।'

রাসূল ﷺ আবারও চুপ থেকে বললেন, 'আমি তো জুলাইবীবকে দেখছি না।'

এবার সবাই তার সন্ধানে নেমে পড়ল। যুদ্ধের ময়দানে নিহতদের মধ্যে তাকে পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল একটু দূরে । তার আশে-পাশে পড়েছিল সাতজন মুশরিকের লাশ। তাদেরকে হত্যা করে তিনি শাহাদাতের শরাব পান করেছেন।

রাসূল ﷺ তার লাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'সে সাতজনকে হত্যা করার পর শহীদ হয়েছে। সে সাতজনকে হত্যা করার পর শহীদ হয়েছে। সে আমার, আমি তার ।'

রাসূল ﷺ তাকে কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে কবর খননের আদেশ দিলেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমরা কবর খুঁড়ছিলাম। আর জুলাইবীবের লাশ কাঁধে নিয়ে রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাসূলের কাঁধই ছিল তার খাট ! কবর খোঁড়া শেষ হলে রাসূল ﷺ নিজ হাতে তাকে কবরে শুইয়ে দিলেন।'

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জুলাইবীবের মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার জন্য আনসারী সাহাবীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে গিয়েছিল।'

এভাবেই রাসূল ﷺ প্রত্যেকের সঙ্গে তার রুচি ও প্রকৃতির অনুকূল বিষয়ে আলোচনা করতেন। এ কারণে রাসূলের কাছে বসে তার কথা শুনতে কেউ বিরক্ত হতো না।

রাসূল ﷺ একদিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর পাশে বসলেন। তিনি তার সঙ্গে কিছু সময় গল্প করবেন। তাকে আনন্দ দেবেন।

বলুন তো, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো বিষয়ের আলোচনা সবচেয়ে অনুকূল? তার সঙ্গে কি রাসূল ﷺ রোমের যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন? নাকি অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেছিলেন?

এ ধরনের বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে রাসূল ﷺ আদৌ আলোচনা করেন নি। কারণ আয়েশা তো আর আবূ বকর নন যে তার সাথে রাজনীতি বা যুদ্ধনীতি নিয়ে আলোচনা করবেন।

রাসূল কি তার সঙ্গে মুসলমানদের অভাব অনটন নিয়ে আলোচনা করেছিলেন? না, এ বিষয়েও রাসূল ﷺ আলোচনা করেন নি। কারণ তিনি তো আর ওসমান নন।

তিনি আয়েশার সঙ্গে দাম্পত্যসুলভ ভালবাসার কথা বলেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন, 'তুমি যখন আমার ওপর সন্তুষ্ট থাক তখন আমি তা বুঝতে পারি। আবার আমার ওপর রাগ করলেও তা অনুভব করতে পারি।'

আয়েশা রাযি বললেন, 'কীভাবে?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যখন সন্তুষ্ট থাক তখন কসম খেতে চাইলে বল, 'মুহাম্মদের রবের কসম!' আর যখন আমার ওপর রেগে থাক তখন বল, 'ইবরাহীমের রবের কসম!'

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আপনি ঠিক বুঝতে পেরেছেন। তবে আল্লাহর কসম! রাগের মুহূর্তে আমি আপনার নামটিই কেবল উচ্চারণ করি না ।

আমরা কি আজ এ সুন্নাতটির অনুসরণ করতে পারি না?

দৃষ্টিভঙ্গি

আপনি যা বলে আনন্দ পান তা নয়, বরং
মানুষ যা শুনতে পছন্দ করে, সে প্রসঙ্গে কথা বলুন।



১৯. প্রথম সাক্ষাতেই কোমল হোন ...

মিশরের গ্রামাঞ্চলে একটি প্রথা প্রচলন ছিল। বাসর রাতে স্বামী বাসরঘরে কোনো বাক্সে একটা বিড়াল লুকিয়ে রাখত। স্ত্রীকে নিয়ে ফুলশয্যার কাছে এসে সে বাক্সটি খুলতেই বিড়ালটি বেরিয়ে আসত। বিড়াল দেখে স্বামী কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করে ওটাকে গলাটিপে মেরে ফেলত। এভাবে স্ত্রীর সামনে নিজের ক্ষমতা জাহির করত।

আপনি ধারণা করতে পারেন, তারা এটা কেন করত?

প্রথম সাক্ষাতেই যেন স্ত্রীর মস্তিষ্কে স্বামীর কঠোর মনোবৃত্তির ছবি অঙ্কিত হয়ে যায়।

আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নিয়ে একটি কলেজে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিলাম তখন একজন প্রবীণ শিক্ষক আমাকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন, 'ছাত্রদের সামনে প্রথম যখন তুমি লেকচার দিতে দাঁড়াবে, তখন খুব কঠোর মনোভাব দেখাবে। চোখ লাল করে তাদের দিকে তাকাবে। যেন প্রথম দিন থেকেই তারা তোমাকে ভয় পায় এবং তোমার ব্যক্তিত্বের শক্তি সম্পর্কে তারা নিশ্চিত হয়ে যায়।'

তার সে উপদেশ স্মরণ রেখেই আমি এ অধ্যায় লিখতে শুরু করেছি। আমি বিশ্বাস করি– প্রথম দর্শনেই দর্শকের মস্তিষ্কে আপনার ভাবমূর্তির ৭০% গেঁথে যায়। এটি একটি সর্বজন স্বীকৃত বিষয়। একে মনস্তাত্ত্বিক চিত্র বলা যেতে পারে।

'প্রাতিষ্ঠানিক আচরণ-কৌশল উন্নয়ন' শীর্ষক এক প্রশিক্ষণে অংশ নিতে কয়েকজন অফিসার আমেরিকা গেল। প্রশিক্ষণের প্রথম দিন তারা খুব ভোরে একটি বিশাল হলরুমে সমবেত হলো। প্রথমদিন হিসেবে তারা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ প্রশিক্ষক মহোদয় হলে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে হলরুম নীরব হয়ে গেল। কিন্তু একজন প্রশিক্ষণার্থী তখনও মুচকি হাসছিল। প্রশিক্ষক তা লক্ষ্য করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উচ্চস্বরে বললেন, 'এই তুমি হাসছ কেন?'

'মাফ করবেন, আমি হাসি নি।'

'না, তুমি হাসছিলে।'

Contents

প্রশিক্ষক তাকে যথারীতি জেরা করতে লাগলেন । 'তুমি মনোযোগী ছাত্র নও। আজকের প্রথম ফ্লাইটেই তুমি বাড়ি ফিরে যাবে। আমি তোমার মতো ছাত্রকে পড়াতে পারব না।'

শিক্ষকের এসব কথায় ছাত্রটির চেহারা মলিন হয়ে গেল। সে একবার শিক্ষক, একবার সহপাঠীদের দিকে তাকাচ্ছিলো। আর চেহারা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছিল। এরপর শিক্ষক তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দরজার দিকে ইশারা করে বললেন, 'বের হয়ে যাও।'

ছাত্রটি হতবাক হয়ে গেল। সে কোনো রকমে রুম থেকে বের হয়ে গেল। শিক্ষক এবার অন্য ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি ড. ... । আমি তোমাদেরকে এই এই বিষয়ে পাঠদান করব। কিন্তু তার আগে তোমাদের একটি ফরম পূরণ করতে হবে। এতে তোমরা নিজেদের নাম লিখবে না। তিনি ফরম বিতরণ করলেন। ফরমে পাঁচটি প্রশ্ন ছিল–

১. তোমার শিক্ষকের আচরণ সম্পর্কে তোমার মতামত কী?
২. শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতি তোমার কাছে কেমন মনে হয়?
৩. তিনি কি ভিন্ন মত গ্রহণ করেন?
৪. তার কাছে পুনরায় শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যাপারে তোমার কেমন আগ্রহ রয়েছে?
৫. তুমি কি প্রতিষ্ঠানের বাইরে তার সঙ্গে দেখা করতে স্বাচ্ছন্দবোধ করবে?

প্রতিটি প্রশ্নের সামনে কয়েকটি সম্ভাব্য উত্তর দেয়া আছে। খুব ভাল, ভাল, মোটামুটি, দুর্বল/ না।

ছাত্ররা ফরম পূর্ণ করে শিক্ষকের কাছে জমা দিল। শিক্ষক সেগুলোকে এক পাশে রেখে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশে আচরণের প্রভাব সম্পর্কে বক্তব্য দিতে শুরু করলেন। হঠাৎ তিনি বললেন, 'আহা! তোমাদের সহপাঠীকে এ পাঠ থেকে কেন বঞ্চিত করব?'

এরপর তিনি ক্লাসরুম থেকে 'বহিষ্কৃত' প্রশিক্ষণার্থীর কাছে গিয়ে করমর্দন করলেন এবং মুচকি হেসে তাকে ক্লাসরুমে নিয়ে এলেন।

এরপর শিক্ষক তাকে বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'একটু আগে আমি তোমার সঙ্গে যৌক্তিক কোনো কারণ ছাড়াই রাগ করেছিলাম। আমার ব্যক্তিগত একটি সমস্যার কারণে এমন হয়ে গেছে। এজন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। তুমি অবশ্যই মনোযোগী ও আগ্রহী ছাত্র। পরিবার-পরিজন ছেড়ে তোমার এখানে আসাটাই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

আমি তোমাকে এবং তোমার সহপাঠীদেরকে শিক্ষার প্রতি এই অনুরাগের কারণে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমার কত বড় সৌভাগ্য! তোমাদের মতো বিদ্যোৎসাহী ও উচ্চশিক্ষিত ছাত্রদেরকে আমি পাঠদান করতে পারছি।

এরপর শিক্ষক কোমল আচরণ ও হাস্য রসিকতার মাধ্যমে পূরো পরিবেশটাকে পাল্টে দিলেন। এখন সবার চোখে মুখে খুশির ঝিলিক। এর কিছুক্ষণ পর তিনি নতুন কিছু ফরম হাতে নিয়ে বললেন, 'তোমাদের সহপাঠী তো ফরম পূরণ করতে পারে নি। তাই সবাই ফরমটি নতুন করে পূরণ কর। কী বল? সবাই প্রফুল্লচিত্তে রাজি হলো।

শিক্ষক সবাইকে আবার ফরম দিলেন। সকলে তা পূরণ করে পুনরায় জমা দিল। প্রথমবারের ফরমগুলোতে 'দুর্বল/ না' এর ঘরগুলোর প্রত্যেকটিতে টিক চিহ্ন পড়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়বারের ফরমসমূহে 'দুর্বল/ না' ও 'মোটামুটি' এর ঘরে একটিও টিক চিহ্ন নেই। সবগুলো টিক চিহ্ন 'খুব ভাল' ও 'ভাল' এর ঘরে।

দুই ফরমের উত্তরের পার্থক্য দেখে শিক্ষক হাসলেন। তারপর ছাত্রদেরকে বললেন, তোমরা যা দেখলে তা এর বাস্তব প্রমাণ যে, মন্দ আচরণ প্রধান কর্মকর্তা ও তার অধীনস্থদের মাঝে কাজের পরিবেশে কিরূপ নেতিবাচক প্রভাব ফেলে? এ বিষয়টি তোমাদের সামনে প্রমাণ করার জন্যই আমি তোমাদের সহপাঠীর সঙ্গে এমন কৃত্রিম দুর্ব্যবহার করেছি। অবশ্য এটা করতে গিয়ে সে দুর্ব্যবহারের শিকার হলো। খেয়াল করে দেখ, সামান্য সময়ের ব্যবধানে তোমাদের সাথে আমার ব্যবহার পরিবর্তন করে কীভাবে তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে দিলাম।'

এটা মানুষের স্বভাব, সহজাত প্রবৃত্তি। এজন্য বিষয়টির প্রতি নজর রাখতে হবে। বিশেষ করে সেসব সেবাপ্রার্থী যাদের সঙ্গে আমাদের জীবনে শুধু একবারই দেখা হয়ে থাকে। বিশ্বমানবতার মহান শিক্ষক রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম সাক্ষাতেই মানুষের হৃদয় জয় করে নিতেন।

মক্কাবিজয়ের পর ইসলামের শেকড় যখন দৃঢ় হলো তখন মদিনায় রাসূল ﷺ-এর কাছে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধি দল আসতে শুরু করলো। এরই ধারাবাহিকতায় আবদে কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলও রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলো।

রাসূল ﷺ তাদেরকে আসতে দেখে তারা বাহন থেকে নামার আগেই তাদের অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে গেলেন। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'স্বাগতম! হে প্রতিনিধি দল! লাঞ্ছনা বা গঞ্জনা নয়, আমাদের পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি সুসংবাদ।' তারাও বাহন থেকে নেমেই রাসূল ﷺ কে সালাম জানাতে ছুটে এলো।

এভাবে অভ্যর্থনাপর্ব শেষ হওয়ার পর তারা বললো, 'আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছে আসার পথে 'মুযার' গোত্রের মুশরিকদের একটি জনপদ পড়ে। তাই যুদ্ধ নিষিদ্ধ মাসগুলোতে যখন যুদ্ধের হামলা বন্ধ হয়ে যায় তখন আমরা আপনার কাছে আসতে পারি। এ ছাড়া অন্য সময়ে আমরা আপনার কাছে ইচ্ছে হলেও আসতে পারি না। অতএব আমাদেরকে সংক্ষিপ্ত এমন কিছু আমল বলে দিন, যা পালন করলে আমরা জান্নাতে যেতে পারব এবং সেসব আমলের প্রতি অন্যদেরকেও আহ্বান করতে পারব।'

রাসূল ﷺ বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি কাজের আদেশ দিচ্ছি, আর চারটি কাজ করতে নিষেধ করছি। আদেশগুলো হলো-

১. আল্লাহকে বিশ্বাস করবে।

আল্লাহকে বিশ্বাস করার মর্ম কি তোমরা জান?

তারা বললো, 'আল্লাহ ও তার রাসূল ভাল জানেন।'

রাসূল বললেন, আল্লাহকে বিশ্বাস করার অর্থ হলো- এ মর্মে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।

২. নামায কায়েম করা।

৩. যাকাত প্রদান করা।

৪. গনীমতের এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মালে জমা দেয়া।

আর তোমাদেরকে চারটি জিনিস করতে নিষেধ করছি। নিষিদ্ধ বস্তু হলো-

১. দুব্বা

২. নাকির

৩. হানতাম

৪. মুয়াফ্ফাত ।

এগুলোতে তৈরি করা মদপান থেকে বিরত থাকবে।

(সহীহ বুখারী: ৪০২০, সহীহ মুসলিম:২৩)

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সঙ্গে রাতের বেলা সফর করছিলেন। রাতের অন্ধকারে তারা অনেক পথ অতিক্রম করলেন। রাতের শেষ প্রহরে একটু বিশ্রামের জন্য তারা যাত্রাবিরতি করলেন। সারারাত সফরের পর সবাই গভীর ঘুমের কোলে ঢলে পড়লেন। তারা ঘুমে এমনভাবে নিমজ্জিত হয়ে গেলেন যে, সূর্য উদিত হয়ে মাথার ওপর চলে এলো। সর্বপ্রথম আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘুম ভাঙলো। তারপর ওমরের। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথার পাশে বসে আস্তে আস্তে তাকবীর ধ্বনি দিতে লাগলেন । তিনি ধীরে ধীরে আওয়াজ বাড়াতে লাগলেন। এক পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগলেন। তিনি সবাইকে নিয়ে জামাতে ফজরের নামায আদায় করলেন।

নামায শেষে তিনি তাকিয়ে দেখলেন, কাফেলার একজন এক প্রান্তে বসে আছে। নামাযে অংশগ্রহণ করে নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি আমাদের সঙ্গে নামায পড়লে না কেন?’ সে বললো, ‘আমার ওপর গোসল ফরয হয়েছে। কিন্তু গোসল করার পানি নেই।’

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করার আদেশ দিলেন। সে তায়াম্মুম করে নামায পড়ল।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে যাত্রা করার আদেশ দিলেন। কারো কাছে পানি ছিল না। সবার খুব পিপাসা লাগল। পথে কোনো কূপ বা পানির সন্ধানও পাওয়া গেল না।

ইমরান বিন হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা পথ চলতে চলতে হঠাৎ এক মহিলার সাক্ষাৎ পেলাম। মহিলা ছিল উটে আরোহী। উটটির পিঠে পানির

বড় বড় দু'টি মশক ছিল। আমরা তার কাছে পানির সন্ধান জানতে চাইলাম। সে বললো, 'আশেপাশে কোথাও পানি নেই।'

আমরা বললাম, 'তোমার বাড়ি থেকে পানি কত দূরে?'

সে বললো, 'পূর্ণ একদিন এক রাতের পথ।'

আমরা বললাম, 'তুমি আমাদের সঙ্গে রাসূল ﷺ-এর কাছে চল।'

সে বললো, 'রাসূল আবার কে?

সে আমাদের পানির সন্ধান দিতে পারে– এ আশায় তাকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে এলাম। রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে মহিলাটির সাক্ষাৎ হলে তিনি তার কাছে পানির সন্ধান জানতে চাইলেন। সে আমাদেরকে যা বলেছিল, রাসূলকেও তাই বললো। অতিরিক্ত সে রাসূল ﷺ-কে নিজের ব্যাপারে একটি কথা জানাল। সে বললো, 'সে কয়েকজন এতিমের মা।'

রাসূল ﷺ তার পানির মশকটি বিসমিল্লাহ বলে স্পর্শ করলেন। তারপর তা থেকে আমাদের পাত্রগুলোতে পানি ঢালতে শুরু করলেন। আমরা চল্লিশজন পিপাসিত ব্যক্তি তা থেকে পানি পান করে পরিতৃপ্ত হলাম এবং আমাদের সমস্ত পাত্র ভরে নিলাম। তারপর তার মশকটি তাকে ফেরত দিলাম। আমরা এতো পানি নেয়ার পরও তা আগের চেয়ে বেশি পানিতে পূর্ণ ছিল।

এরপর রাসূল ﷺ আমাদেরকে বললেন, 'তোমাদের যার কাছে যে খাবার আছে তা নিয়ে এসো।' এভাবে রাসূল ﷺ মহিলার জন্য কিছু রুটি ও খেজুরের ব্যবস্থা করলেন। এরপর তাকে বললেন, 'এগুলো তোমার পরিবারের জন্য নিয়ে যাও। আর কোনো, আমরা পান করা সত্ত্বেও কিন্তু তোমার পানি একটুও কমে নি। আল্লাহ তাআলাই আমাদেরকে পানি পান করিয়েছেন।'

মহিলাটি তার উটে চড়ে বসল। সে খাবার পেয়ে খুব খুশী হলো। বাড়ি পৌঁছে সে সবাইকে বলতে লাগল, 'আমি অনেক বড় একজন যাদুকরের কাছ থেকে এসেছি। তবে তিনি নবীও হতে পারেন, যেমনটি তার সঙ্গীরা বলে থাকে।'

তার কাছে পুরো ঘটনা শুনে তার গোত্রের লোকেরা খুব আশ্চর্য হলো। এ ঘটনার কিছুদিন পরে উক্ত মহিলাসহ গোত্রের সবাই ইসলাম গ্রহণ করলো। (সহীহ বুখারী: ৩৩৬৩ ও সহীহ মুসলিম:১১০০)

মূলত প্রথম দর্শনেই রাসূল ﷺ-এর আচরণ ও অনুগ্রহে মহিলাটি মুগ্ধ হয়েছিল।

আরেক দিনের ঘটনা। জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে কিছু অর্থ-কড়ি চাইল। রাসূল ﷺ তাকে দুই পাহাড়ের মধ্যে বিচরণরত একপাল মেষ দান করলেন।

লোকটি তার গোত্রের কাছে ফিরে এসে বলতে লাগল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা সবাই ইসলাম গ্রহণ কর। কেননা, মুহাম্মাদ ﷺ এমনভাবে দান করেন যে, তার মনে দরিদ্রতা ও অভাবের ভয় নেই।'

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'লোকটি কেবল পার্থিব স্বার্থে আল্লাহর রাসূলের কাছে এসেছিল। কিন্তু সে দিন পেরিয়ে ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই দ্বীন তার কাছে পৃথিবী ও পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে প্রিয় ও সম্মানের বস্তু হয়ে গিয়েছিল।' (সহীহ মুসলিম: ৪২৭৫)

একটি প্রস্তাব...

প্রথম দর্শনেই দর্শকের মস্তিষ্কে আপনার ভাবমূর্তির ৭০% গেঁথে যায়। সুতরাং আপনি মানুষের সঙ্গে এমন আচরণ করুন যেন এটিই আপনার প্রথম এবং শেষ সাক্ষাৎ।



২০. মানব প্রকৃতি মাটির প্রকৃতির ন্যায়

আপনি যদি মানুষের প্রকৃতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন তাহলে দেখবেন মাটি যেমন বিভিন্ন স্বভাবের, মানব প্রকৃতিও তেমনই বিভিন্ন রকমের। কোনো কোনো মানুষের স্বভাব অনেক নরম ও কোমল আবার কিছু মানুষের স্বভাব শক্ত ও কঠিন। অনেকের মন উদার যেন শষ্য-শ্যামল উর্বর ফসলী জমি। আবার অনেকের মন সংকীর্ণ, অনাবাদী অনুর্বর ভূমির মতো, যাতে না পানি জমে, না ফল ও ফসল ফলে। সারকথা হলো, মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি এক রকম নয়। মাটির তৈরি মানুষ, মাটির ভিন্নতার ন্যায় বিভিন্ন প্রকৃতির অধিকারী।

আপনি খেয়াল করলে দেখতে পাবেন, আমরা মাটির ধরন অনুযায়ী মাটির সাথে আচরণ করি। শক্ত মাটির সাথে আচরণ আর নরম মাটির সাথে আচরণ কখনো এক রকম হয় না। নরম, কাদাময় ও পিচ্ছিল মাটিতে আমরা যেভাবে পা টিপটিপ করে হাটি শক্ত মাটিতে সেভাবে হাটি না। কাদা মাটিতে হাটতে গেলে আমরা খুব সাবধানে পা ফেলি অথচ শক্ত মাটিতে আমরা নির্দ্বিধায় চোখ বন্ধ করেও চলতে পারি। মানুষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রেও অনুরূপ খেয়াল রাখতে হবে।

রাসূল ﷺ বলেন-

إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيْعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُوْ آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ جَاءَ مِنْهُمُ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذٰلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ.

অর্থ : আল্লাহ তাআলা সারা পৃথিবী থেকে একত্রিত করা একমুষ্টি মাটি থেকে আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন। মাটির ভিন্নতার কারণে আদম সন্তানের আকার ও প্রকৃতিতে ভিন্নতা তৈরি হয়েছে । তাই আকার আকৃতিতে কেউ লাল, কেউ সাদা, কেউ কালো আবার কেউ মাঝামাঝি বর্ণের। আর স্বভাবের দিক দিয়ে মানুষ কেউ উদার স্বভাবের, কেউ বা সংকীর্ণ, আবার কেউ মন্দ, কেউ ভাল।

(সুনানে তিরমিযী:২৮৭৯, সহীহ ইবনে হিব্বান:৬২৬৬)

এজন্য মানুষের সঙ্গে আচরণ করার সময় এ বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখা উচিত। সে আত্মীয় হোক কিংবা অনাত্মীয়। বাবা-মা, স্ত্রী-সন্তান প্রতিবেশী, সহপাঠী, ক্রেতা-বিক্রেতা সহযাত্রী তথা যে কারো সাথে আচরণের সময় উপর্যুক্ত বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে।

আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও মানুষের এ স্বভাবের ভিন্নতা প্রভাব ফেলে থাকে। আপনি নিজে এটা যাচাই করে দেখতে পারেন। মনে করুন, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার কোনো সমস্যা হলো। এখন আপনার যে বন্ধুটি সবচেয়ে কঠিন প্রকৃতির বলে মনে করেন, তার কাছে আপনি পরামর্শ চান। তাকে বলুন, 'ভাই! আমার স্ত্রী তো আমার জন্য কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার কথা মানে না, আমার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করে, এখন আমি কী করব?'

আমার মনে হয় সে বলবে, 'মহিলাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে তাদের সাথে সব সময় গরম মেজাজে ও চোখ লাল করে কথা বলতে হবে। তার মান অভিমান শেষ করে দেবে। আর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও শক্তিমত্তার পূরোপূরি প্রদর্শন করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো নারীর সামনে তোমার পুরুষত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হবে।'

আপনি যদি তার পরামর্শ গ্রহণ করে বাড়িতে গিয়ে তা প্রয়োগ করেন তাহলে আপনার সংসার ভেঙ্গে যেতে পারে।

আপনি যদি পরীক্ষাটা পূর্ণ করতে চান তাহলে এবার আপনার সবচেয়ে কোমল স্বভাবের একজন বন্ধুর শরণাপন্ন হয়ে আগের বন্ধুকে যা বলেছিলেন তাকেও তা বলুন। দেখবেন, সে অবশ্যই বলবে 'ভাইজান, সে শুধু তোমার স্ত্রী নয়। সে তোমার সন্তানদেরও মা। আর দাম্পত্য জীবনে কেউ সমস্যামুক্ত নয়। তুমি সবর কর। তার ত্রুটিগুলো সহজভাবে নিতে চেষ্টা কর। আর যাই হোক সে তো তোমার অর্ধাঙ্গিনী, জীবন পথের সহযাত্রী।'

মানুষের স্বভাব তার সিদ্ধান্তের ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলে তা খেয়াল করে দেখুন। এ কারণেই রাসূল ﷺ পিপাসায় কাতর, ক্ষুধার্ত বা প্রাকৃতিক প্রয়োজনের প্রবল চাপ অবস্থায় বিচারককে কোনো রায় প্রদান করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, এগুলো ব্যক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব ফেলতে পারে।

প্রাচীনকালে বনি ইসরাঈলের কোনো এক এলাকায় দুর্ধর্ষ ও ভয়ঙ্কর প্রকৃতির এক রক্তপিপাসু খুনী বাস করত। হ্যাঁ, তাকে রক্তপিপাসুই বলতে হবে। কারণ সে এক দু'জন বা দশ বিশ জনকে নয়, নিরানব্বই জন ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। জানি না এতো লোক হত্যা করে কীভাবে সে বেঁচে থাকল। হয়তো সে এতো ভয়ঙ্কর প্রকৃতির ছিল যে কেউ তার কাছে যেতেই সাহস করত না, নয়তো সে দুর্গম কোনো পাহাড়ে বা জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতো। যা-ই হোক, সে নিরানব্বই জন লোককে হত্যা করেছিল।

কিন্তু হঠাৎ একদিন তার হৃদয়রাজ্যে বিশাল এক পরিবর্তন এলো। অন্যায়ের প্রতি তার মনে ঘৃণা সৃষ্টি হল। অনুশোচনা তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরল। তওবার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। সে তখন সে যুগের সবচেয়ে বড় আলেমের সন্ধান জানতে চাইল। লোকেরা তাকে এক আবেদের সন্ধান দিল। সে এক উপাসনালয়ে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করে। এক মুহূর্তের জন্যও নামাযের জায়গা ছেড়ে কোথাও যায় না। তার দিন-রাত কাটে ক্রন্দন আর দোয়ায়। উচ্ছ্বসিত আবেগ আর অত্যন্ত কোমল স্বভাবের মানুষ তিনি। তবে তিনি কেবল একজন ইবাদতগুজার বা আবেদ। শরিয়তের ইলম তার ছিল না।

কাঙ্ক্ষিত লোকের সন্ধান পেয়ে সে আর দেরি করলো না। সঙ্গে সঙ্গে তার উপাসনালয়ে গিয়ে উপস্থিত হলো। তার মন ছিল ভারাক্রান্ত তাই কোনো ভূমিকা ছাড়া সরাসরি বললো, 'আমি নিরানব্বইজনকে হত্যা করেছি। এখন আমি তওবা করলে আমার তওবা কবুল হবে কি?'

সে আবেদ এতটাই নরম স্বভাবের ছিল যে, আমার মনে হয় অনিচ্ছায়ও যদি সে একটি পিঁপড়া মেরে ফেলে তাহলে তার সারাদিন অনুশোচনা ও ক্রন্দন করতে করতে কেটে যায়। তাহলে যে ব্যক্তি নিরানব্বইজন নিরপরাধ মানুষ হত্যা করেছে, এ ব্যাপারে তার উত্তর কেমন হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

তার কথা শুনে সে আবেদ ভয়ে কেঁপে ওঠল। নিরানব্বইটা লাশ যেন তার চোখের সামনে ভেসে ওঠল। সে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ল। সে ভাবল এতো

বড় খুনির আবার মাফ হয় কী করে! তাই সে চিৎকার করে বলে উঠল, 'না! না! তোমার তওবা কবুল হবে না। তোমার তওবা কবুল হবে না।'

অল্পবিদ্যার অধিকারী আবেদের কাছ থেকে এ ধরনের জবাব আসাটাই স্বাভাবিক । কারণ তার কাছে শরিয়তের ইলম এবং আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের জ্ঞান ছিল না। তাই তার সিদ্ধান্ত ছিল আবেগনির্ভর।

এদিকে বর্বর খুনি লোকটি এ উত্তর শুনে রাগে ক্ষোভে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। তার দুচোখ রক্তবর্ণ ধারণ করলো। সঙ্গে সঙ্গে সে তার ছুরি বের করে আবেদকে আঘাত করতে করতে লোকটির দেহ টুকরো টুকরো করে ফেলল। এরপর সে উপাসনালয় থেকে বের হয়ে গেল। এভাবে সে নর-হত্যার সেঞ্চুরি করলো।

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেল। তার মন আবার তওবার জন্য পাগল হয়ে উঠল। সে আবার বড় কোনো আলেমের সন্ধান করতে লাগল। লোকেরা এবার তাকে একজন বড় আলেমের সন্ধান দিল। সেও তৎক্ষণাৎ তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো।

এবার লোকটি যার কাছে এসেছে, বাস্তবেই তিনি ছিলেন খুব ওজনদার ব্যক্তি। চেহারায় ছিল প্রজ্ঞা ও খোদভীতির স্পষ্ট ছাপ। খুনী লোকটি তাকে নিঃসঙ্কোচে জিজ্ঞেস করলো, 'আমি একশজনকে হত্যা করেছি। এখন আমি যদি তওবা করি তাহলে আমার তওবা কি কবুল হবে?'

উক্ত আলেম সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! তোমার তওবার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই? তুমি যেকোনো সময় তওবা করতে পার।'

কত চমৎকার জবাব! আসলেই তো, তওবা করার ক্ষেত্রে তাকে কে বাধা দেবে? এক পথভোলা বান্দা মহান পরাক্রমশালী স্রষ্টার দিকে ফিরে যাবে, তার সামনে মাথা নত করবে কার সাধ্য আছে তাকে বাধা দেয়ার?

যে আলেমের কাছে লোকটি গিয়েছিল সে আলেম সিদ্ধান্ত দিতেন ইলম ও শরীয়তের ওপর ভিত্তি করে। সিন্দান্ত দানের ক্ষেত্রে তিনি নিজের স্বভাব-প্রকৃতি ও আবেগ অনুভূতি দ্বারা প্রভাবিত হতেন না।

সে আলেম উক্ত লোকটিকে বললেন, 'তুমি তো মনে হয় ভাল জায়গায় বসবাস কর না।'

কীভাবে তিনি বুঝতে পারলেন, তার বসবাসের জায়গাটা ভাল নয়। মূলত তিনি লোকটির অপরাধের পরিমাণ দেখে এটা বলেছিলেন। কারণ, যেখানে এত বেশি পরিমাণে অপরাধ করা সত্ত্বেও তাকে কেউ বাধা দিচ্ছে না বা দিতে পারছে না, নিশ্চয় সেটা ভাল জায়গা নয়।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, লোকটি যে এলাকায় থাকে সেখানে জুলুম অত্যাচার, মারামারি ও হানাহানি এত বেশি পরিমাণে হয় যে, মজলুমের পক্ষে কথা বলার মতো কেউ নেই।

তাই তিনি তাকে বললেন, 'তুমি তোমার এলাকা ছেড়ে অমুক শহরে চলে যাও। সেখানকার লোকেরা আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করে। তুমি তাদের সঙ্গে থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইবাদত করতে পারবে।'

লোকটি তখনই খাটি মনে তওবা করে সে শহরের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলো। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পরে ঘটনাক্রমে পথেই তার মৃত্যু হলো। উদ্দীষ্ট শহরে আর সে উপস্থিত হতে পারল না।

তার মৃত্যুর সাথে সাথে আকাশ থেকে রহমত ও আজাবের দুই দল ফেরেশতা অবতরণ করলেন। রহমতের ফেরেশতারা বললেন, 'এ ব্যক্তি খাটি মনে তওবা করে ভাল মানুষদের শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে। সুতরাং তার রূহ আমরা নিয়ে যাব।'

আর আজাবের ফেরেশতারা বললো, 'সে তো কখনো কোনো সওয়াবের কাজই করে নি।' ফিরেশতারা যখন এ নিয়ে বাদানুবাদ করছিল তখন মীমাংসার জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষের আকৃতিতে একজন ফেরেশতা পাঠালেন। তিনি এসে যে সিদ্ধান্ত দিলেন তা হলো, 'ভাল মানুষদের শহর এবং তার নিজের শহরের মধ্যে কতটুকু দূরত্ব তা নির্ণয় করতে হবে। এরপর দেখতে হবে সে কোনো শহরের নিকটবর্তী। তার ওপর ভিত্তি করেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। সে যদি ভাল লোকদের শহরের বেশি নিকটবর্তী হয়ে থাকে তাহলে তাকে ভাল লোক হিসেবে গণ্য করা হবে। ফলে রহমতের ফেরেশতারা তা রূহ নিয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সে যদি খারাপ লোকদের শহরের নিকটবর্তী হয়ে থাকে তাহলে আজাবের ফেরেশতারা তার রূহ নিয়ে যাবে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাপজোপ শুরু হলো। প্রকৃতপক্ষে সে খারাপ লোকদের এলাকার নিকটবর্তী ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করেছিলেন, তাই তার প্রতি রহমত করতে চাইলেন এবং ভাল লোকদের শহরকে কাছে চলে আসতে আদেশ করলেন, তার খারাপ লোকদের শহরকে বললেন দূরে সরে যেতে। ফেরেশতারা মেপে দেখলেন, লোকটি ভাল লোকদের শহরের বেশি কাছাকাছি। তখন তাকে রহমতের ফেরেশতাদের দায়িত্বে অর্পণ করা হলো।

খেয়াল করে দেখুন, ইলম ও প্রজ্ঞানির্ভর একটি ফতোয়া একজন মানুষের জীবনের মোড় কিভাবে ঘুরিয়ে দিল। কিন্তু বর্তমানে মুফতীদের অনেককে দেখা যায়, তারা অনেক সময় আবেগতাড়িত হয়ে ফতোয়া প্রদান করে থাকেন।

অনেক দিন আগের একটি ঘটনা আমার এখনো মনে পড়ে। আমার এক প্রতিবেশী ছিল। প্রায় স্ত্রীর সঙ্গে তার ঝগড়া হতো। একদিন ঝগড়ার চরম পর্যায়ে সে স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে দিল। পরবর্তীতে সে শরিয়তসম্মত প্রত্যাহারের বিশেষ অধিকারবলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলো। কিছুদিন পর একই ঘটনা আবার ঘটল এবং সে একইভাবে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিল। তার সঙ্গে যখনই আমার দেখা হতো, আমি তাকে সতর্ক করতাম। তাকে বারবার তার ছোট ছোট বাচ্চাদের কথা স্মরণ করিয়ে দিতাম। আমি তাকে প্রায়ই বলতাম, 'দেখ, ইতোমধ্যে তুমি তোমার স্ত্রীর ওপর দুটি তালাক প্রয়োগ করে ফেলেছ। তোমার হাতে এখন শুধু একটা তালাক আছে। কখনো যদি এটা প্রয়োগ করে ফেল তাহলে তোমার স্ত্রীকে আর স্বাভাবিকভাবে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। আরেকজনের সঙ্গে তার বিয়ে হতে হবে। তারপর সে স্বামী যদি তালাক দেয় তবেই তুমি তাকে বিয়ে করতে পারবে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর। তোমার সংসারটা ভেঙ্গ না।'

কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন সে আমার কাছে এলো। তার চেহারা ছিল মলিন। তার মুখ থেকে কথা বের হচ্ছিল না। কোনো মতে সে বললো, 'জনাব, আবার তার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছে। একপর্যায়ে আমি তাকে তালাক দিয়ে ফেলেছি!'

তার এ কথায় আমি তেমন আশ্চর্য হই নি। আশ্চর্য হলাম তার পরবর্তী কথায়। সে বললো, 'আপনি কি উদার প্রকৃতির কোনো মুফতী সাহেবকে চেনেন যে আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার পক্ষে ফতোয়া দেবে?'

তার এ কথায় আমি আশ্চর্য হলাম এবং বিষয়টি নিয়ে একটু চিন্তা করলাম। একটু আগে যে বিষয়টি উল্লেখ করেছি, সেটাই তখন আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। অনেক সময় নিজস্ব আবেগ ও অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে ব্যক্তিগত মতামত এমনকি অনেকের ফতোয়ারও পরিবর্তন ঘটে ।

কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের মধ্যে ধন-সম্পদের লালসা খুব বেশি। তাই তারা যদি সবসময় ধনীদের পেছনে ঘুরে, নিজের মানহানি করে কিংবা সম্পদ উপার্জন করতে গিয়ে নিজের সন্তানদের প্রতি অবহেলা করে তাহলে এটা আশ্চর্যের কোনো বিষয় নয়। কারণ, তারা স্বভাবগতভাবেই লোভী। তাই বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে এ স্বভাবের প্রভাব পড়ে।

তাই আপনি যদি এ ধরনের লোকের সঙ্গে কোনো লেনদেন করতে চান বা তার থেকে কিছু আদায় করে নিতে চান, তাহলে তার সঙ্গে কথা বলার আগে সবসময় এ বিষয়টি মাথায় রাখবেন যে, লোকটি লোভী প্রকৃতির। তার থেকে আপনার লক্ষ্য অর্জনের সময় লক্ষ্য রাখুন, তার মনের ওপর যেন অতিরিক্ত চাপ না পড়ে।

উদাহরণ হলো বোঝার চাবিকাঠি। উদাহরণের মাধ্যমে যেকোনো বিষয়ে সহজে বোঝা যায়। তাই এখানে একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করছি।

মনে করুন, আপনি একদিন হাসপাতালে গেলেন। সেখানে এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে আপনার দেখা হলো। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার সহপাঠী ছিল। আপনি তাকে পরদিন মধ্যাহ্ন ভোজে দাওয়াত দিলেন। আর সেও আপনার বাড়িতে আসতে রাজি হলো।

আপনি বাজারে গিয়ে সদাইপত্র কিনলেন। বাড়ি ফিরে আগামীকালের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ফোনে আরো কিছু বন্ধুকেও দাওয়াত দিলেন। যেন সবার সঙ্গে তার দেখা হয়। মনে করুন, আপনার আমন্ত্রিত

বন্ধুদের মধ্যে এক বন্ধু খুব কৃপণ স্বভাবের। ধন-দৌলতের লালসা তার মধ্যে প্রবল। দেখবেন, তাকে যখন আপনি দাওয়াত গ্রহণ করার জন্য বলবেন তখন সে বলবে, 'আহা! আমার ভাগ্যটা কী খারাপ! খুব জরুরি একটা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। তার সঙ্গে দেখা করতে পারলে খুবই ভাল হতো! কিন্তু এখন যে আর সেটা সম্ভব নয়। যাই হোক আপনি তাকে আমার সালাম জানাবেন। আমি ওর সঙ্গে পরে সুযোগমতো দেখা করব।'

আপনি যদি তার কৃপণতার কথা আগে থেকে জেনে থাকেন তাহলে তার না আসার কারণও আপনি বুঝতে পারবেন। মূলত সে ভয় পাচ্ছে, যদি সে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসে তাহলে হয়তো সৌজন্যের খাতিরে তাকে নিজের বাড়িতেও খাবারের দাওয়াত দিতে হবে। এর ফলে তার অনেক টাকা খরচ করতে হবে। অথচ তার অভিলাষ হলো সম্পদের পাহাড় গড়া, ব্যয় করে নিঃশেষ করা নয়।

কিন্তু তখন যদি আপনি তাকে জানান যে, আপনার সে বন্ধুর হাতে একদম সময় নেই। সে মধ্যাহ্নভোজ করেই চলে যাবে। অন্য শহরে তার বিশেষ প্রোগ্রাম আছে। তাহলে দেখবেন, সে বলবে, 'ঠিক আছে। তাহলে আমি এখনই আসছি। আমার সে প্রোগ্রামটা না হয় পিছিয়ে দিচ্ছি।'

আপনার সাথে চলাফেরা করে এমন অনেককে পাবেন, যারা একেবারে নিরিবিলি স্বভাবের। তারা কারো সাথেও নেই পাঁচেও নেই। তার নিজের পরিবারই তার কাছে সবকিছু। পরিবার ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়া তার জন্য সম্ভব নয়। নিজের সন্তানদের ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার কথা না বলে আর যা কিছু তাকে করতে বলবেন, সে তা করতে পারবে। অতএব, যেটা তার জন্য সম্ভব নয়,তা তাকে করতে বলবেন না।

এছাড়াও পৃথিবীতে আরো কত স্বভাবের মানুষ আছে।

আমার কাছে সবচেয়ে ভাল লাগে সেসব মানুষকে যারা অন্যের মন জয় করতে পারে। কৃপণদের সাথে সফর করলে সে তাদের মতো মিতব্যয়ী হয়ে যায়। ফলে কৃপণরাও তাকে পছন্দ করে। আবেগপ্রবণ ব্যক্তিদের সাথে ওঠা-বসা করলে সে তার আবেগের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। ফলে আবেগী ব্যক্তিরাও তাকে ভালবাসে। রসিক ব্যক্তিদের সাথে চলাফেরা

করলে সেও হেসে খেলে রসিকতা করে সময় কাটায়। ফলে রসিক লোকেরাও তাকে পছন্দ করে।

মোটকথা, তারা যে পরিবেশে যায় সে পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। অনুকূল-প্রতিকূল ও আনন্দ-বেদনা নির্বিশেষে সব ক্ষেত্রেই তারা মিশে যেতে পারে।

আসুন সিরাতের পাতাটা উল্টিয়ে একটু পেছনে ফিরে যাই। দেখে আসি নববী যুগের কিছু ঘটনা।

রাসূল ﷺ সাহাবীদের নিয়ে মক্কাবিজয়ের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন। মক্কায় প্রবেশ করার আগেই মক্কার সরদার আবূ সুফিয়ান রাসূল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। রাসূল ﷺ-এর সাথে আলাপ আলোচনার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন।

আবূ সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইসলাম গ্রহণের পর আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ﷺ-কে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'আবূ সুফিয়ান নিজে সরদার মানুষ, আর সরদাররা নিজেদের বড়ত্ব প্রকাশ করতে ভালবাসে। তাই তার বড়ত্ব প্রকাশের কোনো ব্যবস্থা করে দিন।'

তখন রাসূল ﷺ মক্কাবাসীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন, 'যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে, সে নিরাপদ। যে নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবে, সেও নিরাপদ। আর যে মসজিদে হারামে আশ্রয় নেবে, সেও নিরাপদ।'

আবূ সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মক্কায় ফিরে যেতে উদ্যত হলেন, রাসূল ﷺ তার দিকে তাকালেন। রাসূল ﷺ-এর স্মৃতির পাতায় ভেসে ওঠল অতীতের কিছু ঘটনা। আবূ সুফিয়ানের কিছু অতীত কর্মকাণ্ড। এ তো সেই আবূ সুফিয়ান, যে কোরাইশের লোকদেরকে বদর প্রান্তরে যুদ্ধ করতে নিয়ে এসেছিল। ওহুদের যুদ্ধেও সে-ই বিশাল সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিল। খন্দকের যুদ্ধেও তার অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। এই সেই সেনাপতি, বহু যুদ্ধের নায়ক। যুদ্ধে যুদ্ধে কেটে গেছে যার জীবনের সিংহভাগ। এই মাত্র তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাই রাসূল ﷺ তাকে ইসলামের শৌর্য-বীর্য ও ক্ষমতা দেখাতে চাইলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাসকে ডাকলেন। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি উপস্থিত।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'মুসলিম বাহিনী যে গিরিপথ দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করছে সে সরু গিরিপথটির এক প্রান্তে আপনি আবূ সুফিয়ানকে নিয়ে দাঁড়াবেন।' আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আবূ সুফিয়ানকে নিয়ে সেখানে দাঁড়ালেন। সেখান দিয়ে মুসলিম বাহিনী ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলছিল মক্কার দিকে। প্রত্যেক দলের সামনে ছিল একটি করে পতাকা। প্রথম সৈন্যদলটি যখন অতিক্রম করলো, আবূ সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলেন, 'আব্বাস! এরা কারা?'

আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'এরা সুলাইম গোত্রের লোক।'

আবূ সুফিয়ান বললেন, 'সুলাইম গোত্র দিয়ে আমি কী করব!'

এরপর দ্বিতীয় দলটি অতিক্রম করলো। আবূ সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলেন, 'এরা কারা?'

আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'এরা মুজাইনা গোত্রের লোক।'

আবূ সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'মুজাইনা গোত্রের লোক দিয়ে আমার কী হবে?'

এভাবে একের পর এক সবগুলো দল চলে গেল। প্রত্যেকটি দল যাওয়ার সময় আবূ সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের পরিচয় জানতে চাচ্ছিলেন আর আব্বাস রাযি যখন পরিচয় দিচ্ছিলেন, তখন তিনি বলছিলেন, 'এ গোত্রের লোক দিয়ে আমার কী হবে?

সর্বশেষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিক্রম করলেন এক বিশাল সবুজ বাহিনী নিয়ে। তাদের শরীর ছিল লৌহবর্মে আবৃত। বর্মের ফাঁক দিয়ে শুধু তাদের চোখ দু'টোই দেখা যাচ্ছিল। এ সৈন্যদলটি ছিল মুহাজির ও আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত। আবূ সুফিয়ান এ দলটি দেখে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। এরপর হঠাৎ বলে উঠলেন, 'সুবহানাল্লাহ! আব্বাস এটা কোনো দল?'

আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'এটা হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নেতৃত্বে আনসার ও মুহাজির সাহাবীদের সমন্বয়ে গঠিত সেনাদল।'

আবূ সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'এরা তো সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত। আল্লাহর কসম! এদের মোকাবিলা করার সাধ্য কারো নেই।

এরপর সে বললো: হে আবূল ফজল! (আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর উপনাম) তোমার ভাতিজা তো বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়ে গেছে।'

আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আবূ সুফিয়ান! এটা সাম্রাজ্য নয়,এটা নবুয়ত।' আবূ সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'নবুয়ত! হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।'

যখন সব বাহিনী তাদেরকে অতিক্রম করে চলে গেল তখন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আবূ সুফিয়ানের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'আবূ সুফিয়ান'! তোমার সম্প্রদায়কে বাঁচাও।' আবূ সুফিয়ান দ্রুত মক্কায় চলে গেলেন। সেখানে তিনি উচ্চ স্বরে ঘোষণা করতে লাগলেন, 'হে কোরাইশ সম্প্রদায়! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কার উপকণ্ঠে উপস্থিত। তার মোকাবিলা করার সাধ্য তোমাদের কারো নেই। সুতরাং যে আমার ঘরে আশ্রয় নেবে, সে নিরাপদ।'

তারা বললো, 'কী বলছ তুমি। তোমার ঘরে কী সবার জায়গা হবে?'

আবূ সুফিয়ান বললেন, 'আর যে ব্যক্তি নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবে সেও নিরাপদ। যে মসজিদে হারামে আশ্রয় নেবে সেও নিরাপদ।'

তখন লোকেরা কেউ নিজের ঘরে আর কেউ মসজিদে আশ্রয় নিলো।

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর নবীর কী অপূর্ব বিচক্ষণতা! কী অভিনব কৌশল, তিনি আবূ সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মনে প্রভাব ফেললেন। তার ওপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের শক্তিমত্তা প্রদর্শনের যে কৌশলটি প্রয়োগ করেছিলেন, সেটিই ছিল তাকে দুর্বল করার সবচেয়ে উপযোগী ও কার্যকরী কৌশল।

এ আলোচ্য বিষয়ের সারকথা হলো, আপনি কারো সঙ্গে কথা বলার আগেই তার স্বভাব-প্রকৃতি ও পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে জেনে নিবেন। আপনি যদি তার স্বভাব-প্রকৃতি ও পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে জানতে পারেন তাহলে তার সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হবে, কীভাবে কথা বলতে হবে তা নির্ণয় করা আপনার জন্য সহায়ক হবে।

গজওয়ায়ে হুদাইবিয়ার ঘটনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরা করার উদ্দেশ্যে মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের নিয়ে রওয়ানা হয়েছেন। সঙ্গে যোগ দিয়েছেন

আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকজন। সব মিলিয়ে কাফেলায় চৌদ্দশ সদস্য। প্রত্যেকে ওমরার এহ্‌রাম বেঁধে কুরবানীর পশু সঙ্গে করে এনেছেন, যাতে সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা শুধু ওমরার নিয়তেই এসেছেন। রাসূল ﷺ নিজে সত্তরটি উট নিয়ে এসেছেন হেরেম শরিফে জবাই করার জন্য।'

রাসূল ﷺ যখন মক্কার উপকণ্ঠে পৌঁছলেন তখন কোরাইশরা তাদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দিল। রাসূল ﷺ সাহাবীদের নিয়ে হুদাইবিয়া নামক স্থানে তাবু গাড়লেন।

কোরাইশরা সংলাপের জন্য রাসূল ﷺ-এর কাছে একের পর এক প্রতিনিধি পাঠাতে লাগল। সর্বপ্রথম তারা মিকরায বিন হাফসকে পাঠাল। মিকরায কোরাইশ গোত্রের লোক হলেও অঙ্গীকার রক্ষার ক্ষেত্রে অবিচল ছিল না। সে ছিল ধূর্ত প্রকৃতির লোক। রাসূল ﷺ তাকে আসতে দেখেই বললেন, এ লোকটি ধোঁকাবাজ।'

যখন সে কাছে এসে পৌঁছল, রাসূল ﷺ তার উপযোগী কথাই তাকে বললেন। তাকে বললেন,'দেখ, আমরা যুদ্ধ করতে আসি নি। আমরা শুধু ওমরাহ করার জন্য এসেছি। তার সঙ্গে রাসূল ﷺ কোনো রকমের সন্ধি বা চুক্তি করলেন না। কারণ তিনি জানতেন, সে এর উপযুক্ত নয়।

কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই মিকরায কোরাইশদের কাছে ফিরে গেল। মিকরাযের পর কোরাইশরা আহাবিশ গোত্রের সরদার হালিস বিন আলকামাকে পাঠালো। আহাবিশ ছিল এমন এক গোত্র, যারা হেরেম শরিফের সম্মান রক্ষার স্বার্থে মক্কায় অবস্থান করত এবং কাবাঘরের দেখা-শোনা করত।

রাসূল ﷺ তাকে আসতে দেখে বললেন, 'তিনি ইবাদতগুযার সম্প্রদায়ের লোক। তাই তোমরা নিজেদের কোরবানীর পশুগুলোকে সামনে নিয়ে এসো, যাতে সে পশুগুলো দেখতে পায়।'

যখন হুলাইস দেখলো, হেরেম শরিফে জবাই করার জন্য প্রস্তুত অসংখ্য পশু উপত্যাকায় চরে বেড়াচ্ছে, ক্ষুৎপিপাসায় পশুগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছে তখন সে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ল। রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে দেখা না করেই সে ফিরে গেল। কারণ সে নিশ্চিত ছিল যে, তারা একমাত্র ওমরা করার

জন্যই এখানে এসেছে। আর ওমরাহ করতে আসা লোকদেরকে বাধা দেয়ার সংলাপে তিনি কীভাবে অংশ নেবেন? সে কোরাইশদের কাছে ফিরে গিয়ে বিষয়টি জানাল। কোরাইশ নেতারা তার কথা শুনে বললো, 'তুমি এখানে বসে থাক। তুমি তো একজন বেদুঈন। এসব রাজনীতির বিষয় তুমি বুঝবে না।'

এমন অপমানজক কথায় হালিস খুব রেগে গেল। সে বললো, 'হে কোরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা শুনে রাখো, লোকজন বাইতুল্লাহর জিয়ারতে আসতে চাইলে তোমরা বাধা দেবে এ জন্য তোমাদের সঙ্গে আমরা মৈত্রীচুক্তি করিনি। বাইতুল্লাহর সম্মানে যে জিয়ারত করতে আসবে, তাকে কেন বাধা দেয়া হবে? আমার জান যার হাতে সে সত্তার কমস! মুহাম্মদকে ওমরাহ করার সুযোগ করে দাও। নতুবা আমি আমার গোত্রের সবাইকে নিয়ে চলে যাব।'

কোরাইশরা বললো, 'তুমি শান্ত হও। আমাদের সমস্যাটা আমাদেরকেই সমাধান করতে দাও।'এ পর্যায়ে তারা সম্ভ্রান্ত কাউকে প্রতিনিধি করে পাঠাতে চাইল । এবার তারা উরওয়া বিন মাসঊদ সাকাফীকে নির্বাচন করলো। উরওয়া বললো, 'হে কোরাইশ সম্প্রদায়! আমি দেখেছি, ইতোপূর্বে যারাই মুহাম্মদের ﷺ-এর কাছে যাওয়ার পর আপনাদের কাছে ফিরে এসেছে, তারাই আপনাদের তিরস্কার ও ধিক্কারের শিকার হয়েছে। আর আপনারা জানেন আমি আপনাদের পুত্র সমতুল্য এবং আপনারা আমার পিতা-সমতুল্য।'

কোরাইশ নেতারা বললো, 'তুমি সত্য বলেছ। তোমার ব্যাপারে আমরা সংশয়মুক্ত।'

উরওয়া ছিল গোত্রের সরদার। গোত্রে যেমন ছিল তার সম্মান, তেমনই ছিল তার প্রভাব- প্রতিপত্তি। সবার মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতাও ছিল। উরওয়া রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে একেবারে রাসূল ﷺ-এর সামনে বসল।

এরপর সে রাসূল ﷺ-কে লক্ষ্য করে বললো, 'মুহাম্মদ! তুমি তো ইতর প্রকৃতির ও নিম্নমানের কিছু মানুষ একত্রিত করেছ। তাদেরকে নিয়েই তুমি তোমার জন্মভূমি জয় করতে আসলে? আরে! শুনে রাখ, এরা হলো কোরাইশ। এদের সঙ্গে আছে বিরাট সৈন্যদল। তারা আজ বাঘের ন্যায়

ময়দানে ঝাপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। তারা আল্লাহর নামে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বলপ্রয়োগ করে তুমি কিছুতেই মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। আল্লাহর শপথ! আমি তো দেখছি আগামীকাল যখন যুদ্ধ শুরু হবে তখন এরা তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে।'

আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলের পিছনে দাঁড়ানো ছিলেন। তিনি উরওয়ার একথা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি গালি দিয়ে বললেন, 'লাত দেবতার আণ্ডা চোষ!' নরাধম তুই কিভাবে ধারণা করলি আমরা তাকে ছেড়ে চলে যাব?

আবূ বকরের গালি শুনে সাকাফী গোত্রপ্রধান থ বনে গেল। কিন্তু এমন উত্তর শোনার জন্য সে মোটেও প্রস্তুত ছিল না। আসলে সে এমন কিছু শোনারই উপযুক্ত ছিল। কথায় বলে, যেমন কুকুর তেমন মুগুর। এমন অপ্রত্যাশিত আঘাত না পড়লে তার মাথা থেকে অহংকার নামত না।

উরওয়া থমকে গিয়ে বললো, 'মুহাম্মদ! এ কে?'

রাসূল বললেন, 'ইনি আবূ কোহাফার পুত্র।'

উরওয়া বললো, 'আল্লাহর শপথ! আমার ওপর যদি তোমার কোনো অনুগ্রহ না থাকত, তাহলে আজ আমি এর জবাব দিতাম। সে অনুগ্রহের ঋণ আজকের এ অপমানের মাধ্যমে শোধ হয়ে গেল!'

এরপর থেকে উরওয়া নরম স্বরে কথা বলতে লাগল। তবে সে কথা বলার সময় বারবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাঁড়ির দিকে হাত বাড়াচ্ছিল। মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমবার তলোয়ারের প্রান্ত দ্বারা আস্তে তার হাতে খোঁচা দিলেন। উরওয়া যখন দ্বিতীয়বার হাত বাড়াল, মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু তলোয়ার দ্বারা তা সরিয়ে দিলেন। তৃতীয়বার সে হাত বাড়ালে মুগীরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তুমি যদি চাও যে, তোমার হাতটি অক্ষত থাকুক তাহলে রাসূলের মুখের কাছ থেকে তা সরিয়ে নাও।'

উরওয়া চমকে উঠে বললো, 'তোমার ধ্বংস হোক! তুমি কত বড় অভদ্র!

মুহাম্মাদ! এ কে?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে বললেন, 'এ তোমার ভাতিজা মুগিরা বিন শো'বা সাকাফী।'

উরওয়া বললো, 'হে বিশ্বাসঘাতক! এ তো কয়দিন আগে তোকে কোলে পিঠে করে মানুষ করলাম, তোর পেশাব- পায়খানা পরিষ্কার করলাম। আর তুই আজ আমাকে এমন কথা বলতে পারলি?

উরওয়া উঠে দাঁড়াল এবং কোরাইশদের কাছে ফিরে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তা জানাল। সে বললো, 'হে কোরাইশ সম্প্রদায়! আল্লাহর কসম! আমি পারস্যের সম্রাট কিসরাকে এবং রোমের সম্রাট কায়সারকেও দেখেছি এবং আবিসিনিয়ার সম্রাট নেগাসকেও দেখেছি। তবে মুহাম্মদকে তার সহচরগণ যতটুকু সম্মান ও সমীহ করে থাকে আমি কোনো বাদশাহর অনুচরকর্তৃক বাদশাহকে তত সম্মান করতে দেখি নি।

এ কথা শুনে কোরাইশদের মনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রভাব ও বড়ত্ব তৈরি হলো। এ পর্যায়ে তারা সাহল ইবনে আমরকে প্রতিনিধি করে পাঠাল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'এবার তোমাদের বিষয়টা সহজে নিষ্পত্তি হবে।' এরপরই দু'দলের মধ্যে হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হলো।

এমনই ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মানুষ চেনার দক্ষতা এবং প্রত্যেকের সঙ্গে তাদের উপযুক্ত চাবি ব্যবহার করে আচরণ করার কৌশল।

মানুষের স্বভাবের ভিন্নতা সহজাত। যে কারো সঙ্গে কথাবার্তা বা অন্য কোনো কাজ করতে গিয়ে আপনি এটা উপলব্ধি করতে পারবেন। ইচ্ছা করলে আপনি নিজেও বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। যেমন, কোনো বৈঠকে আপনি একটি মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক ঘটনা বর্ণনা করুন। এরপর শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করুন। দেখবেন একেক জনের প্রতিক্রিয়া একেক রকম হবে।

আমি একদিন এক সভায় ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম। অগ্নিপূজক আবূ লু' লু' কর্তৃক ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ছুরিকাঘাত করার প্রসঙ্গে যখন পৌঁছলাম তখন একটু একটু জোরে বললাম, হঠাৎ আবূ লু'লু' মেহরাবের কাছ থেকে সামনে অগ্রসর হলো। এরপর আচমকা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে খঞ্জর দ্বারা তিনটা আঘাত করলো। প্রথম অঘাত তার বুকে লাগল। দ্বিতীয়টি পেটে। তারপর লু'লু' শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে তৃতীয় আঘাতটি করলো তার নাভীর একটু নিচে। এরপর খঞ্জর টান দিলে তার পাকস্থলীর অংশবিশেষ বের হয়ে এলো।

আমি এ ঘটনা বলার সময় শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিলাম। এ ঘটনা শুনে কেউ চোখ বন্ধ করে ফেলল যেন সে এ মর্মান্তিক দৃশ্যটি স্বচক্ষে দেখছে। কেউ তো এ ঘটনা শুনে কেঁদেই ফেলল। আর কাউকে দেখলাম, স্বাভাবিকভাবে শুনে যাচ্ছে। তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই। যেন সে মায়ের কোলে শুয়ে কোনো ঘুমপাড়ানি গল্প শুনছে!

অনুরূপভাবে আপনি আল্লাহ ও তার রাসূলের সিংহ হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বর্ণনা করুন। কীভাবে তিনি ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হলেন। কীভাবে তার পেট কেটে তার যকৃত বের করে আনা হলো। এরপর তা চিবিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করা হলো। কীভাবে তার নাক কান কাটা হলো। এরপর দেখুন শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া কেমন হয়।

জীবনঘনি'এ পরীক্ষা থেকে আমি শিক্ষা পেয়েছি যে, প্রত্যেক সমাজে রুক্ষ স্বভাবের কিছু মানুষ আছে যারা কোমলস্বরে ও সুন্দর করে কথা বলতে পারে না। কথা দিয়ে মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করে না।

এ ধরনের এক ব্যক্তি কয়েকজনের সঙ্গে বসে কোনো এক বিক্রেতার সঙ্গে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা বলছিল। কথা প্রসঙ্গে সে বললো, 'সেই বিক্রেতাটা গাধার মতো মোটা!' এরপর বললোঃ 'একদম এ খালেদের মতো!' একথা বলে সে তার পাশে বসে থাকা এক ব্যক্তির দিকে ইশারা করলো।

আমি বুঝলাম না একদম গাধার মতো দেখতে লোকটা কীভাবে খালেদের মতো হলো?'

এখানে একটি বড় প্রশ্ন হতে পারে। 'মানুষের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করার জন্য কি নিজের স্বভাব পরিবর্তন করা সম্ভব?

আমি বলব, হ্যাঁ! অবশ্যই সম্ভব।

ওমরের শাসন ও কঠোরতার কথা সবাই জানে। একবার নিজ স্ত্রীর সঙ্গে জনৈক ব্যক্তির ঝগড়া হলো। তার স্ত্রীর সঙ্গে এখন সে কী আচরণ করবে এটা জানতে সে ওমরের কাছে এলো।

সে ব্যক্তি ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে দরজায় করাঘাত করতে যাবে এমন সময় শুনতে পেল, ওমরের স্ত্রী উচ্চস্বরে ওমরকে বকাঝকা করছে, আর ওমর নির্বিকার ভঙ্গিতে স্ত্রীর চিৎকার শুনে যাচ্ছেন। তার কোনো কথার উত্তর দিচ্ছেন না এমনকি তাকে প্রহারও করছেন না।

লোকটি ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে না ডেকে দরজা থেকেই ফিরে যেতে উদ্যত হলো। বস্তুত স্ত্রীর সঙ্গে ওমরের এমন ভূমিকা দেখে সে একদম অবাক হয়ে গিয়েছিল। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দরজায় কারো উপস্থিতি টের পেয়ে বের হয়ে এলেন। লোকটি চলে যাচ্ছিল। তিনি লোকটাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এসে দেখা না করে চলে যাচ্ছেন কেন?'

লোকটি বললো, 'আমিরুল মুমিনীন! আমি আপনার কাছে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অভিযোগ করতে এসেছিলাম। কিন্তু আপনার দরজায় দাঁড়াতে না দাঁড়াতে শুনলাম, আপনার স্ত্রী আপনার সাথে উচ্চস্বরে বাদানুবাদ করছে। তাই অভিযোগ না করেই ফিরে যাচ্ছি।'

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন,'শুন! সে আমার স্ত্রী। আমার শয্যাসঙ্গিনী। আমার খাবার প্রস্তুতকারিনী। আমার কাপড়-চোপড় ধোলাইকারিনী। সে আমার জন্য এতো কিছু করে, তবুও কি তার সামান্য দুর্ব্যবহার আমি সহ্য করব না?'

তবে কিছু মানুষ এমনও আছে যারা কোনো কিছুতেই ঠিক হয় না। এরা মার্জিত আচরণের জন্য কখনো চেষ্টাও করে না। সেক্ষেত্রে আমাদের উচিত হলো, তাদের সঙ্গে কোনো মতে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করা। তাদের দুর্ব্যবহারগুলো যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়া।

আমার কাছে কেউ কেউ তার বাবার অতিরিক্ত রাগের কিংবা স্ত্রীর কৃপণতার ব্যাপারে অভিযোগ করে। আরো কতজন কতরকম অভিযোগ নিয়ে আসে! আমি তাদেরকে সংশোধনের কিছু পদ্ধতি ও আচরণকৌশল বলে দিই। তারা আমাকে জানায়, তারা এগুলো প্রয়োগ করেছে কিন্তু সুফল পায় নি, তাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। এর সমাধান কী?

সমাধান হলো, তাদের দুর্ব্যবহারগুওলো সয়ে যেতে হবে। তাদের ভাল আচরণের সমুদ্রে খারাপ আচরণগুলোর সলিলসমাধি দিয়ে দেবে। যথাসম্ভব তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চেষ্টা করবে।

কিছু সমস্যা আছে, মানুষের হাতে যার কোনো সমাধান নেই।

ফলাফল...

যার সঙ্গে আপনি চলাফেরা করেন তার স্বভাব-প্রকৃতি জানতে পারলে **আপনি** সহজে তার ভালবাসা অর্জন করতে সক্ষম হবেন।



২১. মুয়াবিয়ার সুতা ...

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন গণিত শিক্ষক দেখলেন, তার ক্লাসের অধিকাংশ ছাত্র ক্লাসে অমনোযোগী। পড়াশোনায়ও দুর্বল। এদিকে এরা আবার দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। সামনে ফাইনাল পরীক্ষা। তাই তিনি তাদের সংশোধন করতে চাইলেন।

হঠাৎ একদিন তিনি ক্লাসে এসে চেয়ারে বসতে না বসতেই বললেন, 'সবাই বই বন্ধ করে পাশে রাখ, খাতা-কলম হাতে নাও।'

ছাত্ররা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন স্যার?'

শিক্ষক বললেন, 'আমি তোমাদের একটা সারপ্রাইজ পরীক্ষা নেব।'

ছাত্ররা বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করা সত্ত্বেও এক পর্যায়ে শিক্ষকের কথা মেনে নিল। তবে তাদের মধ্যে বিশাল দেহের অধিকারী কিন্তু মোটা মাথার এক ছাত্র ছিল। অঘটন ঘটানোর ক্ষেত্রে সে ছিল খুব পটু।

সে চিৎকার করে বললো, 'স্যার! আমরা পরীক্ষা দেব না। রিভিশন দিয়ে পরীক্ষা দিতেই আমাদের বারোটা বেজে যায়। কিন্তু এখন রিভিশন ছাড়া পরীক্ষা দেব কীভাবে?'

ছাত্রটি কথাগুলো এতো কঠিন স্বরে বললো যে, শিক্ষক রাগে ফেটে পড়লেন। শিক্ষক তাকে বললেন, 'এখানে তোমার খেয়াল খুশিমতো কিছুই হবে না। আমি শিক্ষক আমার কথা তোমাকে মানতে হবে। না চাইলেও পরীক্ষা তোমাকে দিতেই হবে। বুঝতে পেরেছ? আর যদি পরীক্ষা দিতে ভাল না লাগে তাহলে ক্লাস থেকে বের হয়ে যাও।'

ছাত্রটিও ক্রোধে পাগলের মতো বলে উঠল, 'আমি যাব না; বরং আপনি ক্লাস হতে বের হয়ে যান।'

ছাত্রের মুখে এমন কথা শুনে শিক্ষক আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। তিনি 'বেয়াদব', 'অভদ্র' ইত্যাদি গালি দিতে দিতে তিনি ছেলেটির দিকে এগিয়ে গেলেন। এদিকে ছাত্রটিও রুখে দাঁড়াল। এরপর যা ঘটার, তাই ঘটল। শুধু এতটুকু বুঝে নিন যে, খুব খারাপ কিছু ঘটেছিল। আমি এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না।

এ ঘটনার খবর কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছল। কর্তৃপক্ষ ছাত্রটিকে শাস্তি দিলেন। তার ফাইনাল পরীক্ষার মার্কশিটের গ্রেড দুই ধাপ নামিয়ে দেয়া হলো এবং শিষ্টাচার বজায় রেখে চলার অঙ্গীকার করে তাকে একটি দরখাস্ত লিখতে বাধ্য করা হলো।

এদিকে ঐ শিক্ষক 'টক অভ দ্যা স্কুলে' পরিণত হলেন। স্কুলের সর্বত্র তাকে নিয়ে কানাঘুষা শুরু হলো। যার পাশ দিয়েই তিনি যান, সে-ই তাকে নিয়ে ফিসফিস করে আলোচনা করে । অনেকে তাকে নিয়ে বাজে মন্তব্য ছুড়ে দেয়। উপায়ান্তর না দেখে অবশেষে তিনি অন্য বিদ্যালয়ে বদলি হয়ে চলে যান।

অন্য এক শিক্ষক একই ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি খুব কৌশলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি কিভাবে তা করেছিলেন? দেখুন,

তিনিও একদিন ক্লাসে এসে ছাত্রদের বললেন, 'সবাই কাগজ কলম হাতে নাও। তোমাদের আজ সারপ্রাইজ পরীক্ষা হবে।'

তাদের মধ্য থেকে এক ছাত্র দাঁড়িয়ে বললো, 'আপনি যখন যা চাইবেন তা-ই হবে এমন মনে করবেন না। আপনার ইচ্ছামতো সব চলবে না।'

এ শিক্ষক ছিলেন খুব বিচক্ষণ। তিনি মানুষের নাড়ি ও প্রকৃতি বুঝতেন। তিনি জানতেন গোঁয়ার্তুমি দিয়ে গোঁয়ারের মোকাবিলা করা যায় না।

তিনি ছেলেটির দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'ওহ আচ্ছা! খালেদ তুমি মনে হয় পরীক্ষা দিতে চাও না।'

ছাত্রটি চিৎকার করে বললো, 'অবশ্যই, আমি পরীক্ষা দেব না।'

শিক্ষক তখন খুব শান্তভাবে বললেন, ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। যে পরীক্ষা দিতে চায় না, তার ব্যাপারে আমরা বিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবো।

ছেলেরা! তোমরা লেখ, প্রথম প্রশ্ন ঃ নিচের সমীকরণটির সমাধান বের **কর:**

س + ص =ع + 15 ...

এই বলে তিনি একের পর এক প্রশ্ন লেখাতে শুরু করলেন।

গোঁয়ার ছাত্রটি আর ধৈর্য্য ধরতে পারল না। সে চিৎকার করে বললো, 'আমি বলেছি, আমি পরীক্ষা দেব না।'

শিক্ষক শান্তভাবে তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'আমি কি তোমাকে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করেছি? তুমি স্বাধীন মানুষ। তুমি যেমন করবে, তেমন ফল পাবে।'

শিক্ষকের এ কথার পর ছাত্রটি তাকে রাগানোর মতো আর কিছু খুঁজে পেল না। অবশেষে সে শান্ত হয়ে কাগজ- কলম বের করলো এবং সহপাঠীদের সঙ্গে প্রশ্ন লিখতে শুরু করলো।

পরবর্তীতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষকের সাথে তার অসদাচরণের উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছিল।

কাল্পনিক এই ঘটনা দুটি থেকে আপনি অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার যোগ্যতা সবার এক রকম নয়। কেউ পরিস্থিতিকে উত্তাল করে তোলে, আবার কেউ দ্রুত তা শান্ত করে ফেলতে পারে। গোঁয়ার ব্যক্তির সঙ্গে গোঁয়ার্তুমি করলে পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি হয়।

এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, আগুনের মোকাবিলা আগুন দ্বারা করা হলে উত্তাপ ও লেলিহান শিখাই বাড়তে থাকবে। অপরদিকে ঠাণ্ডার সঙ্গে সবসময় ঠাণ্ডা ব্যবহার করলে কোনো কাজই ঠিক থাকবে না। সুতরাং মানুষের সঙ্গে আপনার আচরণ কেমন হবে, তা বুঝতে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সুতা দর্শনের শরণাপন্ন হতে পারেন।

মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'আপনি গভর্নর হিসেবে বিশ বছর এবং খলিফা হিসেবে বিশ বছর এত দীর্ঘ সময় কীভাবে শাসন করলেন?'

মুয়াবিয়া বলেছিলেন, 'আমি জনগণ ও আমার মধ্যে একটি সুতা রেখেছি। সুতার এক প্রান্ত আমার হাতে, অপর প্রান্ত জনগণের হাতে। তারা যখন সুতা ধরে টান দেয় তখন আমি ঢিল দেই, যেন সুতাটা ছিঁড়ে না যায়। আর যখন জনগণ ঢিল দেয় তখন আমি টেনে ধরি।'

মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু সত্য বলেছেন। মানুষের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে এটি একটি যথার্থ উক্তি। কত চমৎকার ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা!

দাম্পত্য জীবনে স্বামী স্ত্রী উভয়ই যদি গোঁয়ার হয়, কেউ কাউকে বিন্দু পরিমাণ ছাড় দিতে না চায় তাহলে তাদের সংসারে কখনো সুখ আসবে না। অনুরূপ দুই পার্টনারের উভয়ে যদি একগুঁয়ে প্রকৃতির হয় তাহলে তাদের অংশিদারিত্ব বেশি দিন টিকবে না।

একবার আমি এক জেলখানায় ধর্মীয় আলোচনা করেছিলাম। ঘটনাক্রমে আমার আলোচনাটি ছিল জেলখানার সে অংশে যেখানে খুনের আসামীদেরকে রাখা হতো।

আমি যখন আলোচনা শেষ করলাম তখন কয়েদীরা সবাই নিজ নিজ সেলে ফিরে গেল। কিন্তু তাদের একজন এগিয়ে এসে আমাকে ধন্যবাদ জানালেন। তিনি জেলখানায় বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এদের অধিকাংশের হত্যার মতো অপরাধ সংঘটনের পেছনে কারণ কী?'

তিনি বললেন, 'রাগ ও ক্রোধই হলো মূল কারণ। এদের কেউ কেউ সামান্য কিছু টাকার জন্য সেলসম্যানের সঙ্গে ঝগড়া করে উত্তেজিত হয়ে কিংবা ফিলিং স্টেশনের কর্মচারীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।'

তখন আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদিস মনে পড়ে গেল-

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ وَلَكِنَّ الشَّدِيْدَ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

'কাউকে ধরাশায়ী করতে পারা বীরত্ব নয়। প্রকৃত বীর তো সে-ই, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।'

(সহীহ বুখারী: ৫৬৪৯, সহীহ মুসলিম: ৪৭২৩)

হ্যাঁ, সে প্রকৃতপক্ষে বীর নয়, যে মল্লযুদ্ধে শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে সবাইকে পরাজিত করতে পারে। যদি এটাই বীরত্বের মাপকাঠি হতো তাহলে হিংস্র প্রাণীরা মানুষের চেয়ে শ্রে'বীর হিসেবে বিবেচিত হতো।

কোনো পরিস্থিতিতে কী করতে হবে এটা যে বোঝে সেই প্রকৃত বীর ।যে দক্ষতার সঙ্গে তার স্ত্রী, সন্তান, উর্দ্ধতন কর্মকর্তা, সহপাঠী, সহকর্মীসহ সবার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারে সেই তো প্রকৃত মানুষ।

হাদীসে আছে-

لَا يَقْضِي الْقَاضِيْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ.

অর্থ : 'বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় কোনো রায় না দেয়।'

রাসূল ﷺ ধৈর্যের অনুশীলন করার আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন-

اِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ.

অর্থ : 'সংযম অনুশীলনের মাধ্যমে ধৈর্যের গুণ অর্জন করা যায়।'

(আল মুজামুল কাবীর, তাবারানী: ১৬২৯৬, শুআবুল ঈমান, বাইহাকী: ১০৩৩৩)

সংযম অনুশীলনের মাধ্যমেই ধৈর্য লাভ হয় রাগ নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রথম বার রাগ নিয়ন্ত্রণ করার সময় আপনার ১০০% কষ্ট হবে, দ্বিতীয় বার রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে আপনার কষ্ট হবে ৯০%। এরপর তৃতীয়বার আপনি যখন রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে যাবেন তখন ৮০% কষ্ট স্বীকার করলেই চলবে। এভাবে আপনি অনুশীলন করতে থাকলে ধৈর্য ও সহনশীলতা একসময় আপনার সহজাত স্বভাবে পরিণত হয়ে যাবে।

একবার আমি একটি বক্তৃতা করার জন্য আমলাজ শহরে গিয়েছিলাম। আমলাজ শহরটি জেদ্দা থেকে তিনশ কিলোমিটার দক্ষিণে। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে এক রগচটা যুবক ছিল। সে হঠাৎ রেগে গিয়ে তুগলকি কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলত।

সে একবার গাড়ি নিয়ে বের হলো। বিশেষ কোনো তাড়া না থাকায় সে ধীরগতিতে গাড়ি ড্রাইভ করছিল। তার পেছনে একটি গাড়ি খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছিল এবং তাকে ওভারটেক করার জন্য বারবার হর্ণ বাজাচ্ছিল।

কিন্তু যুবকটি তার গাড়ির গতি আরো কমিয়ে দিল এবং হাত নেড়ে পেছনের গাড়িটিরও গতি কমাতে বললো। পেছনের গাড়ির চালক খুব বেশি সময় ধৈর্য ধরতে পারল না। সে বিরক্ত হয়ে সাইড দিয়ে ওভারটেক করে চলে গেল। তবে কোনো গাড়িরই কোনো ক্ষতি হলো না।

তবে এটা দেখে যুবকটির মাথা গরম হয়ে গেল। অবশ্য এর চেয়ে তুচ্ছ কিছু ঘটনায়ও সে প্রচণ্ড রেগে যায়। সেও তাদের ধরার জন্য গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল এবং বারবার তাদেরকে থামার জন্য সিগনাল দিতে লাগল। এ অবস্থা দেখে সামনের গাড়িটি থামল। তখন যুবকটি তার মাথার রুমাল খুলে সিটের পাশে রেখে একটি রড (নাটবল্টু খোলার যন্ত্রবিশেষ, বড় রেঞ্চ) হাতে নিয়ে গাড়ি থেকে বের হয়ে এলো। তার চোখ থেকে যেন আগুন ঝরছিল। এ অবস্থায় সে সামনের গাড়ির যাত্রীদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

সামনের গাড়ি থেকে তিনজন যুবক নেমে আসল। যুবকদের প্রত্যেকেই ছিল পেশিবহুল ও সুগঠিত দেহের অধিকারী। তাদের পেশী যেন তাদের পরিধেয় কাপড় ছিড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে! যুবকরা তার দিকে তেড়ে আসছিল। তারা তার হাতে রডটি দেখে তার মনোভাব বুঝতে পেরেছিল। তাই তারাও প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে আসছিল।

এটা দেখে যুবকটি খুব ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। সঙ্গে সঙ্গে সে রডটা উচু করে ধরে বললো, 'সরি, এটা আপনাদের গাড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিল। এটা আপনাদের কাছে ফেরত দিতে এসেছি।'

তিনজনের একজন শান্তভাবে তার হাত থেকে রডটা নিয়ে গাড়িতে উঠে চলে গেল। আর সে দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে বিদায় জানাল।

সমীকরণ ...

গোঁয়ার + গোঁয়ার = বিস্ফোরণ !

২২. হৃদয় জয়ের চাবি ...

প্রত্যেক তালাবদ্ধ দরজা খোলার যেমন আলাদা আলাদা চাবি থাকে তেমনই প্রত্যেক মানুষের হৃদয় জয়ের জন্যও স্বতন্ত্র চাবি আছে। আর সে চাবি হলো, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বভাব ও প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত হওয়া। যদি আপনি মানুষের রুচি ও প্রকৃত স্বভাব সম্পর্কে অবগত হন তাহলে যেকোনো সমস্যার সমাধান, দ্বন্দ্ব নিরসন, নিজের স্বার্থ উদ্ধার এবং অন্যের ক্ষতি থেকে নিজেকে বাঁচানোর সকল পথ আপনার সামনে একদম আয়নার ন্যায় পরিষ্কার হয়ে যাবে।

মনে করুন, কোনো যুবক ছেলের সঙ্গে তার পিতার কথা কাটাকাটি হলো। এক পর্যায়ে তা এমন রূপ ধারণ করলো যে, বাবা ছেলেকে বাড়ি থেকে বের করে দিল। ছেলে কয়েকবার বাড়ি ফিরতে চাইলেও বাবা নাছোড়বান্দা। ছেলেকে ঘরে তুলতে রাজি নয়।

এ অবস্থায় সমঝোতার উদ্দেশ্যে আপনি ছেলের বাবার কাছে গেলেন। প্রথমে তাকে শরিয়তের কিছু বিধি-বিধান শোনালেন। আত্মীয়তা ছিন্ন করার পাপ সম্পর্কেও তাকে সতর্ক করলেন। কিন্তু আপনার একথা লোকটার মধ্যে কোনো ভাবান্তর সৃষ্টি করলো না। সে নিজের অবস্থানে অনড়।

এদিকে আপনি কথাবার্তা বলে বুঝতে পেরেছেন যে, যুবকটির পিতা আবেগপ্রবণ মানুষ। তাই আপনি আপনার কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। আপনি তাকে বললেন, 'জনাব! সন্তানের প্রতি কি আপনার কোনো মায়া মমতা নেই! ছেলেটার কোনো সহায় সম্বল বা আশ্রয়ের কোনো জায়গা নেই। খোলা আকাশের নিচে, মাটির মেঝেতে কাটছে তার দিন-রাত। আপনি তো নিশ্চিন্তে খাওয়া-দাওয়া করছেন আর আপনার ছেলে সকাল-সন্ধ্যা ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে ঘুরছে। যখন আপনি রুটির টুকরা মুখে দেন তখন কি তাকে একটুও মনে পড়ে না? রোদের তাপে শুকিয়ে যাওয়া এ ভবঘুরে ছেলেটার প্রতি আপনার কি একটু দয়া হয় না? শৈশবে যখন সে ছোট্ট ছিল, আপনি তাকে কোলে তুলে নিতেন, আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরতেন, তার ঘ্রাণ নিতেন, চুমু খেতেন সেসব কথা কি আপনার মনে পড়ে না?' আপনি বেঁচে থাকতে আপনার সন্তান এক টুকরা রুটির জন্য পথে পথে মানুষের কাছে হাত পাতছে, এটা আপনার কাছে কেমন লাগে?'

দেখবেন, আপনার এ কথাগুলো বাবার স্নেহের সাগরে ঢেউ তুলবে। সন্ত ানের জন্য তার দরদ উথলে উঠবে।

যদি তার বাবা কৃপণ স্বভাবের হয় তাহলে তাকে বলুন, 'আপনি ভদ্রলোক মানুষ। সমস্যায় পড়ার আগেই সতর্ক হোন। ছেলেকে তাড়াতাড়ি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসুন। সময় ভাল না। আমার আশংকা হচ্ছে খারাপ সঙ্গীদের তালে পড়ে সে চুরিতে জড়িয়ে পড়তে পারে। কিংবা এর চেয়েও বড় কিছু করে ফেলতে পারে। তখন পি হিসেবে এর দায়ভার আপনাকেই বহন করতে হবে। শেষ কথা হলো আপনি তার বাবা, তার অভিভাবক। কোনো কিছুর দায় এড়ানো আপনার পক্ষে সম্ভব নয়।' আপনার এ কথা শুনে কৃপণ বাবা ছেলেকে নিয়ে নতুন ভাবে ভাবতে শুরু করবে।

আপনি যখন ছেলেকে লক্ষ্য করে বলবেন তখন প্রথমে তার প্রকৃতি সম্পর্কে খোঁজ নিবেন। যদি দেখেন যে, ধন-সম্পদের প্রতি তার ঝোঁক আছে তাহলে তার সাথে কথা এভাবে বলুন, 'ভাই! বাবা ছাড়া তোমার কোনো উপায় নেই। দু'দিন পর যখন তুমি বিয়ে করবে তখন তোমার বিয়ের খরচ কে দেবে? যদি তোমার গাড়ি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সেটা মেরামত করার টাকা পাবে কোথায়? হঠাৎ তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালের পাওনা কে মিটাবে? তোমার ভাইয়েরা তো তোমার বাবার কাছ থেকে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে নিচ্ছে। টাকা-পয়সা, জমি-জমা সব তারা হাতিয়ে নেবে। আর তুমি বঞ্চিত হয়ে যাবে। ভেবে দেখ, বাবার কপালে একটি চুমু দিয়ে কিংবা অতীত ভুলের ক্ষমা চেয়ে বাবার কানে দু'একটি কথা বলে তুমি সব সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পার।'

স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য কলহ মেটানোর জন্যও আপনি এ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। মোটকথা, প্রত্যেকের হৃদয়ের দরজা খুলতে হবে তার জন্য নির্দিষ্ট চাবি দিয়ে ।

মনে করুন, আপনি যে অফিসে চাকরি করেন সে অফিসের পরিচালক সহজে কাউকে ছুটি দিতে চায় না। তার কাছে মানবিক আবেগ ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের কোনো মূল্য নেই। সে বোঝে শুধু কাজ আর কাজ। তার কাছে থেকে যদি আপনার ছুটি নিতে হয় তাহলে তাকে বলুন,

'স্যার! আমার একটু রিলাক্স দরকার। আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। কাজে মনোযোগ দিতে পারছি না। তাই কর্মোদ্যম ফিরিয়ে আনতে তিনদিনের ছুটি দরকার। তিনদিন পর আমি নব উদ্যমে কাজ করতে সক্ষম হব। তীব্র কাজের চাপে দিনদিন আমার উদ্যম কমে যাচ্ছে। মাথাটাকে সতেজ করার একটু সুযোগ আমাকে দিন। বেশি নয়, মাত্র তিনদিন। তিনদিন পর আমি নব উদ্যমে কাজে ফিরব।'

আর যদি বসের আচরণে আপনি বুঝতে পারেন যে, তিনি সামাজিক বোধসম্পন্ন মানুষ। সামাজিক আচার-আচরণের প্রতি সংবেদনশীল। বাবা মা ও সন্তানদের খুব খোঁজ-খবর রাখেন, তাহলে আপনি তাকে এভাবে বলুন, 'স্যার! বাবা-মা ও সন্তানদের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমার কয়েকদিনের ছুটি দরকার। অনেক দিন যাবত আমি তাদেরকে খুব মিস করছি। তাদের কথা খুব মনে পড়ছে।....

আপনি যদি মানুষের হৃদয়জয়ের এসব কৌশল ভালভাবে আত্মস্থ করতে পারেন তাহলে দেখবেন, মানুষ বলা-বলি করবে, 'অমুকের আচরণ এতো অমায়িক যে এর জুড়ি মেলা ভার।'

ফলাফল...

প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ের একটি বিশেষ চাবি আছে।

তার স্বভাব ও প্রকৃতি বুঝতে পারলেই আপনি সে চাবিটির সন্ধান পাবেন।



২৩. মানসিক অবস্থা বিবেচনায় রাখুন

মানুষের মানসিক অবস্থা একেক সময় একেক রকম থাকে। সুখ, দুখ, সুস্থতা, অসুস্থতা, সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা, স্থিরতা, অস্থিরতা ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থার কারণেও ব্যক্তির মানসিক অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে থাকে। আর মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে অন্যদের সাথে তার আচরণের ধরনেও পরিবর্তন আসে। এ জন্য কেউ যখন ফুরফুরে মেজাজে থাকে তখন তার কাছে হাস্যরসিকতা ভাল লাগে। কিন্তু উদ্বেগ ও অস্থিরতার সময় হাস্যরসিকতা ভাল লাগে না।

মৃতের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশ করতে গিয়ে তাদের সঙ্গে রসিকতা করা অবশ্যই অনুপযোগী। কিন্তু বন্ধুদের সাথে প্রমোদ-ভ্রমণে গিয়ে আনন্দ-ফূর্তি ও রসিকতা করা যে উপযোগী তা বলাই বাহুল্য। কেননা, এটা সর্বজনস্বীকৃত বিষয়। এখানে তা আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই তা হলো, কারো সঙ্গে কথা বলা ও আচার-আচরণের আগে অবশ্যই তার মানসিক অবস্থা বিবেচনা করা উচিত।

মনে করুন, কোনো মহিলাকে তার স্বামী তালাক দিয়েছে। মহিলার মা-বাবা বেঁচে নেই। ভাই ভাবীর বাসা ছাড়া তার থাকার আর কোনো জায়গা নেই। সেখানে যাওয়ার জন্য সে কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিচ্ছে। এমন সময় প্রতিবেশী জনৈক মহিলা তার সাথে দেখা করতে এলো। সে তাকে বসতে বলে চা-কফি নিয়ে এলো। চা পান করতে করতে প্রতিবেশী মহিলাটি ভাবতে লাগল এ মুহূর্তে তার সাথে কী কথা বলা যায়?

এরই মধ্যে তালাকপ্রাপ্তা মহিলাটি বললো, 'আপা! গতকাল আপনাদেরকে বাসা থেকে বের হতে দেখলাম, কোথায় গিয়েছিলেন?'

প্রতিবেশী মহিলাটি বললো, ও আচ্ছা! ওর বাবা (মহিলার স্বামী) গতকাল আমাকে বাইরে কোনো রেস্টুরেন্টে গিয়ে ডিনার করার জন্য পীড়া-পীড়ি করছিল।' অবশেষে বাধ্য হয়ে বের হতে হলো। ডিনার শেষে আমার বোনের বিয়েতে পরার জন্য মার্কেট থেকে একটা ড্রেস কিনল। এরপর

বিয়ের অনুষ্ঠানে পরার জন্য একটি জুয়েলারি দোকান থেকে আমার জন্য চুড়ি কিনল। বাড়িতে ফিরে দেখলাম বাচ্চাদের মন খারাপ। তখন ও তাদেরকে আগামী সপ্তাহে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে সান্ত্বনা দিল।

অসহায় তালাকপ্রাপ্ত মহিলাটি তার প্রতিবেশীর এসব কথা শুনছিল আর একটু পরে ভাইয়ের বাড়িতে তার কী দুরবস্থা হবে তা ভাবছিল।

এখানে প্রশ্ন হলো, একটু আগে যে মহিলার স্বপ্নের সংসার ভেঙ্গে গেছে তার সঙ্গে এ ধরনের আলাপচারিতা কতটা যুক্তিসঙ্গত?

আপনার কী মনে হয় এ ঘটনার পর ঐ প্রতিবেশী মহিলার প্রতি তার ভালবাসা আরো বাড়বে? তার সঙ্গে আলাপ করতে সে আরো বেশি আগ্রহী হয়ে উঠবে? তাকে দেখলে সে খুশী হবে? নিশ্চয় আমরা সবাই একবাক্যে বলব, 'না'।

বরং প্রতিবেশী মহিলার কথায় তার মনের গহীনে হিংসা ও ক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠবে।

তাহলে এর সমাধান কী? সে কি মিথ্যা কথা বলবে?

কখনো না। সে মিথ্যার আশ্রয় নেবে না; বরং আলোচনাকে সে দীর্ঘায়িত না করে সংক্ষেপে শেষ করবে। সে এমন বলতে পারে, 'বাইরে জরুরি একটা কাজ ছিল। তাই একটু বের হয়েছিলাম।' তারপর সে প্রসঙ্গ পাল্টে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাবে এবং তালাকপ্রাপ্ত অসহায় মহিলাটিকে সান্ত্বনামূলক কথা বলে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দেবে।

আরেকটি উদাহরণ দেখুন। দুই বন্ধু একসঙ্গে নিম্নমাধ্যমিক স্তরের ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে। একজন খুব ভাল ফলাফল করেছে, কিন্তু অপরজন কয়েক বিষয়ে ফেল করেছে কিংবা এত কম নম্বর পেয়ে পাশ করেছে যে, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ লাভ করা তার জন্য সম্ভব নয়। যে ভাল রেজাল্ট করেছে সে নামকরা এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলো। আর অপর বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ না পেয়ে সাধারণ কোনো চাকরিতে যোগ দিল।

যে বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেল সে যখন তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবে, তখন সে কি তার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনকাল, পড়াশোনা ও সেখানকার নানা সুযোগ সুবিধার কথা নিয়ে আলোচনা করবে?

এ প্রশ্নের জবাবেও নিশ্চয়ই সবাই বলবে, 'না।'

তাহলে করণীয় কী?

করণীয় হলো, সে এমন কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে, যাতে বন্ধুর মানসিক চাপ কিছুটা হলেও দূর হতে পারে। যেমন সে বলতে পারে, 'এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে অনেক ধকল পোহাতে হয়েছে। ভাল ফলাফল করা অনেক ছাত্র পরীক্ষা দেয়ার পরও খুব অল্প সংখ্যক ছাত্র চান্স পেয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে ভাল নম্বর নিয়ে পাশকরা বহুছাত্র হতাশ হয়ে ফিরে গেছে।'

এ জাতীয় আলোচনায় বন্ধুর মানসিক চাপ কিছুটা হলেও দূর হবে এবং সে এ বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করে সান্ত্বনা পাবে। বন্ধুর প্রতি তার ভালবাসা আরো বেড়ে যাবে। সে তাকে তার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গণ্য করবে।

আরেকটি উদাহরণ দেখুন। দুই বন্ধুর সাক্ষাত হলো। একজনের পিতা বেশ উদার। ছেলেকে হাত খরচের জন্য যথেষ্ট টাকা দেন। অপরজনের বাবা খুব কৃপণ। সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ছেলের প্রয়োজন অনুপাতে টাকা দেন না। টাকা চাইলেই শুধু হিসাব চান।

এ পরিস্থিতিতে সচ্ছল বন্ধুর জন্য তার বাবার উদারতা নিয়ে গল্প করার অর্থ হলো তার বন্ধুর মানসিক কষ্ট বাড়িয়ে দেয়া। এধরনের আলোচনার মাধ্যমে তার মন খারাপ হয়ে যাবে এবং নিজের বাবার আচরণ মনে করে সে কষ্ট পাবে। এর ফলে এ বন্ধুর সঙ্গে তার চলাফেরা করা কঠিন হয়ে যাবে।

এজন্যই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপরের আবেগ-অনুভূতি ও মানসিক অবস্থার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন-

لَا تُدِيْمُوا النَّظَرَ اِلَى الْمُجَذَّمِيْنَ.

'তোমরা কুষ্ঠরোগীর দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থেক না।'

(সুনানে ইবনে মাযাহ: ৩৫৩৩, মুসনাদে আহমদ: ১৯৭১)

কুষ্ঠরোগ এমন এক রোগ যা চামড়ার উপরিভাগকে সম্পূর্ণ বিকৃত করে দেয়। দেখতে বিশ্রী লাগে। তাই কুষ্ঠরোগী কারো পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে যদি তার দিকে তাকিয়ে থাকে তাহলে সে লজ্জা পায় এবং

তার মানসিক কষ্ট হয় । এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে থাকতে নিষেধ করেছেন ।

এখানে আরো একটি ঘটনা আলোচনা করছি। এ ঘটনার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের মানসিক অবস্থা কত গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় রাখতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম বাহিনী নিয়ে মক্কাবিজয়ের উদ্দেশ্যে মক্কার উপকণ্ঠে এসে থামলেন। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পিতা আবূ কোহাফা ছিলেন অতিশয় বৃদ্ধ ও দৃষ্টিশক্তিহীন। তিনি তার এক নাতনিকে বললেন, ‘আমাকে একটু আবূ কুবাইস পাহাড়ের কাছে নিয়ে যাও। লোকেরা যা বলাবলি করছে তা কতটুকু সত্য, তা একটু দেখে আসি। মোহাম্মদ কি এসে পড়েছে?’

নাতনি দাদাকে নিয়ে পাহাড়ের ওপর দাঁড়াল ।

দাদা বললো, ‘বেটি! কী দেখতে পাচ্ছো?’

‘বিশাল এক দলকে এগিয়ে আসতে দেখছি ।’

‘এটাই তাহলে মোহাম্মদের বাহিনী ।’

মেয়েটি বললো, ‘একজনকে দলটির আগে ও পেছনে আসা যাওয়া করতে দেখছি ।’

দাদা বললো, ‘বেটি! সে এ বাহিনীর সেনাপতি হবে। সৈন্যদেরকে সে দিকনির্দেশনা দিচ্ছে ।’

মেয়েটি হঠাৎ শঙ্কিত স্বরে বললো, ‘দাদা! দলটি তো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে ।

দাদা বললো, ‘তারা এখন মক্কার দিকে আসছে। অতি সত্বর তারা পৌঁছে যাবে। আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি নিয়ে চল। কারণ তারা বলেছে, যে নিজের ঘরে থাকবে, সে নিরাপদ ।’

মেয়েটি দাদাকে নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে বাড়ি পৌঁছার আগেই মুসলিম বাহিনীর ঘোড়সওয়ারদের সামনে পড়ে গেল। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বাবাকে দেখে এগিয়ে এলেন । তিনি আবেগাপ্লুত কণ্ঠে তাকে অভিনন্দন জানালেন। তারপর তার হাত ধরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে মসজিদে নিয়ে গেলেন ।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ কোহাফার দিকে তাকালেন। অতি বার্ধক্যে তার শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে। অস্থি মজ্জা শুকিয়ে গেছে। পরপারের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আবূ বকর অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন পিতার দিকে। কতদিন পিতাকে তিনি দেখেন না। দ্বীনের জন্য তিনি সব ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন মদিনায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে খুশি করার জন্য এবং তার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য বললেন, 'আবূ বকর! মুরুব্বিকে বাড়িতে রেখে আসতে! আমি নিজে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম।'

আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জানতেন, তারা এখন যুদ্ধের ময়দানে । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সেনাপতি। তিনি অনেক ব্যস্ত। এ মুহূর্তে বাড়িতে গিয়ে তার পিতাকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার মতো সময় বের করা রাসূলের জন্য অনেক কঠিন।

তাই তিনি কৃতজ্ঞতার সাথে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আপনি তার কাছে যাওয়ার চেয়ে তিনি আপনার কাছে আসবেন, এটাই তো যুক্তিযুক্ত।'

রাসূল আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আবূ কোহাফাকে সামনে বসালেন। তার বক্ষে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন,'আপনি ইসলাম কবুল করে নিন।'

আবূ কুহাফার চেহারায় আলোর ছটা খেলে গেল। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন। পিতার ইসলাম গ্রহণে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এতো খুশি হলেন যে, সারা পৃথিবী তার করায়ত্ব হলেও তিনি এতো খুশি হতেন না।

রাসূল তাকিয়ে দেখলেন, বৃদ্ধ আবূ কোহাফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চুল দাঁড়ি শুভ্র হয়ে গেছে। তাই তিনি আবূ বকরকে বললেন, 'এ শুভ্রতাকে খেযাব দিয়ে রাঙিয়ে দাও। তবে তা যেন কালো না হয়ে যায়।' (মুসনাদে আহমদ:২৫৭১৮)

এভাবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের সঙ্গে আচরণ ও কথায় তাদের মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন।

মক্কায় প্রবেশের সময় তিনি সৈন্যবাহিনীকে কয়েকটি দলে ভাগ করেন। একটি দলের পতাকা দেন বিখ্যাত সাহাবী সাদ বিন উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর

হাতে। যুদ্ধক্ষেত্রে পতাকা বহন ছিল মর্যাদা ও সম্মানের বিষয়। এ সম্মান শুধু ব্যক্তির নয়; বরং পতাকাবাহীর পুরো গোত্রের সম্মান।

সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কার দিকে তাকালেন। তাকালেন মক্কার অধিবাসীদের দিকে। তিনি ভাবলেন, এরাই তো এতোদিন আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, নানাভাবে তাকে ও তার সহচরদেরেকে কষ্ট দিয়েছে। শান্তিপ্রিয় মানুষকে রাসূলের সংস্পর্শে আসতে বাধা দিয়েছে। এরাই সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে নির্মমভাবে হত্যা করেছে, বেলাল ও খাব্বাবের ওপর বর্বর নির্যাতন চালিয়েছে। আজ উপযুক্ত শাস্তি এদের পেতেই হবে।

সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু পতাকা নাড়িয়ে বজ্রকণ্ঠে বললেন,

'আজ লড়াইয়ের দিন, আজ হেরেমের সীমানায় রক্তপাতের দিন।'

সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এ হুমকি শুনে কোরাইশরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তারা ভাবল, আজ কারো নিস্তার নেই। মুসলমানরা সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। জনৈক মহিলা দ্রুত রাসূলের সঙ্গে দেখা করে সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হুমকিতে কোরাইশদের ভীত হয়ে পড়ার বিষয়টি জানাল। সে স্বরচিত কবিতার ছন্দে বিষয়টিকে এভাবে ব্যক্ত করলো-

হে হেদায়েতের নবী! এখন আপনি ছাড়া কোরাইশদের আর কোনো আশ্রয় নেই।

বিশাল পৃথিবী এখন তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে এসেছে।

তাদের কল্পিত প্রভু যখন তাদের সঙ্গে বৈরিতা প্রদর্শন করেছে

তখন আপনিই তাদের একমাত্র আশা-ভরসার পাত্র।

সা'দ তো হুজূন ও বাতহা এলাকার লোকদের হাড় ধুলায় মিশিয়ে দিতে চায়,

এই খাজরাজী সরদার যদি সুযোগ পায় তাহলে,

সে আমাদের ওপর তীর-বর্শা নিক্ষেপ করতে কোনো দ্বিধা করবে না।

এই কালো সিংহ ও রক্তপিপাসু বাঘ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

সে যদি পতাকা হাতে অধীনস্থদের নির্দেশ দেয় তাহলে কোরাইশ জনপদ ধুলায় মিশে যাবে।

সে বধির সাপের ন্যায়, নাঙ্গা তরবারি নিয়ে কোরাইশকে নিঃশেষ করে দিতে বদ্ধপরিকর।

মহিলার কবিতা শুনে রাসূলের হৃদয়ে দয়া ও সহানুভূতির ঢেউ খেলে গেল। মহিলাটি যেহেতু অনেক বড় আশা নিয়ে রাসূলকে বিষয়টি জানিয়েছিল, তাই রাসূল তাকে নিরাশ করতে চাইলেন না। আবার সাদের হাতে নেতৃত্বের পতাকা দেয়ার পর তা ফিরিয়ে নিলে তার মনে আঘাত লাগবে এ বিষয়টিও তিনি ভাবলেন। তাই তিনি এমন কৌশল অবলম্বন করলেন যেন সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতের পতাকা তার পুত্র কায়েস বিন সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বহন করতে বললেন। কায়েস পতাকা নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং তার পিতা সাদ তার পাশে হেঁটে হেঁটে অগ্রসর হতে লাগলেন। সাদের হাতে পতাকা না দেখে ওই মহিলা ও কোরাইশরা খুশি হলো। এদিকে সাদও মনক্ষুণ্ন হলেন না। কারণ, তিনি তো তখনো তার বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে বহাল আছেন। উপরন্তু পতাকাবাহনের কষ্টও তাকে করতে হচ্ছে না। পতাকা তার পক্ষে তার ছেলে বহন করে চলছে। এক ঢিলে কয়েক পাখি শিকারের এর চেয়ে সুন্দর দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে?

তাই আপনিও এমন আচরণ কৌশল রপ্ত করুন যেন কাউকে হারাতে না হয়। আপনার লক্ষ্যও অর্জন করুন, আবার সবার মনও জয় করে নিন। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে তাতে সমস্যা কী? সবাইকে আপন করে নিন।

সিদ্ধান্ত...

আমাদের আচরণ যেন হয় হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের,
বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নয়।



২৪. অন্যকে গুরুত্ব দিতে শিখুন

মানুষ সাধারণত অন্যের কাছে সম্মান ও মূল্যায়ন আশা করে। এ জন্য আপনি দেখবেন, বিভিন্ন আচরণ ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে থাকে। এমনকি মানুষ অন্যের মনোযোগ আকর্ষণের কিংবা নিজেকে সফল হিসেবে প্রচার করার জন্য অনেক সময় নিজের বীরত্ব ও সাহসিকতা সম্পর্কে কাল্পনিক কাহিনীও তৈরি করতে দ্বিধা করে না।

মনে করুন, একজন লোক তার চারজন সন্তান। তিনি সারাদিন বাইরে কাজ করে ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরলেন। ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন, সন্তানরা যার যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। এগারো বছর বয়সের বড় সন্তানটি টিভি দেখছে। দ্বিতীয়জন তার সামনে বসেই খাবার খাচ্ছে। তৃতীয় জন খেলনা নিয়ে একমনে খেলছে। আর চতুর্থজন খাতায় কি যেন লেখছে।

ঘরে প্রবেশ করে তিনি একটু জোরেই সালাম দিলেন। কিন্তু কারো মধ্যে কোনো ভাবান্তর হলো না। বড় ছেলে টিভি দেখায় ব্যস্ত হয়ে থাকল। দ্বিতীয়জন খেলনা নিয়ে খেলায় লিপ্ত হয়ে রইল। তৃতীয়জনও খাবার খেতে থাকল। কিন্তু চতুর্থজন বাবাকে দেখে খাতা-কলম রেখে উঠে দাঁড়াল, হাসি মুখে স্বাগত জানাতে এগিয়ে এলো এবং বাবার হাতে চুমু খেল। এরপর গিয়ে আবার লেখায় মনোযোগ দিল।

চারজনের মধ্যে পিতা কাকে বেশি ভালবাসবেন?

আমার বিশ্বাস-আমাদের উত্তর ভিন্ন হবে না। আমরা সবাই বলব, 'পিতা চতুর্থজনকেই বেশি ভালবাসবেন'। সে অন্যদের চেয়ে দেখতে সুন্দর কিংবা তার মেধা বেশি। এ কারণে তাকে বেশি ভালবাসবেন এটা কেউ বলবেন না; বরং এর কারণ হলো, সে তার পিতাকে বোঝাতে পেরেছে যে, তার পিতা তার কাছে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি'। আপনি অন্যকে যত বেশি গুরুত্ব দেবেন সেও আপনাকে তত বেশি সম্মান ও মূল্যায়ন করবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়ে খুবই সচেতন ছিলেন। আপন আচরণে প্রত্যেককে তিনি এ কথা বোঝাতেন যে, তার সমস্যা রাসূলের নিজেরই সমস্যা, তার দুঃখ রাসূলের নিজেরই দুঃখ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে বয়ান করছিলেন। জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে রাসূলের দিকে তাকিয়ে বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি দ্বীন সম্পর্কে জানতে চায় দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো তার জানা নেই।

রাসূল ﷺ তাকিয়ে দেখলেন, সে এক আরব বেদুঈন। রাসূল বয়ান শেষ করে তার সঙ্গে কথা বলবেন, হয়তো সে এতটুকু অপেক্ষা করতেও প্রস্তুত নয়। এমনও হতে পারে এর আগেই সে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবে এবং আর কোনো দিন ফিরে আসবে না।

রাসূল বুঝলেন, বিষয়টি তার মতে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, সে রাসূলের বয়ান স্থগিত রেখে দ্বীনের আহকাম জানতে চাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেকোনো বিষয়কে কেবল নিজের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে চিন্তা করতেন না। তিনি সেটা দেখতেন অন্যদের দৃষ্টিতেও।

তিনি মিম্বর থেকে নেমে এলেন। এরপর লোকটির সামনে বসে তাকে দ্বীনের বিভিন্ন বিধি-বিধান শিক্ষা দিতে লাগলেন। লোকটি সবকিছু বুঝে নিল। এরপর তিনি মিম্বরে ফিরে বয়ান শেষ করলেন।

কত মহান, কত ধৈর্যশীল ছিলেন তিনি! সাহাবায়ে কিরাম তো নববী শিক্ষাঙ্গণেই শিক্ষা লাভ করেছেন। তাই তারাও জানতেন অন্যদের প্রতি কেমন মনোযোগী হতে হয়। তাই তারা অন্যকে সম্মান করতেন, অভিবাদন জানাতেন, অন্যদের সুখে-দুঃখে শরিক হতেন। অন্যের সুখ দুঃখকে নিজের মতো করে দেখতেন। এ ক্ষেত্রে তারা ছিলেন একাত্মার মতো।

সাহাবায়ে কিরামের জীবনচরিত রোমন্থন করলে এর অসংখ্য নমুনা খুঁজে পাবেন। তারই একটি কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সে বিশেষ আচরণ।

কা'ব বিন মালেক তখন বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ দুর্বল হয়ে গেছে। অস্থি-মজ্জা সব শুকিয়ে গেছে। দৃষ্টিশক্তিও রহিত হয়ে গেছে। তিনি নিজের যৌবনের স্মৃতিচারণ করছিলেন। তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার পরিণামে রাসূল ﷺ তার সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলেন তা তিনি স্মরণ করছিলেন।

তাবুক যুদ্ধ ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের শেষ যুদ্ধ। তিনি এ যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে সবাইকে প্রস্তুত হতে বললেন। যুদ্ধের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য সবার কাছ থেকে অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করলেন। এ যুদ্ধে যাওয়ার জন্য তৈরি হলেন প্রায় ত্রিশ হাজার সাহাবী ।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপদাহের সাথে লু হাওয়া বয়ে চলছে। আর কিছুদিন পরেই পাকা ফল ও ফসল ঘরে উঠবে। গাছে গাছে ঝুলছে পাকা-আধাপাকা ফল। প্রচণ্ড গরমের মধ্য দিয়ে পাড়ি দিতে হবে দীর্ঘ পথ। শত্রুবাহিনীও অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ও শক্তিশালী। অবশ্য মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যাও কম ছিল না।

কা'ব বলেন, আমি তখন আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় বেশি স্বচ্ছল ছিলাম। জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য দু'টি উটও প্রস্তুত করে রেখেছিলাম। জিহাদে যাওয়ার জন্য আমি মানসিকভাবেও প্রস্তুত ছিলাম।

বাগানের শীতল ছায়া আর পাকা ফলের বাহারি থোকা দেখে দেখে আমার সময় খুব ভালই কেটে যাচ্ছিল। একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে নিয়ে জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। মনে মনে ভাবলাম, আগামীকাল বাজারে গিয়ে আরো কিছু প্রয়োজনীয় রসদ ক্রয় করে কাফেলার সঙ্গে মিলিত হব।

আমি পরদিন বাজারে গেলাম। কিন্তু কিছু সমস্যার কারণে সেদিন ফিরে আসতে হলো। মনে মনে ভাবলাম, আগামীকাল রওয়ানা হয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হব। কিন্তু সেদিনও কোনো কারণে জিহাদের আসবাবপত্র কেনা হলো না।

সেদিনও মনে মনে ভাবলাম, আগামীকাল রওয়ানা হব। এভাবে কয়েকদিন কেটে গেল। কিন্তু আমার আর যাওয়া হলো না। আমি বাজারে কিংবা মদিনার অলি-গলিতে গেলে কট্টর মুনাফিক অথবা যুদ্ধে যেতে অক্ষম ব্যক্তি ছাড়া আর কারো সাথে আমার দেখা হতো না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ত্রিশ হাজার সাহাবীকে নিয়ে তাবুক প্রান্তরে পৌঁছলেন। গন্তব্যে পৌঁছে তিনি অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকালেন। কিন্তু বাইয়াতে আকাবায় অংশগ্রহণকারী একনি'একজন সাহাবীকে তিনি খুঁজে পেলেন না।

তিনি বললেন, 'কা'ব বিন মালেকের কী হয়েছে'?

একজন বলে উঠল: 'হে আল্লাহর রাসূল! সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে সে জিহাদে শরিক হতে পারে নি।

এ কথা শুনে মুয়ায বিন জাবাল বললেন, 'তুমি একটা বাজে মন্তব্য করলে! আল্লাহর কসম হে আল্লাহর রাসূল! তার সম্পর্কে আমরা ভাল ধারণাই পোষণ করি।' রাসূল ﷺ কিছুই বললেন না।

কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অভিযান শেষে রাসূল মদিনার উপকণ্ঠে এসে তাবু গাড়লেন। এ খবর শুনে আমি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। রাসূলের কাছে কী জবাব দেব তা ভাবতে লাগলাম। কোনো অজুহাত পেশ করলে তিনি রাগ করবেন না। আমি পরিবারের বিচক্ষণ লোকদের সাথে পরামর্শ করলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদিনায় পৌঁছলেন, আমার মধ্যে এ বোধ জাগ্রত হলো যে, কোনো ধরনের লুকোচুরি নয়; বরং সত্যের মধ্যেই আমার মুক্তি রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় এসে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাত নামায পড়লেন। এরপর সাহাবীদের নিয়ে বসলেন। যুদ্ধে অনুপস্থিত মুনাফিকরা এসে বিভিন্ন ওজর-অজুহাত পেশ করে মিথ্যা কসম খেল। এদের সংখ্যা ছিল আশিরও বেশি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বাহ্যিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে তাদের অজুহাত গ্রহণ করে নিলেন। তাদের জন্য ইস্তেগফার করলেন। আর তাদের অন্তর্গত অবস্থা আল্লাহর কাছে সঁপে দিলেন।

কা'ব বিন মালেক এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম দিলেন। রাসূল তার দিকে তাকিয়ে ক্ষোভের সাথে একটু মুচকি হাসলেন। কা'ব রাসূলের সামনে এসে বসলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে কা'ব, তুমি কেন জিহাদে শরিক হলে না? তুমি কী বাহন কিন নি?

হ্যাঁ, কিনেছি।

তাহলে কেন জিহাদে শরিক হলে না?

Contents

উত্তরে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ, আপনি ছাড়া অন্য কারো সামনে হলে আমি অবশ্যই অজুহাত দেখিয়ে তাকে খুশি করে ফেলতে পারতাম। কেননা, আল্লাহ তায়ালা আমাকে বিতর্ক করার যোগ্যতা দিয়েছেন। তবে আমি নিশ্চিত, আজ মিথ্যা বলে আপনাকে খুশি করতে পারলেও আল্লাহ তায়ালা একসময় সত্য প্রকাশ করে আমার প্রতি আপনাকে অসন্তুষ্ট করে দেবেন। পক্ষান্তরে সত্য বললে আপনি আমার প্রতি এখন অসন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা করবেন বলে আশা রাখি। হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ, বাস্তবে আমার কোনো ওজর ছিল না। আর আমি ইতোপূর্বে কখনোও এত স্বচ্ছল ও সম্পদের অধিকারীও ছিলাম না। এ কথা বলে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু নীরব হয়ে গেলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সে সত্য বলেছে।' অতঃপর কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সম্বোধন করে বললেন, তুমি অপেক্ষা করতে থাক। দেখি, আল্লাহ তাআলা তোমার ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত দেন।' কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু ওঠে দাঁড়ালেন। পা দুটি আর টানতে পারছেন না। চিন্তিত ও ব্যথিত হৃদয় নিয়ে মসজিদ থেকে বের হলেন। তার সম্পর্কে আল্লাহ কী ফায়সালা করবেন তা তিনি অনুমান করতে চেষ্টা করলেন।

তার এ অবস্থা দেখে গোত্রের কয়েকজন লোক তাকে অনুসরণ করলো। তারা তাকে তিরস্কার করে বললো, আমাদের জানামতে এর আগে কখনও তুমি কোনো অন্যায় করনি। তুমি তো একজন কবি। তুমি চাইলে তো অন্যদের মতো রাসূলের কাছে অজুহাত পেশ করে পার পেয়ে যেতে পারতে। তিনি তো তোমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। আল্লাহও তোমাকে ক্ষমা করে দিতেন।

কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তাদের এরূপ ভর্ৎসনার কারণে একপর্যায়ে আমার মনে হলো যে, আল্লাহর রাসূলের কাছে গিয়ে নতুন করে ওজর পেশ করি।

কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, আমার মতো কি আর কেউ আছে? লোকেরা বললো, 'হ্যাঁ, দু'জন ব্যক্তি তোমার মতোই সত্য বলেছে। তাদেরকেও তোমার মতোই অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে।' কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, তারা দু'জন কে কে?

লোকেরা জানাল, মুরারা বিন রাবিয়া ও হেলাল বিন উমাইয়া।

কা'ব মনে মনে ভাবলেন, 'তারা উভয়েই নেককার, উভয়েই বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তারা আমার আদর্শ। আমি তাদের মতো সত্যের ওপর অটল থাকব। আমি এ বিষয়ে আর রাসূলের কাছে যাব না এবং মিথ্যাও বলব না।'

এরপর কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বেদনাক্লিষ্ট হৃদয়ে বাড়িতে ফিরে গেলেন। এর কিছুক্ষণ পরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু, মুরারা বিন রাবিয়া ও হেলাল বিন উমাইয়ার সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করে দিলেন।

কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সবাই আমাদেরকে এড়িয়ে চলত। আমি বাজারে যেতাম, কেউ আমার সাথে কথা বলত না। এরা যেন আমার পরিচিত কেউ নয়। কেউ যেন আমাকে চেনে না। মদিনার বাগানগুলোও যেন বদলে গেছে। এ যেন আমার চিরচেনা সে বাগান নয়। আমার পৃথিবীও আজ বদলে গেছে। আমি যেন এ পৃথিবীর অধিবাসী নই। অন্য কোনো গ্রহ থেকে এখানে এসেছি।

মুরারা বিন রাবিয়া ও হেলাল বিন উমাইয়া রাত-দিন ঘরে বসে বসে শুধু কাঁদত। তারা বাইরে বের হতো না। দুনিয়া বিরাগী পাদ্রী-সন্ন্যাসীর ন্যায় রাত-দিন শুধু ইবাদতে মগ্ন থাকত। তিনজনের মধ্যে আমি ছিলাম বয়সে নবীন ও অধিক শক্তিশালী। আমি বাইরে বের হতাম। মুসলমানদের সঙ্গে জামাতে নামায পড়তাম। হাটে-বাজারে ঘুরাফেরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে কথা বলত না।

আমি মসজিদে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সালাম দিতাম আর খেয়াল করে দেখতাম যে, তিনি আমার সালামের উত্তর কিভাবে দিচ্ছেন। তার ঠোঁট নড়ছে কি না? আমি রাসূলের পেছনে নামায পড়তাম এবং আঁড়চোখে তাঁর দিকে তাকাতাম। আমি নামাযে মনোযোগী হলে তিনি আমার দিকে তাকাতেন। আর আমি তাঁর দিকে তাকালে তিনি চেহারা ফিরিয়ে নিতেন।

এ অবস্থায় কয়েকদিন কেটে গেল। দিনদিন তার মনোকষ্ট বাড়তে লাগল। প্রতীক্ষার এক একটি প্রহর তার কাছে এক এক বছরের মতো মনে হলো। তিনি ছিলেন নিজ বংশের একজন সম্মানিত ব্যক্তি। বংশের সবচেয়ে বাগ্মী কবি। বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাগণ তাকে চেনেন এবং তারা তার

কবিতারও ভক্ত ও গুণগ্রাহী। বিভিন্ন গোত্রের বড় বড় ব্যক্তিরা তার সাথে সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় থাকত।

কা'ব মদিনায় নিজ গোত্রেই অবস্থান করছেন। কিন্তু কেউ তার সাথে কথাও বলে না কিংবা তার দিকে ফিরেও তাকায় না। একাকীত্বের এ জীবন যখন তার জন্য অসহ্যকর হয়ে উঠল, এবং মানসিক যন্ত্রণা সীমা ছাড়িয়ে গেল ঠিক তখনই তার ওপর নেমে আসল আরেকটি কঠিন পরীক্ষা। তিনি বাজারে ঘুরাফেরা করে মনটাকে একটু সতেজ করার চেষ্টা করছিলেন। শাম দেশের জনৈক খৃষ্টান ব্যক্তি এসে লোকদেরকে বললো, 'আমাকে কা'ব বিন মালেককে একটু দেখিয়ে দেবেন?'

লোকেরা ইঙ্গিতে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখিয়ে দিল। লোকটি কা'বের কাছে এসে তাকে গাসসানের রাজার পক্ষ থেকে প্রেরিত একটি চিঠি দিল। কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু মনে মনে বললেন, আশ্চর্য! গাসসানের রাজা! আমার বিষয়টি তাহলে শামদেশেও পৌঁছে গেছে! গাসসানের রাজার পক্ষ থেকে আমার কাছে চিঠি! সে আমার কাছে কী চায়?

কা'ব চিঠিটি খুললেন। তাতে লেখা আছে, হে কা'ব বিন মালেক! আমি জানতে পেরেছি যে, তোমার সঙ্গী তোমার সঙ্গে নির্দয় ও অমানবিক আচরণ করছে এবং তোমাকে একঘরে করে রেখেছে। তুমি চাইলে আমাদের এখানে চলে আসতে পার। আমরা তোমার সহমর্মী হব।'

চিঠি পড়া শেষে করে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন, ইন্না লিল্লাহ! কাফেররাও আমার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছে! এটাতো ভাল লক্ষণ নয়। এটা বড় কঠিন পরীক্ষা। এরপর তিনি চিঠি নিয়ে তৎক্ষণাৎ উনুনে নিক্ষেপ করলেন।

কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু কাফের রাজার প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হন নি। রাজপ্রাসাদ ও রাজ দরবারের দরজা তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। পার্থিব সম্মান ও রাজ-সান্নিধ্য লাভের সুযোগ তার দোরগোড়ায় এসে তাকে আহ্বান করছিল। এদিকে মদিনা ও মদিনার জীবন তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। পরিচিত মুখগুলো সব অপরিচিত হয়ে পড়েছিল। কেউ সালামের উত্তর দেয় না। হাসিমুখে কেউ কথা বলে না। এমনকি কেউ কোনো প্রশ্নের জবাবও দেয় না। এ অবস্থায় রাজ দরবারের ডাক। কত কঠিন পরীক্ষা!

হ্যাঁ, বিরাট কঠিন পরীক্ষা। শয়তানের বিশাল বড় ফাঁদ। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে রক্ষা করেছেন। তিনি কাফেরদের ফাঁদে পা দেন নি। শয়তানের প্রবঞ্চনার শিকার হন নি। রাজকীয় বার্তাটিকে তিনি জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে শয়তানের সব চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়েছেন।

দিনের পর রাত এসেছে । আবার রাতের পর দিন। এভাবে কেটে গেছে তিরিশটি দিন, পূর্ণ একটি মাস। কাব সে আগের অবস্থাতেই আছেন। কষ্টের পাল্লা দিনদিন ভারী হচ্ছে। প্রতীক্ষার প্রহরগুলো তার মাথার ওপর যেন জগদ্দল পাথরের ন্যায় চেপে বসছে। রাসূল ﷺ নিজে কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না। সিদ্ধান্তমূলক ওহীও ওপর থেকে অবতীর্ণ হচ্ছে না।

এভাবে কেটে গেল ব্যথা ও বেদনাঘেরা চল্লিশটি দিন। সুখের বার্তা নিয়ে পূর্ব দিগন্তে ফুটে ওঠল নতুন সূর্য। রাসূলের পক্ষ থেকে একজন বার্তাবাহক এসে কা'বের দরজায় করাঘাত করলো। বুকভরা আশা নিয়ে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বেরিয়ে এলেন, হয়তো ক্ষমা ও মুক্তির বার্তা এসে গেছে। কিন্তু না। যা ভেবেছিলেন তা নয়। বার্তাবাহক জানালেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে স্ত্রী থেকেও আলাদা থাকতে বলেছেন!

কা'ব জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তাকে তালাক দিয়ে দেব? বার্তাবাহক বললেন, 'না, আপনি কেবল তার কাছ থেকে আলাদা থাকবেন। তার সাথে স্ত্রীসুলভ কোনো আচরণ করবেন না।'

কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু তার স্ত্রীকে বললেন, তুমি তোমার পরিবারের কাছে চলে যাও। আমার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত আসার আগ পর্যন্ত ওখানেই থাকবে।

রাসূল ﷺ মুরারা বিন রাবিয়া ও হেলাল বিন উমাইয়ার কাছেও একই আদেশ পাঠালেন। হেলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রী এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! হেলাল বিন উমাইয়া অতিশয় বৃদ্ধ ও দুর্বল। আমি কি তার খেদমত করতে পারব? রাসূল ﷺ অনুমতি দিয়ে বললেন, তবে সাবধান! সে যেন তোমার সঙ্গে স্ত্রীসুলভ আচরণ না করে।

হেলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রী বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম তার মধ্যে তো যৌন কামনাই নেই। শুরু থেকে নিয়ে সে রাত-দিন শুধু কান্নাকাটি করছে।

এভাবে দিন কাটানো কা'বের জন্য দুর্বিষহ হয়ে ওঠল। দিন দিন তার মানসিক কষ্ট বেড়েই চলল। শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিচ্ছিল আর বারবার তিনি ঈমান নবায়ন করছিলেন। তিনি মুসলমানদের সাথে কথা বলতে চান, কিন্তু তারা কেউ তার সাথে কথা বলে না। তিনি রাসূলকে সালাম করেন, কিন্তু সালামের উত্তর শুনেন না। তিনি কার কাছে যাবেন? কার কাছে পরামর্শ চাইবেন? এখন তার করণীয় কী?

কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কষ্ট ও যন্ত্রণা যখন চরম আকার ধারণ করলো তখন একদিন আমি আবূ কাতাদার কাছে গেলাম। সে আমার চাচাতো ভাই এবং আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। সে তার বাগানে কাজ করছিল। বাগানের প্রাচীর ডিঙিয়ে আমি তার সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু সে আমার সালামের উত্তর দিল না।

আমি তাকে বললাম, আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি হে আবূ কাতাদা! আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি, এটা কি তুমি জান না? সে কোনো জবাব দিল না। আমি আবার একই প্রশ্ন করলাম। সে আগের মতোই চুপ রইল। আমি আবারও বললাম, আল্লাহর কসম হে আবূ কাতাদা! তুমি কী জান না যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি? উত্তরে সে বললো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন।

চাচাত ভাই ও সবচেয়ে প্রিয়জনের কাছ থেকে এমন উত্তর শুনে তার হৃদয়টা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন। নিজেকে নিয়ে তার সংশয় দেখা দিল। কা'বের চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

ধীর কদমে তিনি বাড়িতে ফিরে এলেন। তার অস্থির দৃষ্টি কখনও এ দেয়ালে কখনও ঐ দেয়ালে ঘুরে ফিরছিল। জীবনসঙ্গী স্ত্রী তার পাশে নেই। সান্ত্বনা দেয়ার মতো কোনো আত্মীয় কাছে নেই। লোকজনকে তাদের সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করার পর পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে।

আজ তাদের জনবিচ্ছিন্নতার পঞ্চাশতম রাত। রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উম্মে সালামার ঘরে অবস্থান করছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর ওহী অবতীর্ণ হলো। তাদের তওবা কবুল হয়েছে। তিনি এ সংক্রান্ত আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করলেন। উম্মে

সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কা'ব বিন মালেককে কি এ সংবাদ এখনি জানিয়ে দেব?

জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তো মানুষ তোমার কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। সারারাত তুমি আর ঘুমাতে পারবে না।

ফজরের নামাযের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে তাদের তওবা কবুল হওয়ার কথা শোনালেন। সাহাবীগণ তাদেরকে সুসংবাদ শোনাতে বের হয়ে গেলেন।

কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সেদিন আমি ঘরের ছাদে ফজরের নামায আদায় করে বসে ছিলাম। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে যেমন বলেছেন, আমাদের অবস্থা তেমনি ছিল। 'বিশাল পৃথিবী আমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল'। আমার কাছে সবচেয়ে দুশ্চিন্তার বিষয় ছিল যে, 'এ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু ঘটে, তাহলে তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জানাযাও পড়বেন না কিংবা এ অবস্থায় যদি রাসূল ইন্তেকাল করেন তাহলে তো আমি এ অবস্থাতেই থেকে যাব। কেউ আমার সাথে কথা বলবে না। কেউ আমার জানাযাও পড়বে না'।

এমন সময় সালা' পাহাড়ের ওপর থেকে জনৈক ব্যক্তির চিৎকার শুনতে পেলাম, 'হে কা'ব বিন মালেক! তোমার জন্য সুসংবাদ!

আমি সেজদায় লুটিয়ে পড়লাম। বুঝতে পারলাম, আল্লাহর পক্ষ থেকে সমাধান এসে গেছে। একজন ঘোড়ায় চড়ে আমার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেছেন। আর একজন পাহাড়ের ওপর হতে চিৎকার করে আমাকে সংবাদ জানিয়েছেন। তবে চিৎকারের আওয়াজ ছিল ঘোড়ার চেয়ে দ্রুতগামী।

সুসংবাদদাতা আমার কাছে এলে খুশিতে আমি আমার পরিধেয় বস্ত্র তাকে দিয়ে দিলাম। আল্লাহর কসম, এ দু'টি কাপড় ছাড়া আমার কাছে তখন অন্য কোনো কাপড় ছিল না। এরপর অন্য একজনের কাছ থেকে দু'টি কাপড় ধার নিয়ে পরিধান করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হলাম। লোকেরা দলে দলে আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এলো। তওবা কবুলের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে তারা আমাকে বলছিল, 'আল্লাহ তায়ালা তোমার তওবা কবুল করেছে, তোমাকে অভিনন্দন'।

আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কিরামের মাঝে বসে আছেন। আমাকে দেখে সে মজলিস থেকে তালহা বিন উবাইদুল্লাহ দাঁড়ালেন। তিনি আমার সঙ্গে কোলাকুলি করলেন এবং আমাকে অভিনন্দন জানালেন। আল্লাহর কসম, তালহার এ আচরণের কথা আমি কখনও ভুলব না।

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছে তাকে সালাম দিলাম। খুশিতে তাঁর চেহারা চমকাচ্ছিল। আনন্দিত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা চাঁদের মতো জ্বলজ্বল করত। আমাকে দেখে তিনি বলে উঠলেন, 'তোমার জন্য সুসংবাদ। জন্মের পর থেকে আজকের দিনটি তোমার জীবনের সবচেয়ে খুশির দিন।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার পক্ষ থেকে না-কি আল্লাহর পক্ষ থেকে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে। এরপর তিনি আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করলেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে বসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার তওবার পূর্ণতার স্বার্থে আমি আমার সকল সম্পদ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সদকা করে দিতে চাই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নিজের জন্য কিছু সম্পদ রেখে দাও। এটা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে।

উত্তরে আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমাকে সততার কারণে মুক্তি দিয়েছেন। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, জীবনে কখনও মিথ্যা বলব না, তাহলে আমার তওবা পূর্ণ হবে।'

আল্লাহ তায়ালা বাস্তবেই কা'ব বিন মালেক ও তার সঙ্গীদ্বয়ের তওবা কবুল করেছেন। এ সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে-

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ. وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

অর্থ : আল্লাহ নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি রহম করেছেন। যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে ছিল, যখন তাদের দলের কিছু লোকের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি তাদের তওবা কবুল করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়। অপর এ তিনজন যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল, পৃথিবীর ব্যাপ্তি বিশাল হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তা সংকুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। তারাও বুঝতে পারল যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি সদয় হলেন, যাতে তারা তওবা করে আল্লাহর কাছে ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তওবা কবুলকারী, করুণাময়। (সূরা তওবা: ১১৭-১১৮)

এ ঘটনার যে অংশটি এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় তা হলো, তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং কোলাকুলি করেছেন। এর ফলে তার প্রতি কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আন্তরিকতা ও ভালবাসা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই তো তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যুর কয়েক বছর পরও এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে কা'ব বলেন, আল্লাহর কসম, আমি তালহার কথা ভুলব না। তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু কিসের মাধ্যমে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হৃদয়-মন জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন? তিনি চমৎকার আচরণকৌশল প্রয়োগ করেছেন। তিনি তাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেছেন, তাকে মূল্যায়ন করেছেন, তার আনন্দে অংশীদার হয়েছেন। ফলে তিনি কা'বের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন।

মানুষকে গুরুত্ব দিয়ে এবং তাদের আবেগের সাথে একাত্ম হয়ে মানুষের অন্তর জয় করা যায়। পরীক্ষার ব্যস্ত দিনগুলোতে আপনার মোবাইল ফোনে যদি একটি বার্তা আসে আর তাতে লিখিত থাকে-

তোমার পরীক্ষাগুলো কেমন হচ্ছে ?

তোমার পরীক্ষা নিয়ে আমিও টেনশনে আছি।

দোয়া করছি পরীক্ষায় যাতে ভাল রেজাল্ট করতে পার।

—ইতি তোমার বন্ধু ইবরাহিম

যে বন্ধু আপনার পরীক্ষার খোঁজ-খবর নেয়। আপনার সাফল্য কামনা করে সেই বন্ধুর প্রতি আপনার ভালবাসা ও আন্তরিকতা বাড়বে কি-না? অবশ্যই বাড়বে।

মনে করুন, আপনার পিতা অসুস্থ। আপনি তাকে নিয়ে হাসপাতালে আছেন। এমতাবস্থায় জনৈক বন্ধু আপনার সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করে আপনার পিতার খোঁজ-খবর নিল এবং আপনার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি না জানতে চাইল। আপনি বললেন, এখন সাহায্যের প্রয়োজন নেই। আপনাকে ধন্যবাদ। সন্ধ্যায় সে আবার ফোন করে বললো, 'আপনি তো এখন হাসপাতালে আপনার আব্বুকে নিয়ে ব্যস্ত আছেন। বাসার লোকদের বাজার সদাই বা অন্য কোনো কিছুর দরকার থাকলে বলুন, তাদেরকে তা কিনে দিয়ে আসি।' আপনি তাকে আবারও ধন্যবাদ জানালেন এবং তার জন্য দোয়া করে বিদায় জানালেন। দেখুন, সে আপনার কোনো সাহায্য না করতে পারলেও তার প্রতি আপনার মনের টান ও আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়ে যাবে। আপনি একটু চিন্তা করলেই তা অনুভব করতে পারবেন।

একই সময়ে অন্য একজন বন্ধু আপনাকে ফোন করে বললো, বন্ধু! আমরা সমুদ্র সৈকতে ঘুরতে যাচ্ছি। তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাবে? আপনি তাকে জানালেন, 'আমার বাবা অসুস্থ, তাই আমার জন্য যাওয়া সম্ভব নয়।' একথা শুনে সে আপনার পিতার জন্য দোয়া তো করলই না, এবং তার অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয় নি বলে কোনো ওজুহাতও পেশ করলো না। বরং আপনাকে বললো, দোস্ত! বাবা অসুস্থ হয়েছেন, তো কী হয়েছে? তিনি তো হাসপাতালে আছেন, সেবার জন্য অনেক নার্স আছে। চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আছেন। তোমার সেখানে থাকার তো বিশেষ কোনো ফায়দা নেই। আমাদের সাথে চল । আমরা দলবেধে আনন্দ করব, সমুদ্রে সাঁতার কাটব। সে হাসতে হাসতে এমনভাবে এসব কথা বলছিল যেন আপনার পিতার অসুস্থতা একটা মামুলি ব্যাপার। এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন নেই।

একটু চিন্তা করে দেখুন, এমন বন্ধুর প্রতি আপনার মনোভাব কেমন হবে?

Contents

নিশ্চয় তার প্রতি আপনার ভালবাসা ও আন্তরিকতা কমে যাবে। কেননা, সে আপনার দুঃখে দুঃখী হয় নি। তার কাছে আপনার আবেগ অনুভূতির কোনো মূল্যই নেই।

আমার জীবনেও এমন একটি বিব্রতকর ঘটনা ঘটেছিল। তখন আমি কয়েকদিনের সফরে জেদ্দায় ছিলাম। সেখানে আমি খুবই ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছিলাম। এরই মধ্যে একদিন আমার মোবাইলে আমার ভাই সাউদ একটি বার্তা পাঠাল। তাতে সে লিখেছে,

'আল্লাহ তোমাকে উত্তম সবরের শক্তি দিন।

আমাদের চাচাতো ভাই অমুক জার্মানীতে মৃত্যুবরণ করেছে ।

আমি সে ভাইয়ের সঙ্গে মোবাইলে কথা বলে জানতে পারলাম, 'আমাদের এক চাচাতো ভাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার জন্য দু'দিন আগে জার্মানী গিয়েছিলেন। অপারেশন চলাকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। অবশ্য তার অনেক বয়স হয়েছিল। তার মরদেহ দু'দিন পরেই রিয়াদ বিমানবন্দরে পৌঁছবে। আমি মরহুমের জন্য দোয়া ও এস্তেগফার করে কথা শেষ করলাম।

এর দু'দিন পর আমার জেদ্দার কাজকর্ম শেষ হয়ে গেল। তাই আমি বিমানবন্দরে গিয়ে রিয়াদের ফ্লাইটের অপেক্ষা করছিলাম। এর মধ্যেই কয়েকজন যুবক আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলো। তারা আমাকে চিনতে পেরে এগিয়ে এসে সালাম-মোসাফাহা করলো। তারা কৈশোর পার করে মাত্র যৌবনে পা দিয়েছে। তাদের মাথার চুল ছিল বিদেশি স্টাইলে কাটা। তা সত্ত্বেও আমি তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা এবং স্নেহভরে মজা করছিলাম।

এরমধ্যে আমার মোবাইল ফোন বেজে উঠল। আমি মোবাইলে কথা বলত লাগলাম। কথা শেষ করে দেখতে পেলাম শার্ট-প্যান্ট পরা এক যুবক আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সে এগিয়ে এসে আমাকে সালাম দিল ও মোসাফাহা করলো।

আমি তাকে স্বাগত জানালাম এবং দুষ্টুমি করে বললাম- ফ্যাশনটা তো একদম নতুন! তোমাকে তো বিয়ের বরের মত মনে হচ্ছে। এ জাতীয়

আরও কিছু কথা তাকে বললাম.। যুবকটি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, আপনি সম্ভবত আমাকে চিনতে পারেন নি। আমি অমুক, বাবার লাশ নিয়ে এ মাত্র জার্মানী থেকে এসেছি। পরবর্তী ফ্লাইটে রিয়াদে যাব।

তার কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। সে যেন আমার শরীরে এক গ্যালন ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিল। আমি একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। তার পিতা মারা গেছে, পিতার মরদেহও তার সাথে । আর আমি তার সাথে মজা করছি!

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে তাকে বললাম, 'আমি খুবই দুঃখিত, আমি তোমাকে চিনতে পারি নি। আল্লাহ তোমাকে উত্তম ধৈর্যধারণের শক্তি দান করুন এবং তোমার পিতাকে ক্ষমা করে দিন।'

বস্তুত তাকে চিনতে না পারার ক্ষেত্রে আমার যুক্তিসঙ্গত ওজর রয়েছে। কারণ, আগে তার সঙ্গে আমার তেমন সাক্ষাত হয় নি। তাছাড়া যখন আমি তাকে দেখেছিলাম তখন সে আরবীয় ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও মাথায় রুমাল পরিহিত ছিল। কিন্তু সে শার্ট-প্যান্ট পরে যখন জেদ্দার যুবকদের ভীড়ে আমার সামনে হঠাৎ উপস্থিত হয়েছে তখন আমি তাকে চিনতে পারি নি।

অপরকে যথাযথ মূল্যায়ন করতে হলে তার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা প্রভৃতি অনুভূতিতে আপনাকে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং এ কথা বোঝাতে হবে যে, তার ব্যথায় আপনি ব্যথিত, তার সমস্যা আপনারও সমস্যা। আপনি সব সময় তার কল্যাণ কামনা করেন। এ কারণেই আপনি দেখবেন, উন্নত ও বড় বড় কোম্পানীগুলোতে ক্রেতা ও সেবা গ্রহিতাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষার জন্য 'পাবলিক রিলেশন ডিপার্টমেন্ট' নামে স্বতন্ত্র বিভাগ থাকে। এ বিভাগের দায়িত্ব হলো বিভিন্ন উপলক্ষে ভোক্তাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বার্তা ও উপহার পাঠানো এবং এ জাতীয় বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করা ।

মানুষকে যদি বোঝাতে পারেন যে, তারা আপনার কাছে সম্মানের পাত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আপনি তাদের মন জয় করে ফেলতে পারবেন এবং তারা আপনাকে ভালবাসতে শুরু করবে।

আমাদের বাস্তব জীবন থেকে এর কয়েকটি উদাহরণ নিন:

মনে করুন, আপনি একটি মজলিসে বসে আছেন। মজলিসটি এমন লোকে লোকারণ্য যে নতুন কারো বসার জায়গা নেই। এমন অবস্থায় একজন লোক এসে বসার জায়গা খোঁজ করছে। আপনি একটু সংকুচিত হয়ে বসে তাকে ডেকে এনে তার জন্য বসার মতো একটু জায়গা করে দিলেন । আপনার এ ব্যবহারের কারণে সে আপনাকে ভালবাসতে শুরু করবে।

মনে করুন, আপনি কোনো নৈশভোজে উপস্থিত হয়েছেন। কোনো একজন ব্যক্তি খাবার নিয়ে এদিক-সেদিক তাকিয়ে খালি টেবিল খুঁজতে খুঁজতে সামনে এগিয়ে আসছে। আপনি তার জন্য একটি চেয়ার রেডি করে বললেন, ভাই! এখানে বসুন। সে অবশ্যই আপনার এ আচরণে মুগ্ধ না হয়ে পারবে না। এভাবে মানুষকে মূল্যায়ন করতে সচেষ্ট হোন দেখবেন আপনি তাদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। একবার জুমার দিন রাসূল মিম্বরে খুতবা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ এক বেদুঈন মসজিদে প্রবেশ করে কাতার ডিঙ্গিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। এরপর রাসূল ﷺ-এর দিকে তাকিয়ে সজোরে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এক লোক দ্বীন সম্পর্কে জানে না। আপনি তাকে দ্বীন শিক্ষা দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা বন্ধ করে মিম্বর থেকে নেমে এলেন। একটি চেয়ার আনিয়ে তাতে বসলেন। লোকটির সঙ্গে কথা বললেন এবং তাকে দ্বীন শিক্ষা দিলেন। লোকটি যখন সবকিছু বুঝে নিল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে ফিরে গেলেন।

একজন বেদুঈনকে তিনি কেমন গুরুত্ব দিলেন!। রাসূল যদি তাকে অবহেলা করতেন, হয়ত লোকটি চলে যেত এবং আজীবন দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকত। দ্বীন সম্পর্কে জানার সুযোগ হয়ত তার আর হতো না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনচরিত পড়ে দেখুন। আপনি দেখতে পাবেন, কোনো ব্যক্তি রাসূলের সঙ্গে মোসাফাহা করলে তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের হাত গুটিয়ে নিতেন না, যতক্ষণ না অপর ব্যক্তি প্রথমে নিজ হাত গুটিয়ে নিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কারো সঙ্গে কথা বলার সময় তার দিকে পুরো

চেহারা ও শরীর ফিরিয়ে সরাসরি তাকাতেন। তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। তার কথা শেষ না হতে তিনি কথা বলতেন না; বরং মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনতেন।

অভিজ্ঞতা......

অন্যদের মধ্যে যদি আপনি এ অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারেন যে,
তারা আপনার কাছে সম্মানের পাত্র,
আপনার কাছে তাদের গুরুত্ব রয়েছে তাহলে
তাদের হৃদয় আপনার হাতের মুঠোয় চলে আসবে,
তারা আপনাকে ভালবাসতে শুরু করবে।



২৫. আপনার ব্যাপারে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করুন

আপনি অন্যদেরকে একথা বোঝাতে চেষ্টা করুন যে, আপনি তাদের কল্যাণ কামনা করেন এবং বাস্তবেও তেমন করুন। আপনার অন্তরে যদি অন্যদের প্রতি ভালবাসা ও কল্যাণ কামনা থাকে, আপনি যদি অন্যদের সঙ্গে আচার-ব্যবহারে আন্তরিক হন এবং তাদেরকে আপনার আন্তরিকতার বিষয়টি বোঝাতে সক্ষম হন তাহলে তারাও আপনাকে ভালবাসবে।

জনৈক মহিলা ডাক্তারের প্রাইভেট চেম্বারে সবসময় রোগীদের ভীড় উপচে পড়ত। রোগীরা সবসময় তার কাছেই আসতে চাইত। প্রতিটি রোগী নিজেকে এ ডাক্তারের ঘনি'বলে মনে করত। বস্তুতঃ এ মহিলা ডাক্তার উপযুক্ত আচরণ কৌশল প্রয়োগ করে রোগীদের মন জয় করে ফেলত। তার একটি কৌশল দেখুন। তার একজন মহিলা সহকারী ছিল। তার দায়িত্ব ছিল কোনো রোগী ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে বা রোগের ব্যাপারে পরামর্শের জন্য আসলে সে রোগীকে স্বাগত জানিয়ে তার নাম জেনে নেবে এবং তাকে পাঁচ মিনিট পর সাক্ষাতের সময় দেবে। এর মধ্যে সে এ রোগীর ফাইলটি ডাক্তারকে সরবরাহ করবে। ডাক্তার ফাইল দেখে রোগীর নাম, পেশা, সন্তানদের নাম ইত্যাদি সব তথ্য জেনে নিবে।

পাঁচ মিনিট পর রোগী যখন তার কাছে আসত তখন সে রোগীকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তার রোগের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করত। পাশাপাশি তার সন্তান-সন্ততি ও কর্মক্ষেত্র সম্পর্কেও খোঁজ-খবর নিত। ফলে রোগী মনে করত, এই ডাক্তার তাকে খুব ভালবাসেন । তাই তার সন্তানদের নাম মনে রেখেছেন, তার রোগের বিষয়টিও তার স্মরণে আছে। এমনকি তিনি তার কর্মস্থলের কথাও জিজ্ঞেস করতে ভোলেন নি। ফলে রোগিরা সবসময় তার কাছে আসতেই আগ্রহী থাকে। দেখলেন তো কত সহজে তিনি মানুষের মন জয় করে নিয়েছেন।

অন্যদের প্রতি আপনার আন্তরিকতা ও ভালবাসার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করুন। পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান, সহপাঠী-সহকর্মী, প্রতিবেশী সবাইকে যে আপনি ভালবাসেন তা তাদেরকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিন। আপনি যাকে ভালবাসেন তাকে স্পষ্ট ভাষায় বলুন, 'আমি আপনাকে ভালবাসি।' আমার অন্তরে আপনার প্রতি ভালবাসা ও সম্মানবোধ রয়েছে।

Contents

এমনকি সে যদি পাপাচারীও হয় তবুও তাকে বলুন, আপনি আমার কাছে অ-নে-কের চেয়ে প্রিয়। এ কথা বলার কারণে আপনি মিথ্যাবাদী হবেন না। কেননা, লোকটি আপনার কাছে অবশ্যই লক্ষ লক্ষ ইহুদির চেয়ে প্রিয়! বিষয়টি কি এমন নয়? এ ক্ষেত্রে আপনার মেধাকে কাজে লাগান।

আমার এখনও মনে পড়ে, একবার ওমরা করতে গিয়ে তাওয়াফ ও সায়ী করার সময় আমি মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের জন্য নিরাপত্তা, সাহায্য ও সক্ষমতার দোয়া করলাম। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে, আমার বন্ধু-বান্ধব ও সকল প্রিয়জনকে মাফ করে দিন। কখনো কখনো এভাবেও দোয়া করেছি।

ওমরা শেষ করে আমি প্রথমে সহজে ওমরা আদায় করতে পারায় আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করলাম। এরপর রাত যাপনের জন্য হোটেলে উঠলাম। বিছানায় শুয়ে শুয়ে মোবাইলে একটি ক্ষুদেবার্তা লেখলাম।

'আমি এইমাত্র ওমরা শেষ করেছি। দোয়ায় আমার প্রিয়জনদের কথা স্মরণ করেছি। আপনিও তাদের একজন । তাই আপনার জন্যও দোয়া করতে ভুলি নি। আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করুন, আপনাকেও ওমরা আদায়ে তওফিক দান করুন।'

ক্ষুদেবার্তাটি আমি মোবাইলের ফোনবুকে সংরক্ষিত সকল নম্বরে পাঠিয়ে দিলাম। আমার মোবাইলে প্রায় পাঁচশত ব্যক্তির নাম ও মোবাইল নম্বর সংরক্ষিত ছিল। ক্ষুদেবার্তাটি তাদের মধ্যে এমন প্রভাব ফেলেছে যা আমি কল্পনাও করি নি।

তাদের একজন আমাকে লিখে পাঠিয়েছে, আমি আপনার ক্ষুদেবার্তাটি বারবার পড়েছি ও কেঁদেছি। দোয়ায় আমাকে স্মরণ করেছেন জেনে আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ ।

আরেকজন লিখেছে, কী বলে আপনার জবাব দেব, জানি না। আল্লাহ আপনাকে সর্বোত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

তৃতীয় একজন লিখেছে, আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন আপনার এ দোয়া কবুল করে নেন। আমি কখনও আপনাকে ভুলব না ।

এভাবে আমরা মাঝে মাঝে অন্যদেরকে আমাদের ভালবাসার কথা মনে করিয়ে দিতে পারি। এ জাতীয় সংক্ষিপ্ত বার্তার মাধ্যমে জানিয়ে দিতে পারি যে, জীবনের কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও আমরা তাদেরকে ভুলে যাই নি। তাদের প্রতি রয়েছে আমাদের মনের সুগভীর টান।

বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আপনি লিখতে পারেন, আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে, জুমার দিনের দোয়া কবুলের বিশেষ মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্য দোয়া করি। আপনার নিয়ত যদি ভাল হয় তাহলে এটা রিয়া বা লৌকিকতা হবে না। এটা তো মুসলমানদের পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধির মাধ্যম হতে পারে।

আমার এখনও মনে পড়ে, একবার আমি তায়েফ শহরে গ্রীষ্মকালীন এক দাওয়াতি ক্যাম্পেইনে আলোচনা করছিলাম। শিফা পাহাড়ের পাদদেশে এক পার্কে অনুষ্ঠিত সে অনুষ্ঠানে অনেক যুবক উপস্থিত হয়েছিল। একদল যুবক পার্কের অন্য অংশে আনন্দ-ফুর্তিতে ব্যস্ত থাকলেও উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে সততা ও ভালর লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। অনুষ্ঠান শেষ হলে একদল যুবক এগিয়ে এসে সালাম করলো। তাদের একজন যুবকের চুল ছিল বিদেশি স্টাইলে কাটা এবং তার পরনে ছিল টাইট জিন্সের প্যান্ট। সে আমার সঙ্গে মোসাফাহা করলো, আমাকে ধন্যবাদ জানাল। আমিও খুব আন্তরিকতার সঙ্গে তার সালামের উত্তর দিলাম। এখানে উপস্থিত হওয়ার কারণে তাকে ধন্যবাদ জানালাম এবং তার হাত ধরে নাড়া দিয়ে বললাম, তোমার চেহারা তো চমৎকার, একদম দাঈর চেহারার ন্যায়। সে হেসে চলে গেল। দু'সপ্তাহ পরে হঠাৎ ফোন করে সে বললো, শায়খ! আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি সে যুবক, যাকে আপনি বলেছিলেন, তোমার চেহারা দাঈর চেহারার ন্যায়। আমি অবশ্যই দাঈ হব, ইনশাআল্লাহ। এরপর সে তার অনুভূতি আমার কাছে ব্যক্ত করলো।

দেখলেন তো, আন্তরিকতা ও হৃদয় নিংড়ানো কথার মাধ্যমে মানুষ কীভাবে প্রভাবিত হয়!

রাসূল ﷺ চারিত্রিক মাধুর্য ও অকৃত্রিম ভালবাসা প্রকাশ করে মানুষের হৃদয় জয় করে নিতেন। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দু'জনেই মহান সাহাবী। তারা সবসময় নেক কাজে প্রতিযোগিতা করতেন। কিন্তু আবূ

বকর সাধারণত জয়ী হতেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য শেষরাতে উঠে দেখতেন, আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার আগেই উঠেছেন। কোনো ক্ষুধার্তকে খাবার দিতে গিয়ে তিনি দেখতেন, আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এখানেও তার চেয়ে অগ্রসর। যদি কোনো রাতে অতিরিক্ত নফল নামায পড়তেন, তাহলে দেখতেন আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানেও তার ধরাছোঁয়ার বাইরে।

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের বিশেষ প্রয়োজন পূরণ করার জন্য সবাইকে দান করতে বললেন। ঘটনাক্রমে সে সময় ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পর্যাপ্ত পরিমাণে সম্পদ ছিল। তিনি মনে মনে ভাবলেন, কোনোদিন যদি আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চেয়ে এগিয়ে যেতে পারি, তাহলে আজই সেই দিন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার অর্ধেক সম্পদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরাবর সমর্পণ করলেন। এতো সম্পদ পেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরকে সর্বপ্রথম কী জিজ্ঞেস করেছিলেন? তিনি কি সম্পদের পরিমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন? সম্পদের প্রকৃতি তথা স্বর্ণ না রূপা তা জিজ্ঞেস করেছিলেন?

না, তিনি এসব কিছুই জিজ্ঞেস করেন নি। তিনি ওমরকে এমন কিছু কথা বলেছিলেন, যা শুনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বুঝলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ভালবাসেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'ওমর! পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ?'

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের জন্য এর সমপরিমাণ রেখে এসেছি।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আগ্রহ নিয়ে বসে রইলেন। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কখন আসেন, কী নিয়ে আসেন তা দেখবেন। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার সামর্থ অনুযায়ী সম্পদ নিয়ে আসলেন এবং রাসূলের কাছে তা অর্পণ করলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দান দেখছেন এবং তার ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথোপকথন শুনছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সম্পদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আবূ বকর! তুমি পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে, তার পরিবার-পরিজনকে ভালোবাসেন, তাদের কল্যাণ কামনা করেন। সবদিয়ে তারা কষ্ট করুক এটা তিনি চান না।

আবূ বকর বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাদের জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি!'

আর আমার যা কিছু ছিল তার সব নিয়ে এসেছি। আমি অর্ধেক বা এক চতুর্থাংশ আনি নি বরং আমি সমস্ত সম্পদ নিয়ে এসেছি। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ কথা বলতে বাধ্য হলেন যে, 'আমি কখনও আবূ বকরকে ছাড়িয়ে যেতে পারব না।'

সাহাবীদের প্রত্যেকেই মনে করতেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। তাই তারাও রাসূলকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা দ্রুত নামায পড়ালেন। নামায শেষে সাহাবায়ে কিরামকে আশ্চর্য হতে দেখে রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি নামায সংক্ষিপ্ত হওয়ায় আশ্চর্য হয়েছ?

সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'নামাযের মধ্যে আমি একটি শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। তার মায়ের কথা বিবেচনা করে আমি নামায সংক্ষেপ করেছি।'

দেখলেন তো অন্যের প্রতি কেমন ছিল তাঁর ভালবাসা! তিনি যে অন্যদেরকে অনেক ভালবাসেন সেটা তিনি আচরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতেন।

আপনি একা নন...

আপনিও আপনার হৃদয়ের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করুন। স্পষ্ট করে বলুন, 'আমি আপনাকে ভালবাসি। আপনার সাথে দেখা করে আমার অনেক ভাল লাগল। আমি মনে করি আপনি অনেক বড় মাপের মানুষ।'



২৬. অন্যের নাম মনে রাখুন

কারো নাম স্মরণ রাখা তার প্রতি আপনার গুরুত্বের পরিচায়ক। কারও সঙ্গে আপনার ব্যাংকে, বিমানে কিংবা বিয়ের কোনো অনুষ্ঠানে পরিচয় হলো। তার নাম ঠিকানা আপনি জেনে নিলেন। পরবর্তীতে অন্য কোথাও তার সঙ্গে আবার সাক্ষাত হলো। আপনি যদি তার দিকে এগিয়ে যান আর তার নাম ধরে ডেকে তাকে স্বাগত জানান তাহলে এটা অবশ্যই চমৎকার একটি কাজ হবে। আপনার এ আচরণে সে মুগ্ধ হবে, তার অন্তরে আপনার প্রতি ভালবাসা ও সম্মানবোধ সৃষ্টি হবে।

আপনি কারো নাম মনে রাখলে তার মনে এ ধারণা অবশ্যই জন্মাবে যে, আপনি তাকে মূল্যায়ন করেন। একজন শিক্ষক ছাত্রদের নাম মুখস্থ রাখেন অন্যজন মুখস্থ রাখেন না এমন দুই শিক্ষকের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। প্রথমজনের প্রতি ছাত্রদের আন্তরিকতা অবশ্যই বেশি থাকবে। ছাত্রকে 'হে ছাত্র! দাঁড়াও' না বলে 'হে অমুক! (নাম বলে) দাঁড়াও' বলে সম্বোধন করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

মোবাইল কল রিসিভ করার ক্ষেত্রেও নাম ধরে সম্বোধন করবেন। আপনি যার কাছে কল করেছেন তিনি ফোন রিসিভ করে বললেন, 'কে?' কিংবা বললেন, 'হ্যাঁলো!'। অন্য একজন রিসিভ করেই হাসিমুখে বললেন, 'হে খালেদ! তোমাকে স্বাগতম' অথবা বললেন, হ্যাঁলো, আব্দুল্লাহর আব্বু...। বলুন, কোনোটি আপনার কাছে বেশি ভাল লাগবে? নিশ্চয় তার মুখে আপনার নামের শব্দটি আপনার কানে পৌঁছার আগে আপনার অন্তরে তার মুগ্ধতার আবেশ ছড়িয়ে দেবে।

সাধারণত সভা-সেমিনারে আলোচনা করার পর তরুণরা আমাকে ধন্যবাদ জানাতে এবং করমর্দন করতে ভীড় জমায়। আমি তাদেরকে সবসময় বলে থাকি, 'আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন!' ভাই! আপনার নামটা কি জানতে পারি?' তাদের প্রতি আমার এই গুরুত্ব প্রকাশের কারণে তারা অনেক খুশি হয়।

একবার কুশল বিনিময়ের পর সবাই বিদায় নিল। তাদের একজন কী জন্য যেন আবার এলে আমি তাকে বললাম, খালেদ! আবার এলে কেন? সে অবাক হয়ে বললো, মাশাআল্লাহ! আপনি আমার নাম মনে রেখেছেন!

সেনা কর্মকর্তাদের ইউনিফরমে বুকের ওপর ব্যাজ থাকে। তাতে তাদের নাম লেখা থাকে। আমি একবার এক সেনানিবাসে বয়ান করেছিলাম। বয়ানের পর অনেকেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। একজন অফিসারকে দেখে মনে হলো, তিনি আমার সাথে দেখা করতে চাচ্ছেন। কিন্তু ভীড়ের কারণে পারছিলেন না।

আমি তার ব্যাজের ওপর নজর দিয়ে তার নাম দেখে নিলাম। এরপর তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'স্বাগতম হে অমুক!' আমার কথা শোনার সাথে সাথে খুশিতে তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে গেল। আশ্চর্য হয়ে সে মুসাফাহার জন্য তার হাত বাড়িয়ে হাসিমুখে বললো, 'আশ্চর্য! আপনি আমার নাম জানলেন কী করে?!

আমি বললাম, 'ভাই! যাদেরকে আমরা ভালবাসি, তাদের নাম তো অবশ্যই জানতে হবে। আমার এ আচরণ তার ওপর বিরাট প্রভাব ফেলেছে। অনেকেই এমন আছেন যে, তার নাম অন্য কেউ মনে রাখলে খুশি হয় এবং মনে মনে কামনা করে, 'যদি আমিও অন্যদের নাম মনে রাখতে পারতাম!'

অন্যের নাম মনে রাখতে না পারার পেছনে অনেক কারণ থাকে। বড় একটি কারণ হলো, কারো সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তাকে গুরুত্ব না দেয়া। আরেকটি হলো, কারও সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সময় অন্যমনস্ক থাকা কিংবা নাম শোনার সাথে সাথে তা মনে না গাথা।

তাছাড়া সাক্ষাতকারীর প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গিও এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আপনি হয়তো মনে করেন, তার সঙ্গে আপনার আর কোনোদিন সাক্ষাৎ হবে না। তাই তার নাম মনে রাখার প্রয়োজন বোধ করেন না। কিংবা সাক্ষাতকারী হয়তো সাধারণ মানুষ। তাই তার প্রতি গুরুত্ব দেয়ার আগ্রহ নেই। অথবা যখন সে নাম বলেছিল তখন আপনি তার নাম মনোযোগ দিয়ে শোনেন নি, এখন নতুন করে জিজ্ঞেস করতে সঙ্কোচবোধ করছেন। এসব কারণে অন্যদের নাম মনে থাকে না।

নাম মনে রাখার বিভিন্ন কৌশল আছে। একটি হলো, কারো নাম শোনার সময় এ কথা ভাবা যে, কয়েক মিনিট পর আমাকে নামটি জিজ্ঞেস করা

হবে। আরেকটি হলো, কারও নাম শোনার সময় তার চেহারার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা।

কারও সঙ্গে কথা বলার সময় আপনি তার অবয়ব, কথা বলার ভঙ্গি ও হাসার ধরন ভালভাবে লক্ষ্য করবেন। যেন তা আপনার স্মৃতিপটে গেঁথে যায়। কথার ফাঁকে ফাঁকে বারবার তাকে নাম ধরে ডাকুন। এভাবে বলুন, 'হে অমুক! ঠিক বলেছেন। হে অমুক! আপনি এটা শুনেছেন? হে অমুক! আপনি কি আমার সঙ্গে একমত?' এভাবে বারবার বলুন।

কাউকে নাম ধরে ডাকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কুরআনে দেখুন, আল্লাহ তায়ালা নবীদেরকে তাদের নাম ধরেই সম্বোধন করেছেন-

يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَا.

'হে ইবরাহীম! তুমি এটা থেকে বিমুখ থাক।'

يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ.

'হে নূহ! সে তোমার পরিজনভুক্ত নয়'

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ.

'হে দাউদ! আমি তো তোমাকে পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি বানিয়েছি'

সারকথা...

আমার নাম মনে রেখে, নামসহ সম্বোধন করে

আমার প্রতি আপনার গুরুত্ব ও ভালবাসা প্রকাশ করুন।

আমি অবশ্যই আপনাকে হৃদয়ে স্থান দেব।



২৭. অন্যের প্রশংসা করুন

আমরা নিজের জন্য যেমন কাজ করি তেমনি অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যও অনেক কাজ করে থাকি। আপনাকে যখন কোনো বিবাহের অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়া হয়। তখন সে অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য আপনি আপনার সবচেয়ে দামী ও সুন্দর পোশাকটি পরিধান করেন । কেন এমন করেন? অবশ্যই অন্যের মনোযোগ ও দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই এমন করেন। নিজের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নয়।

আমাদের পোশাক ও আকার-অবয়বের সৌন্দর্যে কেউ আকৃষ্ট হলে আমরা খুশি হই। ড্রইংরুম বা অভ্যর্থনাকক্ষের সাজ-সজ্জার বিষয়টিতে আমরা কত গুরুত্ব দিই! এটাও আমরা করে থাকি শুধু অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। নিজের জন্য নয়। এর প্রমাণ হলো, আমরা অভ্যর্থনাকক্ষের পরিপাটির ব্যাপারে যতটা সচেতন, নিজেদের বেডরুম কিংবা বাচ্চাদের গোসলখানার ব্যাপারে ততটা সচেতন নই।

কোনো বন্ধুকে খাওয়ার জন্য দাওয়াত দিলে আপনার স্ত্রী এমনকি কখনও কখনও আপনি নিজেও খাবার প্রস্তুত ও পরিবেশন করতে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মনোযোগ দিয়ে থাকেন। অতিথি যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়, খাবারের মানের প্রতি তত বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। কেউ আমাদের পোশাক-পরিচ্ছেদ বা ঘরের সাজ-সজ্জার প্রশংসা করলে কিংবা রান্নার তারিফ করলে আমাদের খুশির সীমা থাকে না।

রাসূল ﷺ বলেছেন, 'অন্যের সঙ্গে তেমন আচরণ করুন যেমন আচরণ আপনি অন্যদের কাছ থেকে পেতে চান।' এটা কিভাবে করবেন?

কারও পরনে সুন্দর পোশাক দেখতে পেলেন, তার প্রশংসা করুন, আনন্দদায়ক কিছু কথা বলুন। মাশাআল্লাহ! পোশাকটা তো খুব চমৎকার! এটা পরলে আপনাকে তো বরের মতো লাগে।

আপনার সাথে কেউ সাক্ষাত করতে এলো। তার পোশাক থেকে আতরের সুঘ্রাণ আসছে। তার সুরুচির প্রশংসা করুন। তার আবেগের সাথে আপনিও শরিক হোন। সে কিন্তু আপনার জন্যই সুগন্ধি ব্যবহার করেছে।

তাই তাকে সুন্দর সুন্দর কথা বলে আনন্দ দিতে চেষ্টা করুন। কী সুন্দর ঘ্রাণ! আপনার রুচি তো অনেক উন্নত!

কেউ আপনাকে খাবারের দাওয়াত দিলে তার পরিবেশিত খাবারের প্রশংসা করুন। কেননা, দাওয়াতদাতার মা অথবা স্ত্রী কেবল আপনার জন্য দীর্ঘক্ষণ রান্নাঘরে ছিল। কত কষ্ট করে তারা খাবার প্রস্তুত করেছে! কিংবা রেষ্টুরেন্ট থেকে খাবার আনলেও এর জন্য পরিশ্রম করতে হয়েছে। তাই তাকে এমন কিছু কথা বলুন, যাতে সে উপলব্ধি করতে পারে যে, আপনি তার প্রতি কৃতজ্ঞ। যেন সে এ কথা মনে করে যে, আপনার জন্য তার কষ্ট-ক্লেশ বৃথা যায় নি।

কোনো বন্ধুর বাসায় সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্র দেখতে পেলেন। অকুণ্ঠচিত্তে আসবাবপত্রের প্রশংসা করুন এবং তার সুরুচির তারিফ করুন। তবে প্রশংসা যেন অতিরিক্ত না হয়ে যায় সে ব্যাপারে খেয়াল রাখবেন। কেননা, তাহলে সে মনে করবে, আপনি তার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন ।

কোনো সভা বা মজলিসে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন, একজন বক্তা খুব সুন্দর কথা বলছেন। কথার মাধ্যমে তিনি আসর জমিয়ে তুলেছেন এবং শ্রোতারাও তার কথা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনছে। আপনি তার প্রশংসা করুন। মজলিস শেষে ওঠার সময় তার হাত ধরে বলুন, 'মাশাআল্লাহ! আপনার কথা বলার ক্ষমতা তো চমৎকার! আপনার কারণে আজকের সভা খুব জমে উঠেছে!' এভাবে বলে দেখুন, সে আপনাকে ভালবাসতে শুরু করবে।

আপনি পিতার সাথে পুত্রের কোনো সুন্দর আচরণ দেখলেন। ছেলে পিতার হাতে চুমু খেলো কিংবা পিতার জুতা এগিয়ে দিল। ছেলের প্রশংসা করুন। কেউ নতুন পোশাক পরিধান করেছে, তার প্রশংসা করুন। বোনের বাড়িতে গিয়ে তাকে তার সন্তানদের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি যত্নবান দেখলেন। তার প্রশংসা করুন। এভাবে অন্যের ভাল দিকগুলোই কেবল লক্ষ্য করুন এবং প্রশংসা করুন।

আপনি আপনার বন্ধুকে তার সন্তানদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে দেখলেন অথবা মেহমানদের আপ্যায়নের ক্ষেত্রে তার নতুন কোনো কৌশল

দেখলেন। আপনি বিচক্ষণতার সাথে তার প্রশংসা করুন। আপনার মুগ্ধতা প্রকাশ করুন।

আপনি কারও সাথে তার গাড়িতে উঠেছেন কিংবা ট্যাক্সি ভাড়া করেছেন। গাড়ির ভেতরটা পরিচ্ছন্ন দেখতে পেলেন। কিংবা গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে চালকের দক্ষতা আপনার নজর কাড়ল । আপনি এর প্রশংসা করুন।

অনেকেই হয়তো বলবেন, এতো খুব সাধারণ বিষয়, এতে কোনো বিশেষত্ব নেই। কথাটি সত্য। তবে এ সাধারণ বিষয়ের মধ্যে যে অসাধারণ প্রভাব রয়েছে তাও সত্য। সমাজের নিম্ন-মধ্য- উচ্চ শ্রেণির মানুষ, কুলি, মজুর, ছাত্র ও শিক্ষকসহ সবার সাথে আমি নিজে এটা পরীক্ষা করে দেখেছি। সমাজের অতি উচুঁ স্তরের ব্যক্তিবর্গ ও পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথেও আমি এর প্রয়োগ করেছি। আমি তাদেরকে যারপর নাই প্রভাবিত হতে দেখেছি। প্রভাবিত হবে না বা কেন? মানুষ যেসব ক্ষেত্রে অন্যের প্রশংসা কামনা করে, সেসব ক্ষেত্রে প্রশংসা পেলে সে খুশি না হয়ে পারবে না।

নব বিবাহিত কোনো ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ের এক সপ্তাহ পর আপনার দেখা হলো। বড় ডিগ্রী অর্জনকারী কোনো ব্যক্তির সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হলো। আপনার প্রতিবেশী নতুন ডিজাইনের বাড়ি নির্মাণ করে উদ্বোধনের জন্য আপনাকে দাওয়াত দিতে এলো। এরা সকলেই আপনার মুখ থেকে প্রশংসার বাণী শোনার অপেক্ষা করবে। আপনি তাদের সঙ্গে আশানুরূপ আচরণ করুন।

আমার চাচাতো ভাই আব্দুল মাজীদ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র। ফাইনাল পরীক্ষার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য সে আমাকে সাথে নিয়ে যেতে চাইল। একদিন সকালে আমি তার সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করলাম। এরপর আমি গাড়ি নিয়ে তার বাড়িতে গেলাম। আমরা একসাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাব।

তার মনে আনন্দের ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। সে শিক্ষা জীবনের নতুন এক স্তরে উত্তীর্ণ হতে যাচ্ছে। সে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ নিয়ে ভাবছিল। গাড়িতে ওঠার পর আমি তার শরীর থেকে সুগন্ধির কড়া ঘ্রাণ পাচ্ছিলাম। আমার মনে হলো, সে আতরের পুরো কৌটা তার কাপড়ে ঢেলে

দিয়েছিল। আসলে, আতরের উৎকট গন্ধে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তাই দম নেয়ার জন্য আমি গাড়ির জানালা খুলে দিলাম। বুঝতে পারছিলাম, বেচারা পোশাকের শোভাবর্ধন ও সুঘ্রাণের জন্য যথেষ্ট কসরত করেছে। আতরের গন্ধে আমার কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললাম, 'মা-শা-আল্লাহ! কী চমৎকার মিষ্টি ঘ্রাণ! আমার তো ভয় হচ্ছে, অনুষদের ডীন মহোদয়ের নাকে এই মিষ্টি ঘ্রাণ যাওয়ার সাথে সাথে খুশিতে বলে উঠবেন, 'তোমার ভর্তি মঞ্জুর করা হলো!'

এ কথা শুনে সে যে কী পরিমাণ উল্লসিত হয়েছিল তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। আনন্দে তার পুরো চেহারা বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় হঠাৎ জ্বলে উঠেছিল। সে আমার দিকে তাকিয়ে আনন্দভরা কণ্ঠে বললো, 'ভাই আবূ আব্দুর রহমান! আপনাকে ধন্যবাদ। এটা অনেক দামী আতর। সবসময়ই আমি এ আতরটি ব্যবহার করি। কিন্তু কেউ এটা চিনে না। এরপর সে বারবার তার মাথার রুমালের ঘ্রাণ শুকতে লাগল আর বলতে লাগল, 'কী বলেন, আমার রুচি চমৎকার না?'

এ ঘটনার পর পনের বছর পার হয়ে গেছে। আব্দুল মাজীদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা শেষ করেছে। কয়েক বছর যাবত চাকরিও করছে। কিন্তু সেদিনের ঘটনা এখনও তার মনে আছে। সাক্ষাত হলে প্রায়ই সে তা আমাকে মনে করিয়ে দেয়।

অন্যের প্রশংসা করতে চেষ্টা করুন। মানুষের আবেগকে কাজে লাগিয়ে তাকে প্রভাবিত করা এবং হৃদয় জয় করা অত্যন্ত সহজ কাজ। কিন্তু আমরা অধিকাংশ সময় সাধারণ এ কৌশলগুলো প্রয়োগ করে মানুষের মন জয় করতে চেষ্টা করি না। আমি যদি বলি সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী মহামানব রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের ভালবাসা অর্জনের জন্য এ সব কৌশল বরং এর চেয়েও উত্তম কৌশল প্রয়োগ করতেন।

ইসলামের সূচনাকালে মক্কায় নিরাপদ জীবনযাপন এবং দ্বীনের অনুশাসন মেনে চলা অসম্ভব হয়ে পড়লে মুসলমানরা বাড়ি-ঘর ও ধন-সম্পদ ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করলেন। আবদুর রহমান বিন আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন মক্কার একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। শূন্য হাতে মদিনায় হিজরত করে তিনি নিঃস্ব হয়ে গেলেন। মুহাজিরদের অবস্থার ত্বরিত সমাধানের লক্ষ্যে রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের অবস্থান অনুপাতে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করলেন। আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন সা'দ বিন রাবীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ভাই। সাহাবায়ে কিরামের মন ছিল স্বচ্ছ, হৃদয় ছিল আলোকিত। তাই সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, 'ভাই! মদিনার অধিবাসীদের মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি সম্পদের অধিকারী। আমরা ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। তুমি আমার ভাই। আমার সমস্ত সম্পদ সমান দুই ভাগে ভাগ করে আপনি অর্ধেক নিন, আমার জন্য অর্ধেক রাখুন। আপনার তো বিয়েরও প্রয়োজন। আর মদিনায় পাত্রী যেহেতু সহজলভ্য নয় তাই আমার স্ত্রীদের মধ্যে যাকে আপনার পছন্দ তাকে আমি তালাক দিয়ে দিচ্ছি। আপনি তাকে বিয়ে করে নিন।'

মদিনায় আব্দুর রহমানের কিছুই নেই। তবুও আব্দুর রহমান সা'দকে তার প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিনয়ের সাথে বললেন, 'আল্লাহ আপনার পরিবার ও সম্পদে বরকত দান করুন। আপনি দয়া করে আমাকে মদিনার বাজারটা দেখিয়ে দিন!

সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বাজার দেখিয়ে দিলেন। আব্দুর রহমান ছিলেন অনেক বুদ্ধিমান ও ব্যবসায়িক প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার অধিকারী। তিনি বাজারে গিয়ে বাকিতে কিছু পণ্য ক্রয় করে তা নগদে বিক্রি করলেন। এতে তার অনেক লাভ হলো। ফলে ব্যবসা করার মত মূলধন তিনি পেলেন। বুদ্ধি ও ব্যবসায়িক প্রজ্ঞা কাজে লাগিয়ে অল্পদিনেই তিনি অনেক সম্পদ সঞ্চয় করতে সক্ষম হলেন। এরপর তিনি উপযুক্ত পাত্রী দেখে বিয়ে করলেন। বিয়ের পর আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলের সাথে দেখা করতে এলেন। নতুন স্ত্রীর কাপড় থেকে জাফরানের রং তার কাপড়ে লেগে গিয়েছিল। তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৃষ্টি এড়াল না। তিনি এর কারণ বুঝে ফেললেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের মন ও মনন বুঝতেন। মানুষের মন আকর্ষণ করার জন্য এবং হৃদয় রাজ্যে প্রবেশের জন্য তিনি সুযোগের অপেক্ষায় থাকতেন। আবদুর রহমানের প্রতি দৃষ্টি পড়া মাত্রই তিনি তার পরিবর্তিত অবস্থা নিয়ে ভাবলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী খবর আব্দুর রহমান?' আবদুর রহমান হাসিমুখে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আমি এক আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেছি'। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবাক হলেন। মনে মনে ভাবলেন,

এত তাড়াতাড়ি সে কিভাবে বিয়ে করে ফেলল? মাত্র কয়দিন আগে সে হিজরত করে মদিনায় এসেছে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'মোহর কত দিয়েছ?' আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'খেজুর বীজের ওজন পরিমাণ স্বর্ণ!' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমানের রাদিয়াল্লাহু আনহু বিয়ের খুশিটাকে আরো বাড়িয়ে দিতে চাইলেন। তিনি বললেন, 'একটি বকরি দিয়ে হলেও ওলিমা কর।' এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ধন-সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকতের দোয়া করলেন। ফলে তাতে অনেক বরকত হলো। আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তার উপার্জন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলতেন আমি যদি পাথরও ধরতাম, তাতেও বিশাল লাভ হতো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসহায় ও নিঃস্বদেরও গুরুত্ব দিতেন। তিনি তাদের আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে দিতেন। তাদের মধ্যে এ প্রত্যয় জন্মাতেন যে, তিনি তাদের ব্যাপারে সচেতন এবং তাদেরকে ভালবাসেন। তিনি তাদের ছোটো-খাটো কাজের মূল্যায়ন করতেন। তাদের কাউকে না দেখলে তিনি তার খোঁজ-খবর নিতেন এবং তার ভাল কাজগুলোর প্রশংসা করতেন। ফলে অন্যরাও অনুরূপ কাজ করতে আগ্রহী হতো।

মদিনায় কৃষ্ণাঙ্গ জনৈক মুমিন নারী ছিল। সে মসজিদে নববী ঝাড়ু দিতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় তাকে ঝাড়ু দিতে দেখতেন। মসজিদের খেদমতের প্রতি তার এ আগ্রহ দেখে মুগ্ধ হতেন। বেশ কয়েকদিন যাবত তাকে দেখতে না পেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহু জানালেন, 'সে তো কয়েকদিন আগে মারা গেছে।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা আমাকে তার মৃত্যুর সংবাদ জানালে না কেন'?

সাহাবীগণ মহিলার মৃত্যুর বিষয়টিকে তুচ্ছ বিষয় মনে করেছিলেন। একজন কৃষ্ণাঙ্গ নিঃস্ব মহিলা তো এত গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, তার মৃত্যু সংবাদ রাসূলকে দিতে হবে। সাহাবীগণ বললেন, 'সে রাতে মৃত্যুবরণ করেছে। তাই আমরা আপনাকে জাগাই নি।' তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তার আমল মানুষের দৃষ্টিতে তুচ্ছ হলেও আল্লাহর দৃষ্টিতে ছিল অনেক বড়। তবে তারা ভাবছিলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে সমাহিত এ মহিলার জানাযা পড়বেন!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও'। সাহাবায়ে কিরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তার কবরের কাছে নিয়ে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তার কবরকে সামনে রেখে জানাযার নামায পড়লেন। তারপর বললেন, 'এ কবরগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। আমার এ জানাযার নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা সেগুলোকে আলোকিত করেছেন'। নিঃস্ব একজন মহিলার ক্ষুদ্র একটি আমলের কারণে তার প্রতি রাসূলের এ ভালবাসা ও গুরুত্বের বহিঃপ্রকাশে সাহাবায়ে কিরামের হৃদয়জগত কেমন আলোড়িত হয়েছিল তা কে জানে! রাসূলের এমন আচরণে তারা ঐ মহিলার ন্যায় কিংবা তার চেয়েও বড় আমলের অনুপ্রেরণা কি লাভ করেন নি?

একটি মজার ঘটনা শুনুন। আমার পরিচিত জনৈক যুবক একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়েছিল। সেখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরাও অতিথি হয়েছিলেন। সে অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে একটি আতরের দোকানে প্রবেশ করলো এবং ভাবখানা এমন দেখাল যে, খুব দামী আতর কিনবে। দোকানদার তো খুব খুশি। সমাদর করে তাকে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান আতর দেখাতে লাগলেন। উন্নতমানের কিছু আতর তার কাপড়ে ছিটিয়ে দিলেন। যেন এসব আতর থেকে ক্রেতা তার পছন্দমত একটিকে বেছে নিতে পারে।

বিভিন্ন ধরনের আতরের ছিটায় যখন তার পোশাক সুঘ্রাণে ভরে গেল তখন সে বিক্রেতাকে কোমল সুরে বললো, 'ধন্যবাদ! অনেক আতর তো দেখালেন। কিন্তু এখন নিতে পারছি না। পরে একদিন এসে নিয়ে যাব'!

আতরের সুঘ্রাণ সঙ্গে নিয়ে সে দ্রুত অনুষ্ঠানস্থলে গিয়ে পৌঁছল যেন সুঘ্রাণ শেষ না হয়ে যায়। নৈশভোজে সে তার বন্ধু খালেদের পাশে বসল। কিন্তু খালেদ তার সুঘ্রাণের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করলো না এমনকি তা খেয়ালও করলো না। ফলে সে যুবক অবাক হয়ে খালেদকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি কোনো আতরের ঘ্রাণ পাচ্ছ না!?' খালেদ বললো, 'না'। যুবক আবার বললো, আমি নিশ্চিত তোমার নাক বন্ধ হয়ে আছে।' উত্তরে খালেদ বললো, 'নাক বন্ধ থাকলে তো তোমার ঘামের দুর্গন্ধ পেতাম না!'

উপসংহার...

মানুষ উন্নতি ও সফলতার যত উচ্চ স্তরেই উন্নীত হোক না কেন

সে মাটিরই মানুষ।

তাই সেও প্রশংসা কামনা করে, প্রশংসায় আনন্দিত হয়



২৮. কেবল সুন্দরের প্রশংসা করুন

অন্যের প্রশংসা করা ভাল। তবে সীমাতিরিক্ত নয়। অনেককে দেখা যায় সবসময় কেবল মন্তব্য ও প্রশংসা করতেই থাকে। মোসাহেব প্রকৃতির এ লোকদের মুখে সব সময় প্রশংসার খই ফুটতে থাকে। তাদের মুখ কখনো বিরত হয় না। অথচ একটি প্রসিদ্ধ আরবি প্রবাদ হলো- 'কোনো ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করা হলে হিতে বিপরীত হয়। আর নির্ধারিত সময়ের আগে কোনো কিছু পেতে চাইলে বঞ্চিত হতে হয়।'

তাই কেবল সেই সুন্দরেরই প্রশংসা করুন মানুষ যা দেখে আনন্দবোধ করে, যার জন্য অন্যের প্রশংসা কামনা করে কিংবা আনন্দদায়ক বিভিন্ন মন্তব্য শুনতে চায়। পক্ষান্তরে যেসব বিষয় অন্য কেউ জানলে মানুষ লজ্জাবোধ করে, অন্যের মন্তব্যে অপমান বোধ করে, আপনি সে ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে রাখুন। না দেখার ভান করুন।

কোনো বন্ধুর বাসায় গিয়ে আপনি ড্রইং রুমে পুরোনো চেয়ার দেখতে পেলেন। আপনি তখন অপদার্থের মতো না চাইতেই পরামর্শ দিতে যাবেন না। আপনি বলতে যাবেন না, 'এ চেয়ারগুলো বদলাচ্ছ না কেন? ঝাড়বাতির অর্ধেকই তো জ্বলছে না! নতুন ঝাড়বাতি কিনছ না কেন? আর দেয়ালের পেইন্ট তো অনেক পুরোনো হয়ে গেছে! নতুন পেইন্টিং করছ না কেন?'

ভাই! সে তো আপনার কাছে অভিযোগ ও পরামর্শ শুনতে চায় নি। আপনি তো ডেকোরেশন ইঞ্জিনিয়ার নন যার কাছে সে রুম ডেকোরেশনের জন্য পরামর্শ চেয়েছে। আপনি এ ব্যাপারে চুপ থাকুন। হতে পারে তার পরিবর্তনের সামর্থ্য নেই। হতে পারে সে আর্থিক সঙ্কটে ভুগছে কিংবা অন্য কোনো কারণ আছে। মানুষ লজ্জা পেতে পারে এমন বিষয়ে কথা বলা কিংবা মন্তব্য করার চেয়ে ভারী আর কিছু নেই।

মনে করুন আপনার বন্ধুর পোশাক পুরোনো কিংবা তার গাড়ির এসি নষ্ট হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করবেন না। সম্ভব হলে ভাল কিছু বলুন, নয় তো চুপ থাকুন।

অতীতকালের একটি ঘটনা। জনৈক ব্যক্তি তার এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাত করতে গেল। বন্ধু তার সামনে রুটি ও খাওয়ার উপযোগী ভোজ্য তেল পরিবেশন করলো। অতিথি বন্ধু বললো, ‘রুটির সঙ্গে সবজি থাকলে বেশ ভাল হতো।’ ঘরে সবজি না থাকায় স্বাগতিক বন্ধু পাশের দোকানে গেল। কিন্তু তার কাছে নগদ টাকা ছিল না। দোকানির কাছে সে বাকি চাইল। দোকানী বাকিতে বিক্রি করতে অস্বীকার করলো। ফলে সে বাড়ি ফিরে তার অযু করার বদনাটি নিয়ে দোকানীর কাছে বন্ধক রেখে সবজি নিয়ে এলো। এভাবে সবজি এনে তা অতিথির সামনে পরিবেশন করলো। সবজি দিয়ে অতিথি বন্ধু মনভরে আহারের পর দোয়া পড়ল, ‘আল্লাহর শোকর যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন, পানীয় পান করিয়েছেন এবং আমাদেরকে যা দান করেছেন তাতে সন্তুষ্ট রেখেছেন!’

স্বাগতিক বন্ধু এ কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, ‘হায়! আল্লাহ যা দান করেছেন তাতে যদি তুমি সন্তুষ্ট থাকতে, তাহলে আমার অযুর বদনাটি আর বন্ধক রাখতে হতো না!’

অসুস্থ কোনো ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে আপনি বলবেন না, ‘হায়! হায়! আপনার চেহারা তো হলদে হয়ে গেছে! চোখ দু’টো কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে! শরীরের চামড়া শুকিয়ে গেছে!’ আশ্চর্য! আপনি তো তার চিকিৎসক নন। আপনি সম্ভব হলে সান্ত্বনা দিন, নয়তো চুপ থাকুন।

কথিত আছে, জনৈক ব্যক্তি একজন রোগীকে দেখতে গিয়ে তার পাশে কিছুক্ষণ বসল। এরপর তার রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। রোগী তার রোগের কথা জানাল। রোগটি ছিল দুরারোগ্য। রোগটির কথা শোনা মাত্রই সাক্ষাতকারী চিৎকার করে বলে উঠল, ‘হায়! হায়! কী বলেন! এ রোগ তো আমার অমুক বন্ধুর হয়েছিল, সে মারা গেছে! আমার ভাইয়ের বন্ধু অমুক তো এ রোগে দীর্ঘদিন কর্মক্ষমতা হারিয়ে শেষ পর্যন্ত মারাই গেল! আমার ভগ্নিপতির প্রতিবেশী অমুকও তো এ রোগে আক্রান্ত হয়েই মৃত্যুবরণ করেছে!’ রোগী তো তার কথা শুনে রাগে ফেটে পড়ার উপক্রম।

সাক্ষাতকারী কথা শেষ করে বিদায় নেয়ার আগে রোগী তাকে কিছু বলবে কি না জানতে চাইলে রোগী বললো, ‘হ্যাঁ, ভবিষ্যতে তুমি কখনও আমার

কাছে আসবে না। আর কোনো রোগীকে দেখতে গেলে তার সামনে হতাশাব্যাঞ্জক কথা বলবে না।'

আরেকটি ঘটনা শুনুন। জনৈক বৃদ্ধ মহিলা জানতে পারল তার এক বৃদ্ধ বান্ধবী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সে তার সন্তানদেরকে এক এক করে অনুরোধ করলো তারা যেন তাকে ঐ অসুস্থ বান্ধবীর কাছে নিয়ে যায়। ছেলেরা প্রত্যেকেই নানা অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে গেল। শেষে এক ছেলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হলো। সে মাকে তার গাড়িতে করে রোগীর বাড়িতে নিয়ে গেল।

গন্তব্যে পৌঁছে তার মা গাড়ি থেকে রোগী দেখতে চলে গেল। ছেলে গাড়িতে অপেক্ষা করতে লাগল। মহিলা তার অসুস্থ বান্ধবীর কাছে গিয়ে তাকে সালাম করলো, তার রোগ সম্পর্কে জানল এবং দোয়া করে বিদায় নিল। ফিরে আসার সময় সে দেখতে পেল অসুস্থ মহিলার মেয়েরা বাড়ির হলরুমে বসে কান্নাকাটি করছে। তখন সে তাদেরকে লক্ষ্য করে নিঃসঙ্কোচে বললো, 'আমি চাইলেও তোমাদের কাছে আসতে পারি না। তোমাদের মা তো মারাত্মক অসুস্থ। মনে হচ্ছে তিনি আর বাঁচবেন না, অতিসত্বর মারা যাবেন। আল্লাহ তায়ালা এখন থেকেই তোমাদের মায়ের মৃত্যুতে ধৈর্য ধরার তাওফিক দান করুন!'

হে প্রাজ্ঞ পাঠক! কেবল আনন্দ ও খুশির বিষয়েই মন্তব্য করুন, দুঃখ ও শোকের বিষয়ে মন্তব্য থেকে বিরত থাকুন।

সমস্যা...

পোশাকের অপরিচ্ছন্নতা কিংবা শরীরের দুর্গন্ধ

এ জাতীয় কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়ে যদি কথা বলতেই হয়

তাহলে সুন্দরভাবে ও মায়াবি সুরে তাকে জানিয়ে দিন।

এটা করতে গিয়ে মেধা ও দূরদর্শিতার স্বাক্ষর রাখুন।



২৯. অনর্থক বিষয়ে নাক গলাবেন না

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ.

'অনর্থক বিষয় পরিহার করা ইসলামের সৌন্দর্য।'

রাসূল ﷺ এর মুখ থেকে নিসৃত কত চমৎকার বাণী! অনেক অপদার্থ ব্যক্তি আছে যারা অনর্থক বিষয়ে নাক গলিয়ে আপনাকে বিব্রত করবে। মনে করুন আপনার হাতে একটি নতুন ঘড়ি। এটা দেখামাত্রই বিভিন্ন প্রশ্ন করে আপনাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে।

: 'ভাই! ঘড়িটি কত দিয়ে কিনলেন?'

: এটা আমি উপহারস্বরূপ পেয়েছি'। আপনি হয়তো উত্তরে এমন কিছু বললেন।

: 'আচ্ছা! কে উপহার দিল?

: 'আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে'।

: 'বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু, না এলাকার বন্ধু, নাকি অন্য কোথাকার?'

: 'বিশ্ববিদ্যালয়ের'।

: কী উপলক্ষে উপহার দিল?'

'এমনিই, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবনে....'।

:'উপলক্ষটা কী? কোনো সাফল্যের কারণে, নাকি ভ্রমণের সময়..., নাকি...?'

এভাবে তুচ্ছ কোনো বিষয়ে আপনাকে আদালতের সাক্ষীর মতো জেরা করতে থাকবে। আপনার হয়তো অবশ্যই তখন চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করবে, 'দয়া করে অনর্থক বিষয়ে নাক গলাবেন না।' বিশেষ করে জনাকীর্ণ কোনো আসরে এ ধরনের অবিরাম ও অর্থহীন জেরা নিশ্চয় আপনাকে বিব্রত করে।

আমি একবার মাগরিব নামাযের পর সহকর্মীদের সঙ্গে এক জায়গায় বসে ছিলাম। হঠাৎ একজনের মোবাইল বেজে উঠল। সে আমার পাশেই বসে ছিল। রিসিভ করে 'কে?' বলতেই অপর পাশ থেকে তার স্ত্রীর ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর ভেসে এলো,

: 'গাধা! তুই কই?'

মহিলা বেশ জোরে কথা বলছিল। এ কারণে আমি তাদের সব কথাই শুনতে পাচ্ছিলাম।

কথাবার্তায় মনে হলো, তার স্ত্রীকে মাগরিবের পর শ্বশুরালয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। অথচ এখনো সে আমাদের সঙ্গে বসে আছে। স্বামী বেচারা গালি হজম করে শান্তস্বরে বললো, 'আচ্ছা, আল্লাহ তোমাকে ভাল রাখুন!'

স্ত্রীর রাগ যেন আরো বেড়ে গেল। সে গলার স্বর আরো উঁচিয়ে জবাব দিল, 'আল্লাহ তোকে ধ্বংস করুক! আমি অপেক্ষায় বসে আছি আর তুই তোর বন্ধুদের নিয়ে ব্যস্ত! তুই একটা বলদ!'

স্বামী বললো, 'আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন! আমি এশার পরই আসছি।'

আমি দেখলাম, স্ত্রীর কথার সঙ্গে তার কথার কোনো মিল নেই। আমি বুঝলাম, সে অনেক বুদ্ধিমান। গোঁয়ারের সাথে গোঁয়ার্তুমি করে নিজের শান্তি নষ্ট করে নি।

আমি উপস্থিত লোকদের দিকে তাকাতে লাগলাম। আমার মনে হয়েছিল তাদের কেউ হয়তো তাকে জিজ্ঞেস করবে, 'আপনার সঙ্গে কে কথা বললো? সে কী বললো? কথোপকথনের পর আপনার চেহারা এমন বিবর্ণ হয়ে গেল কেন?' ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানি, কেউ এ ব্যাপারে নাক গলায়নি।

কোনো রোগী দেখতে গিয়ে আপনি যখন তাকে তার রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন তখন রোগী হয়তো এভাবে একটা উত্তর দেয় যে, 'সামান্য রোগ। তেমন কিছু না।' সে হয়তো এ জাতীয় অস্পষ্ট উত্তর দিয়ে মুক্ত হতে চায়। আপনি তখন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে প্রশ্ন করে তাকে বিরক্ত করবেন না। 'বেয়াদবী মাফ করবেন, আসলে আপনার রোগটি কী? একটু নির্দিষ্ট করে বলুন।' এভাবে প্রশ্ন করে রোগিকে কষ্ট দেয়ার কী অধিকার আছে আপনার?

অনর্থক বিষয় পরিহার করা কত সুন্দর!। আপনি কি চান রোগি বলুক, 'আমি অর্শ্ব রোগে আক্রান্ত।' কিংবা 'আমার গুহ্যদ্বারে ক্ষত হয়েছে।'

যখন রোগি কোনো বিষয়ে অস্পষ্ট জবাব দেবে তখন তার সঙ্গে সে বিষয়ে কথা দীর্ঘ করবেন না। আমার কথার অর্থ এটা নয় যে, রোগিকে তার

রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞেসই করা যাবে না; বরং আমার উদ্দেশ্য হলো, প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে যেন বাড়াবাড়ি না করা হয়।

তেমনই শত শত মানুষের সামনে কোনো ছাত্রকে ডেকে উচ্চৈঃস্বরে এরূপ জিজ্ঞেস করাও ঠিক নয়-

'আহমদ! তুমি কি পাশ করেছ?'

'হ্যাঁ, পাশ করেছি।' আহমদ জবাব দিল।

'তোমার গড় নম্বর কত? ক্লাসে তোমার রোল নম্বর কত?'

আপনি যদি আন্তরিকভাবেই তার খোঁজ খবর নিতে চান, তাহলে তাকে একান্তে ডেকে প্রশ্ন করুন। তাছাড়া 'তোমার গড় নম্বর কত?' 'কেন আরো ভাল ফলাফল করতে পারলে না?' 'কেন তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওনি? ইত্যাদি' খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এধরনের প্রশ্ন করার কোনো দরকার নেই। আপনি যদি তার সম্পর্কে জানতেই চান তাহলে তাকে নিয়ে একপাশে দাঁড়ান। তার সঙ্গে একান্তে কথা বলে জানতে চেষ্টা করুন। তার দোষ-ক্রটি মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেয়া তো সমীচীন নয়।

সাবধান! তিলকে তাল করবেন না। কোনো বিষয়কে তার প্রকৃত আকার থেকে বড় করে দেখাবেন না।

কিছুদিন আগে আমি মদিনায় গিয়েছিলাম। সেখানে আমার বেশ কয়েকটি বক্তৃতার প্রোগ্রাম ছিল। আমার সাথে আমার দুই ছেলে আবদুর রহমান এবং ইবরাহীম ছিল। সেখানে জনৈক যুবক আমার ছেলেদেরকে তাদের হেফজখানায় অথবা কোনো গ্রীষ্মকালীন বিনোদন কেন্দ্রে ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে চাইল। আসরের পর যাবে আবার এশার পরে চলে আসবে। আমি তাকে অনুমতি দিলাম।

আব্দুর রহমানের বয়স তখন দশ বছর। আমি আশঙ্কা করছিলাম যুবকটি হয়তো তাকে অনর্থক ও অপ্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্ন করবে। যেমন: 'তোমার আম্মুর নাম কী?' 'তোমাদের বাড়ি কোথায়?' 'তোমরা কয় ভাই?' 'তোমার আব্বু তোমাকে প্রতিদিন কত টাকা দেন?' ইত্যাদি,

তাই আমি আবদুর রহমানকে বললাম, 'বাবা! তোমাকে সে কোনো অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করলে তুমি তাকে বলে দিবে রাসূল ﷺ বলেছেন, 'অনর্থক কাজ পরিহার করা মুসলমানের মহৎ গুণ।' আমি বারবার তাকে হাদিসটি বললাম যাতে তার মুখস্থ হয়ে যায়।

আবদুর রহমান ও তার ভাই যুবকটির সাথে গাড়িতে উঠল। আব্দুর রহমান দৃঢ়ভাবে গম্ভীর হয়ে বসে রইল। যুবকটি কোমলস্বরে বললো, 'আব্দুর রহমান! আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন!' আব্দুর রহমান দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিল, 'আল্লাহ আপনাকেও দীর্ঘজীবী করুন!'

যুবক বেচারা পরিবেশটাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে চাচ্ছিলো। তাই সে বললো, 'আজ কি তোমার আব্বুর বক্তৃতার প্রোগ্রাম আছে?'

আবদুর রহমান হাদিসটি স্মরণ করার চেষ্টা করলো। কিন্তু সে পারল না। তবে সে চিৎকার করে বলে উঠল, 'আপনি অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে নাক গলাবেন না!'

যুবকটি বললো, 'না, না, আমি তো কেবল শায়খের প্রোগ্রামে উপস্থিত হওয়ার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করেছি।'

আবদুর রহমান ভাবল, যুবকটি হয়তো তার সাথে চালাকি করছে। তাই সে পুনরায় বললো, 'আপনি অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন না।'

যুবকটি বললো, 'আবদুর রহমান! আমি দুঃখিত! আসলে আমি বলতে চাচ্ছিলাম...

আবদুর রহমান যুবককে শেষ করতে না দিয়েই চিৎকার করে বলে উঠল, 'না! আপনি অনর্থক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন না।'

ফিরে আসা পর্যন্ত তারা এরূপ আচরণ করছিল! ফেরার পর আবদুর রহমান আমাকে পুরো ঘটনাটি গর্বভরে শোনাল। তার কথা শুনে আমি হাসলাম। তাকে বিষয়টি পুনরায় বুঝিয়ে দিলাম। আসলে সে তিলকে তাল বানিয়ে ফেলেছিল।

কর্মশালা...

অনধিকার চর্চা থেকে বিরত থাকার অনুশীলন

শুরুতে খুবই কষ্টকর মনে হলেও

এর পরিণাম অনেক আনন্দদায়ক।



৩০. অনধিকার চর্চাকারীর সাথে আচরণগতকৌশল

অনেকে অনুমতি ছাড়াই অন্যের মোবাইল নিয়ে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত ম্যাসেজগুলো পড়তে শুরু করে। জনৈক বিচারক একবার নৈশভোজের এক অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। আমার এক বন্ধুও তাতে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল। অনুষ্ঠানে ভিআইপি ও পদস্থ ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। আমার বন্ধু তাদের সঙ্গে বসে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলছিল। মোবাইলটি পকেটে থাকায় তার অস্বস্তি লাগল। তাই সে পকেট থেকে মোবাইলটি বের করে পাশের টেবিলে রাখল। তার পাশে বসা ভদ্রলোক তার সাথে খুব আলাপ জমিয়ে ফেললো। কথা বলার ফাঁকে তিনি কৌতূহলবশত মোবাইল ফোনটি হাতে নিয়ে স্ক্রিনে নজর বুলালেন। সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি মোবাইলটি টেবিলে রেখে দিলেন।

আমার বন্ধু এ দৃশ্য দেখে কোনো মতে তার হাসি চেপে রাখল। আমি তার গাড়িতে চড়েই অনুষ্ঠানস্থল থেকে ফিরছিলাম। সে তার মোবাইলটি সিটের পাশে রাখল। আমি তা হাতে নিয়ে ওই ভদ্রলোকের মতই স্ক্রিনে নজর দিলাম। স্কিনে দৃষ্টি পড়া মাত্রই আমি হাসতে লাগলাম; বরং বলা যায় আসিবা হারি সাগরে ডুবে গেলাম!

এর কারণ কি জানেন?

অনেকে মোবাইলের স্ক্রিনে বিভিন্ন কথা লিখে রাখে। কেউ নিজের নাম লিখে রাখে, কেউ লিখে রাখে 'আল্লাহকে স্মরণ করুন', কেউ অন্য কিছু। আমার বন্ধু তার মোবাইলের স্ক্রিনে লিখে রেখেছে, 'ওই অনধিকার চর্চাকারী! মোবাইলটি ফেরত দে!'

এক শ্রেণির লোক আছে যারা অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে অযথা নাক গলায়। কিছু লোকের স্বভাব হলো তোমার গাড়িতে উঠলে প্রথমেই সামনের ড্রয়ারটি খুলে দেখবে ভেতরে কী আছে।

কোনো কোনো মহিলার স্বভাব হলো অন্য মহিলার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে লিপিষ্টিক বা আইলাইনার নেড়ে-চেড়ে দেখবে। কেউ আছে আপনাকে ফোন করেই জিজ্ঞেস করবে 'আপনি কোথায়?' আপনি উত্তর দেয়ার পর

আবার প্রশ্ন করবে, 'এটা আবার কোনো জায়গা? আপনার সাথে কে আছে?' আমরা এমন অনেকের সঙ্গেই চলাফেরা করি যারা এ জাতীয় আচরণ করে থাকে। প্রশ্ন হলো, তাদের সঙ্গে আমরা কেমন আচরণ করব?

এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক যেন নষ্ট না হয়। তার সঙ্গে যেন সংঘাত না হয়। অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে সূক্ষ্ম বিবেচনাবোধের পরিচয় দিন। কারো সঙ্গে যেন আপনার কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হয়। কারণ ও উপকরণ যা-ই হোক না কেন, নতুন করে শত্রু তৈরি এবং পুরোনো বন্ধুদেরকে হারানোর বিষয়টিকে সহজ করে দেখবেন না।

অনধিকার চর্চাকারীর সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরী কৌশল হলো- প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নের মাধ্যমে দেয়া কিংবা কথার মোড় এমনভাবে ঘুরিয়ে দেয়া যাতে সে তার প্রথম প্রশ্ন ভুলে যায়। উদাহরণস্বরূপ কেউ আপনাকে প্রশ্ন করলো, 'আপনার মাসিক বেতন কত?'

আপনি মুচকি হেসে বিনয়ের সাথে বলুন, 'কেন ভাই! আপনি কি আমার জন্য উচ্চ বেতনের ভাল কোনো চাকরি পেয়েছেন?!'

তখন সে অবশ্যই বলবে, 'আরে না! আমি আসলে এমনিতেই জানতে চাইলাম।

তখন আপনি প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য বলুন, 'বর্তমানে ভাল বেতন পাওয়া অনেক কঠিন হয়ে গেছে। সম্ভবত পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে এমন হচ্ছে!'

তখন সে বলবে, 'পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধির সাথে বেতন-ভাতার কী সম্পর্ক।'

আপনি বলুন, 'আরে ভাই! পেট্রোলই তো সবকিছুর মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে। এ পেট্রোলের জন্যই তো দেশে দেশে কত যুদ্ধ-বিগ্রহ হচ্ছে!'

সে তখন বলবে, 'আমার মনে হয় আপনার এ কথাটি সঠিক নয়। যুদ্ধের পেছনে অন্য অনেক কারণ রয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে দেশে দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছে। এভাবে এক পর্যায়ে সে তার প্রথম প্রশ্নটা ভুলে যাবে।

প্রিয় পাঠক! এভাবে সূক্ষ্ম বুদ্ধির মাধ্যমে কি এ জাতীয় সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়? আপনার কী মনে হয়?

তদ্রূপ কেউ প্রশ্ন করলো 'সফরে কোথায় যাচ্ছেন?' ।

আপনি তাকে পাল্টা প্রশ্ন করুন, 'কেন? আপনি আমার সঙ্গে যাবেন না-কি?'

অবশ্যই সে তৎক্ষণাৎ বলবে, 'না! আমি এমনিতেই জানতে চাইলাম ।

আপনি বলুন, 'একসঙ্গে গেলে টিকেট কিন্তু আপনাকেই কাটতে হবে ।'

তখন সে নিজের অজান্তেই টিকেট প্রসঙ্গে আলোচনায় জড়িয়ে পড়বে এবং তার মূল প্রশ্ন ভুলে যাবে ।

এভাবে সম্পর্কে কোনো ফাটল ছাড়াই আমরা এ জাতীয় সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারি ।

একটু থামুন...

কোনো অনধিকার চর্চাকারীর কবলে পড়লে আপনি তার সাথে কৌশলি আচরণ করুন...

তার মনে কষ্ট না দিয়ে সুন্দর পন্থায় কথার মোড় ঘুরিয়ে দিন ।



৩১. সমালোচনা করবেন না

জনৈক ব্যক্তি তার এক বন্ধুর গাড়িতে উঠল। গাড়িতে উঠেই সে বলে ফেললো, 'তোমার গাড়ি এত পুরোনো!'

এরপর তার বাড়িতে প্রবেশ করে আসবাবপত্রের ওপর দৃষ্টি পড়তেই সে বললো, 'তোমার ঘরের আসবাবপত্রগুলো এতো এলোমেলো কেন?

বন্ধুর সন্তানদেরকে দেখে বললো, 'মাশাআল্লাহ! তোমার সন্তানগুলো তো দেখতে খুব আকর্ষণীয়। কিন্তু এদেরকে আরও ভাল পোশাক পরাও না কেন?'

বন্ধুর স্ত্রী বেচারী কয়েক ঘণ্টা রান্নাঘরে কষ্ট করে তার সামনে বিভিন্ন আইটেমের খাবার পরিবেশন করলো। খাবার দেখে সে আফসোসের সুরে বললো, 'হায় আল্লাহ! ভাত রান্না করেছেন কেন? তরকারিতে লবণ কম হয়েছে! এ জাতীয় খাবারের প্রতি আমার একদম আগ্রহ নেই!'

ফল কিনতে সে একটি দোকানে ঢুকল। দোকানটি নানা রকম ফলমূলে ভরপুর ছিল। সে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার দোকানে আম আছে?'

দোকানদার বললো, 'না। আম তো কেবল গ্রীষ্মকালেই পাওয়া যায়।'

'তরমুজ আছে?'

'না, ভাই।'

তখন তার চেহারার রং পাল্টে গেল। সে বললো, 'তোমার দোকানে কিছুই নেই। দোকান খোল কেন?' একথা বলে সে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। অথচ সে দোকানে চল্লিশ প্রকারের চেয়েও বেশি ফল ছিল। এটা যেন সে ভুলেই গেল।

এমন অনেক মানুষ আছে যারা সমালোচনা করে সবাইকে বিরক্ত করে। কোনো কিছুই তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। ফলে সুস্বাদু খাবারের দিকে তাকালে তাদের নজর গিয়ে পড়ে কেবল অনিচ্ছায় পড়ে যাওয়া এক টুকরো চুলের দিকে। আর কাপড়ের দিকে তাকালে তার নজর পড়ে কেবল কালো সে দাগটার দিকে যা অসাবধানতাবশত লেগে গেছে। উন্নতমানের কোনো কিতাব পড়তে বসলে নজর পড়ে কেবল ছোট-খাটো

Contents

মুদ্রণবিভ্রাটের দিকে বা অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির দিকে। এদের সমালোচনা থেকে কেউ মুক্তি পায় না। এরা ছোট-বড় সব বিষয়ে খুঁত খুঁজে বেড়ায়।

আমার এক বন্ধুর কথা। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাজীবন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে আমরা একসাথে ছিলাম। এখনও আমাদের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু এ দীর্ঘ জীবনে আমার মনে পড়ে না, সে কোনো বিষয়ে আমার প্রশংসা করেছে!

একবার আমি আমার লেখা একটি গ্রন্থ সম্পর্কে তার মন্তব্য জানতে চাইলাম। অনেকেই গ্রন্থটির প্রশংসা করেছেন। ইতোমধ্যে এর কয়েক লক্ষ কপি ছাপাও হয়েছে। সে শীতলকণ্ঠে বললো, 'ভাল, তবে তাতে অপ্রাসঙ্গিক একটি ঘটনা এসে গেছে। ফন্টসাইজটা আমার ভাল লাগে নি। ছাপার মানও তেমন উন্নত নয়। তাছাড়া .....'।

একদিন আমি তাকে একজন বক্তার বক্তৃতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন সে তার বক্তৃতার ইতিবাচক কোনো দিক খুঁজে পেল না। তার এ আচরণ আমার কাছে পাহাড়ের চেয়ে ভারী মনে হলো। এরপর থেকে আমি তার কাছে আর কোনো বিষয়ে তার মন্তব্য জানতে চাই নি। কারণ, আমি তাকে চিনে ফেলেছি। সে সবকিছু নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে।

এভাবে ওই ব্যক্তির কথাও আপনি উদাহরণ হিসেবে পেশ করতে পারেন যে সমাজের সবাইকে আদর্শবান ব্যক্তি হিসেবে কল্পনা করে। এ জন্য সে আশা করে তার স্ত্রী ঘর-বাড়ি ও আঙ্গিনা চব্বিশ ঘণ্টা শতভাগ পরিচ্ছন্ন রাখবে। তার সন্তানরা সারাদিন পরিপাটি থাকবে। যখনি মেহমান আসবে তখনি স্ত্রী উন্নতমানের খাবার প্রস্তুত করবে। কথা বলার সময় স্ত্রীর কাছে শুধু ভাল ভাল কথা আশা করে। সন্তানদের কাছেও ভাল ভাল আচরণ ও উত্তম আদর্শ প্রত্যাশা করে। সবকিছুই ষোল আনা চায়।

সহকর্মী, বাজারে কিংবা পথে যার সঙ্গেই সাক্ষাত হোক, সবার কাছেই সবকিছু শত ভাগ কামনা করে। এদের কেউ কোনো ত্রুটি করে ফেললে পারলে এরা কটু কথার বানে তাকে জর্জরিত করে ফেলে। আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বইয়ে দেয়। একই কথা বারবার বলতে থাকে। ফলে মানুষ বিরক্ত হয়ে যায়। কারণ এ ধরনের মানুষ স্বচ্ছ সাদা কাগজে কালো দাগ ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না।

এ ধরনের লোকেরা মূলত নিজের আচরণের মাধ্যমে নিজেকেই কষ্ট দেয়। কাছের লোকেরাও তাকে ঘৃণা করতে থাকে এবং তার সঙ্গে চলাফেরা করাকে বিড়ম্বনা মনে করে।

এদের ব্যাপারেই কবি বলেছেন-

একটু খড়কুটো দেখলেই যদি পানি পান না কর
তাহলে তো তোমাকে তৃষ্ণার্তই থাকতে হবে।
এমন কে আছে যার পানপাত্র সবসময় স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন থাকে!
সব বিষয়েই যদি তুমি তোমার সঙ্গীকে ভর্ৎসনা কর
তাহলে তো তোমার সাথে কেউ থাকবে না,
এমনকি দোষ ধরার জন্যও কাউকে পাবে না।'

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا

'তোমরা যখন কথা বলবে তখন ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ কথা বলবে।'

আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আচরণের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন-

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও খাবারের দোষ বর্ণনা করতেন না। যদি পছন্দ হতো খেতেন, নতুবা রেখে দিতেন। তিনি কোনো বিষয়কে জটিল করতেন না।'

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি নয় বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমত করেছি। এ দীর্ঘ সময়ে কখনও এমন হয় নি যে, আমি কোনো কাজ করেছি আর তিনি বলেছেন, তুমি একাজ কেন করেছ? তিনি কখনও আমার কোনো দোষ ধরেন নি। আল্লাহর কসম! কখনও আমার কোনো কাজে বিরক্ত হয়ে তিনি 'উফ' শব্দটিও উচ্চারণ করেন নি। কত মহান তার চরিত্র! আমাদেরও তো এমন হওয়া উচিত।'

এ আলোচনার মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে এ আহ্বান জানাচ্ছি না যে, কারও কোনো ভুল হলে উপদেশ দেবেন না কিংবা নীরব দর্শকের ভূমিকা

পালন করে যাবেনএমন না; বরং আমার উদ্দেশ্য হলো, প্রত্যেক বিষয়ে বিশেষ করে পার্থিব বিষয়ে দোষ-ত্রুটি খোঁজার মানসিকতা পোষণ করবেন না; এসব বিষয় দেখেও না দেখার ভান করার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

মনে করুন, আপনার কাছে কোনো মেহমান আসল। আপনি তাকে স্বাগত জানিয়ে ড্রয়িংরুমে নিয়ে গেলেন। চা-নাস্তা পরিবেশন করলেন। সে চা নিয়েই বলে উঠল, 'কাপটা ভরে দিলেন না?'

আপনি বললেন, 'আরেকটু বাড়িয়ে দেব?'

সে বললো, 'আরে না, না। চলবে।

এরপর সে পানি চাইল। আপনি পানির গ্লাস এগিয়ে দিলেন। পানি পান করে সে বললো, 'পানিটা তো খুব গরম!'

তারপর এসির দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনাদের এসিটা তো তেমন ঠাণ্ডা না!' এভাবে সে সবকিছুতে খুঁত খুঁজে বেড়াতে লাগল।

বলুন, এ ধরনের ব্যক্তির উপস্থিতি কি আপনি বোঝা মনে করবেন না? আপনি কি চাইবেন না, সে আপনার বাড়ি থেকে এখনি চলে যাক এবং আর কখনও না আসুক?

মানুষ এতো বেশি সমালোচনা পছন্দ করে না। তাই যদি কারও দোষ-ত্রুটি নিয়ে কথা বলতেই হয় তাহলে সুন্দর ও আকর্ষণীয় মোড়কে আবৃত করে তা উপস্থাপন করুন। সমালোচনার আঙ্গিকে না বলে পরামর্শের আঙ্গিকে কিংবা পরোক্ষভাবে তা তুলে ধরুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও কারও কোনো ভুল-ত্রুটি দেখলে সরাসরি তাকে কিছু বলতেন না। তিনি তাকে শুনিয়ে সবাইকে লক্ষ্য করে বলতেন, 'লোকদের যে কী হলো! তারা এমন এমন কাজ করে!'

একবার তিনজন যুবক খুব আগ্রহ নিয়ে মদিনায় আসল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল রাসূলের ইবাদত ও নামাযের অবস্থা সম্পর্কে জানবে এবং সেভাবে আমল করবে।

তারা গোপনে নবীপত্নীদের কাছে এ সম্পর্কে জানতে চাইলে তাদেরকে তা জানালেন যে, 'তিনি কোনোদিন রোযা রাখেন, কোনোদিন রাখেন না। রাতের কিছু অংশ বিশ্রাম নেন, বাকি অংশে নামায আদায় করেন।'

তারা মনে করেছিল রাসূল ﷺ সব সময় রোযা রাখেন এবং সারারাত নামায পড়েন। নবীপত্নীদের কাছ থেকে তাদের ধারণার চেয়ে কম এবাদতের কথা জেনে তখন তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, 'তিনি তো আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তার পূর্বাপর সব ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন। তার সাথে কি আমাদের তুলনা চলে?

এরপর তারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন প্রতিজ্ঞা করতে লাগল।

একজন প্রতিজ্ঞা করলো, 'আমি কখনো বিয়ে করব না। ইবাদতের সুবিধার্থে চিরকুমার হয়ে থাকব!'

আরেকজন প্রতিজ্ঞা করলো, 'আমি আজীবন রোযা রেখে যাবো!'

তৃতীয়জন প্রতিজ্ঞা করলো, 'আমি রাতে ঘুমাব না। সারারাত জেগে থেকে ইবাদত-বন্দেগি করব!'

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানার পর মিম্বরে উঠে বসলেন। তারপর হামদ ও সালাতের পর বললেন, 'ওদের কী হলো! যারা এমন এমন কথা বলে! লোকদের কী হলো! তারা এমন এমন কথা বলে! আমি তো নামায পড়ি, আবার ঘুমাই। কখনও রোযা রাখি আবার কখনও রাখি না। আমি বিয়ে করেছি। এটা আমার সুন্নত। সুতরাং যে আমার সুন্নত থেকে বিমুখ হবে, সে আমার অনুসারী নয়।'

রাসূল ﷺ কিন্তু নাম উল্লেখ করে বা নির্দিষ্টভাবে কাউকে লক্ষ্য করে বলেন নি যে, 'অমুকের অমুকের কী হলো!'

আরেকদিন রাসূল ﷺ লক্ষ্য করলেন, তার সঙ্গে নামায আদায়কারী কিছু ব্যক্তি নামাযের মধ্যেই আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল। অথচ এটা ভুল। সঠিক পদ্ধতি হলো নামাযে দাড়ানো অবস্থায় দৃষ্টি সাজদার স্থানে রাখা।

নামায শেষে রাসূল ﷺ বললেন, 'লোকদের কী হলো! তারা নামাযের মধ্যে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে!'

কিন্তু এরপরও তারা বিরত হলো না। আগের মতোই করতে লাগল। তবুও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে কটাক্ষ করলেন না কিংবা নাম ধরে কিছু বললেন না; বরং বললেন, 'তারা যদি একাজ থেকে বিরত না থাকে তাহলে তাদের দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে যেতে পারে।'

বারীরা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন মদিনার একজন ক্রীতদাসী। তিনি মুনিবের কাছে স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছায় আবেদন করলেন। মুনিব এর বিনিময়ে কিছু অর্থ-কড়ি দাবি করলো। বারীরা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে এলেন এবং অর্থসাহায্য চাইলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'তুমি চাইলে আমি তোমার মুনিবকে তার দাবি অনুযায়ী অর্থ পরিশোধ করব। তবে তোমার পরিত্যাজ্য সম্পদের স্বত্ব আমার থাকবে'। বারীরা তার মুনিবকে বিষয়টি জানালেন। কিন্তু সে পরিত্যাজ্য সম্পদের স্বত্বত্যাগে অস্বীকৃতি জানাল। সে দুই দিক থেকেই লাভবান হতে চাইল। বিনিময়ে মূল্যও নেবে, আবার পরিত্যাজ্য সম্পদের স্বত্বও ভোগ করবে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পদের মোহ এবং একজন অসহায় নারীর মুক্তিতে বাধ সাধার প্রবণতা দেখে আশ্চর্য হলেন।

তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কে বললেন, 'তুমি তাকে কিনে মুক্ত করে দাও। তার পরিত্যাজ্য সম্পদের স্বত্ব তোমারই থাকবে। কেননা, ক্রীতদাস-দাসীর পরিত্যাজ্য সম্পদের স্বত্ব মুক্তিদাতারই থাকে।' সুতরাং, তাদের অবৈধ ও অন্যায় শর্তের প্রতি লক্ষ্য কর না।

এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'লোকদের কী হলো? তারা লেনদেনের সময় এমন সব শর্ত আরোপ করে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই। আল্লাহর কিতাব-বহির্ভূত শর্ত আরোপ করলে তার কোনো বৈধতা নেই। তা একশ বার বললেও এর কোনো কার্যকারিতা নেই।'

এখানেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারও নামধাম উল্লেখ করে বলেন নি যে, 'অমুকের কী হলো!'।

অতএব, যদি কারও দোষ-ত্রুটি আলোচনা করতেই হয় তাহলে দূর থেকে লাঠি দিয়ে ইঙ্গিত করুন। লাঠি দিয়ে আঘাত করতে যাবেন না। প্রত্যক্ষভাবে না বলে পরোক্ষভাবে বলুন।

আপনার স্ত্রী যদি ঘরের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে উদাসীন হয় তাহলে আপনি তাকে এভাবে বলুন, 'গতরাতে অমুক বন্ধুর বাড়িতে ছিলাম। সবাই তার বাড়ির পরিচ্ছন্নতার প্রশংসা করলো ইত্যাদি' আপনার ছেলে মসজিদে গিয়ে নামায আদায়ে উদাসীন তাকে যদি আপনি বলেন, 'আমাদের প্রতিবেশী অমুকের ছেলেটাকে অনেক ভাল লাগে। সে সব সময় জামাতে

নামায আদায় করে।' তাহলে তা কি অতি উত্তম সংশোধন হবে না? এভাবে বলার অর্থ হলো, শ্রোতাকে বলা হচ্ছে, 'হে শ্রোতা! তোমাকেই বলছি। তুমি মনযোগ দিয়ে কোনো।'

আপনি আমাকে এ প্রশ্ন করতে পারেন যে, 'মানুষ সমালোচনা পছন্দ করে না কেন?'

এর উত্তর হচ্ছে, মানুষ সমালোচনাকে নিজের জন্য অবমাননাকর ও অপূর্ণতা মনে করে। মানুষ চায় নিজের পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্ব।

কথিত আছে, সরল প্রকৃতির একজন লোক একবার নিজেকে কর্তৃত্বশালী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইল। এ উদ্দেশ্যে সে পানির দু'টি ফ্লাক্স নিল। একটি লাল অপরটি সবুজ। ফ্লাক্স দুটিতে ঠাণ্ডা পানি ভরল এবং মানুষের চলাচলের পথে বসে চিৎকার করতে লাগল, 'ঠাণ্ডা পানি! ফ্রি ঠাণ্ডা পানি!'।

পিপাসিত কোনো ব্যক্তি এগিয়ে এসে নিজ হাতে গ্লাসে পানি ঢেলে পান করতে সবুজ ফ্লাক্সের দিকে হাত বাড়ালে পানিওয়ালা সে ব্যক্তি বলতো, 'না, না, লাল ফ্লাক্স থেকে নাও!' সে লাল ফ্লাক্স থেকে পান করত। কেউ এগিয়ে এসে লাল ফ্লাক্স থেকে পান করতে চাইলে তাকে বলত, 'এটা থেকে না, সবুজটা থেকে পান করুন।

একদিন একজন আপত্তি করে বললো, 'দুই ফ্লাক্সের পানির মধ্যে পার্থক্য কী?' সে উত্তর দিল, 'পানি আমার। আমার কথা মতো ভাল লাগলে পান কর, নয়তো চলে যাও!'

এটাই মানুষের প্রকৃতি। মানুষ সবসময় চায় তাকে সবাই মূল্যায়ন করুক, গুরুত্ব দিক। তার কথা মেনে চলুক।

মাছি ও মৌমাছি ...!!
মাছি হবেন না, মৌমাছি হোন।
মৌমাছি শুধু পরিষ্কার ও সুগন্ধযুক্ত বস্তুতেই বসে,
নোংরা বস্তুকে এড়িয়ে চলে। তাই সবাই তার মধুতে হয় তৃপ্ত।
আর মাছি, সে তো কেবল রক্ত আর পুঁজের সন্ধানে থাকে।
তাই সবাই তার প্রতি হয় বিরক্ত।



৩২. শাসনের মেজায পোষণ করবেন না!!

তিনজন পিতা নিজ নিজ সন্তানকে পরীক্ষার দিন টেলিভিশনের সামনে বসা দেখলো। এবার তাদের আচরণ তুলনা করুন।

প্রথমজন তার সন্তানকে বললো, 'মোহাম্মদ! তোমার পরীক্ষার পড়া রিভিশন দাও।'

দ্বিতীয়জন বললো, 'মাজেদ! এখন যদি পরীক্ষার পড়া না পড়, তাহলে তোমাকে মারব। তোমাকে আর কোনো টাকা পয়সা দেয়া হবে না।

তৃতীয়জন তার সন্তানকে বললো, 'সালেহ! এখন তোমার জন্য টিভি দেখার চেয়ে পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করা বেশি দরকার। তাই না বাবা?'

একটু ভাবুন, বাবাদের মধ্যে কার বাচনভঙ্গি সবচেয়ে সুন্দর?

আপনি অবশ্যই বলবেন, তৃতীয়জনের । কেননা, সে বিষয়টাকে পরামর্শের ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছে।

স্ত্রীর সঙ্গেও এমন আচরণ করা উচিত। স্ত্রীকে বলতে পারেন, 'সারা! যদি তুমি চা তৈরী করতে!' খালেদা! আশা করি, আজ আমরা খুব ভোরে নাস্তা করব ইত্যাদি।

তদ্রূপ কাউকে কোনো ভুল করতে দেখলে এমন পদ্ধতিতে সংশোধন করুন, যেন সে নিজেই বিষয়টি নিয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ হয়। মনে করুন, আপনার ছেলে নামাযের সময় মসজিদে অনুপস্থিত থাকে।

আপনি বলতে পারেন, 'সাদ! তুমি কি জান্নাতে যেতে চাও?'

'অবশ্যই, আব্বু!'।

'তাহলে তোমাকে নামাযের প্রতি যত্নবান হতে হবে।'

নববী যুগের একটি ঘটনা । মরুভূমিতে জনৈক বেদুইনের তাবুতে তার স্ত্রী প্রসববেদনায় ছটফট করছিল। স্বামী তার শিয়রে বসে সন্তান ভূমি'হওয়ার অপেক্ষা করছে।

স্ত্রীর প্রসববেদনা তীব্র থেকে তীব্রতর হলো । একপর্যায়ে চরমে পৌঁছল। সন্তান ভূমি'হলো। কিন্তু দেখা গেল ভূমি'সন্তানের গায়ের রং কালো! লোকটি একবার নিজের দিকে তাকাল। এরপর স্ত্রীর দিকে তাকাল। না,

তাদের কেউ তো কালো নয়। তারা উভয়ে ফর্সা । সে আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল, 'তাহলে সন্তানের গায়ের রং কালো হলো কেন?'

অভিশপ্ত শয়তান আর দেরি করলো না। তার অন্তরে সন্দেহের জাল বুনতে শুরু করলো। 'এ সন্তান তোমার নয়! কৃষ্ণ বর্ণের কোনো দুশ্চরিত্র তোমার স্ত্রীর সঙ্গে অপকর্ম করেছে এবং এতে সে গর্ভবতী হয়েছে! আর তাই সে ...।

লোকটি মদিনায় আল্লাহর রাসূলের দরবারে উপস্থিত হলো। তার চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ। সাহাবায়ে কিরাম অনেকেই তখন রাসূলের দরবারে উপস্থিত ছিলেন। লোকটি বলতে শুরু করলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্ত্রী একটি কালো ছেলে প্রসব করেছে। অথচ আমার বংশে কোনো কালো লোক নেই।'

হুজুর ﷺ লোকটির দিকে তাকালেন। তিনি চাইলে লোকটিকে অন্যের প্রতি সুধারণা পোষণ করার এবং স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ না করার বিষয়ে নসীহত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি এক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের জন্য ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। তিনি চাচ্ছিলেন সে নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করুক।

তিনি তার সামনে এমন একটি উদাহরণ পেশ করলেন যাতে তার প্রশ্নের উত্তর নিহিত ছিল। প্রশ্নের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেই দৃষ্টান্তটি কী ছিল?

তিনি কি সাধারণ কোনো গাছের দৃষ্টান্ত পেশ করছেন? না খেজুর গাছের? না রোম-পারস্যের?

না, এসব কোনো কিছুর উদাহরণ তিনি দেন নি। তিনি তার দিকে তাকালেন। একজন সহজ-সরল বেদুঈনের অবয়ব তার সামনে ফুটে উঠল। তার কপালে চিন্তার ভাঁজ। স্ত্রীর সতীত্ব নিয়ে তার মনে নানা প্রশ্ন।

তিনি তাকে বললেন, 'তোমার কোনো উট আছে?'

'জ্বী হ্যাঁ, আছে'।

'কী রঙের'?

'লাল রঙের'।

'তোমার উটের পালে কালো রঙের কোনো উট আছে?'

'না'।

'ছাই রংয়ের আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'তাহলে ছাই রঙের উট কোত্থেকে এলো?!'

রাসূল তাকে বোঝাতে চাইলেন, 'পালের নর-মাদী সব উট যখন লাল রঙের, অন্য কোনো রঙের উট নেই, তখন লাল উটনী ছাই রঙের বাচ্চা কিভাবে প্রসব করলো?' উষ্ট্রশাবকের রং তার মাতা-পিতার রং থেকে ভিন্ন কিভাবে হলো?

লোকটি কিছুক্ষণ চিন্তা করলো। এরপর বললো, 'সম্ভবত তার শিরা তা আকর্ষণ করেছে!' অর্থাৎ উটনীটির পূর্ববর্তী বংশে কারও রং এমন ছিল। আর সেই বংশগত জিন বা হরমোনের প্রভাবে এমন হয়েছে।

এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সম্ভবত তোমার এ সন্তানের রংও পূর্ববর্তী কারও প্রভাবে কালো হয়েছে।

লোকটি এ উত্তর শুনে কিছুক্ষণ চিন্তা করলো। 'এ উত্তর তো তারই উত্তর, এ চিন্তা যেন তারই চিন্তা।' সন্দেহমুক্ত ও সন্তুষ্ট মনে সে স্ত্রীর কাছে ফিরে গেল।

আরেকদিনের ঘটনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সামনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ভাল কাজ সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আলোচনার একপর্যায়ে তিনি বললেন, 'তোমাদের স্ত্রীসম্ভোগও সওয়াবের কাজ।' সাহাবায়ে কিরাম আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'হে আল্লাহর রাসূল! কেউ তার স্ত্রীর সঙ্গে যৌনবাসনা পূর্ণ করলেও সওয়াব পাবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি উত্তর না দিয়ে এমন কথা বললেন, যেন তারা নিজেরাই জবাব বের করতে পারে। নতুন করে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে না হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আচ্ছা বলো তো, কেউ যদি অবৈধভাবে যৌনকামনা পূরণ করে, তাহলে কি তার গোনাহ হবে না?'

তারা বললো, 'অবশ্যই।'

এবার রাসূল ﷺ বললেন, 'তাহলে হালাল ও বৈধ পদ্ধতিতে তা করলে কেন সাওয়াব হবে না?'

অন্যের সাথে সাধারণ কথাবার্তার সময়ও প্রথমে এমন বিষয় উপস্থাপন করুন, যে ব্যাপারে আপনারা উভয়ে একমত।

রাসূল ﷺ ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। সঙ্গে চৌদ্দশত সাহাবীর বিশাল এক কাফেলা। কুরাইশরা তাদেরকে মক্কায় প্রবেশে বাধা দিল। রাসূল ﷺ এবং কুরাইশদের মাঝে কয়েক দফা আলোচনা হলো। অবশেষে উভয় পক্ষ একটা সমঝোতা চুক্তিতে আবদ্ধ হলো।

চুক্তির শর্তাবলী নির্ধারণের জন্য কুরাইশদের পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হলো সুহাইল বিন আমর। আল্লাহর রাসূল ﷺ তার সঙ্গে চুক্তির বিভিন্ন ধারা নিয়ে একমত হলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধারা হলো:

১. মুসলমানরা এবার ওমরা না করেই মদিনায় ফিরে যাবে।

২. মক্কাবাসীদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় হিজরত করতে চাইলে মদিনার মুসলমানগণ তাকে মদিনায় আশ্রয় দিতে পারবে না।

৩. মদিনার কেউ ইসলাম ত্যাগ করে মক্কায় মুশরিকদের কাছে আশ্রয় চাইলে তারা তাকে আশ্রয় দেবে। তাকে ফেরত দেয়া হবে না।

চুক্তিতে এ জাতীয় আরও কিছু শর্ত ছিল, যা বাহ্যত মুসলমানদের জন্য অবমাননাকর ও পরাজয়ের নামান্তর।

প্রকৃতপক্ষে কুরাইশরা মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের কারণে ভীত-স্বন্ত্রস্ত ছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, মুসলমানরা চাইলে এখনি মক্কা জয় করতে পারে।

তাই বাধ্য হয়ে কুরাইশরা সমঝোতার চুক্তি করলো।

অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম এ ধরনের শর্তকে অবমাননাকর মনে করলেন। কিন্তু তারা আপত্তি করবেন, এটা তো কল্পনাই করা যায় না। কেননা, তারা জানতেন, এ চুক্তি যিনি সম্পাদন করেছেন তিনি নিজের ইচ্ছায় কিছুই করেন না। তার সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হয় ওপর থেকে।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অস্থিরতায় ছটফট করছিলেন আর ডানে বামে তাকাচ্ছিলেন। আর ভাবছিলেন তিনি যদি কিছু করতে পারতেন। তিনি কিছুতেই নিজেকে সংযত রাখতে পারছিলেন না। তাই আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে ছুটে গেলেন এবং এ বিষয়ে তার সাথে মতবিনিময় করতে চাইলেন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন প্রজ্ঞাবান ও দূরদর্শী। তিনি আবূ বকরের কাছে গিয়ে প্রথমেই অভিযোগ পেশ করলেন না; বরং প্রথমে এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন, যাতে উভয়ে একমত। তিনি আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে এমন কিছু প্রশ্ন করলেন, যার উত্তরে কেবল 'হ্যাঁ', 'অবশ্যই', 'ঠিক' এসব শব্দই বলতে হবে!

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রশ্ন করলেন, 'আবূ বকর! তিনি কী আল্লাহর রসূল নন'?

আবূ বকর : 'অবশ্যই'।

ওমর: 'আমরা কি মুসলমান নই?'

আবূ বকর: 'অবশ্যই।'

ওমর:'তারা কি মুশরিক নয়?'

আবূ বকর: 'অবশ্যই।'

ওমর:'আমরা কি সত্যের অনুসারী নই?'

আবূ বকর: 'অবশ্যই।'

ওমর:'তারা কি অসত্যের অনুসারী নয়?'

আবূ বকর: 'অবশ্যই।'

ওমর:'তাহলে আমরা কেন দ্বীনকে অবমূল্যায়িত করব?'

আবূ বকর: 'ওমর! তিনি কি আল্লাহর রাসূল নন?'

ওমর:'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

আবূ বকর: ''তাহলে তার অনুশাসন দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি-তিনি আল্লাহর রাসূল'।'' অর্থাৎ সেলাইয়ের ফোঁড় যেভাবে ধারাবাহিকভাবে একটি আরেকটির অনুসরণ করে, কখনও বিপরীতমুখী হয় না; তুমিও তেমনই তার নিঃশর্ত অনুসরণ কর, কখনও তার বিরোধিতা কর না।'

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি-তিনি আল্লাহর রাসূল'।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছ থেকে চলে এলেন । তিনি আত্মসংবরণ করতে চাইলেন কিন্তু পারলেন না। অস্থিরচিত্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন-

'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল নন?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম: 'হ্যাঁ, অবশ্যই!'

ওমর: 'আমরা কি মুসলমান নই?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম: 'হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে!'

ওমর:'তারা কি মুশরিক নয়?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম: 'হ্যাঁ, অবশ্যই!'

ওমর:'তাহলে কেন আমরা দ্বীনের অবমাননা মেনে নেব?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। অতএব আমি কখনও তাঁর নির্দেশ অমান্য করব না। আর তিনি আমাকে কখনও ধ্বংস করবেন না।'

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। চুক্তি কার্যকরী হলো। মুসলমানরা মদিনায় ফিরে গেলেন।

একসময় কুরাইশরা নিজেরাই চুক্তি ভঙ্গ করলো। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয় ও বাইতুল্লাহকে মূর্তিমুক্ত করার উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পারলেন, তার সেদিনের আপত্তি সঠিক ছিল না।

পরবর্তীতে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, 'সেদিনের সে কথাগুলোর কারণে আমি বহু রোযা রেখেছি, সদকা করেছি, নফল নামায পড়েছি এবং গোলাম আযাদ করেছি। আল্লাহ যেন আমার সে ভুল ক্ষমা করে দেন।'

কত চমৎকার ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বোধ ও আচরণ! এবং তারচেয়েও বেশি সুন্দর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বোধ ও আচরণ!

বলার এ দক্ষতাকে আমরা কীভাবে আরও বেশি কাজে লাগাতে পারি?

Contents

আপনার সন্তান হয়তো কুরআন হেফজ করতে আগ্রহী নয়। আপনি তার আগ্রহ বৃদ্ধি করতে চাচ্ছেন। প্রথমে এমন বিষয়ে আলোচনা শুরু করুন, যাতে আপনারা উভয়ে একমত। যেমন আপনি বলতে পারেন-

'তুমি কি চাও না আল্লাহ তোমাকে ভালবাসুন?'

'তুমি কি চাও না জান্নাতে তুমি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী হও?'

উত্তরে সে অবশ্যই বলবে, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!'

এখন আপনি পরামর্শের ভঙ্গিতে তাকে উপদেশ দিন, হলে তো তোমাকে কুরআন হেফজের ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে।'

তদ্রূপ স্ত্রীকে পর্দার ব্যাপারে শিথিলতা করতে দেখলে প্রথমে এমন বিষয়ে কথা বলতে শুরু করুন, যে ব্যাপারে সে আপনার সঙ্গে একমত।

আপনি বলুন, 'আমি জানি তুমি একজন মুসলিম নারী। ভাল ও কল্যাণের প্রতি আগ্রহী।'

তখন সে বলবে, 'অবশ্যই! আলহামদুলিল্লাহ!'

'আমি জানি তুমি একজন পুতঃপবিত্র ও সংযমী নারী। তুমি আল্লাহকে ভালবাস।'

সে তখন বলবে, 'হ্যাঁ, অবশ্যই!'

এবার আপনি পরামর্শের আঙ্গিকে তাকে বলুন, 'তাহলে তুমি পর্দার প্রতি যদি আরেকটু গুরুত্ব দিতে। যদি পর্দায় থাকার প্রতি আরো যত্নবান হতে। তাহলে তো তোমারই ভাল হতো।'

হ্যাঁ, এভাবেই কারও মনে সামান্য আঘাতও না দিয়ে আমরা মানুষ থেকে কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি অর্জন করতে পারি।

একঝলক ...

মৌচাক না ভেঙেও আপনি মধু খেতে পারেন।



৩৩. ভারসাম্য রক্ষা করুন

আপনি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। একজন শিক্ষক সকালে প্রায়শ দেরি করে আসে। আপনি তাকে কিভাবে সতর্ক করবেন? এভাবে বলুন, 'শিক্ষকতার পেশা বেছে নেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। ছাত্রদেরকে বোঝানোর চমৎকার যোগ্যতা আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন। ছাত্ররা আপনাকে অত্যন্ত ভালবাসে এবং শ্রদ্ধা করে। তবে আমি আশা করি, আপনি সকালে সব সময় দেরি করে আসবেন না।'

সন্তানদের পোশাকের ব্যাপারে আপনার স্ত্রী খুব অসচেতন। আপনি তাকে সতর্ক করতে চান। খোঁচা না দিয়ে এভাবে বলুন: 'তুমি নিজে দেখতে খুব সুন্দরী। মাশাআল্লাহ! ঘরও বেশ পরিপাটি। সংসার ও সন্তানদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে গিয়ে তোমাকে অনেক কষ্ট করতে হয় এটা আমি অস্বীকার করি না। তারপরও আমি আশা করি সন্তানদের পোশাকের প্রতি তুমি আরও যত্নবান হবে।'

বস্তুতঃ মানুষের সঙ্গে একজন সদাচারী ব্যক্তির কথার স্টাইল এমনই হওয়া উচিত। যে ভুল করে ফেলেছে তার সামনে প্রথমে তার ভাল ও সুন্দর দিকগুলো উল্লেখ করবেন। এরপর তার ভুল সম্পর্কে সতর্ক করবেন। এটিই ভারসাম্যপূর্ণ আচরণের দাবি।

যখনই আপনি কোনো অপরাধী ব্যক্তির কোনো দোষ-ত্রুটি দেখবেন, প্রথমে তার ভাল দিকগুলো স্মরণ করার চেষ্টা করুন। আপনার সামনের ব্যক্তিটির প্রতি আপনার ধারণা ভাল। এটা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করুন।

যখন তার কোনো ভুল সম্পর্কে তাকে সতর্ক করবেন তখন সে যেন না ভাবে যে, আপনার দৃষ্টিতে সে অনেক ছোট ও তুচ্ছ হয়ে গেছে কিংবা আপনি তার ভাল কাজগুলোর কথা ভুলে গেছেন এবং শুধু মন্দ কাজগুলোর কথাই মনে রেখেছেন।

তার প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ যেন এমন হয় যে, সে যেন ভাবতে পারে, 'আপনি তার ভাল গুণগুলোও মনে রাখেন। রাসূল ﷺ সাহাবীদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন। কারণ, তিনি তাদের সঙ্গে উন্নত ও উৎকৃষ্ট আচরণশৈলী প্রয়োগ করতেন।

একবার তিনি সাহাবীদের মাঝে কিছুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে হচ্ছিল, তিনি কোনো কিছু গভীরভাবে ভাবছেন কিংবা কোনো কিছুর প্রতীক্ষায় আছেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, 'বর্তমান সময়টা হলো মানুষের কাছ থেকে ইলম ও জ্ঞান ছিনিয়ে নেয়ার সময়। এর বিরুদ্ধে মানুষ কিছুই করতে পারবে না।'

অর্থাৎ মানুষ কুরআন ও তার শিক্ষা হতে বিমুখ হবে । শরীয়তের ইলমের প্রতি উদাসীন হয়ে যাবে। তা শেখার প্রতি কারো আগ্রহ থাকবে না এবং কেউ তা বুঝতেও সক্ষম হবে না। ফলে তা মানুষের অন্তর থেকে উঠে যাবে।

এ কথা শুনে মহান সাহাবী যিয়াদ বিন লাবীদ আনসারী দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি খুব আগ্রহভরে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! ইলম কীভাবে আমাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে? আমরা তো বর্তমানে কুরআন তিলাওয়াত করি । ভবিষ্যতেও নিজেরা কুরআন তেলাওয়াত করব এবং আমাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে তা শিক্ষা দেব।'

রাসূল ﷺ তার দিকে তাকালেন। দেখলেন ধর্মীয় চেতনা, উদ্দীপনা ও আত্মমর্যাদাবোধে টইটম্বুর টগবগে এক যুবক। তিনি তার বোধ ও চিন্তাশক্তিকে আরও শানিত করতে চাইলেন।

তিনি বললেন, 'যিয়াদ! এ কী বলছ তুমি, আমি তো তোমাকে মদিনার অন্যতম ফকীহ ও প্রাজ্ঞ হিসেবে জানি।' এ কথা বলে রাসূল ﷺ সকলের সামনে যিয়াদের প্রশংসা করলেন। তাকে মদিনার অন্যতম ফকীহ ব্যক্তিত্ব হিসেবে অভিহিত করলেন। এটি হলো যিয়াদের ভাল এবং উত্তম গুণের আলোচনা। তার আলোকিত দিকের কথা।

এরপর বললেন, 'দেখ, তাওরাত ও ইঞ্জীল ইহুদি-খৃস্টানদের কাছে বিদ্যমান আছে। কিন্তু তা তাদের কী কাজে আসে?'

অর্থাৎ রাসূল তাকে বোঝাতে চাচ্ছিলেন, 'কুরআন বিদ্যমান থাকা আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং আসল উদ্দেশ্য হলো কুরআন তিলাওয়াতের পাশাপাশি তার অর্থ বোঝা এবং সে অনুযায়ী আমল করা।' সাহাবীদের সঙ্গে আল্লাহর রাসূলের আচরণ এমনই ভারসাম্যপূর্ণ ছিল।

আরেকদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ আরবের কয়েকটি গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাদের ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেন। প্রজ্ঞাপূর্ণ, চিত্তাকর্ষক কথার মাধ্যমে তিনি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। আহবান জানালেন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে।

তাদের মধ্যে একটি গোত্রের নাম ছিল 'বনু আবদুল্লাহ'। তিনি তাদেরকেও আল্লাহর দিকে আহ্বান করলেন । তাদের সামনে উত্তম আদর্শ তুলে ধরলেন। তিনি বললেন, 'হে বনু আবদুল্লাহ! আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের পিতৃপুরুষের নামটিকে সুন্দর করেছেন।' তোমরা 'বনু আবদুল উযযা' নও, 'বনু আবদুল লাত'ও নও; বরং তোমরা হলে 'বনু আবদুল্লাহ'। তোমাদের নামের মধ্যে কোনো শিরক নেই। অতএব তোমরা ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নাও।

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর একটি উত্তম বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি মানুষের কাছে পরোক্ষ বার্তা পাঠাতেন । বার্তায় তিনি তাদের প্রতি তার ভাললাগা, কল্যাণকামিতা ও অনুভূতির কথা বলতেন। চিঠি ও বার্তা যখন প্রাপকের কাছে পৌঁছত তখন অনেক সময় তা সরাসরি দাওয়াতের চেয়েও বেশি প্রভাব ফেলত।

খালিদ বিন ওয়ালিদ ছিলেন একজন বীরযোদ্ধা । তিনি সাধারণ কোনো বীর ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একজন দুঃসাহসী মহান বীর। যুদ্ধের ময়দানে তার মূল্য ছিল অপরিসীম। সে রণক্ষেত্রে থাকলে প্রতিপক্ষকে অনেক হিসাব কষতে হতো। আল্লাহর রাসূল ﷺ আন্তরিকভাবে তার ইসলাম গ্রহণ কামনা করতেন। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব? খালিদ তো মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিটি যুদ্ধে অগ্রগামী সৈনিক। মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধে সে পিছপা হয় নি; বরং উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজিত হওয়ার অন্যতম কারণ হলো খালিদ বিন ওয়ালিদের কৌশলী ভূমিকা।

একদিন রাসূল ﷺ তার সম্পর্কে বললেন, 'সে যদি আমাদের কাছে আসত তাহলে আমরা অবশ্যই তাকে মূল্যায়ন করতাম এবং অন্যদের চেয়ে তাকে প্রাধান্য দিতাম।'

এ কথার প্রভাব কেমন ছিল?

এটা জানতে আমাদেরকে একটু পিছনে ফিরে তাকাতে হবে। খালিদ তখন ইসলামের চরম শত্রু। কট্টরপন্থী কাফের এবং কাফের দলের শীর্ষস্থানীয় সেনানায়ক। সুযোগ পেলেই রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো এবং রাসূলকে হত্যার উদ্দেশ্যে ওঁৎ পেতে বসে থাকত। এরই মধ্যে একসময় আল্লাহর রাসূল ﷺ মুসলমানদের নিয়ে ওমরা করার জন্য হুদাইবিয়া পর্যন্ত আসলেন।

খালিদ মুশরিকদের একদল অশ্বারোহী নিয়ে রওয়ানা করলো। এক পর্যায়ে উসফান নামক স্থানে আল্লাহর রাসূল ও সাহাবীদের সঙ্গে মুখোমুখি হলো। খালিদ কাছেই দাঁড়িয়ে রাসূলের ওপর তীর নিক্ষেপ করার কিংবা তরবারী দিয়ে আঘাত করার সুযোগ খুঁজছিল।

সে ওঁৎ পেতে সুযোগের অপেক্ষা করছিল। ইত্যবসরে আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবীদের নিয়ে জামাতের সাথে জোহরের নামায আদায় করলেন। তারা এ সুযোগে হামলা করতে চেয়েছিল। কিন্তু সুবিধা করতে পারল না। আল্লাহর রাসূল শত্রুদের অপতৎপরতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাই তিনি আসরের নামায যুদ্ধকালীন পদ্ধতিতে আদায় করলেন। অর্থাৎ সাহাবীদের দু'দলে ভাগ করে একদলকে পাহারায় রেখে অপর দলকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। বিষয়টি খালিদ ও তার সঙ্গীদের মনে প্রভাব ফেলল। সে মনে মনে ভাবল, 'এ লোক তো খুব সংরক্ষিত।' এখানে নিশ্চয় এমন কোনো সত্তা আছেন, যিনি তাকে হেফাযত করেন এবং সবধরণের ক্ষতি হতে তাকে নিরাপদ রাখেন।

তারপর আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবীদের নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং ঝামেলা এড়াতে ডান দিকের পথ ধরে চলতে লাগলেন, যেন খালিদ এবং তার সঙ্গীদের মুখোমুখি না হতে হয়। আল্লাহর রাসূল হুদাইবিয়ায় পৌঁছে কুরাইশদের সঙ্গে পরবর্তী বছর ওমরা করার জন্য সন্ধিচুক্তি করলেন। তারপর মদিনায় ফিরে এলেন।

খালিদ লক্ষ্য করে দেখলো, দিনে দিনে আরবে কুরাইশদের মান-মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস পাচ্ছে। সে মনে মনে ভাবতে লাগল, 'অবশিষ্ট আর কী আছে? আমি কোথায় যাব? কার কাছে যাব?'

'আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর কাছে? না! সে তো মোহাম্মদের অনুসারী হয়ে গেছে। মোহাম্মদের সঙ্গীরা তার আশ্রয়ে নিরাপদে থাকে।'

'তবে কি সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে যাব? নাহ! তার কাছেও যাওয়া যাবে না।'

নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করে খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করব? না ইহুদী ধর্ম? না-কি আরবের বাইরে কোথাও গিয়ে বসবাস করব?' এভাবে খালিদ চিন্তিত ও দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিল। এ অবস্থায় এক বছর পার হয়ে গেল। মুসলমানদের ওমরার সময় সমাগত হলো। তারা মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

রাসূল ﷺ মক্কায় প্রবেশ করলেন। যে মুসলমানদেরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সে তার জানপ্রাণ সব নিয়োজিত করেছে সে মুসলমানদেরকে এহরাম পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশের দৃশ্য খালিদ সহ্য করতে পারল না। সে মক্কা থেকে বের হয়ে গেল। যে চারদিন রাসূল ﷺ ওমরা আদায়ের জন্য মক্কায় অবস্থান করলেন, সেই চারদিন মক্কার বাইরে অবস্থান করলো। ওমরা সম্পাদন করে আল্লাহর রাসূল ﷺ মক্কার পথ-ঘাট আর ঘর-বাড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করছিলেন। অতীতের পুরোনো স্মৃতিগুলো তার স্মৃতির এ্যালবামে ভেসে উঠছিল। এই সে মক্কা! যেখানে তিনি জন্ম নিয়েছেন, বেড়ে উঠেছেন, কৈশোর ও যৌবন পেরিয়ে নবুয়ত পেয়েছেন। এই সেই হেরা গুহা! যেখানে তিনি ধ্যানমগ্ন হতেন। এই সেই মক্কা! যেখানে ইসলাম ও শান্তির পথে আহ্বান জানানোর 'অপরাধে' তাকে ও তার অনুসারীদেরকে চরমভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল। তাঁর স্মৃতিপটে ভেসে ওঠল এখানকার বাসিন্দাদের অনেকের প্রতিচ্ছবি। ভেসে ওঠল বীর সৈনিক খালিদ বিন ওলিদের প্রতিমূর্তি। খালিদের ভাই ওলিদ বিন ওলিদের দিকে তাকালেন। ওলিদ ছিলেন মুসলমান। তিনি আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে ওমরা করার জন্য এসেছিলেন।

রাসূল ﷺ ইসলামের প্রতি আহ্বান সম্বলিত একটি পরোক্ষ বার্তা খালিদের কাছে পাঠাতে চাইলেন।

Contents

তিনি ওলিদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'খালিদ কোথায়?' ওয়ালিদ তাৎক্ষণিক জবাব দিলেন, 'ইয় রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা তাকে অবশ্যই ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসবেন।'

রাসূল বললেন, 'তার মতো বিচক্ষণ মানুষ ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারে না। সে যদি তার শক্তি ও ক্ষিপ্রতা মুসলমানদের পক্ষে ব্যবহার করত তাহলে এটা তার জন্য অনেক মঙ্গলজনক হতো।'

এরপর রাসূল ﷺ বললেন, 'যদি সে আমাদের কাছে আসে তাহলে আমরা অবশ্যই তাকে মূল্যায়ন করব এবং অন্যদের চেয়ে তাকে প্রাধান্য দেব।'

এ কথা শুনে ওলিদের খুশির সীমা রইল না। সে মক্কার বিভিন্ন স্থানে খালিদকে তালাশ করতে লাগল। কিন্তু কোথাও তাকে পেল না। তাই সে মদিনায় ফিরে আসার আগে তার ভাইয়ের কাছে একটি চিঠি লিখল।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। পরকথা হলো, তুমি এখনো ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে আছ। আমার কাছে এরচেয়ে আশ্চর্যের আর কিছু নেই। তোমার মতো বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ মানুষ মক্কায় আর কয়জন আছে? বল তো, ইসলামের মতো মহান সম্পদ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা কি তোমার সাজে? আল্লাহর রাসূল আমাকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন, 'খালিদ কোথায়? আমি বললাম, 'আল্লাহ তায়ালা তাকে অচিরেই আমাদের নিকট নিয়ে আসবেন।' তিনি বলেছেন, 'তার মতো বিচক্ষণ মানুষ ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারে না। সে যদি তার শক্তি ও ক্ষিপ্রতা মুসলমানদের পক্ষে ব্যবহার করত তাহলে এটা তার জন্য অনেক মঙ্গলজনক হতো।'

তিনি আরো বলেছেন, 'যদি সে আমাদের কাছে আসে তাহলে আমরা অবশ্যই তাকে মূল্যায়ন করব এবং অন্যদের চেয়ে তাকে প্রাধান্য দেব।'

কাজেই ভাই আমার! যেসব সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে তার কথা না ভেবে সামনের কথা চিন্তা কর। ক্ষতিপূরণে সচেষ্ট হও। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নাও।

খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'চিঠিটি হাতে পেয়ে আমার ভেতর কুফরির অন্ধকার থেকে বের হয়ে ইসলাম গ্রহণ করার এক আশ্চর্য উদ্যম সৃষ্টি হলো।

বিশেষত রাসূল আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন এ বিষয়টি আমাকে পুলকিত করলো। এরই মধ্যে একদিন স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন এক সংকীর্ণ-উষর ভূমিতে অবস্থান করছিলাম। সেখান থেকে বের হয়ে এক প্রশস্ত-সবুজ ভূমিতে গেলাম। আমি মনে মনে ভাবলাম, এটা নিশ্চয় সত্য স্বপ্ন।

আল্লাহর রাসূলের কাছে যাওয়ার জন্য দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হওয়ার পর আমি ভাবতে লাগলাম, 'এমন কেউ কি আছে যে, আমার এ মোবারক সফরের সঙ্গী হবে?' এরই মধ্যে সাফওয়ান বিন উমাইয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। আমি তাকে বললাম, 'আবূ ওয়াহাব! তুমি কি চিন্তা করেছ আমরা কিসের মধ্যে আছি?'

'আমাদের অবস্থা তো মাড়ির দাঁতের ন্যায় যাদের একটি অপরটিকে পেষণ করে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। আরব-অনারবে সর্বত্র মোহাম্মদ বিজয়ীবেশে আবির্ভূত হচ্ছে। যদি আমরা তার কাছে গিয়ে তার অনুসারী হয়ে যাই তাহলে আমরাও মোহাম্মদের মর্যাদায় অংশীদার হব।'

সাফওয়ান কঠিনভাবে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো এবং বললো, 'আমি ছাড়া আর যদি সবাই তার অনুসারী হয়ে যায় তবুও আমি তার অনুসারী হব না।

আমি তার কাছ থেকে সরে এলাম। মনে মনে ভাবলাম, 'সে তো যুদ্ধবিধ্বস্ত ব্যক্তি। তার পিতা ও ভাই বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছে। সে ইসলামের অনুসারী হবে না।'

এরপর ইকরিমা বিন আবূ জাহলের সাথে দেখা হলো। তাকেও অনুরূপ প্রস্তাব দিলাম। সেও আমাকে সফওয়ানের মতো জবাব দিল।

আমি তাকে বললাম, 'তাহলে মোহাম্মদের কাছে আমার এই গমনের কথা কাউকে বল না।

সে বললো, 'ঠিক আছে আমি কাউকে বলব না।' এরপর আমি বাড়িতে ফিরে এলাম এবং বাহন নিয়ে রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে ওসমান বিন তালহার সাথে দেখা হলো। মনে মনে ভাবলাম, 'ইনি আমার বন্ধু। আমি যা আশা করছি, তা তাকে বলে দেখি কী বলে। কিন্তু মুসলমানদের সাথে

বিভিন্ন যুদ্ধে তার যেসব আত্মীয়-স্বজন নিহত হয়েছে, তাদের কথা স্মরণ হলে আমি তার সঙ্গে আলোচনা না করার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে ভাবলাম, 'এ ব্যাপারে কিছু বলা আমার জন্য সমস্যা নয়। কেননা, আমি এখন মক্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

তারপর আমি তাকে কুরাইশদের বর্তমান পরিণতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললাম, 'আমাদের অবস্থা এখন গর্তে আটকে পড়া সেই শিয়ালের ন্যায়, গর্তে পানি ঢালা হলে যে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হবে।' আমি তাকে সে কথাগুলোও বললাম, যা ইতোপূর্বে সাফওয়ান ও ইকরিমাকে বলেছিলাম। সে দ্রুত আমার আহ্বানে সাড়া দিল এবং আমার সঙ্গে মদিনায় যাওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানাল।

আমি বললাম, 'আমি তো আজই বের হব। আমি মদিনায় যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। পথের পাথেয় ও বাহন সব প্রস্তুত করে ফেলেছি।

খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমরা পরস্পর ওয়াদাবদ্ধ হলাম যে, 'ইয়াজাজ' নামক স্থানে আমরা একত্র হব। সে আগে পৌঁছলে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। আর আমি আগে পৌঁছলে সেখানে অবস্থান করে তার জন্য অপেক্ষা করব।'

কুরাইশরা জেনে ফেলবে এ আশঙ্কায় আমি রাতের শেষ প্রহরে বাড়ি থেকে বের হলাম। ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ার আগেই আমরা উভয়ে ইয়াজাযে মিলিত হলাম। এরপর দ্রুত পথ চলে 'হাদ্দাহ' নামক স্থানে পৌঁছতেই আমর ইবনুল আসের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাত হলো। সেও উটে চড়ে কোথাও যাচ্ছিল।

আমাদের দেখে সে বললো, 'স্বাগতম হে কাফেলা! কোথায় যাচ্ছ?'

আমরা বললাম, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

সে পাল্টা প্রশ্ন করলো, 'আগে বল, তোমরা কোথায় যাচ্ছ?'

আমরা বললাম, 'ইসলাম গ্রহণ করতে এবং মোহাম্মদের অনুসারী হতে যাচ্ছি।'

সে বললো, 'এ উদ্দেশ্যই তো আমি বের হয়েছি!'

আমরা তিনজন একত্রে মদিনায় প্রবেশ করলাম এবং হাররার কাছে যাত্রা বিরতি করলাম। আল্লাহর রাসূলকে আমাদের আগমণ সংবাদ দেয়া হলো। তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন। আমি আমার সবচেয়ে ভাল পোশাকটি পরিধান করে আল্লাহর রাসূলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। খবর পেয়ে আমার ভাই এগিয়ে এলো। তার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হলো। সে বললো, 'জলদি এসো! আল্লাহর রাসূলকে তোমাদের আগমন সংবাদ দেয়া হয়েছে। তিনি তোমাদের আগমনে খুশি হয়েছেন। তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।' আমরা দ্রুত রাসূলের দরবারে উপস্থিত হলাম। দূর থেকে আমাকে দেখেই তিনি মুচকি হাসছিলেন। সামনে গিয়ে দাঁড়ানো পর্যন্ত তার মুখে হাসির আভা লেগেই ছিল। আমি তাকে সালাম দিলাম। তিনি হাসিমুখে জবাব দিলেন।

আমি বললাম, আশহাদু আল লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।'

তিনি বললেন, 'আলহামদু লিল্লাহ! সকল প্রশংসা ঐ মহান সত্তার , যিনি তোমাকে হেদায়েত দান করেছেন। আমি তোমাকে একজন প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী ব্যক্তি হিসেবে জানি। তাই আশা করতাম, তোমার বিবেক তোমাকে কেবল কল্যাণের দিকেই ধাবিত করবে।'

আমি বললাম, 'আল্লাহর রাসূল! আপনার বিরুদ্ধে যে সকল স্থানে উপস্থিত হয়েছি সেগুলোকে সত্যের বিরুদ্ধাচরণ বলে মনে হয়। অতএব, আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'ইসলাম পূর্ববর্তী যাবতীয় অপরাধ মোচন করে দেয়।'

আমি বললাম, 'আল্লাহর রাসূল! তবুও আমার জন্য ইসতেগফার ও ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

রাসূল ﷺ দোয়া করলেন-

«اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ كُلَّ مَا اَوْضَعَ فِيْهِ مَنْ صَدَّ عَنْ سَبِيْلِكَ»

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনার পথে বাধাদানসহ খালিদ বিন ওয়ালিদের যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করে দিন।'

এরপর খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু পরিণত হলেন ইসলামের অন্যতম মহান ব্যক্তি হিসেবে।

তার ইসলাম গ্রহণ ছিল আল্লাহর রাসূলের একটি পরোক্ষ বার্তার মাধ্যমে। কত চমৎকার সহনশীলতা, বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞা ছিল আল্লাহর রাসূলের! মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে আমাদেরও এ নববী দক্ষতার অনুসরণ করা উচিত।

আপনি কোনো ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে সিগারেট বিক্রি হতে দেখলেন। মালিককে সতর্ক করতে চাইলে প্রথমে তার দোকানের ডেকোরেশন ও পরিচ্ছন্নতার প্রশংসা করুন। তার ব্যবসার উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য দোয়া করুন। এরপর হালাল উপার্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে তাকে সচেতন করুন। এর ফলে সে অনুভব করবে যে, আপনি চশমার কালো আয়না দিয়ে তাকে দেখেন নি; বরং লাঠিটির মাঝখানেই ধরেছেন! তার সাথে ভারসাম্যপূর্ণ কথা বলেছেন।

কথাবার্তায় বিচক্ষণ হোন। সামনের মানুষটির কোনো ভাল গুণ খুঁজে বের করে তা দিয়ে মন্দ আচরণগুলোকে ঢেকে দিন। অন্যের প্রতি সুধারণা পোষণ করুন। তাহলে দেখবেন আপনার ভারসাম্যপূর্ণ আচরণের কারণে অন্যরা আপনাকে ভালবাসতে শুরু করবে।

একপলক ...

কোনো মানুষ যখন দেখবে
আমরা তার মন্দ গুণগুলোর পাশাপাশি
উত্তম গুণগুলোও দেখছি তখন
সে আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে।



৩৪. ভুলের সমাধান করুন সহজভাবে

ছোট বড় অনেক ধরনের অনেক ভুলই মানুষ করে থাকে। ভুল যত বড় হোক তার সমাধান সম্ভব। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, কখনও কখনও শতভাগ সমাধান করা যায় না। তবে বেশির ভাগ সমস্যার সমাধান করা যায়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ভুল শোধরানোর চেষ্টাই করে না। তারা মনে করে ভুল যা হওয়ার হয়ে গেছে, এটা আর ঠিক হবে না।

কখনও কখনও অপরাধীর সঙ্গে আমরা এমন আচরণ করি যে, সেটাও অপরাধের রূপ পরিগ্রহ করে। আমার ছেলে কোনো অপরাধ করে ফেললে তাকে এমনভাবে তিরস্কার করি এবং তার সামান্য ভুলটাকে এত বড় করে তুলে ধরি যে, তার কাছে মনে হয়, সে এমন কুয়োয় পড়ে গেছে যা থেকে বাঁচার কোনো পথ নেই। ফলে সে সমাধানের আশা ছেড়ে দিয়ে ভুলের মধ্যেই ডুবে থাকে।

স্ত্রী কোনো ভুল করে ফেললে কিংবা বন্ধু কোনো অন্যায়ে জড়িয়ে পড়লে যদি আমি তাকে বোঝাতে পারি যে, ভুল করলেও তার সমাধানের পথ খোলা আছে তাহলে ভুলের প্রতিবিধান সহজ হয়ে যায়। বস্তুত ভুলের মধ্যে ডুবে থাকার চেয়ে সঠিক পথে ফিরে আসাই তো কাম্য।

জনৈক ব্যক্তি হিজরতের বায়াত হতে মহানবী ﷺ-এর কাছে এসে বললো, 'আমি হিজরতের বায়াত হতে এসেছি। কিন্তু আমি চলে আসার কারণে বাড়িতে আমার বাবা-মা কান্নাকাটি করছেন। নবী ﷺ তাকে তিরস্কার করলেন না, তার মনোভাবকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যও করলেন না। কারণ, লোকটি তো ভালো উদ্দেশ্যেই এসেছে এবং তার কাজকে সে সঠিক মনে করেছে।

রাসূল ﷺ তাকে বোঝালেন, তার সমস্যার সমাধান কঠিন নয়, সহজ। তিনি তাকে সুন্দর করে বললেন, ঠিক আছে, তোমার বাবা-মার কাছে ফিরে যাও। তাদেরকে যেহেতু তুমি কাঁদিয়ে এসেছ এখন গিয়ে তাদের মুখে হাসি ফোটাও।'

রাসূল ﷺ বৈচিত্র্যময় আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের মাঝে কল্যাণকর আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করতেন। তিনি তাদেরকে ভালো কাজে অগ্রগামী

হওয়ার শিক্ষা দিতেন। এমনকি তারা যদি মারাত্মক কোনো অন্যায়ও করে ফেলতো তবুও তাদেরকে বোঝাতেন, তারা ভালো ও কল্যাণ থেকে দূরে সরে যায় নি।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। ঘটনার শেষ অংশটুকু আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলেও পুরো ঘটনাটি অত্যন্ত উপকারী হওয়ায় এখানে তা শুরু থেকেকেই উল্লেখ করছি।

রাসূল ﷺ কোথাও সফরে যেতে চাইলে স্ত্রীদের নামের লটারী দিতেন। লটারীতে যার নাম উঠত সফরে তাকেই সঙ্গে নিতেন।

'বনু মুসতালিক' এর যুদ্ধে যাওয়ার সময় লটারী দিলে আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর নাম ওঠে। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যাত্রা করলেন। এর আগেই পর্দার বিধান নাযিল হয়েছে। তিনি উটের পিঠের হাওদাতে আরোহণ করতেন। কাফেলার লোকজন কোথাও যাত্রা বিরতি করলে তিনি তার হাওদা থেকে নেমে প্রয়োজন পূরণ করতেন। পুনরায় যাত্রা শুরুর আগে তিনিও তাতে চড়ে বসতেন।

যুদ্ধ শেষে রাসূল ﷺ মদিনায় ফিরে আসার উদ্দেশ্যে কাফেলা নিয়ে মদিনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। কাফেলা চলতে চলতে মদিনার উপকণ্ঠে এসে যাত্রাবিরতি করলো। তখন ছিল রাত। তারা রাতের কিছু সময় সেখানে অবস্থান করলো। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কোনো প্রয়োজনে হাওদা থেকে নামলেন। তার গলায় একটি মূল্যবান 'হার' ছিল। প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করার সময় তার অজান্তে গলার হারটি ছিঁড়ে কোথাও পড়ে গিয়েছিল। রাতের শেষ প্রহরে রাসূল ﷺ পুনরায় যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ আসবাবপত্র গুছিয়ে নিতে লাগলেন।

এদিকে তিনি উটের হাওদাতে প্রবেশ করতে গিয়ে গলায় হাত দিয়ে অনুভব করলেন যে, হারটি নেই।

তিনি দ্রুত সে স্থানের দিকে গেলেন, যেখানে তিনি প্রয়োজন পূরণ করেছিলেন। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর তার হারটি পেয়ে হাওদার কাছে ফিরে এলেন। কিন্তু হায়! হাওদা তো সেখানে নেই।

লোকজন তাঁর হাওদা উটের পিঠে রেখে উট নিয়ে চলে গেলেন। তাঁরা ভেবেছিল, তিনি হাওদাতেই আছেন। কাফেলাও চলতে লাগল।

ঘটনার পরবর্তী অংশ স্বয়ং আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ভাষাতেই শুনুন।

আমি দ্রুত কাফেলার অবস্থানস্থলে ফিরে এসে দেখলাম, সেখানে কেউ নেই সবাই চলে গেছে! আমি সেখানে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। ভাবলাম, পরবর্তী মঞ্জিলে লোকেরা আমাকে না পেয়ে শীঘ্রই এখানে ফিরে আসবে। বড় চাদর দিয়ে আমি আমার শরীর ভালোভাবে ঢেকে বসে থাকলাম।

একসময় ঘুমের প্রবল চাপে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লাম। আমি যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, আল্লাহর শপথ! ঠিক সে সময় সাফওয়ান বিন মুআত্তাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। জরুরি কোনো কাজে তিনি পেছনে থেকে গিয়েছিলেন। তিনি রাতে কাফেলার সাথে ছিলেন না।

দূর থেকে ঘুমন্ত মানুষের আবছায়া দেখে তিনি এগিয়ে এলেন। কাছে আসতেই তিনি আমাকে চিনে ফেললেন। কারণ, পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, 'ইন্নালিল্লাহ!... আল্লাহর রাসূলের স্ত্রী!?'

আমি তার শব্দ শুনে জেগে উঠলাম। তাকে দেখে আমি চাদর দিয়ে চেহারা ঢেকে ফেললাম। আল্লাহর শপথ! তিনি আমার সঙ্গে একটি কথাও বলেন নি। আমিও তার 'ইন্নালিল্লাহ...' শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনি নি।

এরপর তিনি তার বাহন জন্তুকে বসিয়ে দিলেন। আমি তাতে আরোহণ করলে তিনি উটের রশি ধরে লোকদের খোঁজে দ্রুতপদে চলতে লাগলেন।

আল্লাহর কসম! ভোর হওয়া পর্যন্ত আমরা কারও দেখা পেলাম না। কাফেলার কেউ আমার অনুপস্থিতির বিষয়টি অনুভব করতে পারল না। আমরা কাফেলাকে একস্থানে বিশ্রামরত অবস্থায় পেলাম। হঠাৎ লোকটি এসে উটের রশি ধরে টানতে লাগল।

এরপর অপবাদ আরোপকারীরা বিভিন্ন কথা রটাল। বাহিনীর লোকজন এটা শুনে চমকে উঠলেন। অথচ আল্লাহর শপথ! আমি এর কিছুই জানি না।

আমরা মদিনায় পৌঁছলাম। মদিনায় এসে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। লোকদের এসব রটনার কিছুই তখন আমার কানে পৌঁছে নি।

অবশ্য আল্লাহর রাসূল ﷺ ও আমার বাবা-মার কানে সে সব কথা পৌঁছেছিল। তারা যদিও কিছুই আমাকে জানাননি কিন্তু আমার প্রতি আল্লাহর রাসূলের স্বাভাবিক ভালোবাসায় কিছুটা ঘাটতি অনুভব করতে লাগলাম।

এর আগে যখনই আমি কোনো কষ্ট বা অসুস্থতায় ভুগতাম তখন তিনি আমাকে যে ধরনের মায়া-মমতা দেখাতেন সে মুহূর্তে তিনি এমন কিছুই করলেন না। এ সময় যখনই তিনি আমার কাছে আসতেন তখন তিনি কেবল এতটুকু জিজ্ঞেস করতেন, 'কেমন আছ?' এর বেশি আর কিছুই বলতেন না। আমি রাসূলের আচরণে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম।

এ কারণে আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অনুমতি দিলে আমি মায়ের কাছে চলে যেতাম, তিনি আমার শুশ্রূষা করতেন।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই।'

আমি মায়ের কাছে চলে গেলাম। তখনও আমি সেসব অপবাদ সম্পর্কে কিছুই জানি না। অসুস্থ অবস্থায় এভাবে প্রায় বিশ দিনেরও বেশি কেটে গেল। এ দীর্ঘ সময়ের পরে একদিন আমার ব্যথা কিছুটা লাঘব হলো। সে সময়ে একরাতে কোনো প্রয়োজনে আমি বাইরে বের হলাম। সঙ্গে ছিলেন আমার পিতার খালাত বোন 'উম্মে মিসতাহ'। তিনি আমার সঙ্গে পথ চলছিলেন। হঠাৎ দ্রুত চলতে গিয়ে নিজের গায়ের চাদরের সাথে লেগে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলেন বা পড়ে গেলেন । এরপর তিনি বলে উঠলেন, 'মিসতাহর সর্বনাশ হোক!'

আমি বললাম, 'আল্লাহর শপথ! আপনি একি বলছেন? আপনি একজন বদরি সাহাবিকে গালি দিচ্ছেন?'

তিনি বললেন, 'হায় আফসোস! বেটি! সে কী বলেছে তুমি কি কিছুই কোনো নি?'

'হে আবূ বকরের কন্যা! তোমার কাছে কি কোনো খবরই পৌঁছে নি!?

আমি বললাম, 'কিসের খবর?'

তখন তিনি আমাকে অপবাদ আরোপকারীদের রটানো মিথ্যাচার সম্পর্কে সব জানালেন।

আমি বললাম, 'আসলে কি এমন রটানো হয়েছে!?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, বেটি! আল্লাহর কসম! এমনই রটেছে!'

আল্লাহর কসম! এ কথা শোনার পর আমি আর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে পারলাম না। অস্থির হয়ে ফিরে এলাম। আমার অসুস্থতা আরও বেড়ে গেল। আমি কান্না আর থামাতে পারলাম না। মনে হচ্ছিল, এ কান্না আমাকে নিঃশেষ করে দেবে। মাকে বললাম, 'আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! লোকদের অপবাদ সম্পর্কে জেনেও আপনি আমাকে কেন জানালেন না?'

তিনি বললেন, বেটি! এটা তো মামুলি একটা বিষয়! স্বামী যদি তার সুন্দরী স্ত্রীকে ভালোবাসে। আর তার যদি অনেক সতীন থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে তো অনেক কিছুই রটবে!'

আমি বললাম, 'সুবহানাল্লাহ! মানুষ এসব কথা বলাবলি করছে?'

সে রাতে অশ্রুর নোনা জলে অবগাহন করে আমার প্রভাত হলো। রাতভর অশ্রুধারা অবিরত প্রবাহিত হয়েছে। ক্ষণিকের জন্যও চোখে ঘুম আসে নি।

এ হলো আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর অবস্থা। তাঁর ওপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। অথচ তার বয়স তখনও পনেরোর কোঠা পার হয় নি। অথচ তিনি একজন পূতঃপবিত্র, সচ্চরিত্র ও সংযমি নারী। সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে পবিত্র সত্তার জীবনসঙ্গীনী। তিনি ছিলেন পর্দাবৃতা নারী। নিজ চরিত্রে কখনো সামান্য আঁচড় লাগতে দেন নি। অথচ আজ তিনি পিত্রালয়ে অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়ে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছেন।

আর আল্লাহর রাসূলের সে সময়ের অবস্থা হলো, তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর চিন্তা-কষ্টকে লাঘব করার কোনো ব্যবস্থা নেন নি। তাকে এ ব্যাপারে কোনো জিজ্ঞাসাবাদও করেন নি। জিবরাঈল (আ.) কোনো ওহী নিয়ে অবতরণ করেন নি, কুরআনের কোনো আয়াতও অবতীর্ণ হয় নি। রাসূল

ﷺ বিষয়টি নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিলেন। নিজের স্ত্রী সম্পর্কে কানাঘুষা ও অপবাদ তাঁর ওপর ভারী বোঝার মতো চেপে বসেছিল।

এ অবস্থা যখন দীর্ঘ হলো তখন একদিন রাসূল ﷺ খোতবা দিলেন। খোতবায় তিনি বললেন, 'হে লোকজন! তাদের কথা আর কী বলব যারা আমার পরিবারকে নিয়ে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে এবং তাদের বিরুদ্ধে অসত্য কথা বলে বেড়াচ্ছে। অথচ আল্লাহর কসম! আমি তাদেরকে সৎ ও নিরপরাধ বলেই জানি। তারা এমন লোককে নিয়ে অপবাদ দিচ্ছে- আল্লাহর কসম! যার সম্পর্কে আমার ধারণা ভালো। সে কোনোদিন আমার অনুপস্থিতিতে আমার ঘরে প্রবেশ করে নি।'

এ কথাগুলো শুনে আওস গোত্রপ্রধান সা'দ বিন মুআয দাঁড়িয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা যদি আওস সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে তাদের ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট। আর যদি আমাদের খাযরাজ সম্প্রদায়ের হয়ে থাকে তাহলে বলুন, আমাদেরকে নির্দেশ দিন, তাদের গর্দান উড়িয়ে দিতে আমাদের বেগ পেতে হবে না।'

খাযরাজ গোত্রপ্রধান সা'দ ইবনে ওবাদা এ কথা শুনে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি একজন সৎ লোক ছিলেন। কিন্তু বংশীয় মর্যাদাবোধে তিনি ফুলে উঠেছিলেন।

তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, "আল্লাহর কসম! তুমি অসত্য বলছ, তাদের গর্দান উড়ানো হবে না। তারা যে খাযরাজ গোত্রের লোক এ কথা তুমি কিভাবে বললে? তারা যদি তোমার গোত্রের হতো তাহলেও কি তুমি এ কথা বলতে?"

এবার উসায়েদ বিন হুযাইর দাঁড়িয়ে বললেন, 'তুমি মিথ্যা বলছ! আল্লাহর কসম, তাকে আমরা হত্যা করব। তুমি তো দেখি মুনাফিক হয়ে মুনাফিকদের পক্ষে সাফাই গাইছ!'

তারপর লোকজন উত্তেজিত হয়ে গেল। একপর্যায়ে হাতাহাতির উপক্রম হলো। রাসূল ﷺ তখন মিম্বরে ছিলেন। তিনি তাদেরকে বিরত হতে বললেন। এতে সবাই থামল। রাসূল ﷺও আর কোনো কথা না বলে মিম্বর থেকে নেমে ঘরে চলে গেলেন।

রাসূল ﷺ যখন নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, সাধারণ লোকদেরকে বলে বিষয়টির সমাধান সম্ভব নয়, তখন তিনি পরিবারস্থ বিশেষ বিশেষ লোকদের নিয়ে বিষয়টি সমাধান করতে চাইলেন। তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে ডেকে পরামর্শ চাইলেন।

ওসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খুব প্রশংসা করে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তো আপনার পরিবারকে সৎ ও ভালো জানি। এসব ডাহা মিথ্যা ও অপবাদ।'

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! মহিলার কি অভাব আছে? আপনি তার পরিবর্তে অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারেন। তবে এ ব্যাপারে সত্য উদঘাটন করতে চাইলে আপনি কোনো দাসীকে জিজ্ঞেস করুন। সে তো অবশ্যই আপনার সঙ্গে সত্য বলবে।'

তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বারীরাকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'বারীরা! আয়েশার মধ্যে তুমি কি কখনও সন্দেহজনক কিছু পেয়েছ?'

বারীরা বললো, 'জ্বী না। যিনি আপনাকে নবী করে পাঠিয়েছেন সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, আমি তাকে ভালোই জানি। কিছুতেই আমি আয়েশাকে দোষারোপ করতে পারি না। সে অল্প বয়সী একটি মেয়ে। অনেক সময় এমন হতো যে, আমি আটার মণ্ড তৈরি করে তাকে বলতাম, 'এগুলো তোমার দায়িত্বে থাকল, খেয়াল রেখ।' কিন্তু সে ঘুমিয়ে পড়ত আর বকরি এসে তা খেয়ে ফেলত!

ক্রীতদাসী বারীরা রাদিয়াল্লাহু আনহা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর প্রতি কিভাবে সন্দেহ পোষণ করতে পারেন? আয়েশা তো সে সতী-সাধ্বী মেয়ে শিশুকাল থেকে যাকে সযত্নে লালন-পালন করেছেন উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম মুমিন সিদ্দীকে আকবার আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, যাকে বিয়ে করেছেন শ্রেষ্ঠতম মানব রাসূল ﷺ।

সংশয় ও সন্দেহ কীভাবে আসতে পারে? তিনি যে আল্লাহর রাসূলের প্রিয়তম স্ত্রী। রাসূল ﷺ তাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসেন। সে নিষ্কলুষ, পূতঃপবিত্র। অবশ্য আল্লাহ তাআলা তার মর্যাদা সমুন্নত করার জন্য এবং তাকে চির অমর করার জন্য পরীক্ষা করছেন।

অসহ্য যন্ত্রণায় আয়েশার দিন কাটছে। দিন দিন দুঃখ-কষ্ট বেড়ে যাচ্ছে। তিনি রোগশয্যায় ছটফট করছেন। পানাহার করতে ভালো লাগছে না।

আল্লাহর রাসূল সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট সাহাবিদের সামনে খোতবা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে উল্টো মুসলমানদের মাঝে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার উপক্রম হলো। ঘরোয়াভাবে আলী ও ওসামাকে ডেকে সমাধানের চেষ্টা করলেন। তাতেও কোনো ফল বের হলো না। পরিস্থিতি যখন এ অবস্থায়, তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টিকে আয়েশার মাধ্যমেই নিষ্পত্তি করতে চাইলেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'আমি সে দিন এতো কেঁদেছি যে, আমার অশ্রুধারা থামে নি। চোখে ঘুম আসে নি। পরবর্তী রাতও অবিরাম অশ্রুধারা আর নিদ্রাহীন চোখ নিয়ে কাটালাম। আমার বাবা-মা ভাবছিলেন, এ কান্না আমাকে নিঃশেষ করে দেবে।'

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য আবূ বকরের বাড়িতে গেলেন। অনুমতি নিয়ে তার ঘরে প্রবেশ করলেন। আয়েশার বাবা-মা তার শিয়রের পাশেই ছিলেন। জনৈক আনসারী মহিলাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অপবাদ আরোপকারীদের রটানো মিথ্যাচারের পর এ প্রথম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকরের বাড়িতে এলেন। প্রায় একমাস যাবৎ তিনি আয়েশাকে দেখেন নি এবং এ দীর্ঘ সময়ে আয়েশার ব্যাপারে কোনো ওহীও অবতীর্ণ হয় নি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশার কাছে গেলেন। তখন তিনি শয্যাশায়ী। অবিরাম কান্না আর মানসিক দুশ্চিন্তার ফলে তিনি কাটা মুরগীর ন্যায় ছটফট করছেন।

যখনই তিনি কাঁদেন, উপস্থিত মহিলাটিও তার সঙ্গে কাঁদেন। তারা কেউ কিছু করতে পারছেন না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বসলেন। আল্লাহর প্রশংসাবাক্য পাঠ করলেন। এরপর বললেন, 'হামদ ও সালাতের পর হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে আমার কাছে কিছু কথা পৌঁছেছে।' এ কথা বলে তিনি অপবাদের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করলেন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশাকে বলতে চাইলেন যে, মানুষের কখনও কখনও ভুল হয়ে যায় আর ভুলের সমাধান কঠিন কিছু নয়। তাই তাকে বললেন, 'কোনো! তুমি

যদি দোষমুক্ত হয়ে থাক, তাহলে অতিসত্বর আল্লাহ তোমাকে অপবাদমুক্ত ঘোষণা করবেন। আর আল্লাহ না করুন যদি তুমি কোনো গোনাহে জড়িত হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাওবা কর। বান্দা যখন অপরাধ স্বীকার করে তওবা করে তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।' জটিল কোনো প্রক্রিয়ায় না গিয়ে এভাবেই তিনি তার ভুলের সহজ সমাধান দিলেন।

আয়েশা বলেন, 'রাসূল ﷺ যখন কথা শেষ করলেন, দুঃখের ভারে আমি যেন পাথর হয়ে গেলাম। আমার চোখের জল একেবারে শুকিয়ে গেল। আমি অপেক্ষা করছিলাম যে, আমার পক্ষ থেকে আমার মা-বাবা জবাব দিবেন। কিন্তু তারাও একেবারে নীরব ছিলেন।

আব্বাকে বললাম, 'আল্লাহর রাসূলকে আমার পক্ষ থেকে উত্তর দিন।'

তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি রাসূলকে কী বলব বুঝতে পারছি না।'

আম্মাকে বললাম, 'আল্লাহর রাসূলকে আমার পক্ষ থেকে উত্তর দিন।'

তিনিও বললেন, 'আল্লাহর শপথ! কী উত্তর দেব আমি জানি না।

আল্লাহর শপথ! আবূ বকরের পরিবারের ওপর তখন যে বিপদ আপতিত হয়েছিল আমি জানি না অন্য কোনো পরিবারের ওপর কখনও তা আপতিত হয়েছে কি-না! বাবা-মা উভয়ে যখন নিরুত্তর রইলেন তখন আমি কেবল অশ্রুপাত করতে লাগলাম।

এরপর আমি বললাম, 'না! আল্লাহর শপথ! এ বিষয়ে আমি কখনও আল্লাহর কাছে তওবা করব না।'

'আমি জানি, কথাগুলো শুনতে শুনতে আপনাদের অন্তরে গেঁথে গেছে এবং আপনারা তা বিশ্বাস করে নিয়েছেন। এখন যদি আমি আপনাদের বলি যে, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ (আল্লাহ অবশ্যই জানেন আমি নির্দোষ) তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না! আর যদি আমি বিষয়টা স্বীকার করে নিই (অথচ আল্লাহ জানেন, আমি তা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত) তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন। এ মুহূর্তে আমি আমার ও আপনাদের দৃষ্টান্ত হিসেবে শুধু তাই বলবো যা ইউসুফ (আ.) এর পিতা বলেছিলেন-

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ.

অর্থ : ধৈর্যই আমার একমাত্র অবলম্বন। তোমরা যেসব কথা তৈরি করেছ, সে ব্যাপারে আল্লাহই আমার সাহায্যকারী।' (সূরা ইউসুফ : আয়াত-১৮)

আয়শা বলেন, এরপর আমি পাশ ফিরে বিছানায় শুয়ে রইলাম। আমি জানি, আমি নির্দোষ। আল্লাহ অবশ্যই আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করবেন। তবে এ ধারণা আমি কখনও করি নি যে, আল্লাহ তায়ালা আমার পক্ষে ওহী অবতীর্ণ করবেন। আমার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ওহী অবতীর্ণ করবেন আর তা পঠিত হবে এটা আমি কল্পনাও করি নি। আমি আশা করছিলাম, আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ)-কে স্বপ্নের মাধ্যমে আমার নিষ্কলুষতা সম্পর্কে অবহিত করবেন।

আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসূল তখনও মজলিস ত্যাগ করেন নি, উপস্থিত কেউ তখনও ঘর থেকে বের হন নি, এমন সময় রাসূল ﷺ-এর ওপর সে ভাব সৃষ্টি হলো, যা ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় হতো। এরপর তার উপর ওহী নাযিল হলো।

ওহী অবতীর্ণ হতে দেখে (আল্লাহর কসম) আমি শঙ্কিত হলাম না। আমি জানি, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমার আল্লাহ আমার উপর জুলুম করবেন না।

ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আয়েশার প্রাণ যখন রাসূল ﷺ থেকে ওহী অবতীর্ণ হওয়া কালিন ভাব কেটে গেল তখন আমি খেয়াল করলাম, আমার পিতা-মাতার প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম হলো। তারা আশংকা করলেন, না জানি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের এসব কথাকে বাস্তব হিসেবে প্রত্যয়ন করা হয়।

ওহী অবতীর্ণ হওয়া কালিন ভাব কেটে যাওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর রাসূল হাসতে লাগলেন। এরপর তিনি চেহারা থেকে ঘাম মুছলেন। তারপর সর্বপ্রথম তিনি যে কথাটি বললেন তা হলো, 'হে আয়েশা! তোমার জন্য সুসংবাদ । তোমাকে নির্দোষ ঘোষণা করে আল্লাহ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করেছেন।'

আমি বললাম, 'আলহামদুলিল্লাহ!'

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা যে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছেন তা হলো,

إِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۗ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ۗ بَلْ هُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ۚ وَ الَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ
مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ لَوْ لَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ
بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّ قَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ. لَوْ لَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ
شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ.

অর্থ : যারা এ অপবাদ রচনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল; একে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে কারো না; বরং এটা তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর; তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের কৃত পাপকর্মের ফল এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য আছে মহাশাস্তি।

যখন তারা এটা শুনল তখন মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিন নারীগণ আপন লোকদের সম্পর্কে কেন ভাল ধারণা করলো না এবং বললো না, 'এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ।'

তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন স্বাক্ষী উপস্থিত করে নি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করে নি, সে কারণে তারা আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী।

(সূরা নূর : আয়াত-১১-১৩)

আর তাদের সম্পর্কে কঠিন হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন-

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ
فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ : যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মান্তিক শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। (সূরা নূর : আয়াত-১৯)

এরপর রাসূল ﷺ সবাইকে ডেকে খোতবা দিলেন এবং সদ্য অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতগুলো তাদেরকে তিলাওয়াত করে শোনালেন। এরপর

অপবাদ আরোপকারীদের ওপর 'মিথ্যা অপবাদ দেয়ায় শরিয়তের শাস্তি প্রয়োগ করলেন।

এ ঘটনা থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তা হলো, একজন অপরাধী একজন রোগীর ন্যায়, অবিলম্বে তার চিকিৎসা প্রয়োজন। নিন্দা ও ভর্ৎসনা করা এবং বাড়া-বাড়ি করা মোটেই সমীচীন নয়। কেননা,, কখনও অবস্থা এ পর্যায়ে পৌঁছে যে, এর ফলে সে মনে করতে পারে, তার ভুল বা অপরাধের কারণে সবাই খুশি হয়েছে। যে চিকিৎসক রোগীর চেয়েও রোগীর প্রতি অধিক সচেতন তিনিই হিতাকাঙ্ক্ষী চিকিৎসক। যেমন রাসূল ﷺ বলেছেন,

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا مَثَلِيْ وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِيْ تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيْهَا فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيْهَا فَاَنَا اٰخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَهُمْ تَقْتَحِمُوْنَ فِيْهَا.

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'আমার ও অন্যদের দৃষ্টান্ত হলো, জনৈক ব্যক্তি আগুন জ্বালাল। যখন তার চারপাশ আলোকিত হয়ে গেল তখন প্রজাপতি ও বিভিন্ন কীট-পতঙ্গ তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। লোকটি সর্বশক্তি দিয়ে সেগুলোকে বিরত রাখতে চাচ্ছেন কিন্তু সেগুলো তার বাধা অমান্য করে দলেদলে তাতে ঝাপিয়ে পড়ছে! আমিও তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করে যাচ্ছি। কিন্তু তোমরা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছ।' (বুখারী-৬৪৮৩)

মতামত...

কখনও অপরাধীর সঙ্গে আমাদের আচরণ এমন হয় যে,

তা সে অপরাধের চেয়েও বড় অপরাধে পরিণত হয়।



৩৫. ভিন্ন মত

মানুষ যেমন স্বভাব-প্রকৃতি এবং আকার-অবয়বে বিভিন্ন ধরনের, তেমনি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও বিভিন্ন রকমের। আপনি কাউকে কোনো অন্যায় করতে দেখে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে এর কোনো মূল্যায়নই করলো না। এ জন্য আপনি তাকে আপনার শত্রু হিসেবে গণ্য করবেন না। যথাসম্ভব উদারতা অবলম্বন করতে চেষ্টা করবেন।

আপনি কোনো বন্ধুর ভুল সংশোধন করতে চাইলেন কিন্তু সে এতে কোনো ধরনের সাড়া দিল না। এজন্য আপনি বন্ধুত্বকে শত্রুতায় পরিণত করবেন না। আপনি উদারতা অবলম্বন করুন। তাহলে সে তার এ ভুলের উপর অটল থাকলেও অন্তত নতুন কোনো ভুল করবে না।

কথায় বলে, ভুলকে সহজভাবে গ্রহণ করুন। কেননা, এরচেয়ে বড় ভুলও তো হতে পারে। তাই মানুষের সাথে উদার মন নিয়ে চলাফেরা করুন। ছোট-বড় যেকোনো ভুল দেখলে রেগে যাবেন না। ধৈর্য ধরুন, দেখবেন আপনার জীবনটা কত সুখময় হয়ে ওঠে।

রাসূলের আখলাক সম্পর্কে আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন-

- ‘ব্যক্তিগত কারণে তিনি কখনও কারও থেকে প্রতিশোধ নেন নি।
- স্ত্রী, দাসী বা খাদেমকে কখনো নিজ হাতে প্রহার করেন নি। (তবে আল্লাহর পথে জিহাদের ক্ষেত্র এর ব্যতিক্রম)
- কারো কাছ থেকে ব্যথা বা কষ্ট পেলে তিনি প্রতিশোধ নিতেন না। অবশ্য কেউ শরীয়ত নিষিদ্ধ কোনো কাজ করলে আল্লাহর বিধান হিসেবে তাকে শাস্তি দিতেন।

আল্লাহর রাসূল কখনও রাগ করলে আল্লাহর জন্যই করতেন। কখনোই তা ব্যক্তিস্বার্থে করতেন না। এ উভয় ধরনের রাগের পার্থক্য বোঝার জন্য একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। মনে করুন, আপনার ছোট ছেলে সকালবেলা মাদরাসায় যাওয়ার আগে আপনার কাছে এসে হাতখরচ বাবদ এক রিয়াল বা দুই রিয়াল চাইল। আপনি মানিব্যাগ খুঁজে ভাংতি টাকা পেলেন না। ৫০০ রিয়ালের নোট ছাড়া আর কোনো নোটই নেই। নোটটা তাকে দিয়ে বললেন, ‘এটা ৫০০ রিয়ালের নোট। তুমি এখান থেকে দুই

রিয়াল খরচ করে বাকিটা ফেরত দেবে।’ এটা আপনি তাকে খুব গুরুত্বের সাথে বলে সতর্ক করে দিলেন।

কিন্তু বিকেলে সে যখন বাসায় ফিরল তখন তার হাতে এক রিয়ালও নেই। সব খরচ করে বাসায় এসেছে। এ মুহূর্তে আপনি কী করবেন? আপনার রাগের পরিমাণটা কেমন হবে? তাকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা যা করার তা তো করবেনই এরপর খুব মারধরও করবেন। তারপর হাত খরচ বন্ধ করে দিবেন।

মনে করুন, আপনি একদিন আসরের নামায পড়ে বাসায় ফিরলেন। দেখলেন, ছেলেটা নামায না পড়ে কম্পিউটারে গেমস খেলছে অথবা টেলিভিশন দেখছে। তখন কি আপনার রাগটা আগেরবারের মতো হবে?

আমার মনে হয় এবং আপনারাও আমার সাথে একমত হবেন, দ্বিতীয় রাগের চেয়ে প্রথম রাগটা হবে কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগ করলে তা একমাত্র আল্লাহর জন্যই রাগ করতেন। তিনি কাউকে উপদেশ দিলে কখনও তা গ্রহণ করা হতো না। এ জন্য তিনি রেগে যেতেন না। বিষয়টাকে সহজভাবে মেনে নিতেন। কেননা, হেদায়াত তো একমাত্র আল্লাহর হাতে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎকালীন শামের সীমান্তবর্তী এলাকা তাবুকে পৌঁছলেন। তিনি রোম সাম্রাজ্যের কাছাকাছি পৌঁছলেন। এরপর দিহইয়া কালবী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে একটি পত্র দিয়ে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পাঠালেন। দিহইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে পৌঁছে হিরাক্লিয়াসের কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্র পৌঁছে দিলেন।

হিরাক্লিয়াস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চিঠি দেখেই খৃষ্টান পাদ্রী ও ধর্মযাজকদের তলব করে তাদেরকে নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হলেন। সে বললো, ‘আপনারা জানেন, যিনি আবির্ভূত হয়েছেন তিনি তিনটি অপশন দিয়ে আমার কাছে দূত প্রেরণ করেছেন-

১. আমি যেন তার ধর্মের অনুসরণ করি।

২. অথবা জিযিয়া কর প্রদান করি। এ অবস্থায় আমাদের ভূমি আমাদের মালিকানায় থাকবে।

৩. এটাও যদি না মানি তাহলে আমাদেরকে যুদ্ধের মুখোমুখি হতে হবে।

তারপর হিরাক্লিয়াস বললো, 'আসমানি কিতাবে আপনারা পড়েছেন, তিনি আমাদের সাম্রাজ্য হস্তগত করবেন। অতএব আসুন, আমরা সবাই তার ধর্ম মেনে নিই অথবা জিযিয়া কর প্রদান করি।' পাদ্রীরা সম্রাটের প্রস্তাব শুনে ক্রোধে ফেটে পড়ল। এরপর সবাই একযোগে এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলল। প্রতিবাদ ও ক্রোধের তীব্রতায় তাদের শরীর থেকে চাদর খুলে পড়ল। তারা বললো, 'আপনি আমাদেরকে খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করতে বলছেন? হেজাজের এক বেদুইন আরবের দাসত্ব কবুল করার কথা বলছেন?!

ধর্মযাজকদের এ মনোভাব দেখে হিরাক্লিয়াস খুব ভয় পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব দেয়া তার জন্য ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। কারণ তৎকালিন সমাজব্যবস্থা ছিল পাপ ও পাদ্রীনির্ভর। জনসমর্থনও ছিল তাদের হাতের মুঠোয়। হিরাক্লিয়াস ভাবলেন, এ মনোভাব নিয়ে পাদ্রীরা এখান থেকে বের হয়ে গেলে দেশে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে। তাই তিনি দ্রুত একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, 'দেখুন, খৃষ্টধর্মের ওপর আপনাদের অবিচলতা কেমন তা যাচাই করার জন্যই মূলত আমি এ প্রস্তাব দিয়েছি!

হিরাক্লিয়াস নিশ্চিত ভাবেই জানতেন, মুহাম্মদ ﷺ সে রাসূল যার সম্পর্কে ঈসা আলাইহিস সালাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এরপরও বিষয়টাকে আরেকটু যাচাই করতে তিনি আরবের তুজীব গোত্রের খৃষ্টধর্মাবলম্বী জনৈক ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাকে বললেন, 'আরবি ভাষায় পারদর্শী একজন মেধাবী লোককে ডেকে আন। তাকে নবুয়তের দাবিদার ঐ আরব ব্যক্তিটির কাছে তার চিঠির জবাবসহ পাঠাও।

তুজীবী লোকটি গিয়ে তানূখ সম্প্রদায়ের এক খ্রিষ্টান লোককে নিয়ে এলো। সম্রাট তাকে উত্তর সম্বলিত চিঠিটি রাসূল ﷺ-এর কাছে পৌঁছে দিতে বললেন। এরপর বললেন, মুহাম্মদের কথাবার্তার মধ্যে তিনটি বিষয় খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করবে-

১. তিনি আমার নামে লিখিত চিঠির ব্যাপারে কোনো আলোচনা করেন কি-না?

২. আমার চিঠি পড়ার সময় তিনি রাগ নিয়ে কোনো কথা বলেন কি-না?

৩. তার পিঠে কৌতূহলোদ্দীপক কোনো কিছু আছে কি-না?

তানূখ গোত্রের লোকটি শাম থেকে তাবুকে পৌঁছল। সে দেখলো, রাসূল ﷺ তাঁর সঙ্গীদের মাঝে বসে আছেন। লোকটি প্রশ্ন করলো, 'তোমাদের নেতা কোথায়?' বলা হল, 'এই যে তিনি।' লোকটি এগিয়ে এসে রাসূলের সামনে বসল। এরপর হিরাক্লিয়াসের চিঠি হস্তান্তর করলো। রাসূল ﷺ চিঠি গ্রহণ করে নিজের কোলে রাখলেন। এরপর তাকে বললেন, 'তোমার গোত্র পরিচয় কী?'

সে বললো, 'আমি তানূখ গোত্রের লোক।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমার পূর্বপুরুষ ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এর একনি'ও সত্য ধর্ম ইসলাম গ্রহণের প্রতি তোমার কোনো আগ্রহ আছে কি?' এ প্রশ্নের মাধ্যমে রাসূল ﷺ তাকে ইসলামের প্রতি আগ্রহী করতে চাইলেন।

গোত্রীয় ধর্মবিশ্বাসের প্রতি অন্ধভক্তি ছাড়া ইসলাম গ্রহণের পথে লোকটির কোনো বাধা ছিল না। সে স্পষ্টভাষায় বললো, 'দেখুন, আমি একটি জাতির প্রতিনিধি এবং আমি আমার গোত্রের ধর্মমতের অনুসারী। সুতরাং আমি তাদের কাছে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত নতুন ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না!'

রাসূল ﷺ তার উত্তরে রাগ করলেন না। বিষয়টিকে তিনি সহজভাবে গ্রহণ করলেন। তিনি মুচকি হেসে কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন-

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

অর্থ : 'আপনি যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়াত দিতে পারবেন না। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়াত দেন। আল্লাহ জানেন, কারা হেদায়াত লাভ করবে।' (সূরা আল ক্বাসাস-৫৬)

এরপর রাসূল ﷺ খুব কোমলভাবে বললেন, 'হে তানূখী! আমি পারস্যের কিসরার কাছে একটি পত্র পাঠিয়েছিলাম কিন্তু সে আমার পত্রটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। আল্লাহ তাকে এবং তার রাজত্বকে টুকরো

টুকরো করে ফেলবেন।' আমি নাজ্জাশির কাছেও একটি পত্র পাঠিয়েছিলাম। সেও তা ছিড়ে ফেলেছিল। আল্লাহ তার রাজত্বকেও ছিড়ে ফেলবেন। তুমি যার কাছ থেকে এসেছ তার কাছেও একটি পত্র পাঠিয়েছিলাম। সে সম্মানের সাথে তা গ্রহণ করেছে। ফলে যতদিন তার জীবনে কল্যাণ থাকবে, ততদিন প্রজাদের মধ্যে তার প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় থাকবে।'

এ সময় তানূখী হিরাক্লিয়াসের উপদেশটির কথা স্মরণ করলো। সে মনে মনে ভাবল, 'সম্রাট আমাকে যে তিনটি বিষয় লক্ষ্য করতে বলেছেন, এ তো আমার সেই কাঙ্ক্ষিত তিন বিষয়ের একটি। বিষয়টি ভুলে যেতে পারে এ আশঙ্কায় সে তূণীর থেকে একটি তীর বের করে তরবারীর পাতে কথাটা লিখে রাখলো।

রাসূল আলাইহি ওয়া সাল্লাম পত্রটি তার বামে বসা এক ব্যক্তিকে দিয়ে দিলেন। তানূখী জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাদেরকে চিঠিটা কে পড়ে শোনাবে?' তারা বললো, 'মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু!'

মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু চিঠি পড়তে শুরু করলেন। হিরাক্লিয়াস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, 'আপনি আমাকে আল্লাহভীরু লোকদের জন্য প্রস্তুতকৃত জান্নাতের দিকে আহ্বান করছেন, যার পরিধি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীজুড়ে। তাহলে জাহান্নাম কোথায়?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! দিন যখন আসে তখন রাত কোথায় থাকে?'

রাতের কথা শুনেই তানূখীর টনক নড়ল। সে ভাবল এটা তো হিরাক্লিয়াসের বলে দেয়া দ্বিতীয় বিষয়। এবারও সে তূণীর থেকে তীর নিয়ে তরবারীর খাপে কথাটা লিখে নিলো। মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু চিঠি পড়া শেষ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তানূখীর দিকে ঘুরে বসলেন। এরপর তাকে বিনয়ভরে বললেন, 'আমাদের কাছে তোমার তো কিছু অধিকার আছে। কেননা, তুমি একজন রাজকীয় দূত! । তোমাকে পুরস্কৃত করার মতো কিছু আমার কাছে থাকলে অবশ্যই তোমাকে দিতাম। কিন্তু আমরা যে এখন নিঃস্ব মুসাফির। বালির ওপর বসে আছি।'

ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাকে একটা উপহার দেব।' এরপর ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তার থলে থেকে এক জোড়া দামী কাপড় এনে তানূখী ব্যক্তিটিকে প্রদান করলেন।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আচ্ছা, এখন তার আপ্যায়নের জন্য কে প্রস্তুত আছ?'

জনৈক আনসারী যুবক দাঁড়িয়ে বললো, 'আল্লাহর রাসূল! আমি প্রস্তুত ।'

আনসারী যুবকটি মেহমানকে সঙ্গে নিয়ে চলতে লাগল। কিন্তু তানূখীর মন তখন তার কাঙ্ক্ষিত সেই তৃতীয় বিষয়টি জানার জন্য ছটফট করছিল। রাসূলের পিঠে দর্শনীয় কোনো কিছু আছে কি-না ওটা সে কিভাবে দেখবে। এ চিন্তায় সে বিভোর।

তানূখী আনসারী যুবকের সাথে পথ চলছিল। হঠাৎ রাসূল আলাইহি ওয়া সাল্লাম উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, 'হে তানূখী! এদিকে এসো।'

তানূখী দ্রুতপায়ে রাসূলের সামনে এসে দাঁড়াল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিঠ থেকে চাদরটি একটু সরিয়ে তার শেষ ইচ্ছাটা পূরণ করলেন। এরপর তাকে বললেন, 'এ তো এখানে দেখ, আর তোমাকে যে আদেশ করা হয়েছে তা পূরণ কর।'

ঘটনা বলতে গিয়ে তানূখী একদিন বলেছিল, 'আমি তার পিঠের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার কাঁধের মাঝামাঝি স্থানে বড় আকারের কবুতরের ডিমের মতো একটি মোহর স্ফীত হয়ে আছে।'

একটি চিন্তা...

মানুষ নিজের ভুলকে ভুল হিসেবে অনুভব করুক এতটুকুই যথেষ্ট।

সব ভুল সাথে সাথে সংশোধন করবে এমনটা আশা করবেন না।

আপনার কামনা বাস্তবায়িত না হলেও রাগ করবেন না।



৩৬. মন্দের বিপরীতে উত্তম ব্যবহার করুন

আপনি যখন মানুষের সঙ্গে চলা-ফেরা, আচার-আচরণ বা লেনদেন করবেন, তখন স্বভাবত তারা আপনার সাথে তাদের নিজেদের ইচ্ছেমতো আচরণ করবে। আপনি যেমন চান তেমন আচরণ তাদের কাছ থেকে পাবেন না। আপনি যাদের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করবেন, তাদের সবাই আপনার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলবে এমন আশা করবেন না। কেউ হয়তো উল্টো রেগে যাবে। খারাপ ধারণা করে বলবে, 'ব্যাপার কী? হাসছেন কেন?'

আপনি যাদেরকে উপহার-উপঢৌকন দেবেন, তাদের সবাই বিপরীতে আপনাকে উপহার দেবে না; বরং কেউ কেউ তো আপনার সমালোচনা করে বলবে,'লোকটা একদম বোকা, অনর্থক টাকা পয়সা নষ্ট করে।'

কথা বলার সময় আপনি যাদের সঙ্গে আবেগ দেখাবেন বা প্রশংসা করবেন কিংবা কোমল স্বরে কথা বলবেন, তাদের সবাই কিন্তু আপনার সঙ্গে অনুরূপ আচরণ করবে না। কেননা,, মহান আল্লাহ তাআলা রিযিক বণ্টনের ক্ষেত্রে যেমন বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন তেমনি স্বভাব ও চরিত্রকেও বৈচিত্র্যময় করেছেন। এক্ষেত্রে আল্লাহর নীতি হলো-

وَ لَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ ؕ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ.

অর্থ ঃ ভালো ও মন্দ কখনো সমান হতে পারে না। মন্দ আচরণকে উত্তম আচরণ দিয়ে রোধ করুন । তখন দেখবেন আপনার এবং যার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে, যেন সে আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু। (সূরা হা-মীম সেজদা:৩৪)

তবে কিছু কিছু মানুষের আচার-আচরণ খুবই সমস্যাপূর্ণ। এর না আছে কোনো সমাধান, না আছে সংশোধনের সম্ভাবনা। তাই হয়তো তার থেকে দূরে থাকুন নয়তো তার আচার ব্যবহার সহ্য করেই তার সঙ্গে চলাফেরা করুন। এছাড়া আর কোনো পথ নেই।

কথিত আছে, 'আশআব' নামক এক ব্যক্তি জনৈক ব্যবসায়ীর সঙ্গে সফরে বের হলো। সফরে বাহন থেকে মাল-পত্র ওঠানো-নামানো, বাহনকে পানি

পান করানোসহ সব কাজ ব্যবসায়ী একাই করলো। এভাবে কাজ করতে করতে সে ক্লান্ত হয়ে গেল।

ফেরার পথে দুপুরের খাবারের জন্য তারা এক জায়গায় থামল। বাহন থেকে নেমেই আশআব মাটিতে শুয়ে পড়ল। অপরদিকে ব্যবসায়ী লোকটি একা একা বিছানাপত্র নামিয়ে রান্নার আয়োজন করলো। এরপর আশআবের দিকে ফিরে বললো, 'ভাই! আমাদের তো খাবার তৈরি করতে হবে। আমি গোশত কাটব। তুমি কিছু জ্বালানি সংগ্রহ করে আন।'

আশআব উত্তর দিল, 'আমাকে মাফ করুন, আমি দীর্ঘ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

বাধ্য হয়ে লোকটি নিজেই জ্বালানি সংগ্রহ করলো। এরপর সে আশআবকে বললো, 'লাকড়িতে আগুন জ্বালাও।'

এটা শুনে আশআব বললো, 'আমি আগুনের কাছে যেতে পারি না। আগুন থেকে যে ধোঁয়া হয় তাতে আমার বুকে প্রদাহ হয়।'

ব্যবসায়ী নিজেই আগুন জ্বালাল।

এরপর সে আশআবকে বললো, 'গোশতের টুকরাটা একটু ধর। আমি যেন সহজে কাটতে পারি।' আশআব অপারগতা জানিয়ে বললো: গোশত কাটতে গিয়ে ছুরিতে হাত লেগে যদি আমার হাত কেটে যায়'! ব্যবসায়ী নিজেই গোশত কাটল।

এরপর সে বললো, 'গোশতের হাঁড়িটা চুলায় বসিয়ে এবার রান্নাটা শেষ করে ফেলো।' আশআব বললো, 'আমাকে মাফ করবেন, রান্নার আগে খাবারের দিকে বারবার তাকালে আমার সমস্যা হয়!

আশআবের কথা শুনে লোকটি আর দ্বিরুক্তি না করে নিজেই রান্নার কাজ শেষ করলো। সব কাজ একা করে লোকটি ক্লান্ত হয়ে বললো, 'ভাই! আমি আর পারছি না, এবার দস্তরখান বিছিয়ে খাবারটা একটু পরিবেশন করার ব্যবস্থা কর।'

আশআব বললো, 'আমার শরীরটা খুব দুর্বল। কাজ করার কোনো শক্তি আমার দেহে নেই।' কী আর করা! লোকটি বাধ্য হয়ে উঠে নিজেই দস্ত

রখান বিছিয়ে খাবার প্রস্তুত করে আশআবকে ডেকে বললো, 'এসো, খাবার খেতে এসো।'

আশআব এবার আর না করলো না। সে বললো, 'ওজর আপত্তি করতে করতে এখন না করতে আমার খুব লজ্জা লাগছে। কতবার আর না করব! এবার

আপনার আদেশ আর অমান্য করব না।' এরপর সে বিছানা থেকে ওঠে নিঃসঙ্কোচে খাবার খেতে শুরু করলো।

জীবনে চলার পথে যদি কখনো এ ধরনের আশআবদের মুখোমুখি হন তাহলে দুঃখিত হবেন না। পাহাড়ের মতো অটল ও অবিচল থাকবেন।

রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে আবেগের পরিবর্তে বিবেককে প্রাধান্য দিতেন। অন্যের ভুলভ্রান্তি সহ্য করে তাদের সঙ্গে অমায়িক আচরণ করতেন।

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের নিয়ে একটি মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন। ইতোমধ্যে একজন বেদুঈন সেখানে উপস্থিত হলো। সে নিজে অথবা অন্য কেউ কোনো এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। সেই হত্যার রক্তপণ আদায়ে কিছু সাহায্য লাভের জন্য সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করলেন। এরপর নরমস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি তোমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেছি?'

বেদুঈন সাথে সাথে উত্তর দিল। সে বললো, 'না, আপনি আমার সাথে সদ্ব্যবহার করেন নি।'

এ কথা শুনে সাহাবিদের কেউ কেউ উত্তেজিত হয়ে তার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিতে সবাইকে থামিয়ে দিলেন। এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কামরায় গেলেন। বেদুঈনকেও সেখানে নিয়ে গেলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'তুমি আমার কাছে এসে কিছু সাহায্য চেয়েছিলে, আমি তোমাকে সাধ্যমতো কিছু সাহায্য করেছিলাম। তখন তুমি যা বলার বলেছিলে।'

এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আরো কিছু দিয়ে বললেন, 'আমি কি তোমার সাথে সদ্ব্যবহার করেছি?'

এবার বেদুঈন বললো, হ্যাঁ। আল্লাহ আপনাকে আমার পরিজন ও গোত্রের পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

তাকে সন্তুষ্ট করতে পেরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হলেন। কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আশঙ্কা হলো যে, তার সাহাবিদের মনে লোকটির প্রতি এখনো হয়তো ক্ষোভ রয়ে গেছে। তাদের কারো সঙ্গে যদি পথে-ঘাটে লোকটির দেখা হয় তাহলে তারা তার সাথে কিরূপ আচরণ করতে পারে। তাই তিনি সাহাবিদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করতে চাইলেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেদুঈনকে বললেন, 'তুমি আমাদের কাছে এসে সাহায্য চাওয়ার পর আমরা সাধ্যমত তোমাকে সাহায্য করেছি। এরপর তুমি যা বলার বলেছ। সেজন্য তোমার প্রতি আমার সাহাবিদের মনে ক্ষোভ থাকতে পারে। এ জন্য তুমি আমার সামনে একটু আগে যা বলেছ এখন তাদের সামনে গিয়ে তা বল। এতে তাদের মনের ক্ষোভ দূর হবে।

বেদুঈন কথা বলার জন্য সামনে আসার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের বললেন, 'তোমাদের এই ভাই আমার কাছে এসে কিছু সাহায্য চেয়েছিল। আমি তাকে আমার সাধ্যমতো সাহায্য করেছি। সে তখন কিছু কথা বলে ফেলেছে। পরে আমি তাকে ডেকে নিয়ে আরো কিছু দিয়েছি। এখন সে খুশি হয়ে গেছে।'

এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেদুঈনের দিকে ফিরে বললেন, 'বিষয়টা কি এমন নয়?'

সে বললো, 'হ্যাঁ, এমনই। আল্লাহ আমার পরিজন ও গোত্রের পক্ষ থেকে আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।'

বেদুঈন যখন বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদেরকে হৃদয় জয় করার পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেখ, আমার আর এই বেদুঈন লোকটির দৃষ্টান্ত হলো ঐ উটের মালিকের মতো যার উট পালিয়ে যাচ্ছে। লোকজন উটটাকে ধরার জন্য ধাওয়া করলে উটটি ভয়ে আরো দ্রুত বেগে পালাতে লাগল।

উটের মালিক অবস্থা দেখে বললো, 'এ যে তোমরা থাম। আমি দেখছি কী করা যায়। তাকে কিভাবে পোষ মানাতে হয়, সেটা আমি তোমাদের চেয়ে ভালো জানি।'

উটের মালিক উটের দিকে এগিয়ে গেল এবং হাতে কিছু পতিত খেজুর বা ঘাস নিয়ে উটটিকে ডাকতে লাগল। উটটি মালিকের ডাকে সাড়া দিয়ে ধীরে ধীরে তার কাছে চলে এলো। এরপর মালিক তার পিঠে হাওদা বেঁধে চড়ে বসল।

বেদুঈনটির কথা শোনার পর তোমরা তার সাথে যে আচরণ করতে যাচ্ছিলে, আমি যদি তাতে বাধা না দিতাম তাহলে সে জাহান্নামি হয়ে যেত।[২]

কোমলতা যেকোনো বিষয়ের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয় আর কঠোরতা সৌন্দর্য কেড়ে নেয়।

وَ لَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ ۭ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ.

অর্থঃ উত্তম ও অধম কখনো সমান হতে পারে না। আপনি মন্দ (আচরণকে) উত্তম (আচরণ) দ্বারা রোধ করুন। তখন দেখবেন আপনার মাঝে এবং যার মাঝে শত্রুতা রয়েছে, যেন সে আপনার সুহৃদ বন্ধু।

(সূরা হা-মীম সেজদা:৩৪)

বর্ণিত আছে, মক্কা বিজয়ের পর রাসূল ﷺ একদিন কাবাঘর তওয়াফ করছিলেন। তখন মক্কায় ফোযালাহ বিন ওমায়ের নামক এক ব্যক্তি ছিল। সে শুধু বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। সে মহানবী ﷺ-কে দেখে এগিয়ে এলো। এরপর সে মহানবী ﷺ-এর পিছু পিছু তওয়াফ করতে লাগল। তার মনে ছিল কুমতলব। মহানবী ﷺ-কে একটু অসতর্ক পেলেই হত্যা করে ফেলবে। সে যখন মহানবী ﷺ-এর একদম কাছে

---

2 অর্থাৎ তোমাদের আচরণের কারণে সে চলে গেলে হয়তো সে মুরতাদ হয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হয়ে যেত। (মুসনাদুল বাযযার)

এসে গেল তখন মহানবী ﷺ তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আরে! ফোযালাহ না-কি?'

সে বললো, 'জ্বী! ফোযালাহ, ইয়া রাসূলাল্লাহ।'

মহানবী ﷺ বললেন, 'তুমি মনে মনে কী বলছিলে?'

সে অপ্রস্তুত হয়ে উত্তর দিল, 'না, কিছু না। আমি তো আল্লাহর জিকির করছিলাম।

মহানবী ﷺ মৃদু হেসে বললেন, 'ফোযালাহ! আল্লাহর কাছে এসতেগফার কর।'

ফোযালাহ বর্ণনা করেন, 'এরপর রাসূল ﷺ তার হাত মোবারক আমার বুকে রাখলেন আর সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয় প্রশান্ত হয়ে গেল। কসম আল্লাহর! তিনি আমার বুকের ওপর থেকে হাত ওঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো, আল্লাহ তাআলার সমগ্র সৃষ্টির মাঝে তার চেয়ে প্রিয় মানুষ আমার কাছে আর কেউ নেই।'

বাড়ি ফেরার পথে জাহেলি যুগের এক মহিলার সঙ্গে ফোযালাহর দেখা হলো। আগে দেখা হলে সে তার সঙ্গে খোশগল্প ও মেলামেশা করত। ফোযালাহকে দেখে মাহিলাটি বললো, 'এই, এসো আমরা একটু গল্প করি।'

ফোযালাহ স্পষ্ট ভাষায় তাকে প্রত্যাখ্যান করে বললো, 'না'। এরপর সে স্বরচিত তিনটি শ্লোক আবৃত্তি করলো, (অনুবাদ)

'সে (একজন নারী) বললো, চলো না গল্প করি, আমি বললাম, না

আল্লাহ ও ইসলাম তা সমর্থন করে না।

যদি তুমি ইসলামের নবী ও তার বাহিনীকে মক্কা বিজয়ের দিন দেখতে, যে দিন দেব-দেবীদের অসার মূর্তিগুলো গুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল।

তাহলে অবশ্যই তুমি অনুভব করতে আল্লাহর দ্বীন চির ভাস্বর হবে।

আর শিরকের অমানিশা পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে।'

এ ঘটনার পর ফোযালাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন খাঁটি ও একনি'মুসলমানে পরিণত হন।

এভাবে ক্ষমা সুন্দর আচরণের মাধ্যমে রাসূল ﷺ মানুষের হৃদয়রাজ্য জয় করে নিতেন। মানুষকে কাছে টেনে সত্য ও কল্যাণের পথ দেখাতে মহানবী ﷺ কত কষ্ট সহ্য করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। চাচা আবূ তালিব যতদিন বেঁচে ছিলেন, মহানবীর প্রতি কোরাইশদের সকল অত্যাচার ও নিপীড়ন তিনি একাই প্রতিহত করতেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর কোরাইশরা রাসূলের জন্য পবিত্র মক্কাভূমি সংকীর্ণ করে দিল। কোরাইশদের পক্ষ থেকে এমন অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতাপূর্ণ আচরণ আসতে লাগল চাচার জীবদ্দশায় মহানবী ﷺ কখনো এর মুখোমুখি হননি।

তখন রাসূল ﷺ নতুন কোনো আশ্রয়স্থল খুঁজতে লাগলেন।

রাসূল মনে করেছিলেন, সাকীফ গোত্র তাকে সাহায্য করবে। এ আশায় তিনি একাই তায়েফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। যথাসময়ে তিনি তায়েফে পৌছলেন। সেখানকার সাকিফ গোত্রের বড় বড় তিনজন নেতার সাথে তিনি সাক্ষাৎ করলেন । তারা ছিল সহোদর ভাই। একজনের নাম আবদে ইয়ালীল, অন্যজনের নাম মাসুদ, আর তৃতীয়জনের নাম হাবীব।

রাসূল ﷺ তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিলেন। ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন। মক্কার যেসব লোক তার বিরোধিতা করছে তাদের বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তারা কঠোর ভাষায় রাসূল ﷺ-এর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলো।

একজন বললো, 'আল্লাহ যদি তোমাকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়ে থাকেন তাহলে আমি কাবার গিলাফ ছিঁড়ে ফেলব।'

অন্যজন বললো, 'আল্লাহ কি তোমাকে ছাড়া নবী বানানোর মতো আর কাউকে পান নি?'

তৃতীয়জন দার্শনিকের ভঙ্গিতে বললো, 'আমি তোমার সঙ্গে কথাই বলব না। কারণ তুমি যদি সত্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল হয়ে থাক তাহলে তোমার কথার জবাব দেয়া আমার জন্য বিপজ্জনক! আর যদি তুমি মিথ্যা বলে থাক তাহলে তো তোমার সঙ্গে আমার কথা বলার কোনো প্রয়োজনই নেই।'

তাদের এ অনাকাঙ্ক্ষিত উত্তর শুনে রাসূল ﷺ তাদের কাছ থেকে চলে এলেন। তিনি সাকীফ গোত্রের কাছ থেকে কল্যাণকর কিছু পাওয়ার আশা ছেড়ে দিলেন। তবে তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, তায়েফবাসীর এ প্রত্যাখানের সংবাদ জানতে পারলে কোরাইশরা আরো দুঃসাহসী হয়ে উঠবে। তারা আগের চেয়ে বেশি উৎপীড়ন করবে। তাই তিনি তাদেরকে বললেন, 'তোমরা আমার কথা না মান কিংবা আমার সহযোগিতা না কর তাতে আপাতত দুঃখ নেই, কিন্তু আমি যে তোমাদের কাছে এসেছিলাম তা কাউকে জানিয়ে দিয়ো না। এটা গোপন রেখ।'

কিন্তু তারা তা মানল না; বরং রাসূল ﷺ-কে নিপীড়ন করার জন্য তারা নিজেদের কিছু ক্রীতদাস ও নির্বোধ লোককে তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিল। তারা তাকে গালি দিতে লাগল, চিৎকার করে তাকে বিদ্রূপ করতে লাগল। তাদের এই চেঁচামেচিতে রাসূলের আশপাশে অনেক মানুষ জড়ো হয়ে গেল।

এভাবে উপহাস করতে করতে তারা তাকে রাবীয়ার পুত্র ওতবা ও শায়বার একটি বাগান পর্যন্ত নিয়ে গেল। এরপর তারা চলে গেল। রাসূল ﷺ সে বাগানে প্রবেশ করে একটি আঙুর গাছের ছায়ায় হেলান দিয়ে বসে পড়লেন।

পুরো শরীর জুড়ে অসহ্য বেদনা। মনে মনে ভাবছেন কোরাইশদের পরবর্তী আচরণ কেমন হবে, তিনি কিভাবে মক্কায় প্রবেশ করবেন?

মহানবী ﷺ আকাশের দিকে তাকিয়ে দোয়া করলেন-

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُوْ ضُعْفَ قُوَّتِيْ وقِلَّةَ حِيْلَتِيْ وَهَوَانِيْ عَلَى النَّاسِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اِلٰى مَنْ تَكِلُنِيْ اِلٰى عَدُوٍّ يَتَجَهَّمُنِيْ اَمْ اِلٰى قَرِيْبٍ مَلَّكْتَهُ اَمْرِيْ اِنْ لَمْ تَكُنْ سَاخِطاً عَلَيَّ فَلَا اُبَالِيْ غَيْرَ اَنَّ عَافِيَتَكَ اَوْسَعُ لِيْ اَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ الَّذِيْ اَضَاءَتْ لَهُ السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ وَاَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وصَلَحَ

عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَنْ تُحِلَّ عَلَيَّ غَضَبَكَ اَوْ تُنْزِلَ عَلَيَّ سَخَطَكَ وَلَكَ الْعُتْبٰى حَتّٰى تَرْضٰى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِكَ.

'হে আল্লাহ! আপনার কাছেই আমি অভিযোগ করছি। আমি হীনবল, দুর্বল ও অসহায়। আমি কোনো কলাকৌশল জানি না। মানুষ আমার পরিচয় জানে না। হে দয়ার সাগর! আপনি দুর্বলদের প্রতিপালক। আপনি আমারও প্রতিপালক। আপনি আমাকে কার কাছে ন্যস্ত করছেন! এমন অচেনা কারো হাতে, যে আমার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করবে, না-কি এমন কোনো শত্রুর হাতে, যার হাতে আমার যাবতীয় বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ দিয়েছেন। আপনি যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হন তাহলে এতেও আমি কোনো পরোয়া করি না। আপনার দয়া ও নিরাপত্তা তো অনেক প্রশস্ত ও প্রসারিত । আমাকে তাতে শামিল করে নিন। আমি আপনার সত্তার সে নূরের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যার মাধ্যমে সকল অন্ধকার দূরীভূত হয়ে চারদিক আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে এবং যে আলোর ইশারায় দুনিয়া আখিরাতের সবকিছু পরিচালিত হয়। আমার ওপর যেন আপনার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি না নামে। আপনি খুশি না হওয়া পর্যন্ত আমি আপনার সন্তুষ্টি চাই। সকল ক্ষমতা ও শক্তি আপনারই। আপনার শক্তি ও ক্ষমতা ছাড়া কারো কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই।'

এমন সময় একটি মেঘখণ্ড এসে মহানবী ﷺ-এর ওপর ছায়া দিতে লাগল। মেঘ থেকে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম মহানবী ﷺ-কে ডেকে বললেন,'হে মুহাম্মদ! আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যা বলেছে এবং তারা আপনার সাথে যে আচরণ করেছে সবই আল্লাহ শুনেছেন এবং দেখেছেন। তিনি পর্বত নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করেছেন। আপনি তাদেরকে যা ইচ্ছা নির্দেশ প্রদান করুন।'

মহানবী ﷺ কিছু বলার আগেই পর্বত নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতা মহানবী ﷺ-কে সালাম দিয়ে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! হে মুহাম্মদ! আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যে জবাব দিয়েছে, আল্লাহ তাআলা তা শুনেছেন। আমি পর্বতের দায়িত্বশীল ফেরেশতা। আপনার রব আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনি আমাকে যা খুশি আদেশ দিন।'

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু বলার আগেই পর্বত নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতা নিজেই বললেন, 'আপনি যদি চান তাহলে মক্কার এ পাহাড়দুটি একত্রিত করে তাদেরকে ধ্বংস করে দিই।'

পর্বত নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতা নির্দেশের অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনের ব্যথা ভুলে এবং প্রতিশোধ স্পৃহাকে হজম করে উদারকণ্ঠে বললেন, 'না! আমি বরং অপেক্ষা করব। আমি আশা করি, মহান আল্লাহ এদের ঔরশ থেকে এমন প্রজন্ম সৃষ্টি করবেন, যারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে, অন্য কাউকে তাঁর সাথে শরিক করবে না।'

সাহসী হোন ...

আপনার সাথে আপনার সহোদর কিংবা চাচাতো ভাইদের কোনো দ্বন্দ্ব থাকতে পারে। তারা যদি আপনার ক্ষতিসাধন করে আপনি তাদের উপকার করুন। তারা যদি আপনাকে অপমানিত করে আপনি তাদেরকে সম্মানিত করুন। তারা আপনার বিপদে এগিয়ে না আসলেও আপনি তাদের ডাকে কোমরবেঁধে ছুটে যান। তাদের প্রতি আপনি কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। কেননা, বিদ্বেষপ্রবণ ব্যক্তি কখনো নেতৃত্ব দিতে পারে না।



৩৭. ভুল সম্পর্কে নিশ্চিত হলে উপদেশগ্রহণ সহজ

কিছু মানুষ এমন আছে, যারা অন্যের ব্যাপারে বেশি ব্যস্ত। অন্যদের ভুল ধরতে তারা খুব তৎপর। এ কারণে তাদের প্রতি লোকজন খুব বিরক্ত হয়। বিশেষ করে যখন তাদের মন্তব্য ও উপদেশ ব্যক্তিগত রুচি ও নিজস্ব ভাবনা নির্ভর হয়, তখন তো তা অত্যন্ত বিরক্তিকর হয়ে যায়।

মনে করুন, আপনি ও আপনার পরিবারের সদস্যরা অনেক পরিশ্রম করে এবং অনেক টাকা খরচ করে একটি বৌভাতের আয়োজন করলেন। অতিথিদের একজন আপনাকে বললো, 'টাকা তো অনেক খরচ করলেন কিন্তু আয়োজনটা সুন্দর হলো না। আমার মনে হচ্ছে, আপনার পণ্ডশ্রম হয়েছে। চেষ্টা করলে আয়োজনটা আরো উন্নত করতে পারতেন।'

আপনি তার কাছে কারণ জানতে চাইলে সে বললো, 'দেখুন! গোস্তের আইটেমগুলো অধিকাংশ ছিল ভুনা। কিন্তু আমি সেদ্ধ বা ঝলসানো গোস্ত পছন্দ করি। লেবু বেশি হওয়ার কারণে সালাদটা টক হয়ে গেছে। এটা আমার একদম পছন্দ নয়। এরপর দেখুন, মিষ্টান্নগুলোতে ক্রীম দেয়ায় স্বাদই পাল্টে গেছে!'

সে আরো বললো, 'বেশির ভাগ লোকই এগুলো খেতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে নি। তারা কেবল সৌজন্য রক্ষার্থে কিংবা বাধ্য হয়ে খেয়েছে।

চিন্তা করে দেখুন, তাঁর এ জাতীয় মন্তব্যে আপনার মনের অবস্থাটা কেমন হবে? আপনি তার কথায় অবশ্যই বিরক্তিবোধ করবেন। তার কোনো পরামর্শই আপনি শুনবেন না। কেননা, তাঁর প্রত্যেকটা মন্তব্যের পেছনে কাজ করেছে তার নিজস্ব রুচি ও ভাবনা।

এমনই বিরক্তিকর আরেক শ্রেণির মানুষ আছে, যারা নিজ পরিবারের সঙ্গে যেমন আচরণ করে, অন্যদের সঙ্গেও তেমন আচরণই কারতে চায়। সবাইকে উপদেশ দিতে যায়, সবখানে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে চায়। কেউ বাড়ি বানাবে বা গাড়ি কিনবে, সেখানেও সে নিজের ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দ অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়।

সবসময় মনে রাখবেন, এ জাতীয় সমালোচনা ও উপদেশ ব্যক্তির নিজস্ব রুচির ওপর নির্ভরশীল। তবে কেউ যদি আপনার কাছে পরামর্শ চায় বা

আপনার অভিমত জানতে চায়, সেক্ষেত্রে আপনি নিজের সঠিক অভিমত প্রকাশ করুন এবং তাকে একটি সুন্দর উপযোগী পরামর্শ দিন। অনেক সময় দেখা যায়, আপনি যাকে উপদেশ দিতে যাচ্ছেন সে তার নিজের ভুল উপলব্ধিই করতে পারে না। তাকে আপনি শান্তভাবে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে তার ভুলটা ধরিয়ে দিন। এতে সে নিজের ভুল অনুভব করতে পারবে।

কয়েকজন ভদ্রলোক একসঙ্গে সমবেত হয়ে বাবা-মার সঙ্গে সদ্ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করছিলেন। জনৈক রুক্ষ প্রকৃতির বেদুঈন পাশে বসে তাদের কথা শুনছিল। এরই মধ্যে এক ভদ্রলোক হঠাৎ তাকে প্রশ্ন করলো, 'তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে কেমন আচরণ কর?'

বেদুঈন উত্তর দিল, 'আমি তো আমার মায়ের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করি।'

'কেমন ভালো ব্যবহার কর?'

'আমি তাকে কখনো চাবুক দিয়ে আঘাত করি নি!'

অর্থাৎ সে তার মাকে কখনো প্রহার করলে হাত দিয়ে কিংবা মাথার পাগড়ি দিয়ে আঘাত করে। মায়ের সাথে সদাচরণের স্বার্থে চাবুক দিয়ে তাকে আঘাত করে না! এ হলো সে বেদুঈনের ভালো ব্যবহার!

ভালো-মন্দের মাপকাঠি কিংবা ভুল-নির্ভুলের সঠিক মানদণ্ড কি তাঁর কাছে আছে?

সবার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ও কোমল আচরণ করুন। কেউ ভুল করে ফেললে সুন্দরভাবে তাকে বুঝিয়ে দিন।

নবীযুগে, 'মাখযুম' গোত্রের জনৈক মহিলা পড়শিদের কাছ থেকে বিভিন্ন জিনিস ধার নিত। কিন্তু তা ফিরিয়ে দিত না। পরে তার কাছে জিনিসটি ফেরত চাওয়া হলে সে অস্বীকার করে বসত। সে বলত, 'আমি তো কিছু ধার করি নি!' তার এ আচরণ দিনদিন বেড়েই চলল। লোকজন অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অভিযোগ করলো। চুরির শাস্তিস্বরূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত কাটার সিদ্ধান্ত দিলেন।

এ মহিলা ছিল কোরাইশ গোত্রের একটি সম্ভ্রান্ত শাখাভুক্ত । তাই কোরাইশ নেতারা হাত কাটার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছিল না। তারা এ দণ্ড হালকা করার জন্য রাসূলের কাছে সুপারিশ করতে চাইল। হাত কাটার পরিবর্তে বেত্রাঘাত বা আর্থিক জরিমানার রায় হলে তা সম্ভ্রান্ত গোত্রের এ মহিলা ও তার গোত্রের মান রক্ষা পাবে।

কিন্তু কেউই এ বিষয়ে কথা বলার জন্য রাসূলের কাছে যেতে সাহস করছিল না। কেউ এক পা এগুলে দুই পা পিছিয়ে আসে। অবশেষে তারা ভাবল, এ বিষয়ে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে একমাত্র ওসামা বিন যায়েদই কথা বলতে পারবেন। তিনি এবং তার পিতা যায়দ নবী ﷺ-এর ঘরেই লালিত-পালিত হয়েছেন। তারা উভয়ে রাসূলের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন । ওসামা রাসূল ﷺ-এর নিজ সন্তানের মতোই ।

কোরাইশের কিছু লোক বুঝিয়ে শুনিয়ে ওসামাকে এ ব্যাপারে কথা বলতে রাজি করাল।

ওসামা নবী ﷺ-এর কাছে গেলেন। মহানবী ﷺ তাকে স্বাগত জানিয়ে নিজের কাছে বসালেন। ওসামা রাসূল ﷺ-এর কাছে উক্ত মহিলার দণ্ডাদেশ পরিবর্তন করার ব্যাপারে আলোচনা তুললেন। তিনি বললেন, 'মহিলাটি যেহেতু সম্ভ্রান্ত বংশীয় তাই একটু অনুগ্রহ করা যেতে পারে।'

ওসামা তার যুক্তি ও আবেদন পেশ করে যাচ্ছিলেন। মহানবী ﷺ ও মনোযোগ সহকারে তার কথা শুনছিলেন। ওসামা যুক্তির মাধ্যমে মহানবী ﷺ-এর সামনে তার মতটিকে সঠিক প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে মহানবী ﷺ ওসামার দিকে তাকালেন। ওসামা যুক্তি পেশ করছে। কিন্তু সে খেয়ালি করেনি যে, তার দাবিটি অন্যায় ও শরীয়তের নীতিবিরুদ্ধ!

এক পর্যায়ে রাগে মহানবী ﷺ-এর চেহারা মোবারক রক্তিম হয়ে গেল। মুখ খুলে প্রথম কথাতেই তিনি ওসামার ভুলটা ধরিয়ে দিলেন। মহানবী ﷺ বললেন,'ওসামা! তুমি আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ডবিধি শিথিল করার জন্য সুপারিশ করছ?'

এ কথা বলে মহানবী ﷺ একদিকে যেমন তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন, তেমনি অপরদিকে পরোক্ষভাবে ওসামার প্রতি অসন্তুষ্টির কারণও বলে

দিলেন। কেননা, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক বান্দার ওপর আরোপিত দণ্ডবিধি পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ করা বৈধ নয়।

ওসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ভুল বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আমি বুঝতে পারি নি। আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।'

দিন গড়িয়ে রাত হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবিদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। প্রথমে মহান রাব্বুল আলামীনের প্রশংসা করার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে লোকসকল! তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের ধ্বংসের একটি কারণ এও ছিল যে, যখন তাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশীয় কেউ চুরি করত, তারা তার ওপর আল্লাহর বিধান প্রয়োগ করত না। তবে চোর যদি দুর্বল বা নিম্নবর্ণের হতো, তাহলে তার উপর দণ্ডবিধি প্রয়োগ করত। তোমরা ভালো করে শুনে রেখ, আল্লাহর কসম! যদি আমার কন্যা ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদও চুরি করে, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দেব।' এরপর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সে মহিলার হাত কাটা হলো।

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, 'এরপর মহিলাটি আন্তরিকভাবে তওবা করেছিল। কিছুদিন পর তার বিয়েও হয়েছিল। সে মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রয়োজনে আমার কাছে আসা-যাওয়া করত। আমি তার প্রয়োজনের কথা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানাতাম। (সহিহ বুখারী:৩৯৬৫, সহিহ মুসলিম: ৩১৯৭)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ওসামা বিন যায়েদের এমন অনেক ঘটনাই আছে। প্রতিটি ঘটনাতেই তার প্রতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দয়া ও উন্নত আচরণের পরিচয় পাওয়া যায়।

ওসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে একবার জুহাইনা গোত্রের শাখা 'আল ওরাকা' এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পাঠালেন। আমরা তাদেরকে পরাজিত করে পলায়নপর যোদ্ধাদের পিছু ধাওয়া করছিলাম। আমি ও জনৈক আনসারি সাহাবি শত্রুপক্ষের একজনের পশ্চাদ্ধাবন করলাম। লোকটি একটি গাছের পেছনে আত্মগোপন করলো। তাকে ধরার পর তরবারি উত্তোলন করতেই সে বলে উঠল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ...।'

এ কথা শোনার সাথে সাথে আমার আনসারি সঙ্গী আঘাত না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তরবারি নামিয়ে ফেললেন। আমি ধারণা করলাম, সে মৃত্যুর

ভয়ে কৌশল অবলম্বন করছে মাত্র। তাই আমি লোকটিকে হত্যা করে ফেললাম। কালেমা পড়ার পর আমি তাকে হত্যা করেছি বিধায় বিষয়টি আমার মধ্যে শংকা সৃষ্টি করলো। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বিষয়টা জানালাম। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'লোকটি কালেমা পড়া সত্ত্বেও তুমি তাকে হত্যা করলে?'

আমি বললাম, 'আল্লাহর রাসূল! সে তো খাঁটি মনে কালেমা পড়ে নি। সে তা পড়েছিল আত্মরক্ষার্থে।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, 'লোকটি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে? সে খাঁটি মনে কালেমা পড়েছে কি-না তা জানার জন্য তুমি কেন তার বুক ফেড়ে দেখলে না?

ওসামা চুপ করে থাকলেন। বাস্তবেই তো তিনি লোকটির বুক ফেড়ে দেখেন নি। তিনি ছিলেন যুদ্ধের ময়দানে, আর লোকটা তার প্রতিপক্ষ এক যোদ্ধা!'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দিকে তাকিয়ে বারবার বলছিলেন, 'লোকটি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে?' লোকটি কালেমা পড়া সত্ত্বেও তাকে মেরে ফেললে?! কিয়ামতের দিন যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তোমার বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করবে তখন তুমি কী করবে? রাসূল বারবার ওসামাকে একথা বলছিলেন। ওসামা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এতবার কথাটি বললেন যে, আমি মনে মনে অনুশোচনা করছিলাম, 'হায়! যদি আমি আজই ইসলাম গ্রহণ করতাম!'

(সহিহ মুসলিমধ ১৪০)

দেখুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী উদারভাবে তার ভুলটি তুলে ধরে তাকে উপদেশ দিলেন।

আপনি যাকে উপদেশ দিচ্ছেন, যথাসম্ভব তার চিন্তাধারা ও মন-মানসিকতার দিকে খেয়াল রেখে কথা বলবেন। যে বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছেন বিষয়টিকে তার দৃষ্টিতে দেখুন। তাহলে আপনি যাকে উপদেশ দিতে চাচ্ছেন সে আপনার কথা সহজে গ্রহণ করবে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন এক মজলিসে বসা ছিলেন। তাকে ঘিরে সাহাবিগণও বসে আছেন। হঠাৎ জনৈক যুবক এসে বারবার এদিক-

সেদিক তাকাতে লাগল। সে যেন কাউকে খুঁজছে। আল্লাহর রাসূলের ওপর তার চোখ পড়তেই সে তাঁর দিকে অগ্রসর হলো।

সে মজলিসে বসে নসিহত শুনবে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু সে তা করলো না। সে মহানবী ﷺ ও তার পাশে বসা সাহাবায়ে কিরামের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

এরপর হঠাৎ সে নির্ভীক কণ্ঠে বলে উঠল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে ...... করার অনুমতি দিন।'

সে কিসের অনুমতি চেয়েছিল?

ইলমে দীন অর্জনের?

না, সে এর অনুমতি চায় নি। হায়! যদি সে এর অনুমতি চাইত!

তাহলে কি সে বলেছিল, 'আমাকে জিহাদের অনুমতি দিন, আমি জিহাদে যেতে চাই।'

না, সে তাও বলেনি। হায়! যদি সে এটা বলত!

সে কী বলেছিল? সে বলেছিল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে জিনা করার অনুমতি দিন'!

কী বলেন! এভাবে সরাসরি স্পষ্ট ভাষায় কেউ এ কথা বলে?!

হ্যাঁ, সে কোনো রাখঢাক না রেখে স্পষ্ট ভাষায়ই বললো, 'আমকে জিনার অনুমতি দিন।'

রাসূল ﷺ যুবকটির দিকে তাকালেন। তিনি চাইলে কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে যুবককে নসিহত করতে পারতেন। কিছু উপদেশ বাণী শুনিয়ে তার অন্তরে ঈমানী চেতনা জাগরিত করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করলেন।

মহানবী ﷺ খুব নরমস্বরে তাকে বললেন,'আচ্ছা, তোমার মায়ের সঙ্গে কেউ এ কাজ করুক, এটা কি তুমি সহ্য করবে?'

যুবকটি হঠাৎ কেঁপে উঠল। সে কল্পনার চোখে দেখলো তার মা পরপুরুষের সাথে... । সে আর ভাবতে পারল না। সে দৃঢ় কণ্ঠে বললো 'না, আমি কখনো তা সহ্য করব না।'

আল্লাহর রাসূল তাকে শান্ত স্বরে বললেন, 'স্বভাবগতভাবে কোনো মানুষ তার মায়ের সঙ্গে এরূপ আচরণ সহ্য করতে পারে না।'

এরপর মহানবী ﷺ তাকে আবার প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, তাহলে তোমার বোনের সঙ্গে কেউ এ কাজ করুক, এটা কি তুমি সহ্য করবে?'

যুবকটি আবারও শিউরে উঠলো। তার কল্পনায় ভেসে ওঠল তার বোন পরপুরুষের সাথে ....। সঙ্গে সঙ্গে সে দৃঢ় কণ্ঠে বললো 'না, আমার বোনের ক্ষেত্রেও আমি তা কখনো মেনে নিতে পারবো না।'

তখন মহানবী ﷺ বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছো। একজন সুস্থ রুচির মানুষ কখনো তার বোনের সঙ্গে এরূপ আচরণ মেনে নিতে পারবে না।'

এরপর মহানবী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, 'আচ্ছা, তাহলে তোমার ফুফুর সঙ্গে কেউ এ কাজ করুক, এটা কি তুমি পছন্দ করবে?'

'আচ্ছা, তাহলে তোমার খালার সঙ্গে কেউ এ কাজ করুক, এটা কি তুমি পছন্দ করবে?' যুবকটিও নেতিবাচক উত্তর দিতে লাগল।'

তখন মহানবী ﷺ তাকে বললেন, 'তাহলে তুমি অন্যের জন্য তাই পছন্দ কর, যা নিজের জন্য পছন্দ করছ। অন্যের জন্য তা ঘৃণা কর, যা নিজের ক্ষেত্রে ঘৃণা করছ।

এতক্ষণে যুবকটি বুঝতে পারল যে, সে অনেক বড় ভুলের মধ্যে ছিল!

এবার সে কাতরস্বরে বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ যেন আমার হৃদয়কে পবিত্র করে দেন।'

মহানবী ﷺ তাকে কাছে ডাকলেন। যুবকটি ধীরে ধীরে মহানবী ﷺ-এর কাছে এল। যখন সে একেবারে কাছে এসে বসল, মহানবী ﷺ তার বুকে হাত রেখে দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! এর অন্তরকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিন। তার যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করে দিন। তাকে অন্যায় কাজ থেকে মুক্ত রাখুন।' (শুআবুল ঈমান:৫১৮১)

মহানবী ﷺ-এর দরবার থেকে বের হওয়ার সময় যুবকটির স্বগতোক্তি : 'আল্লাহর শপথ! আমি যখন রাসূলের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম, তখন আমার কাছে জিনার চেয়ে প্রিয় অন্য কিছু ছিল না। আর যখন নবী ﷺ-

Contents

এর কাছ থেকে বের হলাম তখন আমার কাছে জিনার চেয়ে নিকৃষ্ট আর কিছু মনে হয় নি।

দেখুন, কী অভিনব পদ্ধতিতে মহানবী  তার ভুল ধরিয়ে দিলেন! এরপর আবেগ ও মমতার কী চমৎকার প্রয়োগ করলেন! প্রথমে তার অন্তরে কাজটির জঘন্যতার দৃঢ়প্রত্যয় সৃষ্টি করলেন, যেন সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা পরিহার করতে পারে। এরপর তাকে কাছে ডাকলেন। তার বুকে হাত রাখলেন, তার জন্য দোয়া করলেন। এককথায়, তাকে সংশোধন করতে যা যা দরকার সবই তিনি করলেন।

এর ফলে ভবিষ্যতে সে এ কাজ কখনো করবে না। জনসম্মুখেও না, কিংবা নির্জনেও না।

একটি মূলনীতি...

অপরাধী যদি অপরাধের নিকৃষ্টতা উপলব্ধি করতে পারে

তাহলে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপদেশ ও নসিহতের প্রয়োজন অনুভব করে।

তখন উপদেশ গ্রহণ করা তার জন্য সহজ হয়, উপদেশ হয় কার্যকর।

◈◈◈

৩৮. তিরস্কার করে আর কী লাভ, যা হওয়ার হয়ে গেছে

অনেকে মনে করে, যে ভুল-ত্রুটি সাধারণত কারো চোখে পড়ে না সে ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিলে বা এ কারণে তাকে তিরস্কার করলে তার নৈকট্যশীল হওয়া যায় এবং এর মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিত্ব শক্তিশালী হয়। আসল কথা হলো, তিরস্কার করা কখনও বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। তিরস্কার করা থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকাই উচিত। এর পরিবর্তে এমনভাবে সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত যা কারো জন্য কষ্টদায়ক কিংবা বিব্রতকর নয়। এমনভাবে যে আপনিও কষ্ট পাবেন না এবং আপনার দ্বারাও যেন কষ্ট না পায়।

কখনো কখনো এমন অনেক অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় যে, দেখেও না দেখার ভান করে থাকতে হয়। বিশেষত জাগতিক ও ব্যক্তিগত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে এমন বেশি করতে হয়। কবি বলেন-

নির্বোধরা কখনো কোনো জাতির নেতা হতে পারে না।

কিন্তু নেতাকে কখনো কখনো নির্বোধের ভান করতে হয়।

মনে রাখতে হবে, তিরস্কৃত ব্যক্তি তিরস্কারকে তার দিকে তাক করে রাখা ধারালো তীর বলে বিবেচনা করে থাকে। কেননা, তিরস্কারকে সে নিজের ত্রুটি হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে।

এটি হলো প্রথম লক্ষণীয় বিষয়।

দ্বিতীয় আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, যথাসম্ভব জনসম্মুখে কাউকে কখনো কোনো উপদেশ দেবেন না। কবি বলেন-

লোকচক্ষুর অন্তরালে যত খুশি উপদেশ দাও

কিন্তু সবার সামনে এ কাজ কখনো কর না।

লোকসমাজে উপদেশ এক ধরনের তিরস্কার

আমি তোমার কাছে এটা কখনো শুনতে চাই না।

তবে, একই ভুল যদি ব্যাপকভাবে ঘটতে দেখা যায় এবং সতর্ক করার প্রয়োজন হয় তাহলে সেখানে রাসূল ﷺ-এর নীতি অবলম্বন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ বলতেন: 'লোকদের কী হলো, যে, তারা এধরনের কাজ করে। এধরনের তিরস্কার চাবুকের ন্যায় কাজ করে।

অনেকে বেশি বেশি তিরস্কার করে অন্যদেরকে দূরে ঠেলে দেয়। আবার অনেক সময় এমন বিষয়ে তিরস্কার করা হয়, যার কোনো প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে তিরস্কার কোনো কাজেই আসে না।

জনৈক গরিব লোক পরিবার-পরিজন ফেলে বিদেশে পাড়ি জমাল। সেখানে সে ট্রাকের ড্রাইভিং পেশায় নিয়োজিত হলো। একদিন সে খুব ক্লান্ত ছিল। ক্লান্তি নিয়েই দূরের কোনো এক শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো।

তন্দ্রাভাব থাকায় সে তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌঁছার জন্য দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাতে লাগল। ইন্ডিকেটরের মাধ্যমে সিগনাল না দিয়েই সে সামনের একটি গাড়িকে ওভারটেক করলো। পরক্ষণেই দেখলো তার সামনে ছোট্ট আরেকটি গাড়ি। গাড়িটিতে তিনজন যাত্রী। ট্রাকচালক ছোট্ট গাড়িটিকে রক্ষা করতে অনেক চেষ্টা করলো। কিন্তু পারল না। একেবারে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো। পথচারীরা ঘটনাটি দেখতে লাগল।

ট্রাকচালক নিচে নামল। দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া গাড়িটি ও গাড়ির যাত্রীদের দিকে তাকাল। কেউ জীবিত নেই। লোকজন গাড়ি থেকে লাশ বের করে অ্যাম্বুলেন্সের জন্য ফোন করেছে।

ট্রাকচালকও বসে বসে অ্যাম্বুলেন্সের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। সে এর পরিণতি ভাবতে লাগল। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠল যন্ত্রণাদায়ক কারাভোগ ও রক্তপণের কথা। কী হবে তার স্ত্রী ও ছোট ছোট সন্তানদের ভবিষ্যৎ। সে এখন অসহায়। তার মাথায় দুশ্চিন্তার পাহাড় চেপে বসেছে।

এদিকে পথচারীরা তার পাশ দিয়ে যাচ্ছে আর তাকে তিরস্কার করছে। আশ্চর্য! এটা কি তিরস্কারের সময়? তারা একটুও সংযম অবলম্বন করতে পারলো না? কিছুক্ষণ কি দেরি করা যেতো না?

একজন বললো, 'এত দ্রুত গাড়ি চালাও কেন? এবার মজা বোঝ।'

আরেকজন বললো, 'আমি নিশ্চিত তুমি তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলে। তারপরও গাড়ি নিয়ে বের হয়েছ। গাড়ি থামিয়ে ঘুমিয়ে নিলে না কেন?'

তৃতীয়জন বললো, 'তোমার মতো ব্যক্তিকে ড্রাইভিং লাইসেন্স না দেয়াই উচিত।'

লোকেরা এ ধরনের আরো অনেক কথা তিরস্কারের স্বরে বলতে লাগল। লোকটি হতভম্ব নির্বাক হয়ে দুই হাত দিয়ে মাথা চেপে একটি পাথরের ওপর বসে থাকল। হঠাৎ সে একদিকে ঢলে পড়ল। এরপর তার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল।

তিরস্কারকারীদের তিরস্কারের আঘাতে সে মারা গেল। তারা যদি ধৈর্যধারণ করে একটু সংযম অলম্বন করত, তাহলে একটি প্রাণ বেঁচে যেত এবং সবার জন্যই মঙ্গলজনক হতো।

নিজেকে তিরস্কৃতের স্থানে রেখে চিন্তা করুন। বিষয়টি তার দৃষ্টি দিয়ে দেখুন। তার জায়গায় হলে হয়তো আপনি এর চেয়েও বড় কোনো ভুল করে ফেলতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব বিষয়ে খুব খেয়াল রাখতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম খায়বার যুদ্ধ থেকে মদিনায় ফিরে আসছেন। দীর্ঘ সফরের কারণে সবাই ক্লান্ত ও শ্রান্ত। চলতে চলতে রাত হয়ে গেল। বিশ্রামের জন্য রাস্তার কাছেই এক জায়গায় কাফেলা যাত্রাবিরতি করলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন, 'আমরা তো ক্লান্ত। ঘুমিয়ে পড়লে ফজরের সময় উঠতে সমস্যা হতে পারে। অতএব, কে ফজর পর্যন্ত জাগ্রত থেকে আমাদেরকে জাগিয়ে দেবে?

বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন খুব উদ্যমী। তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এ দায়িত্ব পালন করব।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবিগণ সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। দীর্ঘ সফরের কারণে তিনিও ক্লান্ত ছিলেন। নামায পড়তে পড়তে একপার্যায়ে তিনি আরো ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। ফলে একটু বিশ্রামের জন্য পূর্বমুখী হয়ে উটের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে সুবহে সাদিকের অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু একসময় নিজের অজান্তেই তিনিও ঘুমিয়ে পড়লেন ।

সকলেই ছিলেন ক্লান্ত ও শ্রান্ত। তাই সবাই খুব গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল। রাত শেষ হলো। সুবহে সাদিক হলো। সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন। অবশেষে সূর্যের প্রখর তাপে তাদের ঘুম ভাঙল।

সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ জাগলেন। তিনি কাফেলার সবাইকে জাগালেন। তড়িঘড়ি করে ঘুম থেকে উঠে সূর্য দেখে সবাই অস্থির হয়ে পড়লেন। সবার দৃষ্টি বেলালের দিকে।

রাসূল ﷺ বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেলাল! তুমি এটা কী করলে?'

বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু খুব সংক্ষেপে উত্তর দিলেন। তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আপনার যা হয়েছিল আমারও তা হয়েছিল।'

আমিও মানুষ। চেষ্টা করেও আমি ঘুম রোধ করতে পারি নি। আপনাদের মতো আমিও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি সত্য বলেছ।'

রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে আর কিছু বললেন না। এক্ষেত্রে তিরস্কার করে লাভ আর কী হবে?

সাহাবিদের অস্থিরতা দেখে রাসূল ﷺ সবাইকে সে স্থান ত্যাগ করতে বললেন। কাফেলা যাত্রা শুরু করলো। একটু সামনে গিয়ে থামলেন। তারপর কাফেলার সবাইকে নিয়ে অযু করলেন। ফজরের কাজা নামায আদায় করলেন। সালাম ফিরিয়ে সাহাবিদেরকে বললেন-

مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

অর্থ : নামায আদায় করতে ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র তা আদায় করে নেবে। (সহিহ মুসলিম:১০৯৭)

আল্লাহু আকবার! কী চমৎকার প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা! কী সুন্দর সিদ্ধান্ত!

আল্লাহর রাসূল ছিলেন সবার জন্য আদর্শ। তিনি এখনকার সেসব নেতাদের মতো ছিলেন না যারা অধীনস্থদের ওপর সবসময় তিরস্কার ও ভর্ৎসনার লাঠি ঘুরান। তিনি নিজেকে অধীনস্থদের স্থানে রেখে তাদের দৃষ্টিতে দেখতেন। মানুষের দেহ নয়; বরং হৃদয়ের সাথে তিনি লেনদেন করতেন তিনি বিশ্বাস করতেন— এরা মানুষ, মেশিন নয়।

অষ্টম হিজরি সনের কথা। রোমানরা সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে শামের দিক থেকে

অগ্রসর হলো। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, রাসূল ﷺ যুদ্ধের জন্য আগে সৈন্য প্রস্তুত করেছিলেন।

রাসূল ﷺও রোমানদের উদ্দেশ্যে সৈন্য প্রেরণের প্রস্তুতি শুরু করলেন। সাহাবিদেরকে যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। তিন হাজার সাহাবিকে যুদ্ধের যাবতীয় সরঞ্জামাদি ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে প্রস্তুত করলেন।

রাসূল বলে দিলেন, 'তোমাদের সেনাপতি হলো যায়েদ বিন হারেসা। যায়েদ শহিদ হলে সেনাপতি হবে জাফর বিন আবু তালেব। জাফরও যদি শহিদ হয় তাহলে সেনাপতি হবে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা।'

রাসূল ﷺ মুজাহিদ কাফেলাকে বিদায় দেয়ার জন্য বের হলেন। সঙ্গে অন্যরাও বের হলো। সবাই সৈন্যবাহিনীকে বিদায় দিল। বিদায়ের কালে তারা বললো-

صَحِبَكُمُ اللهُ، وَدَفَعَ عَنْكُمْ، وَرَدَّكُمْ اِلَيْنَا صَالِحِيْنَ.

অর্থঃ আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি তোমাদের রক্ষা করুন। তোমাদেরকে নিরাপদে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনুন।

আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদতের জন্য উদগ্রীব ছিলেন। তিনি কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন-

হে রহমান আল্লাহ, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই,

আমি আরো চাই একটি বর্শা যেন আঘাত করে আমার বুক
এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়।

আমার কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় যেন লোকজন
ঈর্ষা করে বলে ওঠে:

হে আল্লাহর পথের মুজাহিদ তুমি সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছ।

এরপর মুসলিম বাহিনী মুতার দিকে রওয়ানা হলো। পথিমধ্যে তারা শামের মাআন নামক স্থানে ছাউনি ফেললো। এখানে পৌঁছে মুসলমানরা জানতে পারল, বালকা নামক স্থানে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস এক লাখ নিয়মিত রোমান সৈন্য নিয়ে অবস্থান করছে। তার সঙ্গে বিভিন্ন গোত্রের আরো একলাখ সৈন্য রয়েছে। এর ফলে রোমান সৈন্যদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দুই লাখে।

মুসলমানরা বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে মাআনে দুইরাত অবস্থান করে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। এ বিষয়ে সাহাবিদের মধ্যে অনেক আলোচনা-পর্যালোচনা হলো। কেউ কেউ বললেন, 'আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে চিঠি পাঠিয়ে শত্রুবাহিনীর সমরশক্তি সম্পর্কে অবহিত করি। এতে রাসূল হয় অতিরিক্ত সৈন্য পাঠিয়ে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন, অথবা তিনি যা ভালো মনে করবেন সে অনুযায়ী আদেশ দেবেন। আমরা সে আদেশ পালন করব।' এ ব্যাপারে অনেক কথা হলো।

এসব কথা শুনে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা দাঁড়িয়ে উচ্চ আওয়াজে বললেন, 'হে মুজাহিদগণ! আল্লাহর কসম! আজ তোমরা যা অপছন্দ করছ, তা লাভ করার জন্যই তো তোমরা বেরিয়েছিলে! আল্লাহর পথে শাহাদাত লাভের সৌভাগ্য থেকে তোমরা পিছপা হচ্ছ।! মনে রেখ! আমরা জনবল, সামরিক শক্তি বা অস্ত্রশস্ত্রের ওপর নির্ভর করে দুশমনের মোকাবিলায় আসি নি। মুসলমান কখনো অস্ত্রের ওপর ভরসা করে যুদ্ধ করে না। আমরা তো সে দ্বীন আর ঈমানের শক্তি নিয়ে শত্রুর মোকাবিলায় এসেছি, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। অতএব সামনে চল। বিজয় বা শাহাদত- যাই আমাদের লাভ হোক তাই আমাদের জন্য কল্যাণকর।'

আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ঈমানদীপ্ত ভাষণে সবাই যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। তারা নব উদ্যমে সামনে এগোতে লাগলেন। অবশেষে তারা মুতা নামকস্থানে রোমানদের বিশাল বাহিনীর মুখোমুখি হলেন।

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি মুতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। মুশরিকরা যখন আমাদের কাছাকাছি এলো, তখন তাদের একেকজনের সঙ্গে এতো বিপুল পরিমাণ ঢাল তরবারি, অস্ত্র সরঞ্জাম, রেশম, স্বর্ণ ইত্যাদি দেখলাম যা এর আগে কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা যায় নি। এসব দেখে আমার চোখে ধাঁধা লেগে গেল। তখন সাবেত বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বললেন, 'আবূ হোরায়রা! তুমি মনে হয় বিশাল সৈন্যসমাবেশ দেখছ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।

তিনি বললেন, 'তুমি বদরে আমাদের সঙ্গে ছিলে না। সেখানে আমরা সংখ্যার বলে বিজয় লাভ করি নি।'

এরপর সাহাবিরা শত্রুর মুখোমুখি হলেন। যুদ্ধ শুরু হলো। যায়েদ বিন হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেয়া পতাকা বহন করে যুদ্ধ করতে লাগলেন। বর্শার আঘাতে আঘাতে তার পুরো শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেল। এক পর্যায়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করলেন।

এরপর জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু পূর্ণ সাহসিকতার সঙ্গে পতাকা তুলে নিলেন। তিনি ঝাকড়া চুলের ঘোড়ার পিঠে চড়ে শত্রুর মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তার মুখে তখন উচ্চারিত হচ্ছিল বিশেষ কবিতামালা–

কী সুখ জান্নাতে, কী চমৎকার জান্নাতের দৃশ্য!

এর শরাবে রয়েছে কী ঘ্রাণ আর শীতল পরশ।

আর রোমানদের চরম শাস্তি এ তো কাছে চলে এসেছে। তাদের বংশ
নির্বংশ হবে। নিঃশেষ হবে তাদের সব আশা-ভরসা। ময়দানে যখন
নেমেছে তখন তাদের কাউকে ছাড়ব না।

জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু ডান হাতে পতাকা বহন করছিলেন। শত্রুর আঘাতে তার ডান হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এরপর তিনি বাম হাতে পতাকা তুলে নিলেন। তাও বাহু পর্যন্ত কেটে গেল। তখন দুই বাহুর অবশিষ্ট অংশ দিয়ে পতাকা আকড়ে ধরলেন। এভাবে লড়াই করতে করতে তিনিও শাহাদাতের অমীয় সুধা পানে ধন্য হলেন। তখন তার বয়স হয়েছিল মাত্র তেত্রিশ বছর।

আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি সেদিন জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছেই ছিলাম। তার শাহাদাতের পর আমি গুণে দেখলাম, তার শরীরে পঞ্চাশটির মতো তীর তরবারির জখম ছিল। এসব আঘাতের একটিও তার পেছন দিকে ছিল না। এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তাকে দুটি ডানা দান করেছেন। এ ডানা দিয়ে তিনি জান্নাতে যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ান।

জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু শহিদ হয়ে গেলে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু পতাকা তুলে নিলেন। ঘোড়ার পিঠে চড়ে পতাকা হাতে সামনে এগুতে থাকলেন। তিনি

হয়তো কিছুটা দ্বিধায় ভুগছিলেন। তাই নিজেকে উদ্বুদ্ধ করতে বারবার আবৃত্তি করতে লাগলেন-

শপথ করেছি আমি হে আমার মন,
নামতে হবে তোমাকে ঘোড়া ছেড়ে
যদিও তোমার তা ভালো না লাগে।
দেখ কাফেরদের ঢাল-তলোয়ার কেমন ঝনঝন করে বাজে,
দেখ চতুর্দিকে তারা কেমন ঘোড়া হাকিয়ে ছুটছে।
তুমি কি জান্নাতের বাগ-বাগিচায় বিনোদন করতে চাও না?

এরপর তিনি যায়েদ ও জাফরকে স্মরণ করে বললেন-

হে আমার মন এখানে না মরলেও
একদিন তোমাকে মরতে হবে।
এ যে মৃত্যুর অঙ্গনে তুমি পৌঁছেছ।
এখানে তুমি যা চাইবে তাই পাইবে।
তুমি যদি তোমার পূর্ববর্তী (জায়েদ ও জাফর)দের মতো
কাজ করতে পার তাহলে তুমি সফল হয়ে যাবে।

এরপর তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়লেন। এদিকে তার এক চাচাত ভাই গোশতযুক্ত একটি হাড় নিয়ে এসে বললো, 'এটা খেয়ে কোমরটা একটু সোজা কর। এ কয়দিন তোমার ওপর দিয়ে যে ধকল গেছে তা আর কী বলব।'

আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার হাত থেকে হাড়টা নিয়ে তাতে একটা কামড় দিলেন। ইতোমধ্যে রণাঙ্গনের এক কোণে শোরগোল শুনতে পেয়ে তিনি হাড়টার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'লোকজন জীবনবাজি রেখে লড়ছে আর তুমি এখনো দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত?' এ কথা বলে তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এরপর তরবারি হাতে সেদিকে ছুটলেন এবং লড়াই করতে করতে তিনিও শহিদ হয়ে গেলেন।

মুসলিম বাহিনীর পতাকা মাটিতে পড়ে গেল। মুসলিম বাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। কাফের বাহিনী নবোদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পতাকাটি ঘোড়ার পায়ের তলে দলিত হলো, ধূলোয় ধূসরিত হলো।

বীরযোদ্ধা সাবেত বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু অগ্রসর হয়ে পতাকাটি হাতে তুলে নিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'হে মুসলিম বাহিনী! এ দেখ তোমাদের পতাকা। তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে পতাকাবাহক আমির হিসেবে নির্বাচন কর।'

যারা তার কথা শুনল তারা সবাই বলে উঠল, 'তুমিই গ্রহণ কর। তুমিই গ্রহণ কর।'

তিনি বললেন, 'আমি পারব না।'

এরপর সবাই খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে নির্বাচন করলেন। তিনি পতাকা হাতে নিয়ে বীরবিক্রমে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পরে এক সময় তিনি বলেছিলেন, 'মুতার যুদ্ধে আমার হাতে নয়টি তরবারি ভেঙ্গেছে। যুদ্ধ শেষে আমার কাছে শুধু একটি ইয়েমেনি তরবারি ছিল।'

যাই হোক, একপর্যায়ে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বাহিনী নিয়ে কৌশলে পেছনে সরে আসলেন। রোমানরাও তাদের ছাউনিতে ফিরে গেল।

খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সেনাবাহিনী নিয়ে রাতেই মদিনায় ফিরে আসা নিরাপদ মনে করলেন না। কেননা, এতে রোমান সৈন্যরা তাদের পশ্চাদ্ধান করতে পারে। এটা ভেবে তিনি যাত্রা স্থগিত রাখলেন। সকালবেলা খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সেনাবাহিনীর বিন্যাস পরিবর্তন করলেন। অগ্রভাগকে পশ্চাদভাগে আর পশ্চাদভাগকে অগ্রভাগে মোতায়েন করলেন। ডানদিকের বাহিনীকে বামদিকে এবং বামদিকের বাহিনীকে ডানদিকে মোতায়েন করলেন।

যুদ্ধ আবার শুরু হলো। রোমানরা অগ্রসর হলো। তাদের বিন্যাস আগের মতোই ছিল। তারা মুসলমান বাহিনীতে নতুন নতুন পতাকা ও নতুন নতুন চেহারা দেখতে পেল। তখন রোমানরা ভাবল, 'রাতে মুসলমানদের সাহায্যকারী সৈন্য এসেছে এখন আর তাদের সাথে কুলিয়ে ওঠা যাবে না।'

মুসলমানরা তাদের ওপর নব উদ্যমে প্রচণ্ড আক্রমণ করলো। রোমানদের প্রচুর সৈন্য হতাহত হলো। মুসলমানদের কেবল বারোজন শহীদ হলেন।

খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু দিন শেষে বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে এলেন। এরপর মদিনার উদ্দেশ্য যাত্রা করলেন। মদিনার কাছাকাছি এলে মদিনার বালকেরা তাদের কাছে ছুটে এলো। মহিলারাও ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তারা সবাই কাফেলার দিকে মাটি ছুড়তে লাগল আর বলতে লাগল, 'হে পলায়নকারীরা! তোমরা আল্লাহর পথ ছেড়ে পালিয়ে এসেছ।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেলা থেকে সবকিছু শুনলেন। তিনি অনুভব করলেন, তাদের সামনে এ ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না। তাদের যতটুকু ক্ষমতা ছিল, তারা তা করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেলার পক্ষ থেকে জবাব দিলেন-

لَيْسُوْا بِالْفُرَّارِ وَلٰكِنَّهُمُ الْكُرَّارُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.

অর্থ : তারা পলায়ন করে নি; বরং পুনরায় হামলার উদ্দেশ্যে কৌশল অবলম্বন করে ফিরে এসেছে।

বিষয়টি এভাবে শেষ হয়ে গেল। তারা বীর বাহাদুর। তারা চেষ্টায় কোনো ত্রুটি করে নি। তারাও তো মানুষ। এক্ষেত্রে বিষয়টি তাদের সামর্থ্যের বাইরে ছিল। এখন কাজ হলো শহীদদের জানাযা পড়া। গাজীদেরকে তিরস্কার করে কোনো লাভ নেই।

এটাই ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবসময়ের নীতি।

মক্কার কাফেররা যখন শুনতে পেল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবিদের নিয়ে মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে আসছেন তখন তাদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে একজন লোক পাঠালেন। সে ঘোষণা করলো-

'যে ব্যক্তি নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবে, সে নিরাপদ।

যে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।

যে আবূ সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সেও নিরাপদ।'

মক্কার কাফেররা ভয়ে পালাতে লাগল। ওদিকে কোরাইশের কিছু অশ্বারোহী যুবক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সমবেত হলো। কিন্তু তাদের গোত্রের লোকজন তাদেরকে সমর্থন করতে বা তাদেরকে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করলো। অবশেষে খান্দামা নামক স্থানে তাদের একটি দল সমবেত হলো। এ দলে ছিল সাফওয়ান বিন উমাইয়া, ইকরিমা বিন আবূ

জাহল ও সুহাইল বিন আমর। তারা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আরো কিছু লোক একত্র করলো।

মক্কার কাফের হামাস বিন কায়স রাসূলের আগমনের আগ থেকেই অস্ত্র প্রস্তুত করে রেখেছিল। একদিন তার স্ত্রী তাকে বললো, 'এগুলো কেন প্রস্তুত করছ?'

সে বললো, 'মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য।'

তার স্ত্রী মুসলমানদের শৌর্য-বীর্যের কথা জানত। সে বললো, 'আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীদের সামনে দাঁড়াতে পারবে, এমন কাউকে তো আমি দেখি না।'

হামাস বললো, 'আল্লাহর শপথ! আমি আশা করছি তাদের (মুসলমানদের) কাউকে বন্দী করে নিয়ে এসে তাকে গোলাম হিসেবে আমি তোমার সামনে পেশ করবো।'

এরপর সে অহঙ্কার করে বলতে লাগল-

তারা যদি আসে তাহলে আমি বসে থাকব না।
এ যে আমার আছে পরিপূর্ণ অস্ত্র-শস্ত্র।
আরো আছে দুধারি ও দ্রুত হামলাকারী তলোয়ার।

এরপর স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে খান্দামার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। সেখানে তার সঙ্গীরাও ছিল। সে ওখানে পৌঁছতেই মুসলমানরা তাদের মুখোমুখি হলো। মুসলমানরা তাদের ওপর হামলা করলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে বারো তেরোজনেরও বেশি কাফেরকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিলেন।

হামাস বিন কায়স এ অবস্থা দেখে সাফওয়ান ও ইকরামার দিকে তাকাল। দেখলো, তারা বাড়ির দিকে পালাচ্ছে। সেও বাড়ির দিকে দৌড়াতে লাগল। দ্রুত ঘরে প্রবেশ করে ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠে চিৎকার করে স্ত্রীকে বললো, তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ কর। তারা ঘোষণা করেছে, 'যে ব্যক্তি নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবে, সে নিরাপদ।'

স্ত্রী বললো, 'তুমি যা বলেছিলে, তা গেল কোথায়? তাদেরকে বন্দী করবে! তাদেরকে গোলাম বানিয়ে আমাকে উপহার দেবে।

হামাস তখন বললো,

খান্দামার যুদ্ধে তুমি যদি যেতে !

তাহলে দেখতে, ইকরিমা আর সাফওয়ান পালাচ্ছে,

আবূ ইয়াযিদ হতভম্ব হয়ে স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে আছে,

মুসলমানদের তরবারিগুলো তাদেরকে ধাওয়া করছে।

কাটছে তারা বাহু আর মাথার খুলি

সেখানে মৃত্যুর ভয়াবহ প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছুই শুনতে না।

ক্ষুধার্ত সিংহগুলো যখন আমাদের তাড়া করছিল

(তখন তুমি যদি সেখানে থাকতে) তাহলে ভর্ৎসনা করে আমাকে একটি শব্দও বলতে না।

বাস্তবতাও তাই। তার স্ত্রী যদি খান্দামা যুদ্ধের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করত তাহলে স্বামীকে তিরস্কার করে সে একটি শব্দও বলতে পারত না।

ওদিকে রাসূল ﷺ বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন। তিনি মক্কার সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিলেন। তাই যতটুকু না করলেই নয় ততটুকু যুদ্ধ করলেন। এরপর বললেন-

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيْهِ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ وَلَمْ يَحِلَّ لِيْ إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ.

'আল্লাহ আসমান-জমিন সৃষ্টির দিন থেকে এ শহরকে সম্মানিত করেছেন, অর্থাৎ এ শহরে যুদ্ধবিগ্রহ হারাম করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত তা সম্মানিত থাকবে। আমার আগে কারো জন্য এতে রক্তপাত বৈধ করা হয় নি। তবে আজকের দিনের কিছু সময়ের জন্য আমাকে আল্লাহ তাআলা এর বৈধতা দিয়েছেন। (সহিহ বুখারী:২৯৫১, সহীত মুসলিম: ২৪১২)

রাসূল ﷺ-কে জানানো হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কাউকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু খালিদ বিন ওয়ালিদ তার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে মুশরিকদের যাকে পাচ্ছে, তাকেই হত্যা করছে।'

রাসূল ﷺ জনৈক সাহাবিকে বললেন, 'যাও। খালিদ বিন ওয়ালিদকে গিয়ে বল, 'সে যেন হত্যা থেকে হাত উঠিয়ে নেয়।'

এ ব্যক্তি মনে করলো, আমরা এখন যুদ্ধাবস্থায় আছি। আর রাসূল ﷺ কোরাইশদেরকে ঘরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তারা হত্যার শিকার না হয়। অতএব যে ঘর ছাড়া অন্য কোথাও থাকবে, সে হত্যার যোগ্য হবে। 'সে যেন হত্যা করা থেকে হাত উঠিয়ে নেয়।'–রাসূলের এ কথা থেকে লোকটি বুঝল যে, খালিদ সামনে যাকে পাবে, তাকেই হত্যা করবে। একপর্যায়ে তরবারিসহ হাত গুটিয়ে নেবে। কারণ তখন সে আর কাউকে হত্যা করার মতো পাবে না। নিজের বুঝ অনুযায়ী লোকটি খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এসে চিৎকার করে বললো, "খালিদ! রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তুমি যাকে পাও তাকে হত্যা কর!"

এরপর খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সত্তরজন লোককে হত্যা করলো।

অপর এক ব্যক্তি এসে রাসূল ﷺ-কে জানাল, 'আল্লাহর রাসূল! খালিদ তো হত্যা করেই চলছে।'

রাসূল ﷺ অবাক হলেন। নিষেধ করা সত্ত্বেও খালিদ হত্যা করছে! তিনি খালিদকে ডেকে পাঠালেন। খালিদ উপস্থিত হলো।

রাসূল ﷺ বললেন, 'আমি কি তোমাকে হত্যা করতে নিষেধ করি নি?' রাসূলের এ কথা শুনে খালিদও আশ্চর্য হয়ে বললো, "আল্লাহর রাসূল! অমুক ব্যক্তি তো আমাকে বলেছে, আপনি বলেছেন, 'যাকে পাও তাকে হত্যা কর।"

তখন রাসূল ﷺ সে ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন। সে এসে দেখলো, খালিদও উপস্থিত। রাসূল ﷺ তাকে বললেন,'আমি কি হত্যা করা থেকে হাত উঠিয়ে নিতে বলি নি?'

লোকটি তার ভুল বুঝতে পারল। কিন্তু যা হওয়ার, তা তো হয়ে গেছে।

তখন সে বললো, 'আল্লাহর রাসূল! আপনি একটা চেয়েছেন, আর আল্লাহ চেয়েছেন আরেকটা। আর আল্লাহর ইচ্ছাই বাস্তবায়ন হয়েছে। যা হওয়ার ছিল তা হয়ে গেছে।'

রাসূল ﷺ থেমে গেলেন। তাকে আর কিছু বললেন না।

জীবনের গতি-প্রকৃতি নিয়ে যে চিন্তা করবে তার কাছে এ বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, অনেক সময় মানুষ তার সাধ্যের চেয়ে ভালো কাজ করে ফেলে।

একবার আমি এক যুবকের সঙ্গে তার গাড়িতে চড়লাম। দেখলাম সে গাড়ি খুব সুন্দর চালায়। আমি জানতাম, এক সপ্তাহ আগে সে একটি সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিল।

আমি তাকে বললাম, 'তুমি তো খুব সুন্দরভাবে গাড়ি চালাও। এক সপ্তাহ আগে দুর্ঘটনার শিকার হলে কেন?'

সে উত্তর দিল, 'আমি বাধ্য ছিলাম।'

'মানে?'

'হ্যাঁ! অ্যাকসিডেন্ট না করে আমার উপায় ছিল না। জানেন, কেন?'

'কেন?'

'আমি গাড়ি নিয়ে দ্রুতগতিতে একটি ব্রিজে উঠছিলাম। সেভাবে দ্রুতগতিতে নামতে গিয়ে দেখলাম, আমার সামনে অনেকগুলো গাড়ি সারিবদ্ধভাবে থেমে আছে। জানি না সামনে কি কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে, নাকি চেকপোস্ট ছিল। আমি হঠাৎ সারিবদ্ধ অনেকগুলো গাড়ির মুখোমুখি হয়েছিলাম।'

'আমার সামনে চারটি লেন ছিল। সবক'টি লেনই গাড়িতে পূর্ণ ছিল। তাই আমার সামনে তখন তিনটি পথ খোলা ছিল। এক এই সবগুলো লেন ছেড়ে ব্রীজের ওপর থেকে পড়ে যাওয়া! দুই, শরীরের পূর্ণ শক্তি দিয়ে ব্রেক চেপে ধরা। এ অবস্থায় আমার গাড়ি উল্টে যাবে। তৃতীয় আরেকটি পথ খোলা ছিল। সেটা ছিল সবচেয়ে সহজ।'

আমি বললাম,'সেটা কী?'

সে বললো, 'আমার সামনের চার লেনে দাঁড়িয়ে থাকা চারটি গাড়ির কোনো একটিকে ধাক্কা দেয়া। আমি হেসে বললাম, 'আচ্ছা! তুমি কী করেছিলে?'

সে বললো, 'আমি যথাসম্ভব গতি কমিয়ে নিলাম এবং আমার সামনের গাড়িগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কমদামী গাড়িটি বেছে নিয়ে তাতে ধাক্কা দিলাম!'

এ কথা বলে সে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলো। আমিও হাসলাম। কিন্তু পরে তার কথাগুলো নিয়ে ভেবে দেখলাম, আসলেই সে খুব বেশি তিরস্কারের উপযুক্ত নয়। কেননা, তার সামনে সীমিত কয়েকটি পথই খোলা ছিল। আর সে তুলনামূলক সবচেয়ে ভালো পথটিই গ্রহণ করেছে। সারকথা হলো, কিছু সমস্যা এমন আছে, যার কোনো সমাধান নেই।

যেমন ধরুন, কারো পিতা খুব রাগী। পিতাকে সে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। এখন সে কী করবে? পিতাকে ছেড়ে চলে যাবে? না তাকে নিয়েই থাকতে হবে। কেননা, তার পিতার প্রকৃতি পাল্টানোর সাধ্য তার নেই।

কথার বাঁকে ...

নিজেকে তিরস্কৃতের অবস্থানে রেখে
তার দৃষ্টি দিয়ে বিষয়টি নিয়ে ভাবুন।
এরপর তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিন।



৩৯. ভুল শোধরানোর পূর্বে ভুল সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে নিন

একদিন একজন পরিচিত ব্যক্তি আমাকে ফোন করলো। তার ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর শুনে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, সে প্রচণ্ড রেগে আছে এবং সে তার রাগ দমিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। আমি সবসময় তার যে কণ্ঠস্বর শুনে অভ্যস্ত, এতো তা নয়! যেভাবে সে কথা বলছে তাতে বুঝলাম কিছু একটা হয়েছে।

সে তার কথা শুরু করলো একটি অপপ্রচারকে কেন্দ্র করে। এরপর তার কণ্ঠ আরো তীব্র হল। সে বলতে লাগল, 'আপনি একজন দাঈ, একজন আলেম। আপনার কাজ-কর্মের দায়-দায়িত্ব আপনার ওপরই বর্তাবে ...।'

আমি বললাম, 'ভাইজান! কী হয়েছে সরাসরি বলুন।'

লোকটি বললো, 'আপনি অমুক জায়গায় যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, তাতে আপনি বলেছিলেন... ।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কত দিন আগের ঘটনা?'

'তিন সপ্তাহ আগের।'

'তিন সপ্তাহ? আমি তো গত এক বছরেও সেখানে যাই নি।'

'অবশ্যই গেছেন এবং বৃক্ততায় এ এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।'

এতক্ষণে আমার কাছে স্পষ্ট হলো যে, সে কোনো অপপ্রচারের শিকার হয়েছে এবং তা বিশ্বাস করে নিয়েছে। সে অপপ্রচারের ওপর ভিত্তি করেই আমাকে ফোন করেছে এবং আমার সাথে এ ধরনের কথা বলছে। আমি তাকে ভালোবাসি এবং ভবিষ্যতেও তাকে ভালোবেসে যাব। কিন্তু আমার কাছে তার ওজন কিছুটা হলেও কমে গেছে। আজ বুঝতে পেরেছি যে, লোকটা গুজবে কান দেয়। কেউ যদি বলে 'চিল তোমার কান নিয়ে গেছে' তাহলে কানে হাত দিয়ে না দেখেই চিলের পেছনে দৌড়াতে শুরু করে।

বহুলোক আছে, যারা গুজব ও অপপ্রচারের ওপর ভিত্তি করেই অবস্থান নেয় বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আপনাকে এমন অনেকেই উপদেশ দিতে আসবে। পরবর্তীতে দেখা যাবে, সে কোনো গুজব বা অপপ্রচারের ওপর ভিত্তি করে আপনাকে উপদেশ দিতে এসেছে।

গুজব ও অপপ্রচার অনেকের অন্তরেই বদ্ধমূল হয়ে যায়। এর ওপর ভিত্তি করে তারা আপনাকে নিয়ে বিভিন্ন কিছু ভাবতে শুরু করে। অথচ এসব ভাবনার ভিত্তিই সম্পূর্ণ অবাস্তব।

মাঝে মধ্যে শোনা যায়, অমুক ব্যক্তি এই এই কাজ করেছে। তখন এটা প্রচার করার আগে সংবাদটা বাস্তব কি-না, তা নিশ্চিত হয়ে নিন। এতে তার কাছে আপনাকে লজ্জিত হতে হবে না। আর এটাই মহানবী ﷺ-এর নিয়ম।

একবার জনৈক ব্যক্তি মহানবী ﷺ-এর কাছে এলো। মহানবী ﷺ লক্ষ্য করলেন, লোকটির বেশভূষা জীর্ণশীর্ণ, চুল এলোমেলো। মহানবী ﷺ তার সংশোধন করতে কিছু বলতে চাইলেন। কিন্তু তিনি ভাবলেন, লোকটি যদি আসলেও দরিদ্র হয়ে থাকে তাহলে সে চাইলেও সবকিছু ঠিক করতে পারবে না।

তাই মহানবী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি ধন সম্পদ আছে?'

সে বললো,'হ্যাঁ, আছে।'

'কী ধরনের সম্পদ আছে?'

'উট ঘোড়া, ভেড়া বকরি সবই আছে।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'যেহেতু আল্লাহ তাআলা তোমাকে সম্পদ দিয়েছেন তাই তোমার দেহে যেন এর নিদর্শন থাকে।'

তারপর বললেন, 'তোমাদের উটগুলো তো নিঁখুত অবস্থাতেই জন্মগ্রহণ করে। তারপর তোমরা ক্ষুর দিয়ে সেগুলোর কান কেটে ফেল। আর বল, এটি হলো 'বুহাইরা'। অথবা তার শরীরে বা চামড়ার কেনো জায়গায় ছিদ্র করে বল, এটা হলো 'সরম'। এরপর এগুলোকে নিজেদের ও পরিবারের জন্য হারাম সাব্যস্ত কর।'

সে বললো, 'হ্যাঁ, আমরা তো এমনই করি।'

রাসূল তখন বললেন,'তাহলে আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন, তা তো অবশ্যই তোমার জন্য বৈধ । আর মনে রেখ, আল্লাহর ক্ষুর অনেক বেশি ধারাল!' (মুসতাদরাকে হাকিম:৭৪৭১)

নবম হিজরিতে আরব ও অন্যান্য জনপদের বিভিন্ন গোত্র থেকে তাদের প্রতিনিধিরা রাসূলের কাছে আসত। কেউ তো মুসলমান হয়ে আসত। তারা এসে বায়াত গ্রহণ করত। আবার কিছু লোক আসত কাফের অবস্থাতেই। তারা এসে ইসলাম গ্রহণ করত কিংবা সন্ধি করত। একদিন রাসূল সাহাবিদের নিয়ে বসা ছিলেন। এমন সময় দশ বারোজন সওয়ার এলো। তারা রাসূলের মজলিসে এসে বসল। কিন্তু সালাম দিল না।

রাসূল তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি মুসলমান?'

তারা বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা মুসলমান।'

রাসূল বললেন, 'তাহলে তোমরা সালাম দিলে না কেন?'

তারা কোনো কিছু না বলে দাঁড়িয়ে সালাম দিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তর দিয়ে তাদেরকে বসতে বললেন। এরপর তারা নামাযের সময় সম্পর্কে রাসূলকে জিজ্ঞেস করলো।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগের ঘটনা। ইসলামি ভূখণ্ডের সীমা তখন অনেক বিস্তৃত। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করলেন।

কুফায় তখন বিভিন্ন দল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছিল। তাদের একটা দল ওমরের নিকট সা'দের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে চিঠি লিখল। চিঠিতে তারা তার অনেক দোষ ত্রুটির কথা উল্লেখ করলো। এসবের মধ্যে একটি হলো, তিনি নামাযের প্রতি যত্নবান নন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু চিঠি পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই কোনো সিদ্ধান্ত নিলেন না কিংবা তাকে কোনো নসিহতও করলেন না; বরং তিনি মুহাম্মাদ বিন মাসলামাকে একটি চিঠি দিয়ে সা'দের কাছে পাঠালেন এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে লোকজনের কাছ থেকে তার সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে নির্দেশ দিলেন।

মুহাম্মদ বিন মাসলামা সা'দের কাছে পৌছে খলিফার নির্দেশ শোনালেন। এরপর তার সঙ্গে বিভিন্ন মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে লাগলেন এবং লোকজনের কাছ থেকে তার ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে শুরু করলেন। সবাই তাঁর সুনাম করলো।

অবশেষে তারা বনু আবসের একটি মসজিদে প্রবেশ করলেন। মুহাম্মদ বিন মাসলামা সেখানকার মানুষের কাছে তাদের গভর্নর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সবাই তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করলো।

মুহাম্মদ বললেন, 'আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, তোমরা তার ব্যাপারে ভিন্ন কিছু জেনে থাকলে বল।' সবাই বললো, 'আমরা যা বলেছি, ঠিক বলেছি। আমরা তাকে ন্যায়পরায়ণ গভর্নর হিসেবেই পেয়েছি।'

তিনি আবার ভালোভাবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। তখন মসজিদের শেষ প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়াল। তার নাম ওসামা বিন কাতাদাহ।

সে দাঁড়িয়ে বললো, 'আপনি যেহেতু শপথ করিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তাহলে শুনুন, সা'দ সর্বক্ষেত্রে সমতা বিধান করে না অর্থাৎ পক্ষপাতিত্ব করে এবং ন্যায়ভাবে বিচার করে না!'

এ কথা শুনে সাদ যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি বললেন, আমি কি এমন?

লোকটি বললো, 'হ্যাঁ, এমনই।'

এ কথা শুনে সা'দ বললেন, 'হে আল্লাহ! তোমার এই বান্দা যদি মিথ্যা বলে থাকে, খ্যাতি অর্জন ও প্রচার লাভের আশায় এখানে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে তার হায়াত বাড়িয়ে দাও, তার দরিদ্রতা প্রলম্বিত কর এবং তাকে ফেতনা কবলিত কর।'

এরপর সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই মসজিদ থেকে এসে মদিনায় ফিরে গেলেন। এ ঘটনার কয়েক বছর পর তিনি ইন্তেকাল করেন।

অপরদিকে সেই লোকটি সা'দের বদদোয়ার কুফল ভোগ করতে লাগল। তার অভাবী জীবন দীর্ঘ হলো। অস্থি-মজ্জা দুর্বল হয়ে পড়ল, পিঠ কুঁজো হয়ে গেল। দুঃসহ দীর্ঘ জীবনের যন্ত্রণায় সে কাতর হয়ে পড়ল। এছাড়া প্রচণ্ড দরিদ্রতা তাকে ঘিরে ধরল। সে রাস্তায় বসে ভিক্ষা করত। বার্ধক্যের কারণে তার ভ্রুযুগল চোখের ওপর ঝুলে পড়েছিল। যখনই তার কাছ দিয়ে মহিলারা পথ অতিক্রম করত সে তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিত এবং

Contents

তাদের পিছু নিত। এ অবস্থা দেখে মানুষ তাকে নিয়ে হৈচৈ করত এবং তাকে গালি দিত।

সে আফসোস করে বলত, 'হায়, আমি কী করব! সৎ ও মহৎ গভর্নর সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের বদদোয়ার কবলে পড়ে আমি শেষ হয়ে গেলাম!'

নববী সতর্কবাণী ...

যে কারো কথা যাচাই না করে গ্রহণ করা উচিত নয়।

যা শুনেছে তা বলা মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

(সুনানে আবূ দাউদ: ৪৩২১ ও ৪৩৪০)



৪০. শাসন করতে হলে কোমলভাবে করুন

পূর্ববর্তী আলোচনার উদ্দেশ্য এই নয় যে, কাউকে কখনো তিরস্কার বা ভর্ৎসনা করা যাবে না। মাঝে মধ্যেই নিজের সন্তান, স্ত্রী কিংবা বন্ধু-বান্ধবকে ভর্ৎসনা করতে হয়। তবে এক্ষেত্রে তাদেরকে সুযোগ দেয়া বা সহজ পন্থা অবলম্বন করতে হবে। অতএব, তাদেরকে সাথে সাথে কিছু না বলে নিজের মর্যাদা রক্ষা করার সুযোগ দিন।

মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা। আরবদের মাঝে মহানবী ﷺ-এর মর্যাদা তখন সমুন্নত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। মক্কার অধিকাংশ মানুষ ততদিনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। সে মুহূর্তে রাসূল ﷺ হুনাইনের যুদ্ধে বের হলেন। মুশরিকরা সুশৃঙ্খল ও প্রশিক্ষিত বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত হলো। তাদের প্রথম সারিতে ছিল অশ্বারোহী দল। এরপর পদাতিক বাহিনী। এরপর নারীকে মোতায়েন করলো। সবশেষে ভেড়া ও বকরির পাল। অন্যদিকে মুসলিম বাহিনীতেও সৈন্য সংখ্যা ছিল বারো হাজার।

মুশরিকরা হুনাইনের উপত্যকায় আগে এসে পৌঁছল। তাদের কয়েকটি দল এ উপত্যকার দুই পাশে বড় বড় পাথরের ফাঁকে ফাঁকে আত্মগোপন করে রইল।

যুদ্ধ শুরু হলো। মুসলিম বাহিনী হুনাইন উপত্যকায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে কাফের বাহিনী তাদের ওপর চতুর্দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পাহাড়ের আড়াল থেকে তীর ও পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল। মুহূর্তে মুসলিম বাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল। ঘোড়াগুলো অস্থির হয়ে তাদের পেছনে গিয়ে আশ্রয় নিতে লাগল। মুসলিম বাহিনী বেশিক্ষণ মোকাবেলা করতে পারলো না। সবার আগে বেদুঈনরা পালিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুশরিকরা বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলো।

আল্লাহর রাসূল দেখতে পেলেন, মুসলমানরা পালাচ্ছে। চতুর্দিকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, পলায়নপর ঘোড়াগুলো দিগ্বিদিক ছুটছে।

রাসূল ﷺ আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে মুহাজির ও আনসার বাহিনীর নাম ধরে আহ্বান করতে নির্দেশ দিলেন। তার আহ্বানে প্রায় সত্তর/আশিজন মুসলিম সৈন্য ঘুরে দাঁড়ালেন। এরপর আল্লাহ তাআলার সাহায্য এলো। মুসলিম বাহিনীর বিজয় তাকবীরে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল।

এরপর মহানবী ﷺ এর সামনে গণীমতের মালপত্র একত্র করা হলো। দেখা গেল, যারা সবার আগে রণাঙ্গন ছেড়ে পালিয়েছিল। যারা তীর তলোয়ারের ভয়ে পলায়ন করেছিল, তারাই গনীমত লাভের আশায় সবার আগে রাসূলের সামনে এসে হাজির হলো।

বেদুঈনরা রাসূলকে ঘিরে ধরে বললো, 'আমাদেরকে গণীমতের অংশ দিন। আমাদের প্রাপ্য গনীমত আমাদের মাঝে বণ্টন করে দিন।'

মহানবী ﷺ তখন বলতে পারতেন, আশ্চর্য! তোমরা বলছ 'আমাদের গনীমতের অংশ'! অথচ তোমরা তো যুদ্ধই কর নি। তোমরা এখন গনীমতের অধিকার দাবি করছ অথচ রণাঙ্গনে যখন চিৎকার করে তোমাদেরকে আহ্বান করা হয়েছিল তখন তোমরা সাড়া না দিয়ে রণাঙ্গন ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলে। আর এখন বলছ 'আমাদেরকে গণীমতের অংশ দিন।'

কিন্তু তিনি এধরনের কোনো কথা বলেন নি। কেননা, পার্থিব সম্পদের প্রতি তার মনে কোনো মোহ ছিল না।

তারা রাসূল ﷺ কে চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে ধরল। চারপাশে ভিড় করে চলার পথরুদ্ধ করে দিল। তারা বারবার বলতে লাগল, 'আমাদের গনীমত বণ্টন করে দিন।' প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে মহানবী ﷺ একটি গাছের পাশ ঘেঁষে অতিক্রম করলেন। মহানবী ﷺ-এর চাদর গাছটির ডালে আটকে গেল এবং চাদর কাঁধ থেকে পড়ে গেল। শরীরের উত্তমাঙ্গের কিছু অংশ প্রকাশ পেল। কিন্তু তখনও তিনি রাগ করলেন না। তিনি তাদের সবার দিকে ফিরে দাঁড়ালেন এবং সম্পূর্ণ শান্ত ও কোমল স্বরে বললেন, 'হে লোকজন! আমার চাদর ফিরিয়ে দাও। আল্লাহর শপথ! আমার কাছে যদি তিহামা এলাকার গাছপালা পরিমাণ ভেড়া-বকরীও থাকত, আমি তা সব তোমাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম। কখনো তোমরা আমাকে কৃপণ, ভীরু কিংবা মিথ্যাবাদীরূপে পাবে না।'

মহানবী ﷺ সত্য বলেছেন। তিনি কৃপণ ছিলেন না। কৃপণ হলে তিনি সব সম্পদ নিজের কাছেই রেখে দিতেন। তিনি ভীরু কিংবা কাপুরুষও ছিলেন না। ভীরু হলে তো মৃত্যুর ভয়ে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতেন। তিনি মিথ্যুক বা প্রতারকও ছিলেন না। মিথ্যাবাদী হলে মহান আল্লাহ কিছুতেই তাকে সাহায্য করতেন না।

নবী করিম ﷺ-এর জীবনে এ ধরনের প্রচুর ঘটনা রয়েছে। একদিনের ঘটনা। মহানবী ﷺ কোনো একজন সাহাবিকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটছিলেন। পথিমধ্যে তিনি জনৈক মহিলাকে তার শিশু সন্তানের কবরের পাশে কাঁদতে দেখলেন। মহানবী ﷺ তাকে বললেন, 'আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর।'

মহিলাটি মহানবী ﷺ-কে চিনতে পারলো না। তাই সে বলে ফেললো, 'যান এখান থেকে! আপনি আমার ব্যথা কী বুঝবেন?'

মহানবী ﷺ তাকে আর কিছু বললেন না। চুপচাপ চলে এলেন। তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে তিনি বুঝতে পারলেন, মহিলাটির এখন যে মানসিক অবস্থা, তাতে এ মুহূর্তে তাকে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা উচিত নয়। এদিকে সঙ্গী সাহাবি মহিলাকে বললো, 'এ কী বললে তুমি? তিনি তো আল্লাহর রাসূল। মহিলাটি তখন অত্যন্ত লজ্জিত হলো। এরপর সে রাসূল ﷺ-এর বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হলো। সে ভেবেছিল রাসূল ﷺ এর বাড়িতে গেট থাকবে। গেটে দারোয়ান থাকবে। দারোয়ানের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে অনেক কষ্ট করে ভেতরে যেতে হবে। কিন্তু সে এমন কিছুই দেখলো না। তাই সে খুব অবাক হলো। যাই হোক সে রাসূল ﷺ-এর কাছে গিয়ে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললো; 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে চিনতে পারি নি। আমি এখন ধৈর্যধারণ করব।'

মহানবী ﷺ বললেন, 'বিপদের প্রথম মুহূর্তে যে ধৈর্যধারণ করা হয় বস্তুত তা-ই ধৈর্য।' (সহিহ বুখারি:১২০৩, সহিহ মুসলিম:১৫৩৫)

সব কাজে কোমলতা...

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক কাজের জন্য এহসান বা সুন্দরতম পন্থা আবশ্যক করে দিয়েছেন। তাই (যুদ্ধক্ষেত্রে) কাউকে হত্যা করতে হলে সেক্ষেত্রেও সুন্দরতম (অর্থাৎ তুলনামূলক কম কষ্টদায়ক) পন্থা অবলম্বন করবে। (চতুষ্পদ জন্তুকে) জবাই করতে হলে সুন্দরভাবে (অর্থাৎ তুলনামূলক কম কষ্টদায়ক পন্থায়) জবাই করবে। জবাইয়ের আগেই ছুরি ধার দিয়ে নেবে, যেন জবাইয়ের সময় পশুর কষ্ট কম হয়। (সহিহ মুসলিম:৩৬১৫)



৪১. দুশ্চিন্তা ও ঝামেলা এড়িয়ে চলুন ...

আমার মনে হয়, কোনো ডায়াগনস্টিক সেন্টারে লোকটার পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা হলে প্রাথমিকভাবে তার অন্তত দশ-বারোটা রোগ ধরা পড়বে। কমপক্ষে উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস তো থাকবেই! কারণ, এ লোক সবসময় মানসিক কষ্টে ভোগে। আর মানসিক কষ্টে ভোগার কারণ হলো সে সবসময় অন্যদের কাছ থেকে সবকিছু পূর্ণ মাত্রায় কামনা করে। কোনো কিছু একটু কম বা নিম্নমাত্রার হলে তার উদ্বেগের আর সীমা থাকে না। এ লোক স্ত্রীর সাথে সারাক্ষণ লেগেই থাকে। তাঁর দোষগুলো খুঁজে খুঁজে বের করে বলে-

'নতুন প্লেটটা ভেঙ্গে ফেললে?'

'হলরুমটা এখনো ঝাড়ু দিলে না?'

'আমার নতুন জামাটা ইস্ত্রি করতে গিয়ে পুড়ে ফেললে ?'

আবার সন্তানদের ব্যাপারে বিরক্তি প্রকাশ করে যাচ্ছে,

'খালেদ ছেলেটা এখনো গুণের নামতাই শেখে নি !'

'সা'দ পরীক্ষায় এ প্লাস পায় নি!'

সারাহ আর হিন্দ কী যে করে কে জানে... ।

এ হলো তার ঘরের অবস্থা। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে তো অবস্থা আরো ভয়াবহ!

'আবূ আব্দুল্লাহ যে কৃপণের গল্পটা বলেছে তা আমাকে লক্ষ্য করেই বলেছে।'

'গতরাতে আবূ আহমদ পুরোনো গাড়ি নিয়ে যে টিপ্পনি কাটল, তা তো আমার গাড়ি নিয়েই। কেননা, সে বলার সময় আমার দিকে বারবার তাকাচ্ছিল।'

এভাবে সে সব নেতিবাচক বিষয় নিজের দিকেই টেনে আনে।

প্রবাদ আছে, 'সময় তোমার অনুকূলে হলে তো ভালো। না হলে তুমি নিজেকে সময়ের অনুকূলে করে নাও।'

আমার এক বেদুঈন বন্ধু তার দাদার কাছ থেকে শেখা একটি প্রবাদ বাক্য প্রায়ই আমাকে শোনাত। যখনই আমি তাকে প্রজ্ঞাপূর্ণ কিছু বলতে যেতাম, সে বারবারই সে প্রবাদ বাক্যটি আমাকে শোনাত।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে বলত, 'শা-য়-খ! আপনার বাঁকা হাত যদি সোজা করতে না পারেন, তাহলে বাঁকা রেখেই মোসাফাহা [করমর্দন] করুন!'

গভীরভাবে চিন্তা করলে আপনি দেখবেন, কথাটি একদম যথাযথ। আমরা যদি কোনো কোনো ভুল-ক্রুটি মেনে নিতে অভ্যস্ত না হই, দেখেও না দেখার ভান না করতে পারি। কিংবা কোনো বিষয় নিয়ে গভীরভাবে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ি তাহলে দেখা যাবে, একসময় আমরা মানসিক যন্ত্রণার যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে যাচ্ছি।

কবি কত চমৎকার বলেছেন-

নির্বোধরা কখনো কোনো জাতির নেতা হতে পারে না।

কিন্তু নেতাকে কখনো কখনো নির্বোধের ভান করতে হয়।

সৌম্য-শান্ত-কান্তিময় এক যুবক উপযুক্ত জীবন সঙ্গিনী নির্বাচন করতে তাঁর শায়খের শরণাপন্ন হলো। সে আশা করছে, তার স্ত্রী হবে তার জীবন সফরের আমৃত্যু সহযাত্রী।

শায়খ যুবককে জিজ্ঞেস করলেন,'স্ত্রীর মধ্যে তুমি কী ধরনের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য তুমি কামনা কর?

যুবক বললো, 'তাকে দীর্ঘদেহী ও সুন্দরী হতে হবে। তার চুলগুলো রেশমি ও কালো কুচকুচে হতে হবে। আরো হতে হবে সুগন্ধময় ও সুভাষিণী। তাকে দেখলে আমার মন জুড়িয়ে যাবে। আমি দূরে থাকলে সে তাঁর সতীত্ব রক্ষা করে চলবে। সে কোনো বিষয়ে আমার বিরোধিতা করবে না। তার ব্যাপারে আমি কোনো ভয়ের আশংকা করব না। ধর্মপরায়ণতার দিক থেকে সে হবে অনেক উচ্চ মানের। আর প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের দিক থেকে সে হবে উপকারী।...'

এভাবে নারী জাতির মধ্যে যে সব গুণ থাকতে পারে, সবই সে উল্লেখ করলো এবং তাঁর স্ত্রীর মধ্যে সবগুলোর সন্নিবেশ কামনা করলো।

একপর্যায়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে শায়খ বললেন,'থাম, বাবা থাম! আর বলতে হবে না। আমি এ ধরনের নারীর সন্ধান তোমাকে দিতে পারব।

এ কথা শুনে যুবক খুশিতে আত্মহারা হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায়? কোথায় আছে এ ধরনের কনে?

শায়খ শান্তভাবে বললেন, 'আল্লাহ চাহে তো কেবল জান্নাতেই তুমি এমন নারী পাবে! এ পৃথিবীতে মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপূর্ণতা মেনে নিতে অভ্যস্ত হতে হবে।'

দুনিয়ার জীবনে মানুষের ভুল-ত্রুটি মেনে নিতে নিজেকে প্রস্তুত রাখুন। সহনশীলতার মনোভাব পোষণ করুন। অন্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে ঘাটাঘাটি করে অনর্থক নিজেকে কষ্ট দেবেন না।

আপনার সহকর্মীকে বলে ফেলবেন না যে, 'তুমি তো আমাকে উদ্দেশ্য করেই এসব কথা বলেছ।'

সন্তানকে লক্ষ করে বলবেন না, 'অলসতা করে তুমি আমাকে কষ্ট দিতে চাও।'

কখনো স্ত্রীকে বলবেন না যে, 'তুমি তো এ সব করে আমার সাজানো সংসারটা ধ্বংস করতে চাচ্ছ।'

মহানবী ﷺ মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি সহ্য করতেন। তাই তার জীবন ছিল উপভোগ্য ও সুখময়। কখনো এমন হতো যে, দুপুর বেলা ক্ষুধার্ত অবস্থায় তিনি বাড়িতে এসে জিজ্ঞেস করতেন, 'ঘরে কি খাওয়ার কিছু আছে?'

স্ত্রীগণ বলতেন, 'না, কিছুই নেই।'

মহানবী ﷺ বলতেন, 'ঠিক আছে। আমি তাহলে রোযা রাখছি।'

(সুনানে নাসাঈ: ২২৮৯)

একে কেন্দ্র করে তিনি ঝগড়া করতেন না। চেঁচিয়ে বলতেন না, 'আমাকে জানালে না কেন? জানালে তো কিছু কিনে আনতাম।' তিনি কেবল বলতেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে! তাহলে আমি রোযা রাখছি।' ব্যাস, এভাবেই সমস্যার সমাধান করতেন!

কুলসুম বিন হুসাইন ছিলেন উল্লেখযোগ্য সাহাবিদের একজন। তিনি বলেন, রাসূলের সঙ্গে আমি তাবুক যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছি। তাবুকের

সফরে কোনো একরাতে আমরা ‘আখদার’ উপত্যকার মধ্য দিয়ে চলছিলাম।

সেই রাতে আমাদের সফর অনেক দীর্ঘ হলো। ফলে আমরা অনেকেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। চলার পথে প্রায়ই আমার উট মহানবী ﷺ-এর উটের সঙ্গে ধাক্কা লাগার উপক্রম হতো। আমি হঠাৎ জেগে উঠে আমার উট দূরে সরিয়ে নিতাম, যেন আমার উটের হাওদা মহানবী ﷺ-এর পায়ে লেগে না যায়।

মাঝপথে একপর্যায়ে আমি চলতে চলতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। মহানবী ﷺ-এর উটের সঙ্গে আমার উট লেগে গেল এবং এর ফলে মহানবী ﷺ জোরে আঘাত পেলেন। আঘাতের ব্যথায় মহানবী ﷺ-এর মুখ থেকে ‘উহ!’ শব্দ উচ্চারিত হতেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলে। আমি অস্থির চিত্তে বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।’ মহানবী উদারকণ্ঠে বললেন, ‘চল, সামনে চলতে থাক।’

ব্যাস, এতটুকুই বললেন। রাগ করে বললেন না, কেন এদিক চলে এলে? রাস্তা তো অনেক প্রশস্ত, কেন এদিকে এসে আমাকে কষ্ট দিলে?’

পায়ের আঘাত নীরবে সহ্য করেছেন, পরিস্থিতি মেনে নিয়েছেন। এটাই ছিল মহানবীর সাম্যের নীতি।

একদিন তিনি সাহাবিদের মাঝে বসা ছিলেন। এমন সময় জনৈক মহিলা একটি কাপড় নিয়ে এলো। সে বললো, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নিজ হাতে এ কাপড়টি বুনেছি। আমার মনের আশা আপনি এটি পরিধান করবেন।’ মহানবী ﷺ-এর তখন একটি কাপড়ের অনেক প্রয়োজন ছিল। তিনি খুশিমনে তা গ্রহণ করলেন এবং ঘরে গিয়ে লুঙ্গির মতো করে তা পরিধান করে বের হলেন।

উপস্থিত সাহাবিদের মধ্যে একজন বললেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! কাপড়টি আমাকে দিয়ে দিন।’ মহানবী ﷺ বললেন, ‘ঠিক আছে।’

তিনি আবার ঘরে প্রবেশ করলেন। পুরোনো লুঙ্গিটি পরিধান করে নতুন কাপড়টি খুলে তা সুন্দরভাবে ভাঁজ করে সে সাহাবিকে দিয়ে দিলেন।

উপস্থিত সকলেই তাকে বললেন, তুমি কাজটি ভালো করনি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো প্রার্থনাকারীকে ফিরিয়ে দেন না, এটা জেনেই তো তুমি চাদরটি চেয়েছ।'

সাহাবি বললেন, 'আল্লাহর কসম! রাসূলের বরকতময় চাদর মৃত্যুকালে আমার কাফন হবে– এ আশায়ই আমি চাদরটি চেয়েছি।' (বুখারী: ১১৯৮)

অবশেষে তিনি যখন মারা গেলেন, প্রিয় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মোবারক সে চাদরটি গায়ে জড়িয়ে তাকে দাফন করা হলো।

কত সুন্দর ছিল তার আচরণ! এর মাধ্যমেই তিনি জয় করেছিলেন সারা বিশ্বের মানুষের হৃদয়।

আরেকদিনের ঘটনা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের নিয়ে এশার নামাযে দাঁড়ালেন। হঠাৎ ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শিশুপুত্র হাসান ও হোসাইন মসজিদে প্রবেশ করলো। হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা নানাজী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে চলে গেল।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামত করছিলেন। যখন তিনি সেজদায় গেলেন, হাসান ও হোসাইন তার পিঠে চড়ে বসল। সেজদা থেকে ওঠার সময় তিনি কোমলভাবে তাদের নামিয়ে পাশে বসিয়ে দিলেন। আবার যখন সেজদা করলেন, তখন আবার তারা পিঠে উঠে বসল। এভাবে তিনি নামায শেষ করলেন। এরপর আদর করে তাদের কোলে বসালেন।

এটা দেখে আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কাছে গিয়ে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! তাদেরকে তাদের মায়ের কাছে দিয়ে আসি?' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিলেন না। তাদেরকে নিজের কোলে বসিয়ে আদর সোহাগ করলেন। কিছুক্ষণ পর যখন আকাশে বিজলি চমকে উঠল তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যাও, যাও, ঘরে মায়ের কাছে যাও।' তারা উঠে তাদের মায়ের কাছে চলে গেল। (মুসনাদে আহমদ: ১০২৪৬)

আরেক দিনের কথা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান বা হোসাইনকে কোলে নিয়ে জোহর আথবা আসরের সময় সাহাবিদের কাছে এলেন। এরপর নামাযের ওয়াক্ত হলে তাকে পাশে রেখে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। রুকু করলেন, সেজদা করলেন। কিন্তু সেজদা থেকে আর উঠলেন না। দীর্ঘ

সময় রাসূল ﷺ সেজদারত থাকায় সাহাবিগণ শঙ্কিত হলেন। রাসূলের আবার কী হলো?

দীর্ঘ সেজদার পর মহানবী ﷺ মাথা তুললেন। সেজদা থেকে উঠলেন, নামায শেষ করলেন। পরে সাহাবিগণ বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আপনি আজকের মতো এত দীর্ঘ সেজদা তো আর কখনো করেন নি। আপনার কী হয়েছিল? সেজদায় থাকাকালীন কি ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল?

মহানবী ﷺ বললেন, 'তোমরা যা ভেবেছ এগুলোর কিছুই হয় নি। আমার এ নাতিটি ঘাড়ে চড়ে বসেছিল। আমি তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নামিয়ে দিতে চাই নি।' (সুনানে নাসায়ীঃ ১১২৯, মুসতাদরাকে হাকীমঃ ৪৭৫৯)

একদিন মহানবী ﷺ উম্মে হানীর ঘরে আসলেন। মহানবী ﷺ ক্ষুধার্ত ছিলেন। তাই জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘরে কি কোনো খাবার আছে?'

উম্মে হানী বললেন, 'কয়েক টুকরা শুকনো রুটি ছাড়া কিছুই নেই। আপনার সামনে তো পেশ করতে লজ্জা লাগছে।'

মহানবী ﷺ বললেন, 'তা-ই নিয়ে এসো।'

উম্মে হানী শুকনো রুটি নিয়ে এলেন। মহানবী ﷺ তা লবণমিশ্রিত পানিতে ভিজিয়ে খেতে লাগলেন। উম্মে হানীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তরকারি-ঝোল কিছুই কি নেই?'

উম্মে হানী বললেন, 'আল্লাহর রাসূল ! কিছু সিরকা আছে।'

মহানবী ﷺ বললেন, 'নিয়ে এসো।'

উম্মে হানী সিরকা নিয়ে এলেন। মহানবী ﷺ সিরকা-রুটি দিয়েই আহার শেষ করলেন।

এরপর আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করে বললেন, 'সিরকা কত উত্তম ব্যঞ্জন!' (আল মু'জামুল আওসাত, তাবরানীঃ ৭১৭২)

মহানবী ﷺ এমন সাদা-সিধা জীবন যাপন করতেন। যেকোনো বিষয়কে ব্যস্ততার নিরিখে বিচেনা করতেন।

মহানবী ﷺ সাহাবিদের নিয়ে হজের সফরে বের হলেন। পথিমধ্যে এক স্থানে যাত্রাবিরতি হলো। মহানবী ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে অযু করে

Contents

নামাযে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ পর জাবের বিন আবদুল্লাহ এলেন। নামাযের নিয়ত করে তিনি রাসূলের বামপাশে দাঁড়ালেন। মহানবী ﷺ কোমলভাবে তার হাত ধরে তাকে ডান পাশে নিয়ে এলেন এবং উভয়ে নামায পড়তে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর জাব্বার বিন সাখার অযু করে মহানবী ﷺ-এর বামপাশে এসে দাঁড়ালেন। মহানবী ﷺ এবার আলতোভাবে উভয়কে পেছনে সরিয়ে দিলেন। রাসূল ﷺ সামনে থাকলেন। এভাবে নামায শেষ করলেন। (সহিহ মুসলিম: ৫৩২৮)

এভাবেই তিনি তাদেরকে নামাযে ইমামের পেছনে দাঁড়ানোর পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন।

একদিন মহানবী ﷺ কোথাও উপবিষ্ট ছিলেন। উম্মে কায়স বিনতে মিহসান তার নবজাতক সন্তানকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। সে আশা করছে মহানবী ﷺ শিশুটির মুখে বরকতস্বরূপ প্রথম খাবার তুলে দেবেন এবং তার কল্যাণের জন্য দোয়া করবেন।

মহানবী ﷺ শিশুটিকে কোলে নিলেন। একটু পর অবুঝ শিশুটি মহানবী ﷺ এর কোলে পেশাব করে দিল। রাসূল ﷺ একটু পানি আনতে বললেন। পানি আনা হলে তিনি নিজ হাতে ধুয়ে নিলেন। (সহিহ বুখারী:২১৬)

বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে গেল। তিনি রাগ করলেন না। কিংবা ভ্রুও কুঞ্চিত করলেন না।

রাসূলের এ আদর্শ থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার। আমরা তিলকে তাল বানিয়ে নিজেদেরকে কষ্ট দিতে যাব না। আমার চারপাশের সবকিছু পুরোপুরি আমার মন মতো হবে এটা ভাবব না।

কবি বলেছেন-

কারো দোষ পেলে, তা শুধরে দিন, কেননা,
একমাত্র আল্লাহ তাআলা-ই দোষ থেকে মুক্ত।

অনেক মানুষ আছে, তুচ্ছ বিষয়কে বিশাল বানিয়ে ফেলে। অনেক পিতা-মাতাও মাঝে মাঝে এ ধরনের কাণ্ড ঘটায়। অনেক সময় কোনো কোনো শিক্ষক শিক্ষিকা এমন আচরণ করে।

গোপন দোষ মোটেও তালাশ করবে না। অন্যের ওজর আপত্তি ভুল-ত্রুটি উদারচিত্তে মেনে নিতে সবসময় প্রস্তুত থাকুন। আপনার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিয়ে যে আপনার কাছে ওজর পেশ করে, ক্ষমা চায় আপনি তার প্রতি সহানুভূতিশীল হোন, নিঃস্বার্থভাবে তাকে ক্ষমা করে দিন।

কবি বলেন-

যে ওজর নিয়ে এসেছে তার ওজর গ্রহণ করে তাকে ক্ষমা করে দিন।
সত্য বলুক, মিথ্যা বলুক; করুন তাকে প্রাণের আপন
সে আপনাকে মন্দ বলুক, বা ভালো বলুক
কাছে এসে তো আপনার আনুগত্য করছে।
আড়ালে সে যা খুশি তা করুক না কেন।

একদিন মহানবী ﷺ মিম্বরে উঠে সাহাবিদের উদ্দেশ্যে বয়ান করলেন। সে দিন তিনি এতো উঁচু আওয়াজে বয়ান করলেন যে, ঘরের বৃদ্ধ নারীরাও তা শুনতে পেল। তিনি কী বলেছিলেন তা কি কল্পনা করতে পারেন?

তিনি বলেছিলেন, 'হে লোকজন! তোমরা যারা মুখে মুখে ঈমান এনেছ, কিন্তু এখনো অন্তর দিয়ে ইসলাম গ্রহণ কর নি, তাদেরকে বলছি, সাবধান! কোনো মুসলমানের গিবত কর না। দোষ তালাশ কর না। কারণ যে অন্যের দোষ খুঁজে ফেরে, আল্লাহ তাআলা তার দোষ প্রকাশ করে দেন। আর শুনে রেখ, আল্লাহ কারো দোষ প্রকাশ করলে সে যেখানেই থাকুক না কেন তার মুক্তি নেই। সে অবশ্যই লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে।'

(মুসনাদে আহমদ : ১৮৯৬৩)

কারো দোষ খুঁজে বেড়াবেন না। কারো গোপন বিষয় নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটি করবেন না। মন্দ বিষয় এড়িয়ে চলুন।

নবী করীম ﷺ জটিলতা বাড়তে দিতেন না। একবার তিনি এক মজলিসে বসা ছিলেন। শান্ত ও ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ সে মজলিসে যে-ই বসে, নবি করিম ﷺ-এর প্রভাবে তার দেহ মন পবিত্র ও প্রশান্ত হয়। সাহাবিদের লক্ষ করে মহানবী ﷺ বললেন, 'কোনো, তোমরা কেউ আমার কাছে আমার কোনো সাহাবির দোষ বলবে না। আমি পরিচ্ছন্ন হৃদয় নিয়ে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাই।'

(সুনানে আবূ দাউদ: ৪২১৮, সুনানে তিরমিযী: ৩৮৩১)

নিজেকে কষ্ট দেবেন না...

আপনার স্বচ্ছ হৃদয়টাকে ধুলা উড়িয়ে অস্বচ্ছ করবেন না।
কেউ ধুলা উড়ালে জামার হাতা দিয়ে নাক ঢেকে নিন।
জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত একে উপভোগ করুন।



৪২. ভুল স্বীকার করে নিন

অনেক সময় দেখা যায় দু'জনের মধ্যে বছরের পর বছর শত্রুতা চলতে থাকে । কখনো মৃত্যু পর্যন্ত তা বহাল থাকে। অথচ একটি মাত্র কথায় সব মিটমাট হয়ে যেতে পারে। একজন শুধু বললেই হয়, 'আমি ভুল করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দিন।'

কোনো ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন।

জটিল কোনো ঠাট্টা বা মশকারা করেছেন।

কাউকে অনুচিত কোনো কথা বলে ফেলেছেন।

এর প্রতিক্রিয়ার আগুন জ্বলে ওঠার আগেই তা নিভিয়ে ফেলুন। বিনয়ের সঙ্গে বলুন, 'আমি দুঃখিত, ভুলটা আমিই করেছি। আমাকে মাফ করে দিন।' এই ছোট্ট কথাটি বলতে পারা অনেক বড় মনের পরিচায়ক।

একবার আবূ যর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাঝে কোনো বিষয়ে তর্ক হলো। রাসূলের মহান সাহাবি হলেও তারাও তো রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ। একপর্যায়ে আবূ যর রাগের বশে বেলালকে বলে বসলেন, 'কালোর ঘরে কালো!'

বেলাল রাসূলের কাছে গিয়ে অভিযোগ করলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ যরকে ডেকে পাঠালেন।

'তুমি কি তাকে গালি দিয়েছ?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ'। আবূ যর বললেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি তার মায়ের কথা উল্লেখ করে গালি দিয়েছ?'

আবূ যর বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! কেউ কাউকে গালি দিলে তো মা কিংবা বাবার নাম নিয়েই দেয়!'

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার বললেন, 'আবূ জর! তোমার মধ্যে এখনো জাহেলি যুগের প্রভাব রয়ে গেছে।' (সহিহ মুসলিম: ৩১৩৯)

এ কথা শুনে আবূ যর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর চেহারার রং পাল্টে গেল।

তিনি বললেন, 'এই বুড়ো বয়সেও আমার মধ্যে জাহেলি যুগের প্রভাব রয়ে গেছে?!'

Contents

মহানবী ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ'।

এরপর মহানবী ﷺ আবূ যরকে তুলনামূলক ছোট ও অধীনস্থদের সঙ্গে আচার আচরণের পদ্ধতি শেখালেন। মহানবী ﷺ বললেন, 'কোনো, তারা তোমাদের ভাই, মহান আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। অতএব অধীনস্থ ভাইটির সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। তুমি যা খাবে, তাকেও তা খাওয়াবে। তুমি যে ধরনের কাপড় পরবে তাকেও সে ধরনের কাপড় পরাবে। সাধ্যাতীত কাজের বোঝা তার ওপর চাপিয়ে দেবে না। কাজ করতে যদি তার কষ্ট হয় তাহলে তুমি নিজে তাকে সাহায্য করবে।'

এরপর আবূ যর কী করলেন? সঙ্গে সঙ্গে বেলালের কাছে ছুটে গেলেন। তার সামনে মাটিতে বসে সবিনয়ে ক্ষমা চাইলেন। তিনি নত হতে নিজের গাল মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। যেন মাটির সঙ্গে মিশে যাবেন! এরপর বললেন, 'আপনার পা দিয়ে আমার মুখটা মাড়িয়ে দিন!'

আল্লাহু আকবার! শত্রুতা ও বিদ্বেষের আগুন প্রজ্জ্বলিত হওয়ার আগেই তা নিভিয়ে ফেলতে সাহাবিদের হৃদয় ও মন কেমন ব্যাকুল ছিল! কখনো কারো সঙ্গে মনোমালিন্য হলে কিছুতেই তাঁরা তা বাড়তে দিতেন না।

আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে কোনো বিষয়ে কথা বলছিলেন। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কোনো এক কথায় ওমর অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে মজলিস ছেড়ে চলে গেলেন। এতে আবূ বকর যারপরনাই লজ্জিত হলেন। এ মনোমালিন্য দীর্ঘায়িত হয়ে যায় কিনা এ আশঙ্কায় তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন ওমরের পেছনে। বললেন, 'ভাই! ওমর আমার জন্য এস্তেগফার করুন।'

ওমর তাঁর দিকে ফিরেও তাকালেন না। তিনি ছুটলেন নিজের বাড়ির দিকে।

আবূ বকর ক্ষমা প্রার্থনা করে যাচ্ছেন। কিন্তু ওমর বাড়ি ছুটে চলছেন। আবূ বকরও চলতে চলতে ওমরের দুয়ারে হাজির হলেন। কিন্তু ওমর তাঁর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে ভেতরে চলে গেলেন।

উদ্বিগ্ন হয়ে আবূ বকর ছুটে গেলেন রাসূলের কাছে। দূর থেকেই মহানবী ﷺ তাকে দেখলেন। দেখলেন, আবূ বকরের চেহারায় বিষণ্নতার ছাপ। এটা দেখে রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমাদের ভাই আবূ বকরকে বিষণ্ন লাগছে।'

তিনি এসে নীরবে মহানবী ﷺ-এর কাছে বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ না যেতেই ওমরও সেখানে এসে হাজির হলেন। তিনিও অনুতপ্ত ও লজ্জিত। আসলে তাদের হৃদয় ছিল পরিষ্কার। স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন।

ওমর এসে সালাম দিয়ে রাসূলের মজলিসে বসলেন। তিনি রাসূলকে পুরো ঘটনা বললেন। কীভাবে তিনি আবূ বকর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন ও মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। সব তিনি বলে গেলেন।

সব শুনে মহানবী ﷺ ওমরের প্রতি খুব অসন্তুষ্ট হলেন। মহানবী ﷺ-এর অবস্থা দেখে আবূ বকর বসে থাকতে পারলেন না। তিনি বললেন, 'হুজুর! ভুল আমিই করেছি। আমিই অন্যায় করেছি। ওমরের কোনো দোষ নেই। তিনি ওমরকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য বারবার তার পক্ষ হতে ওজর পেশ করতে লাগলেন।

রাসূল ﷺ এবার মুখ খুললেন। তিনি বললেন, 'তোমরা কি আমার বন্ধুকে একা ছেড়ে দেবে? তোমরা কি আমার বন্ধুকে একা ছেড়ে দেবে? হে লোকসকল! আমি তোমাদেরকে দ্বীনের পথে আহ্বান করেছিলাম। তোমরা সকলে সেদিন আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছিলে। কেবল এ আবূ বকর আমাকে সত্যায়ন করেছিল।' (সহিহ বুখারী:৪২৭৪)

আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করুন। আপনি তাদের মতো হবেন না, যারা অন্যের সংশোধন করতে গিয়ে নিজেই ভুল করে সংশোধনের উপযুক্ত হয়ে যায়। তারা কলুর বলদের মতো চারপাশে শুধু ঘুরতে থাকে, কিন্তু কোনো সমাধান খুঁজে পায় না।

আপনি যদি দায়িত্বশীল অবস্থানে কিংবা অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হন, শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের, স্বামী হিসেবে স্ত্রীর কিংবা সন্তানের পিতা বা মাতা হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই মনে রাখবেন, আপনার প্রতিটি আচরণ ও নড়াচড়ার প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখা হচ্ছে। সবাই আপনার প্রতিটি কাজ খেয়াল করে দেখছে। তাই সবসময় মার্জিত চলাফেলা করবেন।

Contents

খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে কাপড় বিতরণ করলেন। প্রত্যেকে এক টুকরো করে কাপড় পেল। যাকে শুধু লুঙ্গি কিংবা শুধু চাদর হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

জুমার দিন ওমর মিম্বরে উঠে খুতবার শুরুতে বললেন, 'আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর (খলিফার) আনুগত্য আবশ্যক করেছেন।'

এ কথা বলতেই শ্রোতাদের একজন দাঁড়িয়ে গেল। সে বললো, 'আমরা আপনার কথা শুনব না, আপনার আনুগত্যও করব না!'

খলিফা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন!?

লোকটি বললো, 'আপনি আমাদেরকে একটি করে কাপড় দিয়েছেন অথচ নিজে নিয়েছেন দুটি। দেখা যাচ্ছে, আপনার চাদর লুঙ্গি দু'টিই নতুন।'

এ কথা শুনে ওমর উপস্থিত মুসল্লিদের দিকে নজর ফেরাতে লাগলেন। মনে হলো, তিনি কাউকে খুঁজছেন। পুত্র আবদুল্লাহর প্রতি নজর পড়তেই বললেন, আবদুল্লাহ! দাঁড়াও। বল, তুমি কি আমাকে জুমার নামায পড়ানোর জন্য তোমার কাপড়টি দাও নি? আবদুল্লাহ বিন ওমর বললেন, 'হ্যাঁ, দিয়েছি।'

এ কথা শুনে লোকটি শান্ত হয়ে বসে বললো, 'হ্যাঁ, এখন আমরা আপনার কথা শুনব ও আপনার আনুগত্য করব।' বিষয়টি এভাবেই সমাধান হয়ে গেল।

প্রিয় পাঠক! খলিফাতুল মুসলিমীনের সামনে লোকটির অভিযোগ করার ধরনটি মোটেও সুন্দর হয়নি এ ব্যাপারে আমিও আপনার সঙ্গে একমত। কিন্তু ওমরের আচরণ লক্ষ্য করুন। সহনশীলতা ও পরম সহিষ্ণুতার কী চমৎকার উদাহরণ তিনি রেখে গেলেন। কত সহজে তিনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করলেন এবং সকল উত্তেজনা ও সন্দেহের অবসান ঘটালেন।

অতএব, আপনি যদি চান যে, আপনার স্ত্রী, আপনার ছেলে-মেয়ে ও আপনার ভাই-বোন সবাই আপনার পরামর্শ মেনে চলুক, তাহলে আপনাকেও কিছু উপদেশ মেনে চলতে হবে।

জনৈক ভদ্রলোক প্রায়ই তার স্ত্রীকে বলত, 'সন্তানদের প্রতি আরো যত্নবান হও। রান্নাবান্না আরো খেয়াল করে কর।'

কখনো বলত: 'বেডরুমটা গুছিয়ে রাখার কথা আর কত বার বলব?' একটা কথা কয়বার বলা যায়?

স্ত্রী খুব কোমলস্বরে উত্তর দিত, চিন্তা করবেন না সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি যেভাবে বলবেন সেভাবেই হবে।'

একদিন স্ত্রী তাকে বললো, 'কয়দিন পরেই ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষা। আপনি তাদের সাথে থাকলে ভালো হয়। বাইরে বন্ধুদের কাছে দেরি না করে বাসায় একটু তাড়াতাড়ি আসবেন।'

এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা রেগে গিয়ে বলতে লাগল, 'আমি পারব না, আমার সময় নেই। আমি দেরি করে আসব না তাড়াতাড়ি আসব– এটা বলার তুমি কে? আমার ব্যাপারে কখনো নাক গলাবে না!'

একটু চিন্তা করে বলুন, এরপর মহিলাটি কি আর কোনো দিন তার স্বামীর কথা শুনবে? আর কোনো দিন মন থেকে তার কথা মেনে নেবে?

সে ব্যক্তিই বুদ্ধিমান, যে মানুষের চোখ বন্ধ করার চেষ্টা না করে নিজের দেয়ালের ছিদ্র বন্ধ করে দেয়। যেন কেউ চোখ গলানোর সুযোগই না পায়। কোনো কাজ করলে সেখানে কারো সন্দেহ করার কোনো সুযোগ রাখবেন না। সন্দেহজনক কিছু থাকলে নিজেই তা খোলাসা করে দিন।

একবার আলবেনিয়ায় একটি দাওয়াতি সেন্টারের পক্ষ থেকে বিশেষ এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে অনেক দাঈ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেন্টারের সভাপতি যথাসময়ে সেমিনারে উপস্থিত হলেন। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, তার মুখে কোনো দাড়ি নেই। আমরা একে অপরের দিকে তাকাচ্ছিলাম। এ কী! একজন দাঈ, একটি দাওয়াতি সেন্টারের সভাপতি, অথচ তার নিজের মুখে রাসূলের সুন্নত নেই!

সেমিনারের শুরুতে একটু মুচকি হেসে তিনি বললেন, 'প্রিয় উপস্থিতি! আপনারা হয়তো আমার দাড়িহীন চেহারা দেখে অবাক হচ্ছেন। আসলে আমার দাড়ি উঠে না। সেমিনার শেষে আবার আমাকে নিয়ে বক্তব্য দিতে শুরু করবেন না।' এ কথা শোনামাত্র আমরা সবাই হেসে উঠলাম। আমাদের সব জল্পনা-কল্পনা দূর হয়ে গেল। এ কথা বলে দেয়ার জন্য আমরা তাকে ধন্যবাদ জানালাম।

এ ক্ষেত্রে মহানবী ﷺ কী করেছেন? চলুন, একটু দেখে আসি। হাদিসের পাতা উল্টিয়ে চলে যাই আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বের মদিনায়। রমজান মাস। অন্ধকার রাত। মসজিদে নববীতে মহানবী ﷺ ইতেকাফ করছেন। উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা এলেন মহানবী ﷺ-এর সাথে সাক্ষাত করতে। মসজিদে নববীতে তিনি কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। রাসূল ﷺ-এর সাথে কথা বললেন। এরপর ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। মহানবী ﷺ তাকে এগিয়ে দেয়ার জন্য মসজিদের দরজা পর্যন্ত এলেন। ইতোমধ্যে দুজন আনসারী সাহাবি তাদের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করলেন। মহানবী ﷺ এবং উম্মুল মু'মিনীনকে দেখে তারা দ্রুত চলে যেতে লাগলেন।

মহানবী ﷺ তাদের ডেকে থামালেন। এরপর বললেন, এ যে আমার সঙ্গে যে মহিলা দেখছ সে আমার স্ত্রী সাফিয়া ।'

তারা বললো, 'সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সঙ্গে বেগানা নারী থাকবে– এমন সন্দেহ তো আমরা কখনো করতে পারি না।'

মহানবী ﷺ বললেন, 'কোনো, শয়তান রক্তের প্রবাহের ন্যায় মানুষের শিরা উপশিরায় চলাচল করে। আমার মনে হয়েছে, সে হয়তো তোমাদের অন্তরে কোনো কুধারণা সৃষ্টি করবে। এ জন্য এটা তোমাদেরকে জানিয়ে দিলাম।' (সহিহ বুখারী:৩০৩৯, সহিহ মুসলিম: ৪০৪০)

সাহসিকতা ...

ভুলের উপর অটল থাকা সাহসিকতা নয়।
প্রকৃত সাহসী তো সে-ই, যে ভুল স্বীকার করে নেয়।
বারবার ভুল করে না।



৪৩. ভুল সংশোধন করার সঠিক পদ্ধতি

কেউ কোনো ভুল করলে তার সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করতে হবে, সেটিও শিখতে হয়। মনে রাখবেন, প্রত্যেক বন্ধ দুয়ার খোলার যেমন একটি চাবি আছে, তেমনি প্রত্যেক মানুষের হৃদয়জগতে প্রবেশেরও একটি সুন্দর পথ রয়েছে।

যখন কেউ বড় ধরনের কোনো ভুল করে ফেলে এবং বিষয়টি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে সে আর কী ভুল করে এটা দেখার জন্য যখন সবাই উৎসুক হয়ে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে তখন আপনি কী করবেন? আপনি তখন সবার মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করুন। এর ফলে আপনি বিষয়টি নিয়ে ভাবার এবং সমাধান করার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাবেন। এ সময়ের মধ্যে এমন ব্যবস্থা নিন যেন এ ধরনের কাজ ভবিষ্যতে কেউ না করে।

বনুল মুসতালিকের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথের ঘটনা। রাসূল ﷺ বিশ্রামের জন্য একস্থানে যাত্রাবিরতি করলেন। এ সুযোগে জাহজাহ বিন মাসউদ নামক মুহাজিরদের এক কিশোরকে পানি সংগ্রহের জন্য পাঠানো হলো। আনসাররা পাঠাল সিনান ইবনে ওবার আল-জুহানীকে। পানির জন্যে কুপের কাছে গিয়ে উভয়ের মধ্যে ঝগড়া হলো। একপর্যায়ে একজন অপরজনকে পেছন থেকে জোরে আঘাত করলো।

জুহানী চিৎকার করে উঠল, 'হে আনসাররা! ও আমাকে মেরে ফেললো। সাহায্য কর।'

জাহজাহও চিৎকার করে উঠল, 'হে মুহাজিররা! আমাকে বাঁচাও।'

আনসাররা ছুটে এলেন। মুহাজিররাও দৌড়ে এলেন। সবাই যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন। সবার হাতে হাতে অস্ত্র। এক পর্যায়ে বিরোধ চরম আকার ধারণ করলো। যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হলো।

এ পরিস্থিতিতে মহানবী ﷺ সেখানে হাজির হলেন। মহানবী ﷺ-এর আগমনে পরিস্থিতি শান্ত হলো। বিরোধের আগুন নিভে গিয়ে সেখানে বইতে লাগল শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের সুবাতাস।

কিন্তু ফুঁসে উঠল বিষধর সাপ। মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল ক্রোধে ফেটে পড়ল। তার সাথে ছিল আনসারদের একটি দল। সে বলতে লাগল, 'তারা আমাদের সাথে এধরনের আচরণ কিভাবে করলো?! এতো বড় দুঃসাহস ওরা কোথায় পেল? আমাদের দেশে এসে আমাদের সাথে এমন ব্যবহার! তাদের ব্যাপারে এ প্রবাদ বাক্যটিই প্রযোজ্য, কুকুরকে ভালো খাইয়ে মোটাতাজা করলে শেষে তোমাকেই কামড়াবে, আর অভুক্ত রাখলে তোমার পেছনে ঘুরঘুর করবে।'

অভিশপ্ত মুনাফিক আরো বললো, 'মদিনায় ফিরে গিয়ে ভদ্র লোকেরা এসব অভদ্র লোকদেরকে মদিনা থেকে বের করে দেবে।'

এ অভিশপ্ত মুনাফিক এরপর নিজের গোত্রের কিছু লোকের কাছে গিয়ে বললো, 'তোমরা নিজেদের জায়গা-জমি ওদেরকে দিয়ে দিলে আর এখন ওরাই তোমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছে। তোমাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করছে। তোমরা জায়গা না দিলে ওরা কি এমন আস্কারা পেত? তারা হয়তো অন্য কোথাও চলে যেত।'

এভাবে সে সবাইকে উত্তেজিত করতে লাগল। আনসারদের মধ্যে কিছু মুনাফিক ছিল। তারা তাকে সমর্থন দিয়ে সাহস জোগাতে লাগল।

ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত ছোট্ট একটি বালক সবকথা শুনল। বালকটির নাম যায়দ বিন আকরাম। সে রাসূল ﷺ-এর কাছে গিয়ে বিষয়টি জানাল। ওমর বিন খাত্তাব রাসূলের কাছে উপস্থিত ছিলেন। সব শুনে তিনি আর শান্ত থাকতে পারলেন না। উত্তেজিত হয়ে বললেন: হতভাগার কী দুঃসাহস! রাসূলের শানে এমন চরম বেয়াদবি! এটা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না।'

ওমর ভাবলেন, লেজে আঘাত করার চেয়ে বিষধর সাপটার মাথায় আঘাত করাই উত্তম। মুনাফিকটাকে হত্যা করতে পারলে এ ফেতনা আঁতুড় ঘরেই মুখ থুবড়ে পড়বে। তবে মুহাজিরদের পরিবর্তে আনসারদের কেউ ওকে হত্যা করলে নতুন কোনো ফেতনার আশঙ্কা নেই।

এ ভেবে ওমর মহানবী ﷺ-কে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আনসার সাহাবি আব্বাদ বিন বিশরকে বলুন সে যেন এ মুনাফিকটাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়।'

কিন্তু মহানবী ﷺ ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী। তিনি চিন্তা করলেন, সবাই এখন যুদ্ধ থেকে ফিরছে। সবার হাতে হাতে অস্ত্র । এ পরিস্থিতিতে উত্তেজনাকর কিছু করা মোটেই সমীচীন নয়।

মহানবী ﷺ ওমরকে বোঝালেন, 'ওমর! অন্যরা শুনলে কী বলবে? তারা বলবে, মুহাম্মদ এখন নিজের লোকদেরকে হত্যা করছে। না ওমর! এটা হতে পারে না। তুমি বরং সবাইকে বলে দাও এই মুহূর্তে যাত্রা শুরু করতে।'

প্রখর রোদে একটু বিশ্রাম নেয়ার জন্য সবাই একটু যাত্রাবিরতি করেছিল। এর মধ্যে রাসূল ﷺ হঠাৎ যাত্রা শুরু করতে নির্দেশ দিলেন! তিনি তো কখনো প্রচণ্ড রোদে সফর করেন না। এটাতো তার স্বভাববিরুদ্ধ! তাহলে কী হলো? সবার মধ্যে চাপা গুঞ্জন।

কাফেলা চলতে শুরু করলো। আবদুল্লাহ বিন সালূল জানতে পারল, যায়েদ বিন আরকাম নামক এক কিশোর রাসূলকে সবকিছু বলে দিয়েছে। অবস্থা বেগতিক দেখে সে রাসূলের কাছে এসে উপস্থিত হলো। সে বারবার শপথ করে বললো, 'হুজুর, আমি এসবের কিছুই বলি নি, ছেলেটি আমার নামে মিথ্যা বলেছে।'

আবদুল্লাহ ইবনে সালূল ছিল তার গোত্রের সরদার। একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাই আনসাররা মহানবী ﷺ-কে বললেন, 'হুজুর, ছেলেটি হয়তো ভুল করেছে, সে হয়তো ভালো করে শুনেনি।'

তারা আবদুল্লাহ বিন সালূলকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করতে লাগল।

মহানবী ﷺ কারো দিকে না তাকিয়ে পথ চলতে লাগলেন। একপর্যায়ে আনসার সরদার উসাইদ বিন হুযাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলের কাছে এলেন। মহানবী ﷺ-কে সালাম দিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এমন প্রখর রোদে সফর করছেন। এমন অবস্থায় তো কখনো আপনি সফর করেন না।'

মহানবী ﷺ তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি কোনোনি, তোমাদের সঙ্গী কী বলেছে?'

উসাইদ আরয করলেন, 'কোনো সঙ্গী, হে আল্লাহর রাসূল?'

মহানবী ﷺ বললেন, 'আবদুল্লাহ বিন উবাই'।

'সে কী বলেছে?'

"সে বলেছে, 'মদিনায় ফিরে গিয়ে ভদ্র লোকেরা এসব অভদ্র লোকদেরকে মদিনা থেকে বের করে দেবে।'

একথা শুনে উসাইদ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আপনি চাইলে তাকে বের করে দিন। আল্লাহর কসম আপনিই ভদ্র ও সম্মানিত, আর সে হলো নীচ, হীন ও অভদ্র।'

কিছুক্ষণ পর উসাইদ একটু শান্ত হয়ে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আমার মনে হয় আপনি তার সঙ্গে কোমল আচরণ করলে ভালো হয়। কারণ, যে মুহূর্তে তার গোত্র তার মাথায় নেতৃত্বের মুকুট পরানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল, ঠিক তখনই আল্লাহ আপনাকে আমাদের মাঝে পাঠিয়েছেন। তাই সবসময় সে মনে করে যে, আপনি তার নেতৃত্ব কেড়ে নিয়েছেন।

মহানবী ﷺ এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে নীরবে পথ চলতে লাগলেন।

এদিকে কাফেলার লোকদের মধ্যে চাপা গুঞ্জন চলতে লাগল। সবাই এ বিষয়ে আলোচনা করছে।

'এই প্রখর রোদে আমরা পথ চলছি কেন?'

'সে কী বলেছে?'

আল্লাহর রাসূল তার সাথে কেমন আচরণ করেছেন?

'ইবনে সালূল তো সত্যই বলেছে।'

'না, না, সে মিথ্যা বলেছে।'

এভাবে কানাঘুষা চলতে লাগল। কথার ডালপালা ছড়িয়ে পড়ল। এসব কথার কারণে মুসলিম বাহিনীতে বিশৃঙ্খল দেখা দিল। অথচ তারা এখনো শত্রুদের এলাকায় অবস্থান করছে। যে কোনো মুহূর্তে তারা হামলা করতে পারে।

মহানবী ﷺ অনুভব করলেন, মুজাহিদ বাহিনীতে ক্রমে বিভেদ ও বিভক্তি তৈরি হচ্ছে। লোকজন সবাই উত্তেজিত। মুহাজির ও

আনসারদের মধ্যে যেকোনো মুহূর্তে লড়াই বেঁধে যেতে পারে। তারা শুধু অপেক্ষা করছে, কখন কাফেলা থামবে, কখন বিষয়টা নিয়ে একদল অন্যদলের মুখোমুখি হবে।

মহানবী ﷺ সবার অবস্থা বুঝতে পারলেন। তিনি তাদের চিন্তা-ধারার গতিপথ পাল্টে দিতে চাইলেন। তিনি চাইলেন তাদের নজর ভিন্ন দিকে ফেরাতে। তাই তিনি সেদিনের প্রচণ্ড সূর্যতাপেও বিরামহীনভাবে চললেন। সূর্য অস্তমিত হলো। নামাযের জন্য একটু থামলেন। সবাই ভাবল, এই তো নামাযের পর মহানবী ﷺ যাত্রাবিরতির ঘোষণা করবেন। কিন্তু না, নামায আদায় করেই মহানবী ﷺ আবার যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দিলেন। এভাবে রাত শেষ হলো। চারদিকে ভোরের আলো ফুটে উঠল। ফজরের নামায আদায়ের জন্য যাত্রাবিরতি হলো। সবাই ভাবল, মহানবী ﷺ এবার বুঝি বিশ্রামের সুযোগ দেবেন। কিন্তু মহানবী ﷺ আবার সফরের নির্দেশ দিলেন।

একটানা দীর্ঘ সফরে সবাই ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়ে পড়ল। মাথার ওপর সূর্যের প্রচণ্ড তাপ। মহানবী ﷺ যখন অনুভব করলেন যে, কাফেলার সবাই সীমাহীন ক্লান্ত, তাদের পক্ষে এখন কোনো বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়া কিংবা ঘটে যাওয়া বিষয়টি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা সম্ভব নয়, তখন তিনি বিশ্রাম করার সুযোগ দিলেন।

দীর্ঘ সফরের পর একটু বিরতি পেয়ে যে যেখানে জায়গা পেল সেখানেই শুয়ে পড়ল। ক্লান্তিতে সবাই গভীর নিদ্রায় ডুবে গেল। মহানবী ﷺ এটাই চেয়েছিলেন। এভাবেই তিনি সবাইকে বিশৃঙ্খলার চিন্তা থেকে দূরে রেখেছিলেন।

দীর্ঘ বিশ্রামের পর সবাইকে তিনি ঘুম থেকে জাগিয়ে আবার দ্রুত সফরের নির্দেশ দিলেন। সফর শেষ হলো। মদিনায় পৌছে কাফেলার সবাই যার যার বাড়িতে চলে গেল।

এরপর আল্লাহ তাআলা ওহী নাযিল করলেন-

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ؕ وَلِلّٰهِ

خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ. يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ؕ وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُوْلِهٖ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ لٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থ ঃ এরা তো তারা যারা বলে, 'আল্লাহর রাসূলের সাহচর্যে যারা আছে তাদের জন্য তোমরা ব্যয় কর না। পরিণামে তারা আপনা-আপনিই চলে যাবে।' অথচ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধনভাণ্ডার আল্লাহরই। কিন্তু মুনাফিকরা তা বোঝে না। তারা বলে, 'আমরা যদি মদিনায় ফিরে যাই তাহলে সেখানে থেকে সম্মানিত লোকেরা ইতর লোকদের বহিষ্কৃত করবে।' সম্মান তো আল্লাহ, তার রাসূল ও মুমিনদেরই । কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না। (সূরা মুনাফিকূন:৭-৮)

মহানবী ﷺ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করলেন। এরপর ছোট্ট বালক যায়েদ বিন আরকামের কান ধরে বললেন, 'এ তো সে বালক, যে আল্লাহর জন্য তার কান উৎসর্গ করেছে।'

এরপর সবাই ইবনে সালূলকে ধিক্কার দিতে লাগল। সবাই তাকে ভর্ৎসনা করলো। মহানবী ﷺ ওমরকে বললেন, 'ওমর! তুমি যেদিন বলেছিলে, সেদিন তাকে হত্যা করলে অনেকে তার পক্ষে দাঁড়িয়ে যেত। কিন্তু আজ নির্দেশ দিলে যে কেউ তাকে হত্যা করে ফেলবে।' এ কথা বলে মহানবী ﷺ চুপ রইলেন। এরপর এ ব্যাপারে তিনি আর কিছু বলেন নি।

কেউ কেউ মানুষের সামনে ভুল করে ফেলে। তখন অন্যরা যেন এ ভুল না করে, এ উদ্দেশ্যে মানুষের সামনেই সংশোধন করে দিতে হয়। কিন্তু এর জন্য সঠিক ও সুন্দর পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।

একদিন মহানবী ﷺ সাহাবিদের সঙ্গে বসা ছিলেন। তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল। গাছে ফল নেই। ক্ষেত ফসলশূন্য। আকাশে বৃষ্টি নেই। চারদিকে হাহাকার আর হতাশা।

এমন সময় জনৈক বেদুইন এসে আল্লাহর রাসূলকে বললো, 'আল্লাহর রাসূল! মানুষ ক্লান্ত-শ্রান্ত, অনাহারে-অর্ধাহারে পরিবার-পরিজন মৃত্যুপথযাত্রী। সহায়-সম্পত্তি সব শেষ হয়ে গেছে। ভেড়া-বকরি-গবাদি

পশু কিছুই নেই। আমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে বৃষ্টি প্রার্থনা করুন। আমরা তো আল্লাহর মাধ্যমে আপনার কাছে সুপারিশ করি

বেদুঈনের কথা শুনে রাগে মহানবী ﷺ-এর মোবারক চেহারা লাল হয়ে গেল। লোকটা কী বলছে? 'আমরা আল্লাহর মাধ্যমে আপনার কাছে সুপারিশ করি'! সুপারিশ তো বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে হয়। বড়র কাছে ছোটরা সুপারিশ করে। মহান আল্লাহ তো আমাদের সবার স্রষ্টা। তিনি কীভাবে বান্দার কাছে সুপারিশ করবেন!

মহানবী ﷺ তাকে বললেন, 'আরে বোকা! তুমি কী বলছ তা কি চিন্তা করে দেখেছো?'

এরপর মহানবী ﷺ আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা ঘোষণা করতে লাগলেন। বারবার বলতে লাগলেন, 'সুবহানাল্লাহ!' 'সুবহানাল্লাহ!' 'আল্লাহ তাআলা পবিত্র ও সুমহান ।'

সাহাবিরাও সমস্বরে মহান আল্লাহর প্রশংসা করতে লাগলেন। মহানবী ﷺ এরপর লোকটিকে বললেন, 'আরে বোকা! কোনো, আল্লাহর মাধ্যমে কোনো বান্দার কাছে সুপারিশ করা হয় না। তিনি তো সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি অনেক বড় ও মহান। তুমি কি জানো আল্লাহ কেমন? নভোমণ্ডলে এভাবে রয়েছে তার সিংহাসন। এরপর মহানবী ﷺ হাতের আঙুল বৃত্তাকার করে গম্বুজের মতো বানিয়ে তাকে সিংহাসনের ধারণা দিলেন। এরপর বললেন, 'আর কাঠের হাওদা আরোহীকে নিয়ে যেমন আওয়াজ করতে থাকে তাও তেমনি আওয়াজ করতে থাকে।' (সুনানে আবূ দাউদ:৪১০১)

জনসম্মুখে ভুল করলে তা সংশোধনের নববী পদ্ধতির একটি চিত্র আপনারা দেখলেন। কিন্তু নির্জনে বা একাকি কেউ কোনো ভুল করে ফেললে তা কিভাবে তিনি সংশোধন করতেন। আসুন তাও একটু দেখে নিই।

একরাতে মহানবী ﷺ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ঘরে এলেন। এসে তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ শুয়ে রইলেন। যখন তিনি ধারণা করলেন যে, আয়েশা ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন তিনি খুব আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠলেন। এরপর গায়ে চাদর জড়িয়ে জুতো পরে নিঃশব্দে দরজা খুলে বের হলেন। আস্তে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলেন।

Contents

এদিকে আয়েশা জেগেই ছিলেন। তিনিও নিঃশব্দে সবকিছু দেখলেন। তাঁর মধ্যে নারীসুলভ আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠল। তিনি ভাবলেন, মহানবী ﷺ হয়তো অন্য কোনো স্ত্রীর কাছে যাচ্ছেন। তাই তিনিও ওঠে বসলেন। ওড়না চাদর পরিধান করে তিনিও খুব সন্তর্পণে মহানবী ﷺ-কে অনুসরণ করতে লাগলেন।

নীরব নিস্তব্ধ রাতের আঁধার ভেদ করে মহানবী ﷺ সামনে এগিয়ে চলছেন। চলতে চলতে তিনি জান্নাতুল বাকিতে গিয়ে পৌঁছলেন। তাঁর সাহাবিদের কবরগুলোর সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাকিয়ে থাকলেন তার প্রিয় সাহাবিদের কবরগুলোর দিকে। এ কবরের অধিবাসীরা ছিল তাঁর এক সময়ের সঙ্গী। তাদের দিনরাত কেটেছে এক আল্লাহর ইবাদতে। মৃত্যু তাদের আলিঙ্গন করেছে জিহাদের ময়দানে। তারা এখন পাতালপুরিতে সমবেত। উর্দ্ধজগতে মহান প্রভুর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য।

মহানবী ﷺ তাদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ইসলামের জন্য তাদের আত্মত্যাগের স্মৃতিগুলো মহানবী ﷺ-এর চোখের সামনে ভেসে উঠল। তিনি দু'হাত তুলে তাদের জন্য দোয়া করতে লাগলেন।

একবার তিনি কবরগুলোর দিকে তাকান, আবার তাকান আলো ঝলমল নীল আকাশের দিকে। আবার হাত তুলে কায়মনোবাক্যে মোনাজাত করেন। এভাবে দীর্ঘক্ষণ তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। এদিকে আয়েশা দূর থেকে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখলেন।

এরপর মহানবী ﷺ ফিরে আসতে উদ্যত হলেন। তা দেখে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও দ্রুত হাঁটতে লাগলেন। মহানবী ﷺ-কে কাছে আসতে দেখে আয়েশা তার চলার গতি আরো বাড়িয়ে দিলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু মহানবী ﷺ-এর আগেই ঘরে ফিরে আসতে সক্ষম হলেন। ঘরে ঢুকে ওড়না চাদর খুলে যথাস্থানে রেখে তিনি শুয়ে পড়লেন। ঘুমের ভান করে তিনি শুয়ে পড়লেন ঠিকই, কিন্তু তার শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত চলাচল করছিল। মহানবী ﷺ তার শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আয়েশা! কী হয়েছে তোমার? ভয় পেয়েছ?'

আয়েশা বললেন, 'না, কিছু হয় নি।'

মহানবী ﷺ বললেন, 'তুমি নিজেই বলবে। না হলে আল্লাহ আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন।'

এ কথা শুনে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা মহানবী ﷺ-কে সবকিছু খুলে বললেন। তিনি বললেন যে, 'আসলে আমার আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লেগেছিল। তাই আমি দেখতে গিয়েছিলাম, আপনি কোথায় যান?'

মহানবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমিই কি আমার সামনে ছিলে?'

আয়েশা উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ'।

মহানবী ﷺ তখন আয়েশার কাঁধে হালকা পরশ বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'আয়েশা! তুমি কি মনে করেছ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার সাথে অবিচার করবেন?'

আয়েশা বললেন, 'মানুষ কত কিছু গোপন রাখতে চায়! কিন্তু আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেন।'

মহানবী ﷺ বললেন: অবশ্যই।

এরপর মহানবী ﷺ তাকে ঘর হতে বের হওয়ার কারণ বললেন। 'রাতে যখন আমাকে দেখেছ তখন জিবরাঈল (আ) এসেছিলেন। কিন্তু তুমি রাতের পোশাকে ছিলে, এ কারণে তিনি ঘরে প্রবেশ করেন নি। আড়াল থেকেই আমাকে ডেকেছেন এবং জান্নাতুল বাকিতে গিয়ে মৃতদের জন্য দোয়া করতে বলেছেন। তিনি আমাকে আড়াল থেকে ডাকাতে আমিও অতি নিঃশব্দে তার ডাকে সাড়া দিয়েছি। তুমি ঘুমিয়ে ছিলে মনে করে তোমাকে আর ডাকি নি। কেননা,, আমার মনে হয়েছে তোমাকে জাগ্রত অবস্থায় রেখে গেলে তুমি নিঃসঙ্গ বোধ করবে।'

(মুসলিম:১৬১৯, সুনানে নাসায়ী:৩৯০১)

হ্যাঁ, আমাদের প্রিয় মহানবী ﷺ ছিলেন এমনই কোমল মনের মানুষ। ফুলের মতো সুরভিত যার জীবন। কোনো ভুলকে তিনি বড় করে দেখতেন না, বড় করে তুলতেন না। সাহাবায়ে কিরামকে বারবার বলতেন-

'কোনো মুমিন ব্যক্তি যেন তার মুমিনা স্ত্রীকে ঘৃণা না করে। তার কোনো একটি চরিত্র তার অপছন্দ হলে আরেকটি ঠিকই মনোপূত হবে।'

(মুসলিম:১৪৬৯)

কারো একটি আচরণ কিংবা ব্যবহারের ত্রুটির কারণে তার প্রতি পুরোপুরি অসন্তুষ্ট হওয়া ঠিক নয়। দোষ গুণ মানুষের থাকবেই। দোষ না দেখে আপনি বরং আপনি তার গুণটি দেখুন। গুণের কারণে তার দোষ ক্ষমা করে দিন।

কারো কোনো ত্রুটি আপনার নজরে পড়লেও আপনি তা ওভারলুক করুন। তার ভালো দিকগুলো স্মরণ করুন। তার যে কাজ আপনি পছন্দ করেন না, যে আচরণ আপনার মনোপুত নয়, সেগুলো হজম করুন কিংবা এড়িয়ে চলুন।

চেতনার আলো ...

তিরস্কারযোগ্য সে নয়, যে উপদেশ গ্রহণ করে না,
বরং তিরস্কারযোগ্য সে, যে ভুল পন্থায় উপদেশ প্রদান করে।



৪৪. বাঁধন খুলে দিন

ভুল যদি সমষ্টিগতভাবে কয়েকজন মিলে করে তখন তাদের সবাইকে একত্রে উপদেশ দেয়াই নিয়ম। কিন্তু কখনো কখনো আপনাকে আঁটির বাঁধন খুলে ফেলতে হবে। অর্থাৎ, প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে কথা বলতে হবে এবং প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবেই উপদেশ দিতে হবে।

মনে করুন, বাড়িতে আপনি ছোট ভাইয়ের রুমের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। ভেতর থেকে ছোট ভাইয়ের কণ্ঠ শুনতে পেলেন। সে তার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলছে। তারা সবাই মিলে কোনো একটি দেশে ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে। কিন্তু যে দেশে যাওয়ার প্ল্যান তারা করছে সে দেশের পরিবেশ এতো অশ্লীল যে, সেখানে গিয়ে গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা খুব কঠিন ব্যাপার।

আপনি চাচ্ছেন তারা যেন ও দেশে না যায়। আপনি তাদেরকে এ ব্যাপারে উপদেশ দিতে চাচ্ছেন। কিন্তু কিভাবে তাদেরকে এ উপদেশ দেবেন? কিভাবে উপদেশ দিলে তাদের মনে রেখাপাত করবে?

একটি পদ্ধতি তো হলো, আপনি তাদের কাছে গিয়ে কিছু নীতিকথা বলে ফিরে এলেন। কিন্তু আসল কথা হলো, সাধারণত এ পদ্ধতি কার্যকর ও সফল হয় না। এর পরিবর্তে আপনি যদি আঁটির বাঁধন খুলে প্রত্যেকটি লাঠি আলাদা আলাদাভাবে ভেঙ্গে ফেলেন তাহলে কেমন হয়? একটু চেষ্টা করে দেখুন।

পরামর্শ শেষে তারা সবাই যখন আলাদা হয়ে যাবে, তখন আপনার দৃষ্টিতে তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বিচক্ষণ তাকে ডেকে নিয়ে একান্তে বসুন। তাকে বলুন, 'জানতে পারলাম তোমরা নাকি অতিসত্বর ভ্রমণে যাচ্ছ। কোনো, আমি মনে করি তুমি তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। তুমি নিশ্চয় জানো, তোমরা যে দেশে যেতে চাচ্ছ, সেখানে সফরে অধিকাংশ পর্যটক বিপদ-আপদ, রোগ-ব্যাধি ও অন্যায়-অশ্লীলতা থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। অনেকে সেখান থেকে বিভিন্ন জটিল রোগের ভাইরাস বহন করে নিয়ে আসে।'

'তুমি কি তাদের সৎকর্মের সাওয়াবের অংশিদার হতে চাও না? তুমি কি তাদেরকে গোনাহ থেকে বাঁচাতে চাও না? তাদের পরামর্শ দাও, তারা যেন অন্য কোনো দেশ ভ্রমণ করে, যেখানে তোমরা নদী ও সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবে, বিনোদন ও আনন্দ করতে পারবে। কিন্তু কোনো প্রকার অন্যায় ও গোনাহের কাজ করতে হবে না।'

আপনি যখন এভাবে সুন্দরভাবে পরামর্শ দেবেন, নিঃসন্দেহে আলোচিত সে দেশটিতে ভ্রমণের প্রতি তার আগ্রহ অর্ধেক কমে যাবে।

এবার আপনি আরেকজনকে ডাকুন। ঠিক তাকেও এভাবে বলুন। এরপর তৃতীয়জনের কাছে যান, তাকেও একই কথা বলুন। তবে খেয়াল রাখবেন, তাদের কেউ যেন বুঝতে না পারে যে, আপনি অন্য কাউকে একই কথা বলেছেন।

পরবর্তীতে তারা যখন সমবেত হবে, তখন তাদের কেউ ভ্রমণের গন্তব্যস্থল পরিবর্তনের কথা উঠালে সঙ্গে সঙ্গে তার পক্ষে আরেকজনকে পেয়ে যাবে। এভাবে আপনি সূচনার আগেই একটি মন্দ কাজের কবর রচনা করতে পারেন।

আরেকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন। মনে করুন, একদিন আপনি জানতে পারলেন, আপনার সন্তানেরা তাদের একজনের কক্ষে একত্রিত হয়ে অশ্লীল ভিডিও বা অশ্লীল কোনো সিনেমা দেখে। এক্ষেত্রেও প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে বোঝানো উচিত। সবাইকে একসাথে বোঝাতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে, তারা জেদ করে অন্যায়ের ওপর অটল হয়ে যেতে পারে।

আপনি হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, মহানবী ﷺ থেকে কি এমন আচরণের কোনো নিদর্শন আছে?

হ্যাঁ, অবশ্যই আছে।

মহানবী ﷺ ও মুসলমানদের সাথে কোরাইশ কাফেরদের শত্রুতা, নিপীড়ন ও বিরোধ যখন চরমে পৌঁছল, তখন তারা সবাই মিলে মহানবী ﷺ ও বনু হাশিমের অন্তর্ভুক্ত মহানবী ﷺ-এর সকল নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে বয়কট করলো। তাদের পক্ষ থেকে এ মর্মে একটি ঘোষণাপত্র লেখা হলো যে, 'বনু হাশিমের কাছ থেকে কোনো কিছু কেনা যাবে না, তাদের

কাছে কোনো কিছু বিক্রি করাও যাবে না। আমাদের কোনো নারীকে তাদের সঙ্গে বিয়ে দেয়া হবে না এবং আমাদেরও কেউ তাদের কোনো নারীকে বিয়ে করতে পারবে না।'

ফল-ফসলহীন দুর্গম একটি উপত্যাকায় মহানবী ﷺ ও তার সাহাবিদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখা হলো। খাদ্যের অভাব এমন চরমে পৌঁছল যে, সাহাবিরা একপর্যায়ে গাছের পাতা খেতে বাধ্য হলেন।

অবস্থা এতো করুণ হলো যে, একদিন জনৈক সাহাবি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে বাইরে বের হলে হঠাৎ পায়ের নীচে খসখস আওয়াজ শুনতে পেলেন। তাকিয়ে দেখেন, এক টুকরো উটের চামড়া। তিনি চামড়াটুকু তুলে নিলেন এবং ভালোভাবে ধুয়ে আগুনে পোড়ালেন। এরপর তা টুকরো টুকরো করে পানিতে মেশালেন। তিনদিন তিনি এগুলো খেয়েই কাটিয়েছিলেন!

এভাবে চরম কষ্টের মাঝে অবরুদ্ধ অবস্থায় বনু হাশিম ও মুসলমানদের কয়েক মাস কেটে গেল। একদিন মহানবী ﷺ-তার চাচা আবূ তালিবকে বললেন, 'চাচা! আল্লাহ তাআলা কোরাইশদের ঘোষণাপত্রে উইপোকা লাগিয়ে দিয়েছেন। তাতে আল্লাহর নাম ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। জুলুম, সম্পর্কচ্ছেদ এবং মিথ্যা অপবাদ সব পোকায় খেয়ে ফেলেছে।'

উইপোকা কোরাইশদের সে চুক্তিনামাটি খেয়ে ফেলেছে। সেখানে 'আপনার নামেই শুরু করছি হে আল্লাহ' এ বাক্যটি ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই! এ কথা শুনে আবূ তালিব অবাক হয়ে বললেন, 'তোমার প্রতিপালক কি তোমাকে এ ব্যাপারে জানিয়েছেন?'

মহানবী ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ'।

আবূ তালেব বললেন, 'আল্লাহর শপথ! তোমার কাছে কেউ আসার আগেই আমি কোরাইশদেরকে এ বিষয়ে জানাব।'

এরপর আবূ তালিব কোরাইশদের কাছে গিয়ে তাদের বললেন,'হে কোরাইশ সম্প্রদায়! আমার ভাতিজা তো আমাকে এ কথা বলেছে। সে যা বলেছে যদি তা সত্য হয়, তাহলে তোমরা আমাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ কর এবং আমাদেরকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে দাও। আর

Contents

যদি তার কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে আমি আমার ভাতিজাকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করব। তখন তোমরা যা খুশি তাই কর।'

কোরাইশ সম্প্রদায় বললো, 'ঠিক আছে, তোমার কথায় আমরা রাজি আছি।'

সবাই মিলে যখন চুক্তিনামাটি দেখলো, তখন রাসূল ﷺ-এর কথা সত্য প্রমাণিত হলো। কিন্তু কোরাইশরা অঙ্গীকার পূরণ তো করলই না; উপরন্তু তারা মুসলমানদের ওপর অত্যাচার আরো বাড়িয়ে দিল। অবরুদ্ধ উপত্যাকায় দিন কাটতে লাগল বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব। ক্ষুধা-পিপাসায় তারা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে উপনীত হলো।

অবশ্য কোরাইশ কাফেরদের মধ্যে কিছু নরম দিলের মানুষও ছিল। তাদেরই একজন হলো হিশাম বিন আমর। গোত্রে তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি রাতের বেলা গোপনে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের অবরুদ্ধ উপত্যকায় উটে করে খাবার নিয়ে আসতেন। উপতাকার কাছাকাছি পৌছে তিনি উটের গলা থেকে রশি খুলে পেছন থেকে হাঁকাতে থাকতেন। একপর্যায়ে খাদ্যবাহী উট উপত্যকার ভেতরে চলে যেত।

এভাবে কেটে গেল বহুদিন। কিন্তু হিশাম আর কতদিন এভাবে এতো লোকের খাবারের ব্যবস্থা করবেন। তাই তিনি স্থির করলেন, যেভাবেই হোক এ নির্মম চুক্তিনামা ভঙ্গ করতে চেষ্টা শুরু করতেই হবে। কিন্তু পুরো কোরাইশ যেখানে একমত হয়ে আছে, সেখানে এমন কিছু করা তো সহজ কাজ নয়।

তিনি কী করলেন? তিনি আঁটির বাঁধন খুলে ফেলার পদ্ধতি অবলম্বন করলেন।

প্রথমে তিনি যুহাইর বিন আবি উমাইয়ার কাছে গেলেন । যুহাইর ছিল আবদুল মুত্তালিবের কন্যা আতিকার পুত্র। তিনি যুহাইরকে বললেন, 'যুহাইর! তুমি যা খুশি তা পানাহার করছ, সুন্দর পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করছ, স্ত্রীর সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাচ্ছ। অথচ তোমার মামাদের অবস্থা দেখ। তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়েছে। কেউ তাদের কাছে কোনো কিছু বিক্রি করছে না, তাদের কাছ থেকে কেউ কিছু কিনছে না। তাদের মেয়েদেরকে কেউ বিয়ে করছে না, আবার তাদের কাছে কেউ মেয়ে বিয়েও দিচ্ছে না। আমি তো শপথ করে বলতে পারি, তারা যদি

আবূ জাহেলের মামাবংশীয় হতো, তাহলে আবূ জাহল তাদেরকে এভাবে বয়কট করে রাখত না। অথচ তুমি বনু হাশিমের ভাগ্নে। আমার বুঝে আসছে না তুমি এখনো কীভাবে বসে আছ?!'

যুহাইর বললো, 'হিশাম! আমি একা কী করব? যদি আমার সঙ্গে আর কেউ থাকত, তাহলে চুক্তি প্রত্যাহারের ব্যাপারে আমি চেষ্টা করতাম।'

হিশাম: 'তুমি তো একা নও। এ কাজে তোমার সঙ্গে আরেকজন আছে।'

যুহাইর : 'কে সে?'

হিশাম: 'আমি! আমি তোমার সঙ্গে আছি ।'

যুহাইর: 'আচ্ছা দেখ তাহলে তৃতীয় কাউকে পাওয়া যায় কি-না?'

হিশাম : 'ঠিক আছে। তবে এ মুহূর্তে আমার কথাটা গোপন রাখ।'

এরপর হিশাম গেলেন মুতইম বিন আদীর কাছে। মুতইম ছিলেন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোক। হিশাম তাকে বললেন,'মুতইম! বনু আবদে মানাফের দুটি শাখাগোত্র তিলে তিলে ধ্বংস হয়ে যাবে, আর তুমি নীরবে তা দেখে যাবে?

মুতইম : 'ভাই, আমি কী করতে পারব? আমি তো একা মানুষ।'

হিশাম: 'তুমি একা কোথায়? এ কাজে তো তুমি আরেকজনকে তোমার সঙ্গে পাবে।'

মুতইম : 'কে সে?'

হিশাম: 'আমি, আছি তোমার সঙ্গে।'

মুতইম : 'তাহলে তৃতীয় কাউকে তালাশ কর।'

হিশাম : 'হ্যাঁ, তৃতীয়জনও আছে।'

মুতইম : 'কে সে?'

হিশাম : 'যুহাইর বিন আবি উমাইয়া।'

মুতইম : 'আচ্ছা, তাহলে চতুর্থ আরেকজন খুঁজে বের কর।'

হিশাম বললেন, 'ঠিক আছে। তবে বিষয়টা একটু গোপন রাখ।'

এরপর হিশাম গেলেন আবূল বুখতারী বিন হিশামের কাছে। হিশাম তার সাথে প্রথম দু'জনের মতো কথা বললো। একপর্যায়ে সে আগ্রহী

হয়ে বললো, 'আচ্ছা, আমাদেরকে সহযোগিতা করার মতো আর কেউ কি আছে?'

হিশাম বললেন, 'হ্যাঁ, আছে।'

'কে সে ?'

হিশাম বললেন, 'যুহাইর বিন আবি উমাইয়া, মুতইম বিন আদী। আর আমি তো তোমার সঙ্গেই আছি।'

সে বললো, 'আচ্ছা, তাহলে আরো কাউকে খুঁজে বের কর।'

এরপর হিশাম চলে গেলেন যামআহ বিন আসওয়াদের কাছে। তার সঙ্গেও আগের মতো কথা বললেন এবং অবরুদ্ধদের সঙ্গে তার আত্মীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে এ পরিস্থিতিতে তার কর্তব্য পালনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করলেন।

যামআহ বললো, 'তোমার এ আহ্বানের পক্ষে আর কেউ কি আছে?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, অমুক অমুক আছে।'

এভাবে সবাই এ বিষয়ে একমত হলেন এবং সবাই পরবর্তী কোনো এক রাতে মক্কার উপকণ্ঠে 'হাতমুল হাজুন' নামক স্থানে সমবেত হবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন।

নির্ধারিত সময়ে সকলে সেখানে সমবেত হওয়ার পর এ মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন যে, উক্ত চুক্তিনামা ভঙ্গ করে বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিবকে মুক্ত না করা পর্যন্ত তারা তাদের অবস্থান থেকে সরে যাবেন না।

যুহাইর বললো, 'আমি প্রথমে এ চুক্তিনামার নির্মমতা নিয়ে কথা শুরু করব। তখন তোমরা সবাই একের পর এক আমাকে সমর্থন দিয়ে যাবে।

পরদিন খুব ভোরে তারা সবাই কাবা চত্বরে উপস্থিত হলেন। লোকজন অন্যান্য দিনের মতো লেনদেন ও অন্যান্য কাজকর্ম করতে লাগল। যুহাইর বিন আবি উমাইয়া একজোড়া নতুন পোশাক পরে সাতবার কাবাঘর তাওয়াফ করলো। এরপর উপস্থিত লোকজনের কাছে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে বললো, 'হে মক্কার অধিবাসীরা! আমরা কি পানাহার করছি না? পোশাক পরিধান করছি না? তাহলে বনু হাশেম আমাদের স্বগোত্রীয় হয়েও কেন আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত? কেন তাদের সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে? কেন তাদেরকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে? আল্লাহর

শপথ! আমি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছি, যতক্ষণ না ঐ নির্মম চুক্তিনামা ছিঁড়ে ফেলা হবে, ততক্ষণ আমি ক্ষান্ত হব না।'

আবূ জাহেল তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে কাছেই বসা ছিল। সে বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বলে উঠল, 'যুহাইর! তোমার কথা ঠিক নয়। এ চুক্তিনামা কিছুতেই ভঙ্গ হবে না।'

তৎক্ষণাৎ যামআহ বিন আসওয়াদ দাঁড়িয়ে আবূ জাহেলের প্রতিবাদ করে কঠোর ভাষায় বললো, 'আবূ জাহেল! তোমার কথা ঠিক নয়। যখন ঐ চুক্তিনামা লেখা হয়েছিল তখনই আমরা তাতে রাজি ছিলাম না।'

আবূ জাহেল প্রতিবাদ করার জন্য যামআহ বিন আসওয়াদের দিকে তাকাল। ঠিক তখনই আবূল বুখতারী দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, যামআহ ঠিকই বলেছে। আমরা এ চুক্তিনামায় রাজি ছিলাম না, আমরা এটাকে সমর্থনও করি না।'

আবূ জাহেল বুখতারীর দিকে তাকাল। ওদিক থেকে মুতইম বিন আদী বলে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমরা দু'জন ঠিকই বলেছ। এর বিপরীত যে বলছে, সে মিথ্যুক। আমরা এ চুক্তির দায় থেকে মুক্ত, এর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।'

হিশাম বিন আমরও দাঁড়িয়ে একই কথা বললেন।

সবার ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদে আবূ জাহেল থ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ এদিক সেদিক তাকিয়ে থেকে সে স্বগতোক্তিক করতে লাগল, 'নিশ্চয় এটা পরিকল্পিত কাজ। রাতেই অন্য কোথাও এ ব্যাপারে পরিকল্পনা করা হয়েছে।'

এরপর মুতইম বিন আদী চুক্তিনামাটা ছিঁড়ে ফেলতে কাবাঘরের কাছে গেল। কিন্তু আশ্চর্য! উইপোকা 'তোমার নামেই হে আল্লাহ' এ অংশটি ছাড়া সব খেয়ে শেষ করে ফেলেছে!

মেধাবী হোন....

অভিজ্ঞ ডাক্তার প্রথমেই রোগির দেহে ইঞ্জেকশন পুশ করেন না।
ইঞ্জেকশন পুশ করার আগে আঙুল দিয়ে টিপে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করেন। এরপর ইঞ্জেকশন পুশ করেন।



৪৫. নিজেকে কষ্ট দেবেন না

আমার জীবনের স্মরণীয় একটি দিনের কথা। আমরা কয়েকজন বন্ধু একবার মরুভূমিতে ঘুরতে গিয়েছিলাম। সঙ্গে আমার বন্ধু আবূ খালিদও ছিল। তার দৃষ্টিশক্তি ছিলো খুব দুর্বল। তাই বিভিন্ন কাজে আমরা তাকে সাহায্য করতাম। খাওয়ার সময় খেজুর, কফি ইত্যাদি তার হাতে তুলে দিতাম। সে বারবার নিষেধ করে বলতো, 'আমিও তোমাদের সঙ্গে কাজ করবো। আমাকেও যে কোনো কাজ দিতে পারো।' কিন্তু আমরা তাকে কোনো কাজ দিতাম না।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছে আমরা একটি বকরি জবাই করলাম। গোশত কেটে টুকরো টুকরো করে একটি পাত্রে রাখলাম। এরপর আমরা তাঁবু টানানোসহ বিভিন্ন জরুরি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আমাদের পরিকল্পনা ছিল আপাতত অন্যান্য জরুরি কাজগুলো সেরে পরে পাক করবো। তাই গোশতগুলো ডেগচিতে ওভাবেই রেখে দেয়া হলো।

এদিকে আবূ খালিদ হঠাৎ খুব আগ্রহের সাথে পাতিলের কাছে গেলো। আহ, সে যদি না যেতো তাহলে ভালো হতো! সে পাতিলের কাছে গিয়ে দেখতে পেলো গোশতে এখনো পানিই দেয়া হয় নি। তাই গাড়িতে রাখা মালপত্রের কাছে এসে সে পানি খুঁজতে লাগলো। সেখানে জেনারেটর, বৈদ্যুতিক তার, টর্চ লাইট, পানি ও পেট্রোলভর্তি চারটি বোতল এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ছিলো। সে তার সবচেয়ে কাছের বোতলটি নিয়ে খুশিমনে গোশতের কাছে চলে এলো। তারপর বোতলের অর্ধেকটা পাত্রে ঢেলে দিলো।

তাকে একাণ্ড দেখে আমাদের একজন সাথি দূর থেকে চিৎকার করে বলে উঠলো, 'না! না! আবূ খালিদ! এটা ঢেলো না। কিন্তু কে শোনে কার কথা। আবূ খালিদ বোতল উজাড় তরে ঢালছিলো আর বলছিলো. 'আমাকেও একটু কাজ করতে দাও! আমিও তোমাদের সাথে একটু কাজ করতে চাই।'

আমরা তাড়াতাড়ি তার হাত থেকে বোতলটি কেড়ে নিলাম। আবূ খালেদের কাণ্ড দেখে কেউ হাসি থামাতে পারলো না। অনেকে হাসতে হাসতে কেঁদে ফেললো। কারণ বোতলটিতে পেট্রোল ছিল।

সেদিন আমরা দুপুরের খাবার শুধু রুটি আর চা দিয়েই শেষ করেছিলাম। এতো বড় একটি ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও আমাদের সেদিনের ভ্রমণটি কিন্তু খারাপ হয়নি; বরং আনন্দময় একটি ভ্রমণই হয়েছিল। অসতর্কতাবশত যা ঘটে গিয়েছিল তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে আমরা নিজেদের শান্তি ও আনন্দ নষ্ট করি নি। যা হওয়ার তা তো হয়ে গেছে।

আরেকটি ঘটনা । আমি তখন মাধ্যমিক স্তরে পড়াশোনা করি। আমরা সহপাঠীরা মিলে একবার ভ্রমণে বের হলাম। পথিমধ্যে হঠাৎ আমাদের একটি গাড়ির ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে গেলো। ফলে গাড়িটির স্টার্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। তাই ইঞ্জিন স্টার্ট করার জন্য অন্য গাড়ি এনে নষ্ট গাড়িটির মুখোমুখি দাঁড় করানো হলো। কারণ ভালো গাড়ির ব্যাটারি থেকে নষ্ট গাড়িটির ব্যাটারিতে তারের মাধ্যমে সংযোগ দিতে পারলে ইঞ্জিন চালু করা সম্ভব। আর একবার চালু হলে অনেকক্ষণ চলা যাবে।

তারিক এসে দুই গাড়ির মাঝে দাঁড়িয়ে তার দিয়ে দুই গাড়ির ব্যাটারি সংযুক্ত করে একজনকে ইশারায় বললো, 'ইঞ্জিন চালু করো।' একজন ড্রাইভিং সিটে উঠে বসলো। দুর্ভাগ্যবশত গাড়িটি তখন ফার্স্ট গিয়ারে ছিল। স্টার্ট দিতেই গাড়িটি লাফিয়ে উঠলো। বাম্পারের ধাক্কায় তারিক মাটিতে পড়ে হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যথা পেলো। তখন ড্রাইভিং সিটে বসা বন্ধু চিৎকার করে বললো, 'আবার স্টার্ট দেবো?'

আমরা তাড়াতাড়ি গাড়ি দু'টিকে দুদিকে সরিয়ে রাখলাম। এরপর তারিককে দাঁড় করিয়ে হাঁটাতে চেষ্টা করলাম। হাঁটুতে খুব আঘাত লাগায় সে হাঁটতে পারছিলো না। তবে আশ্বর্যের বিষয় হলো, এতো ব্যথা পেয়েও সে চিৎকার তো দূরের কথা, কাউকে একটু বকাও দেয় নি। তিরস্কারমূলক কোনো শব্দও সে উচ্চারণ করেনি; বরং সে যে ক্ষুব্ধ নয়, তা বোঝাতে কিছুটা মুচকি হাসছিলো।

বস্তুত: এসব ক্ষেত্রে চিৎকার করে কী লাভ? যা হওয়ার, তা তো হয়েই গেছে। ড্রাইভিং সিটে বসা বন্ধুটি পরে অবশ্য তার ভুল বুঝতে পেরেছে।

তাই জীবনটাকে যদি আনন্দময় ও শান্তিপূর্ণ করতে চান, যদি জীবনকে উপভোগ্য হিসেবে গড়তে চান তাহলে সর্বক্ষেত্রে এই মূলনীতিটি মনে রাখবেন। 'সাধারণ জিনিসকে কখনো বড় করে তুলবেন না।'

অনেক সময় আমরা নিজেদেরকে কষ্ট দেই। সংকুচিত হই ও কষ্ট পাই। এভাবে কষ্ট পাওয়া, সমস্যার কোনো সমাধান নয়।

মনে করুন, আপনি একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গেছেন। আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ বেশ সুন্দর ও পরিপাটি। মাথার রুমাল ও ওপরের বন্ধনীটিও বেশ দর্শনীয়। দেখতে আপনাকে বরের চেয়েও সুন্দর লাগছে!

আপনি হাসিমুখে সবার সঙ্গে করমর্দন করছেন। হঠাৎ পেছন থেকে একটি শিশু এসে আপনার রুমাল ধরে আচমকা টান দিলো। আপনার রুমাল, বন্ধনি ও টুপি সব মাটিতে পড়ে গেলো। উপস্থিত সবাই আপনার এ অবস্থা দেখে হাসাহাসি করতে লাগলো। এ অবস্থায় আপনি কী করবেন?

অনেকেই এ জাতীয় পরিস্থিতিতে এমন কিছু করে বসেন, যা কখনোই সুন্দর সমাধান নয়। কেউ হয়তো বাচ্চাটির পেছনে পেছনে দৌড়াতে শুরু করে, চিৎকার করে ডাকতে থাকে। কেউ তিরস্কার করে শক্ত ভাষায় তাকে গালমন্দ করে। কিন্তু এর ফলাফল কী?

ছেলেটি তো চেয়েছিলো লোকজনের মনোযোগ আপনার প্রতি আকৃষ্ট করে একটা কোলাহল সৃষ্টি করতে অথবা সবার কাছে আপনাকে হাসির পাত্র বানাতে। আপনার আচরণের কারণে তার উদ্দেশ্য সফল হলো। এই পুরো দৃশ্যটা কেউ মোবাইলের ভিডিওতে ধারণ করে ব্লুটুথের মাধ্যমে সামাজিক সাইটগুলোতে আপলোড করবে। ফলে আপনি আরো হাসির পাত্র হবেন।

তাই ভেবে দেখুন, ছেলেটিকে বকা দিয়ে আপনি নিজেকে আরো বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলছেন? তাকে শাসাতে গিয়ে বাস্তবে আপনি তাকে নয়, আপনি নিজেকেই অপ্রীতিকর অবস্থার মুখোমুখি করছেন।

আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করুন, আপনি একটি নুতন কাপড় পরিধান করেছেন। হয়তো এখনো কাপড়টির মুল্যও শোধ করেন নি। চাকুরির ইন্টারভিউ দেয়ার জন্য একটি কোম্পানিতে গেছেন। আপনি যে দরজা দিয়ে ঢুকছেন, তাতে একটু আগে রং দেয়া হয়েছিলো। দরজার পাশে এ বিষয়ে একটি নোটিশও লাগানো ছিলো। আপনি সেটা খেয়াল করেন নি। অসাবধানতাবশত কিছুটা রং আপনার কাপড়ে লেগে গেলো। এখন আপনি কী করবেন?

বেশিরভাগ সময়ই আমরা এ ধরনের পরিস্থিতিতে এমন কাজ করে বসি, যা আসলে এ সমস্যার কোনো সমাধান হতে পারে না। আমরা উত্তেজিত হয়ে পড়ি । রংমিস্ত্রীকে ধমক দিয়ে বলি, 'এখানে দর্শনীয় জায়গায় নোটিশটি লাগাতে পারলে না?'

স্বাভাবিকভাবেই মিস্ত্রীও আপনার ওপর রেগে যাবে। সেও অশ্রাব্য কিছু বলে ফেলবে। এর ফল কী হবে? আগে তো আপনার কাপড়ে রং লেগেছিল। এখন আপনার মান সম্মান ধুলোয় মিশে গেলো।

বস্তুত: এ ধরনের আচরণ করে আপনি অন্যকে নয়; বরং নিজেকেই কষ্ট দিচ্ছেন, নিজেকেই অপদস্থ করছেন।

প্রিয় পাঠক, বিরক্ত হবেন না। আরো একটি উদাহরণ দিয়ে এ প্রসঙ্গের ইতি টানছি। মনে করুন, কোথাও আপনার বক্তৃতার প্রোগ্রাম আছে। এ জন্য আপনি সুন্দর পোশাক পরে বাসা থেকে বের হয়ে রাস্তায় নেমেছেন। রাস্তার পাশে কাদাপানি জমে ছিল। একটি গাড়ি দ্রুতগতিতে এসে কাঁদা ছিটিয়ে আপনার পুরো কাপড় ময়লা করে দিয়ে গেলো। আপনি কি এখানেও চিৎকার দিয়ে গাড়ি ও ড্রাইভারকে গালমন্দ করে নিজেকে কষ্ট দেবেন?

একটু ভাবুন, গাড়ি তো চলেই গেছে। আপনার এই গালমন্দ আর চিৎকার কী কোনো ফল বয়ে আনবে? আপনি কি এর মাধ্যমে শান্তি পাবেন?

জীবনের বাঁকে বাঁকে এমন অনেক কষ্টদায়ক ঘটনার সম্মুখীন আমরা হই। এগুলো নিয়ে চিৎকার করে নিজের কোনো লাভ হয় না। কষ্ট ও মনোপীড়া ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও পীড়াদায়ক এমন অনেক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন।

একদিন তিনি প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা এর সঙ্গে একান্তে বসেছিলেন। আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওহুদের দিনের চেয়েও কঠিন কোনো মুহূর্ত কি আপনার জীবনে এসেছিল?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্মৃতিপটে উহুদের যুদ্ধের বীভৎস দৃশ্যগুলো ভেসে উঠলো। আরো ভেসে উঠলো প্রিয়তম চাচার বিকৃত লাশের দৃশ্য । তাকে

শুধু নির্মমভাবে হত্যাই করা হয় নি, নাক কান কেটে তার লাশ বিকৃত করা হয়েছিল। বুক ও পেট কেটে পুরো শরীর ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছিল।

সেদিন আঘাতে আঘাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দাঁত শহিদ করা হয়েছিল। নুরানি চেহারা জখম হয়েছিল। রক্ত ঝরেছিল মোবারক শরীর থেকে।

সেদিন তাঁর অনেক সঙ্গী তাঁরই চোখের সামনে এক এক করে শহিদ হয়েছিলেন। সত্তরজন সঙ্গীকে ওহুদ প্রান্তরে দাফন করে তিনি মদিনায় ফিরে এসেছিলেন। মদিনায় তখন প্রতীক্ষার প্রহর গুনছিল বিধবা নারী ও এতিম শিশুরা।

আহ! কী কষ্টের ও বেদনার দিন ছিলো সেটি!

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা জবাবের অপেক্ষায় ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমার গোত্রের লোকজনের কাছ থেকে আমি সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছিলাম আকাবার দিন। সেদিন আমি তাদের সামনে আমার নবুয়তের সংবাদ দিয়েছিলাম।'

এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনি কাজে তায়েফবাসীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা, তাদের প্রত্যাখ্যান এবং একদল নির্বোধ কর্তৃক তাকে পাথর মেরে পুরো শরীর রক্তাক্ত করে দেয়ার ঘটনা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে শোনালেন।

তার জীবনে এ ধরনের মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক অনেক ঘটনাই ঘটেছিল। কিন্তু এসব তার স্বাভাবিক পথচলায় বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। এই কষ্টগুলোকে তিনি ধরে রাখেন নি, বরং জীবনকে উপভোগ করেছেন। তাই দুঃখগুলো সব কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে, রয়ে গেছে তাঁর সুমহান আদর্শ ও উন্নত মানবতাবোধ।

তাই শোক ও দুশ্চিন্তায় মজে গিয়ে নিজেকে ধ্বংস করবেন না। ভর্ৎসনা ও নিন্দার মাধ্যমে অন্যকেও ধ্বংসের পথে ঠেলে দেবেন না।

অনেক সময় আমরা সমস্যার সমাধান এমনভাবে করি, যা মূলত সে সমস্যার সমাধান নয়।

আহনাফ বিন কায়েস বনু তামিমের সরদার ছিলেন। তিনি বাহুবল, ঐশ্বর্য বা বংশীয় মর্যাদার কারণে নেতৃত্ব লাভ করেন নি, বরং সহনশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমেই নেতৃত্বের আসনে তিনি আসীন হয়েছিলেন।

একবার হিংসার বশবর্তী হয়ে কিছু লোক জনৈক নির্বোধকে বললো, 'এই নাও এক হাজার দিরহাম। তুমি গিয়ে বনু তামিমের সরদার আহনাফ বিন কায়েসের গালে জোরে একটা চড় মেরে আসবে।'

নির্বোধ লোকটি বিলম্ব না করে সাথে সাথে রওয়ানা হলো। সে এসে দেখলো, আহনাফ বিন কায়েস চাদর জড়িয়ে বসে আশেপাশের লোকদের সঙ্গে কথা বলছেন।

লোকটি ধীর পদক্ষেপে তার দিকে এগিয়ে গেলো। একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। কোনো সুসংবাদ নিয়ে এসেছে এই ভেবে আহনাফ বিন কায়েস তার দিকে মাথা উঠিয়ে তাকালেন, আর হতভাগা অমনি হাত উঁচিয়ে তার গালে কষে একটা চড় মারলো। আহনাফ ব্যথায় চিৎকার করে উঠলেন। কিন্তু তিনি উত্তেজিত হলেন না। নিজেকে সামলে নিলেন। শান্ত ভাবে লোকটাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমাকে চড় মারলে কেন? লোকটা বললো, 'কিছু লোক আমাকে এক হাজার দিরহাম দিয়ে বলেছে আমি যেন বনু তামীমের সরদারকে চড় মেরে আসি।'

তিনি বললেন, 'হায়! হায়! তুমি কী করলে! আমি তো বনু তামিমের সরদার নই!'

'তাহলে! বনু তামীমের সরদার কে?'

আহনাফ বললেন,'ওই যে লোকটা। একা একা বসে আছে। তরবারিটা পাশে রাখা। সেই তো বনু তামিমের সরদার।' আহনাফ বিন কায়েস হারিসা বিন কোদামাকে দেখিয়ে দিলেন। হারিসা তখন রাগে ও ক্ষোভে ফুসছিলো। মনে হচ্ছিলো, তার ক্রোধের একটা অংশ সবার মধ্যে ভাগ করে দিলেও সবাই রাগে ফেটে যাবে।

লোকটা বললো, 'হ্যাঁ, দেখেছি। ওই তো বসে আছে।'

আহনাফ বললেন, 'যাও, তাকে গিয়ে চড় মেরে এসো। সে-ই বনু তামিমের সরদার!'

লোকটি হারিসার একেবারে কাছাকাছি চলে গেলো। তার চোখ থেকে তখন যেন আগুন বের হচ্ছিলো। লোকটি তার কাছে গিয়ে থামলো। হাত উঁচিয়ে জোরে একটা চড় মারতে যাবে অমনি হারিসা লোকটির হাত ধরে তরবারির আঘাতে তা দ্বিখণ্ডিত করে ফেললো !

প্রবাদ আছে, 'সেই তো বিজয়ী যার মুখে ফোটে শেষ হাসি।'

প্রত্যয় ...

ভুল পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করলে সমাধানের পথ কখনো খুঁজে পাবেন না; বরং তাতে আপনার কষ্টই বাড়বে।



৪৬. কিছু সমস্যা এমন যার কোনো সমাধান নেই

অনেক সময় আমরা এমন সমস্যার সম্মুখীন হই, আমাদের কাছে যার কোনো সমাধান নেই। তখন তো মেনে নিতে পারাটাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমরা তা পারি না; বরং সমাধানের ব্যর্থ চেষ্টা করতে থাকি।

যেমন অনেককে দেখবেন, ড্রাইভিং করতে গিয়ে যানজটের মুখোমুখি হলে রাগে স্টিয়ারিং হুইল-এ ঘুসি মেরে বলে, 'উ-ফ! সারাদিন কেবল জ্যাম আর জ্যাম!'

গ্রীষ্মের গরমে অনেককে দেখবেন, রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে আর বিরক্তি প্রকাশ করে বারবার বলছে, 'ধ্যা-ত! এততো গ-র-ম!'। আর ভাবখানা এমন যে, তার সাথে কথা বলার কোনো সুযোগ নেই।

কর্মক্ষেত্রে আপনি এমন কারো সহকর্মী হতে পারেন। ব্যাপারটা যদি এমন হয়, তাহলে তো তার সঙ্গে আপনার প্রতিদিন দেখা হওয়াটাও একটা বিরক্তিকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। সে অফিসে এসে বসতে না বসতেই নানাভাবে আপনাকে বিরক্ত করে তুলবে। 'দেখছেন! কতো কাজ! একা কি এতো কিছু করা যায়! কতদিন ধরে বলে আসছি বেতন বাড়ানোর জন্য, কিন্তু বেতন বাড়ানোর কোনো খবর নেই। বেতন না বাড়িয়ে শুধু কাজের চাপ বাড়াচ্ছে।

প্রতিদিন সকালে সে অফিসে আসে বিষন্ন চেহারা নিয়ে আর বিকেলে ফিরে যায় একরাশ বিরক্তি নিয়ে। মাঝে মধ্যেই সে আপনাকে বলবে, 'আমার শরীরটা খুব খারাপ! ছেলেটা অসুস্থ!'

এককথায়, আমরা প্রত্যেকেই জীবনে এমন অনেক সমস্যার সম্মুখীন হই, যার কোনো সমাধান নেই। তাই সে বিষয়গুলো স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়ে জীবনকে স্বাভাবিক গতিতে পরিচালনা করতে হবে।

জনৈক আরব কবি তার কবিতায় এ বিষয়টি দুইজনের সংলাপের মধ্য দিয়ে খুব সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবিতার মর্মার্থ হলো-

: আকাশটা কেমন মলিন হয়ে আছে। এমন হলে কি আর ভালো লাগে?

: আকাশ মলিন হয়ে আছে তাতে তোমার কী? তুমি হাসো। তোমার হাসিতে আকাশও হেসে ওঠবে।

: দখিনা হাওয়া বন্ধ হয়ে আছে। গরমে জীবন যেন বেরিয়ে যাচ্ছে।

: হাসো, মন খুলে হাসো। আক্ষেপ করলে কি আর বাতাস ফিরে আসবে?

: ভালোবেসে যাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম হৃদয়ের মণিকোঠায়, যার ভালোবাসা আমার হৃদয়ের আকাশটাকে ছুঁয়েছিল। সে আজ আমায় ছেড়ে চলে গেছে দূরে, বহুদূরে। তাকে সবকিছু দিয়ে বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু সে আমার সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করে আমার হৃদয়টাকে খান খান করে ফেলেছে। তারপরও কি তুমি আমাকে হাসতে বলবে?

: হ্যাঁ, তারপরও তুমি হাসবে। যা হয়েছিল তা ভুলে গিয়ে সব ব্যথা বেদনা কবর দিয়ে সে কবরের ওপর দাঁড়িয়েই তুমি হাসবে। মন খুলে হাসবে। কেননা, তুমি যদি হাসতে না পারো বা তার সঙ্গ চাও তাহলে দুঃখ আর বেদনারা তোমাকে গ্রাস করে আজীবন তোমাকে কষ্ট দেবে। তাই কষ্ট ভুলে যেতে প্রাণ খুলে হাসবে। চারদিকে আমার শুধু শত্রু আর শত্রু। তাদের শোরগোল আর হাঙ্গামায় আমার জীবন অতিষ্ঠ। তাদের কুটচাল আর ষড়যন্ত্রে আমার সব পর্যুদস্ত। তারপরও বলো আমার মুখে কিভাবে হাসি ফুটবে?

: হ্যাঁ, তবুও তুমি হাসবে। তারা যখন নিন্দা করবে তখন তুমি ভাববে এটা হয়তো অন্য কাউকে করছে, তোমাকে করছে না। তাছাড়া তুমি যদি তাদের চেয়ে বড় ও সম্মানী না হতে তাহলে তারা তোমার পেছনে লাগতো না। তুমি বড় বলেই তারা তোমার নাগাল পেতে চায়। এটা ভেবে তুমি আত্মতৃপ্তি পেতে পারো। দিনরাত সব বিস্বাদ হয়ে আছে। শান্তির টিকিটুকুও নেই। এখন কী করি বলো?

: হাসো, মন খুলে হাসো। তোমার চেহারায় যেন না থাকে অশান্তির কোনো ছাপ। দুঃখ বেদনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সুখের গান গাও। কষ্ট যাতনা ভুলে গিয়ে শান্তির আবহ ছড়াও। বলো, দুঃখ বয়ে বেড়ালে কি তোমার কোনো লাভ হবে? তাহলে কেন অযথা দুঃখের বোঝা বয়ে জীবনকে হারাবে? জীবন তো উপভোগের বিষয়। একে সুখের অনুভূতি দিয়ে উপভোগ করো। দুঃখের অন্ধকার রাত পেছনে ঠেলে দিয়ে সুখময় আলোকজ্জ্বল দিবসকে বরণ করে নাও।'

হ্যাঁ, জীবনকে এভাবেই উপভোগ করতে হয়। প্রতিকূল পরিবেশেও আপনার ব্যবহারে কেউ যেন কষ্ট না পায়, এ ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। ঘরে স্ত্রী সন্তানের সঙ্গে, কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গেও আচরণের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। তাদেরকে অযথা কেন কষ্ট দেবেন? মনে রাখবেন, আপনাকে দেখলে বা আপনার কথা মনে হলে তাদের মনে যেন বিষণ্নতা এসে চেপে না বসে। আপনাকে তারা যেন বোঝা মনে না করে।

এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত ব্যক্তির জন্য আওয়াজ করে কাঁদা, চিৎকার করা, জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলা, মাথার চুল কামানো– ইত্যাদি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। মৃতের জন্য তো আমাদের করণীয় হলো– গোসল দেয়া, কাফন পড়ানো, জানাযা পড়া, দাফন করা এবং দোয়া করা। মাতম কিংবা চিৎকারে তো মৃতের কোনো লাভ হয় না। কেবল জীবিতদের আনন্দময় জীবনে বেদনার কালো ছায়া নেমে আসে।

মাআফি বিন সুলাইমান একবার জনৈক সঙ্গীকে নিয়ে হাঁটছিলেন। সঙ্গীটি হঠাৎ ভ্রু কুচকে মাআফি বিন সুলাইমানের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ইস! আজ কী ঠাণ্ডা!'

মাআফি বললেন, 'তুমি কি চাইলেই এখন পরিবেশটাকে গরম করে ফেলতে পারবে?'

'না'। তার সঙ্গীটি জবাব দিল।

'তাহলে অযথা অভিযোগ করে লাভ কী?' মাআফি বললেন, এর চেয়ে বরং একবার 'সুবহানাল্লাহ' বললেও তো তোমার লাভ হতো।'

দেখুন মাআফির অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা। অনুভূতির উচ্চতা। আপনিও ভাবুন আর জীবনকে উপভোগ করুন।

জীবনের জন্য বেঁচে থাকুন...
খুঁজে খুঁজে সমস্যা বের করবেন না।
ছোট বিষয়কে বড় করে তুলবেন না।
আনন্দময় জীবন গড়ুন, জীবনকে উপভোগ করুন।



৪৭. দুশ্চিন্তা করে নিজেকে নিঃশেষ করবেন না

ভার্সিটিতে আমার একজন ছাত্র ছিলো। তার নাম ছিল সাদ। একবার সে এক সপ্তাহ ক্লাসে অনুপস্থিত ছিল। এক সপ্তাহ পর ক্লাসে এলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'সাদ! তুমি এতোদিন ক্লাসে অনুপস্থিত ছিলে কেন? কী হয়েছিল তোমার?'

সে বললো, 'তেমন কিছু না, একটু ব্যস্ত ছিলাম।'

অথচ তার চেহারায় আমি দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম।।

আমি বললাম, 'কী হয়েছিল?'

সে বললো, 'আমার ছেলে অসুস্থ। ওর লিভারে সমস্যা। কয়েক দিন আগ থেকে আবার তার ব্লাডে ইনফেকশন হয়েছে। গতকাল ডাক্তার সাহেব জানালেন, ইনফেকশন মস্তিস্ক পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।'

আমি বললাম,'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ! ভাই! ধৈর্য ধরো। দোয়া করি, আল্লাহ যেন ওকে সুস্থ করে দেন। আর আল্লাহ যদি তাকে নিয়ে যান, তাহলে কিয়ামতের দিন যেন ওকে তোমার জন্য সুপারিশকারী বানিয়ে দেন।'

সে বললো, শায়েখ! আমার ছেলে তো নাবালেগ নয়।'

'ওর বয়স কত?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'সতেরো বছর।' সে জবাব দিলো।

'আল্লাহ ওকে সুস্থ করে দিন। ওর ভাই বোনদেরও সুস্থ রাখুন।'

মাথা নিচু করে সে বললো, 'শায়েখ! ওর কোনো ভাই বোন নেই। আমার এই একটিই সন্তান। আর ওর এই অবস্থা হয়ে গেলো!'

ছাত্রটির অবস্থা সত্যিই বেদনাদায়ক ছিলো। আমি তাকে সংক্ষেপে বললাম, 'সাদ! পরিস্থিতি যাই হোক, ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। আল্লাহ যা নির্ধারিত করে রেখেছেন, তাই হবে।'

এরপর তাকে কিছুটা সান্ত্বনা দিয়ে চলে এলাম।

হ্যাঁ, আপনিও কখনো দুশ্চিন্তায় ভেঙ্গে পড়বেন না। কেননা, দুশ্চিন্তা কখনোই সমস্যার পূর্ণ কিংবা আংশিক সমাধান দিতে পারে না।

কিছুদিন আগে আমি মদিনায় গিয়েছিলাম। সেখানে খালিদের সঙ্গে দেখা হলো। সে বললো, 'ডা. আবদুল্লাহর সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়?'

আমি বললাম, 'কেন? কী হয়েছে?'

সে বললো, 'সমবেদনা প্রকাশের জন্য।'

'কীসের সমবেদনা?'

তার বড় ছেলে পরিবারের সবাইকে নিয়ে পাশের শহরে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিল। ভার্সিটিতে জরুরি কাজ থাকায় তিনি একাই শুধু মদিনায় ছিলেন। ফেরার পথে এক সড়ক দুর্ঘটনায় তারা সবাই নিহত হয়েছেন। পরিবারের এগারোজন সদস্য সবাই তাকে ছেড়ে চলে গেছে!'

ডা. আব্দুল্লাহ সৎ ও নিষ্ঠাবান একজন ব্যক্তি। তার জীবনের পঞ্চাশটি বসন্ত পেরিয়ে গেছে। তিনি তো রক্ত মাংসে গড়া একজন মানুষ। তারও আবেগ–অনুভূতি আছে, বুকের মাঝে একটি অন্তর আছে, অশ্রুভরা দু'টি চোখ আছে। তার হৃদয়ও আনন্দে আপ্লুত হয়, বেদনায় কাতর হয়।

তিনি হৃদয়বিদারক খবরটি শুনলেন। তাদের জানাযা পড়লেন। এরপর নিজ হাতে এক এক করে মাটিতে রাখলেন কলিজার এগারোটি টুকরা। এগারটি 'তাজা' প্রাণ।

এরপর বাড়িতে ফিরে বিষণ্ন হৃদয়ে পায়চারি করেন ঘরের ভেতর। বিক্ষিপ্ত পড়ে থাকা খেলনাগুলোর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। কত দিন হয়ে গেলো এগুলো পড়ে আছে। খালুদ ও সারা এগুলো নিয়ে খেলায় মেতে ওঠে না। ওরা যে চলে গেছে না ফেরার দেশে।

তিনি বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। বিছানাটি এলোমেলো পড়ে আছে। তার স্ত্রীও তো আর নেই।

ইয়াসিরের সাইকেলের কাছে গিয়ে দাঁড়ান। সেই কবে থেকে ওটা এভাবেই নিশ্চল পড়ে আছে। এটি যে চালাতো, সেও তো আজ আর এ নশ্বর পৃথিবীতে নেই।

একসময় বড় মেয়ের কামরায় প্রবেশ করেন। ঘরে কেউ নেই। বিয়ের লাগেজগুলো সাজানো। কাপড়গুলো বিছানায় এলোমেলো। আহ! সেও তাকে ফেলে চলে গেছে!

সুবহানাল্লাহ! ধৈর্য তো আল্লাহর দান! এতো বড় ঝড়-ঝাপটার পরও কী আশ্চর্য ধৈর্য তার! কী দৃঢ় মনোবল তার!

মেহমানরা নিজেরাই সঙ্গে করে চা-কফি নিয়ে আসছেন। কারণ বাড়িতে তার কোনো কাজের লোক নেই।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, সমবেদনামূলক কিছু বলতে গেলে তিনিও সমবেদনামূলক শব্দ বলতে শুরু করবেন। অবস্থা দেখে আপনার মনে হবে, তিনি হয়তো সমবেদনা জানাতে আসা মেহমানদের একজন। শোকসন্তপ্ত ব্যক্তিটি মনে হয় অন্য কেউ।

তিনি বারবার বলেছেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'! যা দিয়েছিলেন, যা নিয়ে গেছেন কিছুই তো আমার ছিল না। সবই তো আল্লাহর দান! দেয়া ও নেয়া তো তাঁরই কাজ! প্রত্যেক বিষয়ের জন্যই তার আছে নির্দিষ্ট সময়-নির্ধারিত মুহূর্ত।

এটাই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। যদি তিনি এমন না করতেন, তাহলে দুশ্চিন্তা করতে করতে নিজেও শেষ হয়ে যেতেন।

আমার পরিচিত এক লোক, যখনই তাকে দেখি, সুখি বলে মনে হয়। সংক্ষেপে যদি তার অবস্থা বর্ণনা করি, তাহলে তা এমন হবে:

খুবই অল্প বেতনের চাকুরি ...

ছোট্ট একটি বাসা, তাও ভাড়ায় নেয়া...

একটি মাত্র গাড়ি, তাও পুরোনো ...

অনেকগুলো ছেলেমেয়ে ...

এরপরও সব সময় তার মুখে হাসি লেগেই থাকে। জীবনকে সে উপভোগ করছে।

আপনিও তার মতো জীবনকে উপভোগ করুন। দুশ্চিন্তায় ভুগে নিজেকে নিঃশেষ করবেন না। নিজের সমস্যার কথা মানুষের কাছে বলে বেড়াবেন না। তাহলে তারা আপনার ওপর চেপে বসবে।

মনে করুন, কারো একটি প্রতিবন্ধী ছেলে আছে। আপনার সঙ্গে দেখা হলেই সে বলতে থাকে 'আমার ছেলেটা অসুস্থ। ওর জন্য আমার খুব কষ্ট

হয়। ছেলেটা আমার বড় অসহায়। ...' এমন কথা শুনতে আপনার কতো দিন আর ভালো লাগবে?

মনে করুন, কারো স্ত্রী সারাক্ষণ তার সঙ্গে বলতে থাকে, 'আমাদের বাড়িটা পুরোনো হয়ে গেছে! গাড়িটা তো আর চলার মতো নয়! এই সব কাপড় কি এখন আর পরা যায়?'

বলুন তো, কী লাভ এ ধরনের অভিযোগ করে? শুধু কষ্ট বাড়ানো ছাড়া আর কী হয় এর দ্বারা? কবি কত চমৎকার বলেছেন-

আক্ষেপ করে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে জীবনটা শেষ করলে!

হাত পা গুটিয়ে বসে থেকে বলছো, 'আমার সময়টা ভালো যাচ্ছে না!'

তুমি নিজে যদি অগ্রসর না হও তাহলে কে তোমার দায়িত্ব নেবে?

আলোকিত চিন্তা ...

নিজের কাছে যা আছে
তাই নিয়ে সুখি হতে চেষ্টা করুন।
আপনি সুখি হবেন।



৪৮.নিয়তির ওপর সন্তুষ্ট থাকুন

একবার কয়েকটি আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করতে এক শহরে গেলাম। একটি বড় মানসিক হাসপাতাল থাকায় শহরটি খুব প্রসিদ্ধ ছিল। মানুষ এটাকে বলত 'পাগলের হাসপাতাল।' সে শহরে গিয়ে আমি সকাল থেকে পর-পর দুটি বক্তৃতা দিয়ে বের হলাম। জোহরের আযানের তখনও এক ঘণ্টা বাকি।

আমার সাথে আবদুল আজীজ নামের এক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি ছিলেন ওই শহরের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ দাঈদের একজন। আমরা একই গাড়িতে ছিলাম। আমি তাকে বললাম, 'আবদুল আজীজ, এ শহরে একটি জায়গা আছে যদি সময় থাকে তাহলে ওখানে যাবো।'

আবদুল আজীজ বললো, 'কোথায়? আপনার বন্ধু শায়খ আব্দুল্লাহর ওখানে? নাকি ডা. আহমদের কাছে? আমি তাকে ফোন করেছিলাম, কিন্তু তিনি রিসিভ করেন নি। নাকি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী গ্রন্থাগারটি দেখতে যেতে চাচ্ছেন?'

আমি বললাম, কোনোটাই না। আমি আসলে বলছিলাম মানসিক হাসপাতালটির কথা।

আশ্চর্য হয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, পাগলগুলোকে দেখবেন!!

'হ্যাঁ, পাগলগুলোকেই দেখব।' আমি জবাব দিলাম।

ও হেসে মজা করে বললো, কেন? আপনি কি আপনার নিজের মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে নিশ্চিত হতে চান?

বললাম, না, তবে অনেক উপকার হবে। আমরা অনেক কিছু শিখতে পারব। আমাদের উপর আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতগুলো বুঝতে পারব।

আমার কথা শুনে আবদুল আজীজ ওদের অবস্থা চিন্তা করতে করতে কিছুটা মনমরা হয়ে গেলো। সে আসলে বেশ কোমল মনের অধিকারী ও আবেগ প্রবণ মানুষ। সে আমাকে তার গাড়ি দিয়েই ওখানে নিয়ে গেল। আমরা গুহার মতো একটা বিল্ডিং-এর কাছে গিয়ে থামলাম। চতুর্পার্শ্বে

গাছ-গাছালি বেষ্টিত জায়গাটি দেখলেই কেমন যেন রাজ্যের বিষণ্নতা এসে জড়ো হয়।

একজন চিকিৎসকের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাদেরকে স্বাগত জানালেন। আমাদের আগমণের উদ্দেশ্য জেনে তিনি ঘুরে ঘুরে গাইডের মতো আমাদেরকে হাসপাতালটি দেখাতে লাগলেন। আমাদেরকে ওদের বিভিন্ন রকমের অবস্থার কথাও বললেন। তিনি আরো বললেন, 'প্রত্যক্ষণ আর শ্রবণ কখনো এক হয় না।'

তিনি আমাদেরকে নিয়ে একটি লম্বা করিডোর পার হলেন। করিডোরটির দুই পাশে রোগিদের ওয়ার্ড ছিল। সেখান থেকে বিভিন্ন রকম আওয়াজ আসছিল। আমরা ডানদিকের একটি রুম পার হয়ে ভেতরে গেলাম। সেখানে দশটির বেশি বেড খালি পড়ে ছিল। শুধু একটিতে একজন লোক শুয়ে হাত-পা ছোড়াছুড়ি করছে।

আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে কী হচ্ছে? তিনি বললেন, সে একজন পাগল। তার মৃগী রোগও আছে। পাঁচ/ছয় ঘণ্টা পরপর তার মৃগীরোগ দেখা দেয়। আমি 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পড়লাম। মনে মনে ভাবলাম, প্রকৃত শক্তি ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই।

এরপর জিজ্ঞেস করলাম, কতদিন যাবৎ তার এই অবস্থা?

বললেন, 'দশ বছরের বেশি।'

এ কথা শুনে বড় একটি আঘাত পেলাম। আমার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। কোনোমতে তা সংবরণ করে নিরবে সামনে এগোলাম। কয়েক পা এগুতেই আরেকটি কামরার সামনে এসে পৌঁছলাম। দরজাটি তালাবদ্ধ। তাতে কিছুটা জায়গা ফাঁকা রয়েছে। এখান দিয়ে ভেতর থেকে একজন লোক ইশারায় আমাদেরকে কি কি যেন বোঝাচ্ছিল। কিন্তু আমরা কিছুই বুঝলাম না। উঁকি দিয়ে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করলাম। দেখলাম, কামরাটির দেয়াল ও মেঝে সব বাদামি রঙের। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে কী?

তিনি বললেন, পাগল!!

লক্ষ করলাম ডাক্তার সাহেব আমার প্রশ্নটিকে তেমন গুরুত্ব দিলেন না। তাই বললাম, আমি জানি সে পাগল। ভালো হলে তো আর এখানে তাকে দেখা যেত না। তার সমস্যাটা কী? তিনি বললেন, দেয়াল দেখলেই এই লোকটির মাথায় রক্ত উঠে যায়। হাত-পা অস্থির হয়ে ওঠে এবং দেয়ালে কিল-ঘুষি বা চড় মারতে থাকে। কখনও বা লাথি মারে আবার কখনও মাথা ঠুকতে থাকে। এভাবে একদিন হাতের আঙ্গুলগুলো ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়, আরেকদিন পা কেটে যায়। কোনোদিন তো মাথা ফেটে যায়। আরেকদিন... এতটুকু বলেই ডাক্তার সাহেব কষ্টে মাথা নিচু করে ফেললেন। এরপর বললেন, তার কোনো চিকিৎসাই আমরা করতে পারছি না। তাই এই ঘরে আটকে রেখেছি। দেখতেই তো পাচ্ছেন। এ কামরার দেয়াল ও মেঝেতে ফোম লাগানো আছে। যখন যেভাবে খুশি আঘাত করুক। কিচ্ছু হবে না।

ডাক্তার সাহেব নিরবে সামনের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখনও আমি ও আমার বন্ধু দাঁড়িয়ে রইলাম। মৃদু আওয়াজে শুধু বললাম,

"সব প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে এদের মতো পরীক্ষায় ফেলেন নি।"

তারপর আবার করিডোর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। যেতে যেতে একটি কামরার সামনে গিয়ে থামলাম। এখানে কোনো বিছানা পাতা নেই। ত্রিশ জনের বেশি মানুষ হবে। এখানে একেক জনের একেক অবস্থা। কেউ আযান দিচ্ছে কেউ গান গাইছে। কেউ শুধু ঘুরছে। কেউ নাচছে। এদের মধ্যে তিনজনকে চেয়ারে বসিয়ে হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে। এরা এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে আর বন্ধনমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। আশ্চর্য হয়ে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম, এই লোকগুলোর কী সমস্যা? সবাইকে না বেঁধে ওদেরকে বেঁধে রাখা হয়েছে কেন?

ডাক্তার সাহেব বললেন, এরা সামনে কোনো কিছু পেলেই তার উপর চড়াও হয়ে বসে। দরজা-জানালা সব ভেঙ্গে ফেলে। এয়ার কন্ডিশনার, লাইট, ফ্যান ইত্যাদি কোনো কিছুই তাদের সামনে নিরাপদ নয়। এজন্যই আমরা এদেরকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এভাবেই বেঁধে রাখি।

একবুক ব্যথা নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তারা এই অবস্থায় কতদিন যাবৎ অতিবাহিত করছে? বললেন, এ এসেছে দশ বছর হলো। আর এর সাত বছর। আর এই লোক নতুন এসেছে, মাত্র পাঁচ বছর হয়েছে।

এ কক্ষ থেকে বেরিয়ে ওদের কথা চিন্তা করে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছিলাম। আল্লাহ আমাদেরকে এসব বিপদ থেকে মুক্ত রেখেছেন। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম, বের হওয়ার পথটা কোনো দিকে? ডাক্তার বললেন, এখনও একটি কক্ষ বাকি আছে। হয়তো ওখানেও আপনি শেখার মতো কিছু পাবেন। একথা বলে আমার হাত ধরে একটি বড় ঘরে নিয়ে গেলেন। এ ঘরের ভেতরেও ছিল এক দল রোগি। এককে জনের এককে রকম অবস্থা। কেউ নাচছে কেউ ঘুমুচ্ছে। একজন লোককে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় দেখে আমার চেহারার রং ফ্যাকাসে হয়ে গেল। রাগে লাল হয়ে গেলাম। ডাক্তারের দিকে ফিরে তাকালাম। ডাক্তার আমার চেহারায় রাগের চিহ্ন দেখে বললেন, এতো তাড়াতাড়ি রাগ করবেন না। আমি তার ব্যাপারটা আপনাকে খুলে বলছি। এই লোকটিকে যখনই আমরা কোনো কাপড় পরিয়েছি সে তা দাঁতে কামড়ে ছিড়ে ফেলেছে। আমরা একদিনে তাকে দশটি কাপড়ও পরিয়েছিলাম, সে সবগুলোর একই অবস্থা করেছে। এই লোক তার শরীরে কাপড়ের একটি ছিটেফোঁটাও রাখতে চায় না। তাই আমরা ওকে শীত-গ্রীষ্মে এভাবেই ফেলে রাখি। এর আশেপাশের সবাই যেহেতু মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত তাই তারা এর অবস্থা ওভাবে অনুভব করে না। আমি এ কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলাম। এখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না। ডাক্তারকে বললাম, চলুন তাড়াতাড়ি বের হই। তিনি বললেন, আরো অনেক কিছু তো রয়ে গেল ।

আমি বললাম, যা দেখলাম উপদেশ গ্রহণের জন্য তা-ই যথেষ্ট। ডাক্তার হাঁটতে লাগলেন। আমরাও সাথে সাথে চললাম। তিনি একের পর এক কক্ষ পার হতে লাগলেন। আমরাও নিরবে তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। হঠাৎ ডাক্তার ঘুরে দাঁড়ালেন। ভাবখানা এমন যেন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভুলে গিয়েছেন। এরপর তিনি বললেন, জনাব, এখানে একজন বড় শিল্পপতি আছেন । তিনি ছিলেন কোটিপতি । দুই বছর আগে হঠাৎ

মাথায় সমস্যা হওয়ায় তার ছেলেরা এখানে এনে রেখে গেছে । আর একজন ছিলেন বড় ইঞ্জিনিয়ার। আরেকজন... । এভাবে ডাক্তার সাহেব একেকজনের কথা বলতে লাগলেন, যারা সমাজে অনেক সম্মানিত ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন । ধনী ছিলেন কিন্তু এখন সব শেষ। রোগিদের কক্ষ দু'পাশে রেখে হেঁটে যাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম আল্লাহর কী লীলাখেলা! রিজিক বণ্টন করেছেন। কাউকে দিয়েছেন কাউকে বঞ্চিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা কোনো লোককে মাল-সম্পদ, বংশগত মর্যাদা ও পদমর্যাদা সব দেয়ার পরও কখনো কখনো বিবেক-বুদ্ধি ও হুশ-জ্ঞান ছিনিয়ে নেন। তাইতো প্রচুর সম্পদের অধিকারী ও অনেক শক্তিশালী লোককেও আপনি পাগলা গারদে বন্দী দেখতে পাবেন। আবার অনেকে আছে অনেক উচ্চ বংশীয়, সম্পদশালী ও জ্ঞান-গরীমাসম্পন্ন। কিন্তু মানসিকভাবে অসুস্থ। ফলে বিশ-ত্রিশ বছর তাকে বিছানায় শুয়ে-বসে পার করতে হচ্ছে। তার বিত্ত-বৈভব ও সহায়-সম্পদ কোনোই কাজে আসছে না।

আবার অনেকেই এমন আছেন যারা সুস্থ-সবল। জ্ঞান বুদ্ধিও আছে যথেষ্ট পরিমাণে। তবে ধন-দৌলত নেই । তাই তারা হয়তো হাঁটে-বাজারে নিম্নমানের কাজ করছে অথবা ভিক্ষা করে জীবনযাপন করছে। তাদের ভাগ্যে দু'বেলা দু'মুঠো খাবারও হয়তো জুটছে না। কাউকে আল্লাহ দিচ্ছেন, আবার কারও কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছেন।

'আপনার প্রভু যা চান তা সৃষ্টি করেন এবং যাকে চান তাকে বেছে নেন। এতে কারো কোনো এখতিয়ার নেই। তাঁর সাথে যারা যা কিছু শরিক করে তিনি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র ।'

তার ইচ্ছা ও ক্ষমতায় সকল কিছুর সৃষ্টি। মানুষের ইচ্ছায় কী হয়? কিছুই হয় না। সুতরাং আল্লাহর দেয়া পরীক্ষার বস্তুগুলোকে হিসেব করার আগে প্রত্যেক পরীক্ষাগ্রস্ত ব্যক্তিরই উচিত আল্লাহর দেয়া নিয়ামতসমূহ নিয়ে ভেবে দেখা। আপনাকে মাল দেয়া হয় নি, তো কী হয়েছে? সুস্থতা তো দেয়া হয়েছে। এর কোনোটিই পান নি আপনি, আপনার তো জ্ঞান আছে। এগুলোর কোনোটিই আপনার ভাগ্যে জুটে নি, আপনাকে কমপক্ষে ইসলাম

তো দেয়া হয়েছে। অভিনন্দন আপনাকে! এটা নিয়েই বেঁচে থাকুন এবং এর উপরই মৃত্যু বরণ করুন। তাই এক্ষুনি অন্তরের অন্তস্থল থেকে উচ্চস্বরে বলুন "আলহামদুলিল্লাহ।"

এমনই ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'যাতুস-সালাসিলের' যুদ্ধে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে শাম অভিমুখে পাঠালেন। তিনি সেখানে গিয়ে দেখলেন, শত্রুপক্ষের লোকবল অনেক বেশি। তাই তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অতিরিক্ত সাহায্যের জন্য খবর পাঠালেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দলপতি বানিয়ে একটি বাহিনী পাঠালেন। তাতে প্রথম শ্রেণির অনেক মুহাজির এবং আবূ বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। তাদেরকে বিদায় জানানোর সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওবায়দা ইনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, আমর বিন আসের সাথে কোনো বিষয়ে দ্বিমত করবে না। আবূ ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু রওনা হলেন। আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে যাওয়ার পর আমর তাকে বললেন, তুমি আমার জন্য সাহায্য হিসেবে এসেছে। আমি হচ্ছি পুরো কাফেলার আমীর। আবূ ওবায়দা বললেন, না; বরং আমি আমার মতো থাকবো আর আপনি আপনার মতো থাকবেন। আমি আমার সাথে আসা সাথিদের আমীর আর আপনি আপনার সাথে থাকা সাথিদের আমীর। আবূ ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন সহজ সরল লোক ছিলেন, দুনিয়ার কোনো মূল্যই তার কাছে ছিল না।

আমর বললেন, না; (আমিই আমীর) তুমি আমার সাহায্যকারী। আবূ ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আমর! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, "তোমরা দু'জন কোনো বিষয়ে দ্বিমত করবে না।" সুতরাং আপনি আমার বিরোধিতা করলেও আমি আপনার অনুসরণ করব। আমর বললেন, আমি তোমারও আমীর। আর তুমি শুধুই সাহায্যকারী। আবূ ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু মেনে নিলেন। আমর সামনে অগ্রসর হয়ে ইমাম হয়ে সবাইকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। যুদ্ধের পর আওফ ইবনে মালিক সর্বপ্রথম মদিনায় আসলেন। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে বললেন, "যুদ্ধের খবর যা জানো শোনাও।" তিনি যুদ্ধের সব

ঘটনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে শোনালেন । আমর ইবনুল আস ও আবূ ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাঝে ঘটে যাওয়া ঘটনাটিও শোনাতে ভুললেন না। সব শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ তাআলা আবূ ওবায়দা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর রহম করুন।' আল্লাহ তাআলা আবূ ওবায়দা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি রহম করুন।

একটু চিন্তা করুন:

জীবনের অন্ধকার সময়গুলো চিন্তায় আসার আগেই আলোকজ্জ্বল সময়গুলো নিয়ে ভাবুন। সুখী হতে পারবেন।



৪৯.পাহাড়ের মতো দৃঢ় হোন

আমার দাওয়াতি জীবনের শুরুর দিকে এক গ্রামের একটি সভায় আমাকে আমন্ত্রণ করা হলো। সেখানকার একজন লোক আমাকে নেয়ার জন্য আসলেন। আমি তার গাড়িতে উঠলাম। পুরোনো জীর্ণশীর্ণ গাড়ি। তার সাথে কথাবার্তা বললাম। কথার ফাঁকে বললেন, তিনি নতুন বিবাহিত। তারপর এ এলাকার মেয়েদের বিবাহে মাত্রাতিরিক্ত মোহর ধার্য্য করা হয় বলে অভিযোগ করলেন। এর ফলে তিনি একটা নতুন গাড়ি বা অন্ততপক্ষে এর চেয়ে ভালো একটি গাড়িও কিনতে পারেন নি। আমি তার জন্য দোয়া করলাম, আল্লাহ যেন তাকে এরচেয়ে ভালো একটি গাড়ি কেনার তাওফিক দান করেন । এরপর মসজিদে গিয়ে বয়ান করলাম। বয়ানের শেষ দিকে শ্রোতাদের প্রশ্ন পড়ে পড়ে আমাকে শোনানো হলো। এসব প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন অতিরিক্ত মোহর ধার্য্যকরণের বিষয়েও ছিল। প্রশ্নটি পেয়ে আমি অত্যন্ত খুশি হয়ে ওই লোককে বললাম, আপনার বিষয়টি তো চলে এসেছে। এরপর আমি অতিরিক্ত মোহর নির্ধারণ ও তরুণ-তরুণীদের ওপর এর বিরূপ প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলাম। এরপর বললাম, রাসূল ﷺ তাঁর মেয়েদেরকে ৫০০ দিরহামের বেশি মোহরে বিবাহ দেন নি। এরপর খুব আবেগের সাথে বললাম, এর মানে হচ্ছে, তোমাদের মেয়েরা হুজুর ﷺ-এর মেয়েদের চেয়েও বেশি দামী! এক পাশ থেকে এক বৃদ্ধলোক চিৎকার করে বলে ওঠল, আপনি আমাদের মেয়েদের বিরুদ্ধে কথা বলছেন কেন?

আরেকজন দাঁড়িয়ে বললো, হ্যা! তিনি আমাদের মেয়েদের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। আরেকজন দাঁড়িয়ে হাত উঁচিয়ে বলতে লাগল উফ্ফ্ফ!!! আমাদের মেয়েদেরকে নিয়ে কথা বলছে!!! আমি এক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সম্মুখিন হলাম। দাওয়াতি জীবনের শুরু মাত্র। এই তো কিছুদিন আগে গ্র্যাজুয়েট করে বেরিয়েছি। কী করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। চুপচাপ বসে রইলাম। মুখে 'টু' শব্দটিও করলাম না। তবে প্রথমজন যখন দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন তখন তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসেছিলাম। এমনিভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় জনের দিকেও। মসজিদের পেছন দিকে কিছু যুবক হাসছিল আর কতেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছিল।

Contents

আমার অবস্থা তখন ফাঁদে আটকে পড়া পাখির মতো। তারা আমাকে যখন এভাবে নির্বাক বসে থাকতে দেখলো তখন তারাও আস্তে আস্তে শান্ত হতে লাগল। এক পর্যায়ে একজন লোক দাঁড়িয়ে সবাইকে বসিয়ে দিয়ে বললো, হুজুরকে বিষয়টি স্পষ্ট করে বলার সুযোগ দিন। ফলে সবাই চুপ হয়ে গেল। আমি লোকটির শুকরিয়া আদায় করলাম। এরপর আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বললাম।

আপনি যখন কারো সাথে কোনো আচরণ করছেন, সত্যিকার অর্থে তখন আপনি কিন্তু আপনার ব্যক্তিত্ব গড়ছেন। আপনার ব্যাপারে তাদেরকে ধারণা দিচ্ছেন। এর ওপর ভিত্তি করেই তারা আপনার সাথে ব্যবহার করবে, আপনাকে সম্মান করবে। মনে রাখবেন- বাতাস যত জোরে প্রবাহিত হোক না কেন, দৃঢ়মূল বৃক্ষ কখনও বাতাসে ভেঙ্গে পড়ে না। সামান্য একটু ধৈর্য্য বিশাল সফলতা বয়ে আনতে পারে। আপনার জ্ঞান যত বাড়বে, আপনার রাগ তত কমবে। আপনি হবেন সমুদ্র যাকে কোনো কিছুই নাড়াতে পারবে না। অথবা পাহাড়! বাতাসও যাকে হেলাতে পারে না। আপনিতো এমন হবেন, কোনো ব্যক্তি যদি আপনাকে রাগিয়ে তোলে -কোনো বৈঠকে হোক, বা কোনো বাড়িতে, কোনো টিভি চ্যানেলে, অথবা বিশেষ কোনো সভা সমিতিতে- তাহলে আপনি কখনও রেগে যাবেন না। আপনি যদি শান্তভাবে চুপচাপ থাকেন- রাগ না করেন কিংবা গলা উঁচু না করেন তাহলে লোকজন কিন্তু আপনার প্রতিই ঝুঁকবে আর আপনার প্রতিপক্ষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।

আবূ সুফিয়ান বিন হারব ব্যবসায়ী কাফেলা নিয়ে শাম থেকে মক্কায় ফিরছিল। মুসলমানরা তাদের ওপর হামলা করার উদ্দেশ্যে বের হলেন। আবূ সুফিয়ান কাফেলা নিয়ে পালিয়ে বাঁচলো। কুরাইশ গোত্র এ সংবাদ পেয়ে অস্ত্রসজ্জিত বিরাট এক বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বদর প্রান্তরে মুসলমান ও কুরাইশদের মাঝে যুদ্ধ হলো। মুসলমানগণ জয় লাভ করলেন। কুরাইশ কাফেরদের ৭০ জন মারা পড়ল আর ৭০ জন বন্দী হলো। যারা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল তারা ক্ষত-বিক্ষত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় কোনো রকমে পালিয়ে ফিরে গেল। এদিকে আবূ সুফিয়ানও তার কাফেলা নিয়ে মক্কায় পৌঁছলো।

যুদ্ধবিদ্ধস্ত ও পরাজিত কুরাইশ বাহিনী তখন ক্ষত-বিক্ষত। মক্কাবাসীদের অবস্থা তখন খুব করুণ। আব্দুল্লাহ ইবনে আবী রাবিয়া, ইকরামা বিন আবূ জাহেল এবং সফওয়ান বিন উমাইয়াসহ কুরাইশের যারা বদর প্রান্তরে আত্মীয়-স্বজন হারিয়েছে তারা সবাই আবূ সুফিয়ানের কাছে গেল। এরপর তারা আবূ সুফিয়ানসহ সেই ব্যবসায়ী কাফেলায় যাদের পণ্য-দ্রব্য ছিল তাদের সকলের সাথে কথা বললো। তারা বললো, হে কুরাইশ সম্প্রদায়, মোহাম্মদ আমাদের সর্বনাশ করেছে আর তোমাদের প্রিয় নেতাদেরকে হত্যা করেছে। তাই যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য তোমরা এ কাফেলার সব মাল দিয়ে দাও। আমরা প্রতিশোধ নিবো। তারপর তারা যা করেছিল তার বর্ণনা আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে এভাবে দিয়েছেন-

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ.

অর্থ : "নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে তারা আল্লাহর পথে বাঁধা দানের জন্য নিজেদের ধন দৌলত খরচ করেছে। এটা তাদের জন্য দুঃখের কারণ হবে। তারপর তারা পরাজিত হবে। আর যারা কুফরি করেছে তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে।' (আনফাল : আয়াত-৩৬)

এরপর তারা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য পূর্ণ উদ্যমে প্রস্তুতি নিতে লাগলো। এদের সাথে মিত্র দুই গোত্র বনি কেনানা এবং বনি তেহামাও যোগ দিল। তারা সবাই স্ত্রীদের সাথে নিয়ে নিলো, যাতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পুরুষদের পালানোর কোনো পথ না থাকে। আবূ সুফিয়ান তার স্ত্রী হিন্দা বিনতে ওতবাকে সাথে নিলো। ইকরামা বিন আবূ জাহেল তার স্ত্রী উম্মে হাকিম বিনতে হারেসকে নিয়ে বের হলো। হারেস ইবনে হিশাম তার স্ত্রী ফাতেমা বিনতে ওলিদ বিন মুগিরাকে সাথে নিলো।

কুরাইশরা রওয়ানা হলো। তারা মদিনার নিকটস্থ একটি উপত্যকার পাশে তাবু গাড়ল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের খবর শুনে সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করলেন। তিনি প্রস্তাব দিয়ে বললেন, 'আমার ভাবনা হলো, আমরা

মদিনাতেই অবস্থান করবো। তারা মদিনায় প্রবেশ করলে তাদেরকে আক্রমণ করব। তোমরা কী বলো?' তখন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি বা করতে পারে নি এমন কিছু সাহাবি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের খেয়াল হলো, আমরা মদিনার বাইরে গিয়ে উহুদ প্রান্তরে তাদের মোকাবিলা করব। বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীরা যে মর্যাদা লাভ করেছিল তারাও সে মর্যাদা লাভের আশা করছিল। এ জন্য তারা এর ওপর জোর দিচ্ছিল। তাদের পীড়াপীড়িতে অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে গিয়ে শিরোস্ত্রান পরে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে বের হলেন। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ অবস্থায় দেখে লজ্জিত হলো। তারা বুঝতে পারল তাদের পীড়াপীড়ির কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার বাইরে বের হয়ে যুদ্ধ করতে এক রকম বাধ্য হয়েছেন। তাই তারা বললো, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি চাইলে মদিনায় অবস্থানের ফয়সালাও দিতে পারেন। আমরা তা মেনে নিতে প্রস্তুত। আপনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে শিরোস্ত্রান পরার পর আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী ও শত্রুদের মাঝে কোনো ফয়সালা করার আগে তা খুলে ফেলা কোনো নবীর পক্ষে সমীচীন নয়।'

আবূ সুফিয়ানসহ মুশরিকরা উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে এলে বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত সাহাবিগণ শত্রুর মুখোমুখি হবেন ভেবে খুশি হলেন। তারা বললেন, আল্লাহ আমাদের আশা পূর্ণ করেছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সাহাবিদেরকে বললেন, এমন সংক্ষিপ্ত কোনো রাস্তা দিয়ে আমাদেরকে কে উহুদ প্রান্তরে নিয়ে যেতে পারবে? যেখান দিয়ে গেলে শত্রুরা আমাদের ব্যাপারে টের পাবে না। তখন বনু হারেসা ইবনুল হারেস গোত্রের আবূ খায়সামা নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আমি পারব ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন তারা বনু হারেসার বিভিন্ন বাগান ও ক্ষেতের মধ্য দিয়ে যাত্রা করলেন।

মারবা বিন কায়জী নামক একজন অন্ধ মুনাফিক ছিল। মুসলিম বাহিনী যখন তার বাগান অতিক্রম করছিলেন তখন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথিদের আগমন আঁচ করতে পেরেই তাদের দিকে ঢিল ছুঁড়তে লাগলো। এরপর সে বললো, আপনি যদি আল্লাহর রাসূল হন তাহলে আপনার জন্য কোনোভাবেই আমার বাগানে প্রবেশের অনুমতি নেই। তারপর সেই

নরাধম বড় একটি মাটির ঢিল হাতে নিয়ে বললো, আমি যদি নিশ্চিতভাবে জানতাম, এই মাটির ঢেলা মুহাম্মদকে লাগাতে পারবো, তাহলে অবশ্যই এটা তার মুখে মারতাম।

সাহাবিরা এটা শুনে তাকে শায়েস্তা করার জন্য তার ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন। রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা তাকে মারধর করো না। তার চোখ যেমন অন্ধ হৃদয়ও তেমনি অন্ধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ হেঁটে চলে গেলেন। সেই মুনাফিকের দিকে ফিরেও তাকালেন না। কারণ তিনি ﷺ ছিলেন গাম্ভীর্যপূর্ণ, অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান। নির্বোধদের কথায় তিনি কিভাবে কান দেবেন। তুচ্ছ জিনিসের কারণে তিনি কখনো রাগান্বিত হতেন না।

যদি ঘেউ ঘেউকারী সব কুকুরকেই পাথর ছুঁড়ে মারতে যান- তাহলে একসময় এক তোলা পাথরও একটি স্বর্ণের বার দিয়ে কিনতে হবে। কুকুর তো ঘেউ ঘেউ করবেই। কাফেলাকেও তার পথে তো চলতে হবে ।

পুনশ্চ

বাতাস কখনো পাহাড়কে নাড়াতে পারে না। বাতাস তো বালি নিয়ে খেলা করে। বালিকে যেখানে খুশি সেখানে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। পাহাড়কে কিছুই করতে পারে না।



৫০. গালমন্দ করে কী লাভ?

আমরা অনেকে এমন মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকি যাদের কেউ কেউ কোনো অন্যায় করে বসে কিন্তু তার মধ্যে সামান্য হলেও ভালো কোনো গুণ থাকে। তাই আমরা যদি তার ভালোর দিকটা তুলে ধরি তা হবে উত্তম। কথিত আছে, এক ডাকাতদল মানুষের বাসায় চুরি করত আর এই লুণ্ঠিত অর্থের কিছু গরিব-দুঃখী ও এতিমদের কল্যাণে ব্যয় করত!! আর কিছু অংশ দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করত!!

এমন অনেক মহিলার কথাও শুনে থাকবেন, যারা শুধু পেটের দায়ে পতিতাবৃত্তি করছে। অনেক অস্ত্রধারীও এমন রয়েছে যারা মানুষকে খুন করতে উদ্যত। কিন্তু ছোট একটি শিশু বা এক নারীর ভালোবাসায় তার হৃদয় বিগলিত হচ্ছে সে ছুড়ি ফেলে দিচ্ছে। প্রত্যেক মানুষের বক্ষপিঞ্জরে একটি হৃদয় আছে। অনেক সময় তা গলে যায়। তার থেকে মায়া, মমতা আর ভালোবাসা ঝরে পড়ে।

বস্তুত প্রত্যেক মানুষের মাঝে ভালো গুণও আছে। সেই ভালো গুণের ভিত্তিতেই তার সাথে আচরণ করুন। প্রথমেই কারও প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করবেন না।

আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর অপরাধীদের ওজর আপত্তি তালাশ করতেন। আর অন্যায়কারীদের প্রতিও ভালো ধারনা রাখতেন। কোনো অপরাধীর মুখোমুখি হয়েও তার অন্যায় ও ভুলের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে প্রথমে তার ঈমানি অবস্থা লক্ষ্য করতেন। কারো প্রতি খারাপ ধারনা পোষণ করতেন না। সবার সাথে এমন আচরণ করতেন যেন এরা তাঁর ছেলে বা ভাই। নিজের জন্য যেমন ভালোটা পছন্দ করতেন সবার জন্যই তেমন পছন্দ করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এক ব্যক্তি শয়তানের ধোঁকায় মদ পান করত। একবার মদ পান করা অবস্থায় তাকে রাসূল ﷺ-এর কাছে আনা হলো। তখন রাসূল ﷺ-এর নির্দেশে তাকে শাস্তি দেয়া হলো। কিছুদিন পর আবার মদ খেল। আবার আনা হলো, আবার শাস্তি দেয়া হলো। কিছুদিন যাওয়ার পর লোকটি আবার মদ খেল। আবার আনা হলো ও শাস্তি দেয়া হলো । কিছুদিন যাওয়ার পর লোকটি আবার মদ খেল। আবার আনা হলো ও শাস্তি দেয়া হলো। এবার যখন লোকটি বের

হয়ে যাচ্ছিল তখন এক সাহাবি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে ওঠলেন , তার উপর আল্লাহর অভিশাপ হোক। একই কাজ সে আর কতবার করবে!

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে ফিরে তাকালেন (রাগে তার চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেছে) বললেন, "তাকে অভিশাপ দিয়ো না। আমি জানি সে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালোবাসে"। (বোখারী ও মুসলিম)

মানুষের সাথে আচার ব্যবহার করুন ন্যায়পরায়ণতার সাথে। তাদের ভালো অভ্যাসগুলো স্মরণ করুন। কারো দোষচর্চা করতে গিয়ে তার গুণগুলো ভুলে যাবেন না। তাদেরকে বুঝিয়ে দিন যে, আপনি তাদের ভালো গুণগুলোর বিষয়ে সচেতন আছেন। তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে না।

মনে রাখুন...

মানুষের ভেতরের মন্দ অভ্যাস সম্পর্কে বলার আগে
তার ভালো গুণটিকে স্মরণ করুন।



৫১. যা হচ্ছে তা মেনে নিন

যদি কোনো কিছুতে আপনাকে বাধ্য করা হয় বা প্রতিকূল কোনো অবস্থায় পতিত হন, তাহলে যতক্ষণ তাতে আটকে রয়েছেন সেটাকে উপভোগ করতে থাকুন। এমনটিই বলেছিলাম একজন যুবককে। ওর ডায়াবেটিস হয়েছিল। সে চিনি ছাড়া চা খায় আর আফসোস করতে থাকে। আমি তাকে বললাম, চা খাওয়ার সময় আফসোস করতে থাকলে চা কি মিষ্টি হয়ে যায়? সে বললো, না। বললাম, যতক্ষণ এ অবস্থাতে আছো, এটাকেই উপভোগ করতে থাক। অর্থাৎ পৃথিবীতে সব সময় আমাদের ভালো লাগার জিনিগুলোই ঘটবে না। আর এই যে, চাওয়া পাওয়ার মাঝে বিস্তার ব্যবধান এমনটি আমাদের জীবনে অনেক ঘটে থাকে। যেমন আপনার গাড়িটা পুরনো হয়ে গেছে। এসি কাজ করে না। সিট কভারগুলো ফেটে গেছে। এই মুহূর্তে এগুলো ঠিক করার সামর্থ্য আপনার নেই। তো এখন আপনি কী করবেন? যতক্ষণ এই অবস্থার মধ্যে আছেন, এ অবস্থাটিই উপভোগ করতে থাকুন।

মনে করুন, আপনি একটি প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিলেন। উত্তীর্ণ হলেন কিন্তু সুযোগ পেলেন এমন একটি বিষয় নিয়ে পড়ার যাতে আপনার আগ্রহ নেই। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়েই সেখানে রইলেন। মনকে কোনোভাবে মানাতে পারছেন না। কি করবেন এখন আপনি? যেহেতু আপনাকে থাকতেই হচ্ছে, সময়টিকে উপভোগ্য করে তুলুন।

এক জায়গায় চাকুরির দরখাস্ত দিলেন, কিন্তু চাকরি হলো না। হলো অন্য খানে। চাকুরি শুরু করলেন সেখানেই (মনের বিরুদ্ধে) এবং সেখানেই আপনাকে থাকতে হচ্ছে। কী সমাধান এর? এ চাকরিটাকেই উপভোগ করতে থাকুন।

কোনো মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন; রাজী হলো না। তার বিবাহ হলো অন্য জনের সাথে। মনটা আপনার খুব খারাপ। কী করবেন? কোনোভাবে এ সময়টিকেই ইনজয় করার চেষ্টা করুন। বহু মানুষ এমন আছে যাদের ধারনা, এ অবস্থাসমূহের সমাধান হচ্ছে দীর্ঘ সময় ধরে বিলাপ ও আফসোস করতে থাকা। তারা চেনা-অচেনা যার তার

কাছে অভিযোগ করে বেড়ায়! আর এমন করলেই তো আর যা হারিয়ে গেছে তাও ফেরত আসবে না আর যা তার কপালে লেখা নেই তাও তার হাতে এসে পড়বে না। তাহলে বলুন তো, প্রকৃত সমাধানটা কী? আপনি যা চাচ্ছেন তার কোনোটাই হচ্ছে না। তাহলে যা ঘটছে সেটাকেই মেনে নিন।

জ্ঞানী তো সেই, যে ভালো অবস্থা ফিরে আসা পর্যন্ত যেকোনো অবস্থার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। তা যেমনই হোক না কেন। আমার এক বন্ধু একবার একটি মসজিদ নির্মাণের কাজে হাত দিলো। নির্মাণ খরচে ঘাটতি হওয়ায় কাজটি শেষ করার জন্য কিছু সাহায্যের আশায় শহরের একজন ব্যবসায়ীর কাছে গেল। তিনি তাদেরকে দরজা খুলে বসতে দিলেন। নিজেও তাদের সাথে বসে কিছুক্ষণ কথা বললেন। সাধ্য অনুযায়ী সাহায্যও করলেন। এরপর পকেট থেকে একটি ওষুধ বের করে খেতে লাগলেন। আগন্তুকদের একজন বললেন- জনাব শরীর কি খারাপ? বললেন, না এগুলো ঘুমের ঔষুধ। দশ বছর যাবৎ এটা না খেলে আমার ঘুম আসে না। লোকজন তার জন্য দোয়া করে চলে আসলেন। ফেরার পথে দেখলেন, শহরের প্রধান প্রবেশপথে রাস্তার কাজ চলছিল। প্রকল্পটিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য একটি বড় ভ্রাম্যমান জেনারেটর চলছিল। জেনারেটরের অসহ্য শব্দে পুরো এলাকাটা গমগম করছিল। এটা আশ্চর্যের ব্যাপার না। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো জেনারেটর মেশিনের ঠিক পাশেই একজন গরিব শ্রমিক কয়েকটি পেপারের টুকরো বিছিয়ে আরামে ঘুমাচ্ছিল।

হ্যাঁ, জীবনকে এভাবেই উপভোগ করুন। দুশ্চিন্তা করার মতো সময় নেই। হাতে সম্বল যেটুকু আছে সেটুকুই কাজে লাগাতে চেষ্টা করুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ একবার জিহাদে বের হলেন। পথে তাদের খাদ্য সংকট দেখা দিলো। তারা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যার কাছে যে টুকু খাবার অবশিষ্ট আছে সব একত্র করার আদেশ দিলেন। এরপর নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন। সবাই খাবার আনতে লাগল, কেউ একটি খেজুর, কেউ দু'টি কেউ একটি রুটির টুকরা,

সব এই চাদরের উপর জমা হলো। সবাই এখান থেকে খেল এবং মজা করে খেল। কারো হয়ত পেট ভরে তৃপ্তি সহকারে খাওয়া হলো না কিন্তু কোমর সোজা হয় পরিমাণ তো খাওয়া হলো। নিজের কাছে যা আছে তা নিয়েই সুখী হওয়া যায়।

চিরন্তণ বাণী

মানুষ যা চায়, তার পুরোটাই সে পায় না।
বাতাস সে দিকেই প্রবাহিত হয়, যা জাহাজের কাম্য নয়।



৫২.ভ্রাতৃত্ব বজায় রেখেও মতবিরোধ করা যায়

একবার একজন আলেমের সাথে শাফিঈ রহ. একটি মতভেদপূর্ণ ফিকহি মাসআলা নিয়ে বিতর্ক করছিলেন। দীর্ঘক্ষণ বিতর্ক চলল। দু'জনেই গলা উঁচিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন। কিন্তু কেউই অপরের যুক্তিতে সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। অপর আলেম লোকটির চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি রেগে গেলেন, মনে কষ্টও পেলেন। মজলিশ শেষে যখন উভয়েই উঠে চলে যাচ্ছিলেন, তখন ইমাম শাফিঈ রহ. গিয়ে লোকটির হাত ধরে বললেন, আমরা ভ্রাতৃত্ব বজায় রেখেও তো মতবিরোধ করতে পারি, তাই না?

একবার হাদিসবিশারদ কয়েকজন আলেম কোনো এক খলিফার দরবারে বসা ছিলেন। মজলিসের মধ্য থেকে একজন লোক একটি হাদিসের ব্যাপারে কথা বললো। একজন আলেমের কাছে হাদিসটি অপরিচিত মনে হলো। তিনি বললেন, এটা আবার কেমন হাদিস!! আপনি এটা কোথায় পেলেন? হুজুর ﷺ-এর নামে মিথ্যা কথা বলছেন কেন? লোকটি বললো, এটি একটি প্রমাণিত হাদিস। এর জবাবে অপরজন বললেন, না এটা হাদিস না। এ ধরনের হাদিস আমরা শুনি নি। মজলিসে একজন বিচক্ষণ উজির ছিলেন। তিনি অস্বীকারকারী আলেমের দিকে ফিরে শান্তভাবে বললেন, আপনি কি নবী করিম ﷺ-এর সব হাদিসই শুনেছেন? তিনি বললেন, না। উজির বললেন, তাহলে অর্ধেক? আলেম বললেন, হতে পারে। উজির মহোদয় বললেন, তাহলে মেনে নিন; আপনি যে অর্ধেক পরিমাণ হাদিস শুনেন নি, এ হাদিসটি সেগুলোর মধ্য থেকে একটি। সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

ফুযাইল ইবনে আয়াজ ও আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. উভয়ে সাথি ছিলেন। তারা কখনই একে অপর থেকে পৃথক হতেন না। তারা উভয়েই আমলদার ও দুনিয়াবিরাগী আলেম ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েন। এদিকে ফুযাইল বিন আয়াজ হেরেম শরীফে অবস্থান করে নামায ও ইবাদতে মগ্ন থাকেন।

একদিন ফুযাইল রহ. হারামে বসে ইবাদত করছিলেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.-কে তার খুব মনে পড়ল। চোখ বেয়ে অশ্রুও প্রবাহিত হলো।

তারা উভয়ে এক সাথে জিকির করতেন। তাই ফুযাইল রহ. ইবনুল মুবারক রহ.-এর কাছে চিঠি লিখলেন। তাকে হেরেম শরীফে চলে আসতে বললেন। তারা একসাথে ইবাদত করবেন ও জিকির করবেন। তিলাওয়াত করবেন। প্রাণভরে একসাথে আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন। ইবনুল মুবারক রহ. যখন পত্রটি পেলেন, একটি কাগজের টুকরা নিয়ে ফুযাইল রহ. কে লিখে পাঠালেন,

'হে হেরেম শরীফে বসে ইবাদতকারী আমার বন্ধু, যদি তুমি আমাদেরকে দেখতে তাহলে অবশ্যই তোমার মধ্যে এ প্রত্যয় জন্ম নিতো যে, তুমি ইবাদত নিয়ে তামাশা করছো।

তুমি তো চোখের জলে গাল ভাসাচ্ছো, কিন্তু আমাদের গলা আমাদের শরীরের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে।

তোমরা তো পার্থিব প্রয়োজনে ঘোড়া হাকিয়ে বেড়াচ্ছো। কিন্তু আমাদের ঘোড়া শত্রুর পিছু ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে।

তোমরা সুগন্ধ কস্তুরির সুবাস নিয়ে হৃদয়-মন সতেজ করো, কিন্তু আমাদের সুরভি কী জানো? রক্তের ঘ্রাণ আর রণক্ষেত্রের ধুলোবালি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অমোঘ বাণীর কথা আমরা জানি, আল্লাহর রাহে চলমান ঘোড়ার পদাঘাতে উত্থিত ধুলা কারো শরীরে লাগলে জাহান্নামের আগুন তাকে কখনো স্পর্শ করবে না।

আল্লাহর কিতাবের বাণীও আমাদের সামনে পরিষ্কারভাবে আছে, আল্লাহর পথে জীবনবাজি রেখে যারা শহিদ হয় তারা কখনো মৃত নয়।'

তারপর বললেন, আল্লাহ তাআলার কিছু বান্দা আছেন যাদেরকে আল্লাহ রোযা রাখার বিশেষ তাওফিক দান করেন। তারা এত রোযা রাখে যেমনটি অন্য কেউ পারে না। আবার কাউকে কুরআন তিলাওয়াতের তাওফিক দান করেন। আবার কাউকে জিহাদ করার তাওফিক দান করেন আবার কাউকে রাত জেগে নামায পড়ার তাওফিক দান করেন আর আপনি যে কাজে রয়েছেন তা আমার কাজ থেকে উত্তম নয় আবার আমি যে কাজে রয়েছি তাও আপনার কাজ থেকে উত্তম নয়। তবে আমাদের মাঝে যে বিষয়টিতে মিল আছে তা হলো– আমরা উভয়ে ভালো কাজে ব্যস্ত আছি। এভাবেই উভয়ের দ্বন্দের সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নিরসন হলো।

বস্তুত আমরা যার যার সাধ্য অনুযায়ী ভালো কাজেই আছি আর তোমার প্রভু যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন এবং এ ব্যাপারে তিনি স্বাধীন।

এমনই ছিল সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আদর্শ। কাফেররা একবার সংঘবদ্ধ হয়ে মদিনার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা করলো। এমন এক বাহিনী নিয়ে তারা মদিনায় এলো, যে বাহিনী আরববাসী আগে কখনও দেখে নি।

সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু পরিখা খনন করলেন। কাফেররা তা ডিঙ্গিয়ে মদিনায় প্রবেশ করতে পারল না। তারা খন্দকের ওপাশে তাবু গাড়ল। মদিনায় বনু কোরায়যা নামীয় এক ইহুদী গোত্র ছিল। এরা মুসলমানদের সাথে কোনো একটা গোলযোগ বাঁধানোর প্রহর গুনছিল। এবার তারা কাফেরদের সাথে আঁতাত করে এগিয়ে এলো। এরা মদিনার ভেতরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও লুটপাট শুরু করলো। এদিকে মুসলমানরা পরিখা পাহারা দিতে গিয়ে মদিনার ভেতরে মনোযোগ দিতে পারছিলেন না। খুব সঙ্কটময় পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে সময় অতিবাহিত হচ্ছিল। এরপর এক সময় আল্লাহ তাআলার সাহায্য এলো। তিনি কাফেরদের উপর এমন বাতাস প্রবাহিত করলেন এবং এমন সৈন্যদল পাঠালেন যারা কাফের সেনাদের সবকিছু এলোমেলো করে দিল। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তারা পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে রাতের আঁধারে লেজ গুটিয়ে পালাল।

সকাল বেলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিখা থেকে ফিরে মদিনায় এলেন। সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু সকলেই যার যার অস্ত্র রেখে হালকা হলেন। সবাই নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে গেলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বাড়িতে এসে অস্ত্র রেখে গোসল করে নিলেন। দুপুর হতে না হতেই জিবরাইল আ. এসে হাজির হলেন। বাড়ির বাইরে থেকে তাঁকে ডাকলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত বাইরে এলেন। জিবরাইল আ. বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি শিরোস্ত্রান খুলে ফেলেছেন?" হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। জিবরাইল আ. বললেন, ফেরেশতারা তো এখনো যুদ্ধের পোশাক খুলে নি। আমরা এইমাত্র ওদেরকে ধাওয়া করেই ফিরলাম। একেবারে হামরাউল আসাদ পর্যন্ত তাড়িয়ে দিয়ে এসেছি। অর্থাৎ কুরাইশরা যখন মদিনা ছেড়ে মক্কায় পালিয়ে যাচ্ছিল ফেরেশতারা তাদের পিছু নিয়ে ধাওয়া করে মদিনা থেকে দূরে

সরিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর জিবরাইল আ. বললেন, "আল্লাহ তাআলা বনু কোরাইযার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার আদেশ দিয়েছেন। আমি ওখানে যাচ্ছি ওদের পায়ের নিচের মাটি সরিয়ে দেব।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্রুত একজন ঘোষণাকারীকে বললেন, যে আমার অনুগত সে যেন আসরের নামায বনু কোরাযায় গিয়েই আদায় করে।" সবাই দৌড়ে গিয়ে অস্ত্র তুলে নিয়ে বনু কোরায়যা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। পথে আসরের সময় হয়ে গেল। কেউ কেউ বললেন, আমরা বনু কোরায়যায় গিয়েই আসর পড়ব। আবার কেউ কেউ বললেন, না আমরা নামায এখনই পড়ব। রাসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, নামাযের সময় হয়ে গেলেও সময়মতো নামায না পড়ে কোরায়যায় গিয়েই পড়তে হবে; বরং তার উদ্দেশ্য হলো, আমরা যেন তাড়াতাড়ি রওয়ানা করি। তাই কেউ কেউ নামায আদায়ের পর বাকী পথটুকু পাড়ি দিলেন। অন্যান্যরা নামায সেখানে না পড়ে কোরায়যায় গিয়েই পড়লেন। এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানানো হলে তিনি কোনো দলকেই তিরস্কার করেন নি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু কোরায়যাকে অবরোধ করলেন। আল্লাহ তাআলা ওদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সাহায্য করলেন।

চিন্তা করুন, কীভাবে তাঁরা ভ্রাতৃত্ব বজায় রেখেই মতভেদ করতেন। তাদের এই মতভেদ নিজেদের মাঝে কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করত না। কোনো ফাটল বা ঝগড়াও সৃষ্টি করত না।

বন্ধু আমার! আপনি যদি শান্তিপ্রিয়ভাবে ভদ্রতার সাথে খোলামনে মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকেন, মানুষ আপনাকে ভালোবাসবে। আপনি তাদের হৃদয়রাজ্য জয় করতে পারবেন। আর এর আগেই আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসবেন। কেননা, অনর্থক মতভেদ কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না।

এক নজর,

আমরা এক হয়ে যাবো এটা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো,

আমাদের মাঝে যেন অমিল না থাকে।



৫৩. কোমলতা সৌন্দর্য্য বাড়ায়

কোনো লোকের গুণে যখন মুগ্ধ হই তখন বলি, লোকটি খুব সৎ, গাম্ভীর্যপূর্ণ, শান্ত ও কোমল স্বভাবের। পক্ষান্তরে কারও বদনাম করতে চাইলে বলি, লোকটি অস্থিরচিত্ত ও কঠিন প্রকৃতির। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন -

إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ.

অর্থ : কোনো জিনিসের মাঝে কোমলতা তার সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে আর কোমলতা না থাকলে তার শ্রীহীনতা বৃদ্ধি পায়। (মুসলিম-৬৭৬৭)

আপনি কি এক টন লোহা আঙ্গুল দিয়ে নাড়াতে পারবেন? হ্যাঁ, একটি ক্রেন আনুন। লোহাটিকে ভালোভাবে বাঁধুন। ওপরে ওঠান। লোহাটি শূন্যে ওঠে এলে দেখবেন, হাতের ছোট আঙ্গুলটি দিয়ে নাড়াতে পারছেন।

দুই বন্ধু একবার পরিকল্পনা করলো। তারা এক লোকের দুই মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিবে। বন্ধুদুজনের একজন অপরজনকে বললো, আমি ছোট জনকে নিব। তুমি বড় জনকে নাও । অপরজন চিৎকার করে বলে ওঠল, না তুমি বড় জনকে নাও আমি ছোটজনকে নিব। প্রথমজন বললো, ঠিক আছে, তুমি ছোটজনকেই নাও। আর আমি তার চেয়ে ছোট জনকে নিব। সে বললো, ঠিক আছে। বন্ধু যে তার সাথে একমত হয় নি এটা সে ধরতেই পারল না। তবে সে কোমল ভাষায় কথার ধরণ পাল্টেছে মাত্র।

হাদিসে আছে-

إِذَا أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ شَرًّا نَزَعَ مِنْهُمُ الرِّفْقَ.

অর্থ : আল্লাহ যখন কোনো জাতির ভালো চান তখন তাদেরকে কোমলতা দান করেন। আর আল্লাহ তাআলা যখন কোনো জাতিকে সংকটে ফেলতে চান তখন তাদের থেকে কোমলতা উঠিয়ে নেন।”(মুসনাদে আহমদ-২৩২৯০)

আরও আছে, “আল্লাহ তাআলা কোমল। তিনি কোমলতা পছন্দ করেন। আর কোমলতার কারণে যা দান করেন তা অন্য কিছুর মাধ্যমে দান করেন না।” (মুসলিম)

একজন শান্ত, কোমল ও নম্র স্বভাবের মানুষ সবার কাছেই প্রিয় হয়ে থাকে। তার কাছে গেলে মনে শান্তি লাগে এবং তার কথায় আস্থা পাওয়া যায়। বিশেষ করে যদি তার কথা ও ব্যবহার হয় সুন্দর ও ভদ্র হয়।

হানাফি মাজহাবের ইমামদের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ ইমাম হচ্ছেন কাজী আবূ ইউসুফ রহ.। তিনি আবূ হানিফা রহ.-এর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছাত্র। আবূ ইউসুফ রহ. বাল্যকালে খুব দরিদ্র ছিলেন। তার বাবা তাকে আবূ হানীফা রহ. এর দরসে উপস্থিত হতে নিষেধ করতেন। বাজারে গিয়ে কিছু কামাই-রোজগার করতে বলতেন । কিন্তু তার প্রতি আবূ হানিফা রহ. এর খুব মায়া ছিল। অনুপস্থিত থাকলে খুব আফসোস করতেন। একদিন আবূ ইউসুফ রহ. আবূ হানিফা রহ. এর কাছে তার পিতার ব্যাপারটি খুলে বললেন। আবূ হানিফা রহ. আবূ ইউসুফ এর পিতাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, ছেলে দিনে কত রোজগার করে?

পিতা বললেন, দুই দেরহাম। আবূ হানিফা রহ. বললেন, আমি আপনাকে প্রতিদিন দুই দিরহাম দিব। আপনি ওকে পাঠিয়ে দিবেন। ও ইলম শিখবে। এরপর আবূ ইউসুফ রহ. দীর্ঘদিন যাবৎ আবূ হানিফার কাছে অবস্থান করে জ্ঞান অর্জন করেন।

আবূ ইউসুফ রহ. যুবক বয়সে উপনীত হলেন। যোগ্যতায় সকল সতীর্থকে ছাড়িয়ে গেলেন। একবার তার এমন অসুখ হলো যে, একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে গেলেন। আবূ হানিফা রহ. তাকে দেখতে গেলেন। তার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। আবূ হানিফা রহ. খুব দুঃখ পেলেন। মনে হলো তিনি আর বাঁচবেন না।

তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে আসলেন। অস্ফুট স্বরে বলছিলেন, আবূ ইউসুফ, আমি তো আশা করতাম আমার পরে তুমি মানুষের কাজে আসবে। দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আবূ হানিফা রহ. তার মজলিসে ছাত্রদের কাছে গেলেন। এরপর দু'দিন যেতে না যেতেই আবূ ইউসুফ রহ. সুস্থ হয়ে ওঠলেন। গোসল সেরে কাপড় পরে শায়েখের দরসে রওয়ানা হলেন। পাশ থেকে একজন জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাচ্ছেন? বললেন, শায়েখের দরসে যাচ্ছি।

সবাই একসাথে বলে ওঠল, আর কতদিন ইলম শিখবেন? আপনার পড়া তো শেষ। শোনেন নি শায়েখ আপনার ব্যাপারে কী বলে গিয়েছেন? বললেন, কী বলেছেন? তারা বললেন, শায়েখ বলেছেন, "আমি তো মানুষের জন্য আমার পরে তোমাকেই আশা করেছিলাম।" অর্থাৎ আপনি আবূ হানিফা রহ. এর সকল ইলম হাসিল করে ফেলেছেন। আজ তিনি ইন্তেকাল করলে আপনি হবেন তার স্থলাভিষিক্ত। আত্মতৃপ্তিতে ভরে ওঠল আবূ ইউসুফ রহ. এর মন। মসজিদে গেলেন। দেখলেন এক পাশে আবূ হানিফা রহ. এর মজলিস। তিনি অন্য পাশে বসে দরস ও ফতওয়া দিতে শুরু করলেন।

আবূ হানিফা রহ. নতুন মজলিস দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটা আবার কার মজলিস? শাগরেদরা বললো, এটা হচ্ছে আবূ ইউসুফ রহ. এর। আবূ হানিফা রহ. বললেন, অসুখ ভালো হয়েছে? শাগরেদরা বললো, হ্যাঁ। বললেন, তাহলে আমাদের দরসে এল না কেন? শাগরেদরা বললো, আপনার বলে আসা কথাটি পরিবারের লোকেরা তাকে জানিয়ে দিয়েছে। তাই তিনি এখন মানুষকে দরস দিচ্ছেন। আপনাকে আর প্রয়োজন নেই। আবূ হানিফা রহ. চিন্তা করতে লাগলেন অবস্থা অনুযায়ী কোমলতার সাথে কিভাবে ব্যবস্থা নেয়া যায়। গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। তারপর বসে থাকা এক ছাত্রের দিকে ফিরে বললেন, তুমি ঐ 'শায়েখে'র কাছে গিয়ে বল, শায়েখ! আমার একটি প্রশ্ন। তোমাকে দেখে সে খুশি হবে, আর তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, কী সমস্যা? তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে এই আশায়ই তো বসেছে!! তাকে গিয়ে বলবে একজন লোক দর্জীকে একটি জামা খাটো করে দেয়ার জন্য দিলো। কয়েকদিন পর লোকটি এসে জামা চাইলে দর্জী অস্বীকার করে বসল। বললো, আমি আপনার থেকে কোনো কাপড়ই নেই নি। তখন লোকটি পুলিশকে জানালে পুলিশ এসে তল্লাশি চালিয়ে দোকান থেকেই জামাটি বের করলো।

প্রশ্ন হলো, দর্জী কি খাটো করে দেয়ার মজুরি পাবে, নাকি পাবে না? জবাবে সে যদি বলে, মজুরি পাবে। তুমি বলবে, আপনি ভুল বলেছেন। যদি বলে, মজুরি পাবে না তাহলেও বলবে, ভুল বলেছেন। ছাত্রটি এরকম জটিল মাসআলা পেয়ে খুব খুশি হলো।

সে আবূ ইউসুফ রহ.-এর কাছে গিয়ে বললো, আমার একটি প্রশ্ন আছে। আবূ ইউসুফ রহ. বললেন, কী প্রশ্ন? ছাত্রটি শায়খের শিখিয়ে দেয়া প্রশ্নটি তার সামনে উপস্থাপন করলো। আবূ ইউসুফ রহ. জবাবে বললেন: হ্যাঁ, মজুরি পাবে যদি সে কাজ করে থাকে। ছাত্রটি বললো, ভুল বললেন। আবূ ইউসুফ রহ. আশ্চর্যন্বিত হলেন। অনেকক্ষণ মাসআলাটি গভীরভাবে চিন্তা করলেন। এরপর বললেন না মজুরি পাবে না।

প্রশ্নকারী এবারো বললো, আপনি ভুল বলেছেন। আবূ ইউসুফ রহ. তার দিকে তাকালেন। এরপর আল্লাহর নামে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তোমাকে কে পাঠিয়েছে? সে আবূ হানিফা রহ. এর দিকে দেখিয়ে বললো, উনি পাঠিয়েছেন। আবূ ইউসুফ রহ. মজলিস থেকে উঠে সোজা আবূ হানিফা রহ. এর মজলিসে গিয়ে বসে বললেন, ! একটি প্রশ্ন। আবূ হানিফা রহ. তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। আবূ ইউসুফ রহ. উঠে কাছাকাছি গিয়ে একেবারে আবূ হানিফা রহ.-এর মুখোমুখি হয়ে বসলেন। খুব আদবের সাথে বললেন, একটি প্রশ্ন. আবূ হানিফা রহ. বললেন কী প্রশ্ন তোমার? আবূ ইউসুফ রহ. বললেন, আপনি সেটা জানেন আবূ হানিফা রহ. বললেন, জবাব দাও তুমি না শায়খ!! আবূ ইউসুফ রহ. বললেন, না ! আপনিই শায়েখ। তখন আবূ হানিফা রহ. মাসআলার জবাবে বললেন, আমরা দেখব, সে জামাটি কতটুকু খাট করেছে। যদি মালিকের মাপ অনুযায়ী খাটো করে থাকে, তাহলে তো সে কাজ পূর্ণ করেছে। পরবর্তীতে তার থেকে অস্বীকৃতির বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। এখানে যেহেতু সে কাজ পূর্ণ করেছে, তাই পারিশ্রমিক পাবে। আর যদি নিজের ইচ্ছেমতো খাটো করে থাকে তাহলে বোঝা যাবে যে, সে নিজের জন্য কাজ করেছে। তাই এক্ষেত্রে মজুরি পাবে না। আবূ ইউসুফ রহ. আবূ হানিফা রহ. এর জবাব মাথা পেতে নিলেন। আর আবূ হানিফা রহ.-এর মৃত্যু পর্যন্ত তারই দরবারে পড়ে থাকলেন। পরে তার মৃত্যুর পর আবূ ইউসুফ রহ. বিচারকের আসনে বসলেন।

কী সুন্দর কোমলতা ও শান্তভাবে সমস্যার সমাধান করলেন। স্বামী স্ত্রী একে অপরের সাথে এভাবেই যদি কোমল আচরণ করে এমনিভাবে বাবা-মা, প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ ও শিক্ষকগণও যদি অধীনস্থদের সাথে আচরণ

করেন তাহলে কিন্তু অনেক সমস্যা ও ঝগড়-বিবাদ দূর হয়ে যাবে। ভদ্রতা আমাদের সব সময়ের প্রয়োজনীয় বিষয়। গাড়ি চালাতে, শিক্ষকতায়, বেচা কেনায় আমরা নম্র ব্যবহার করবো। নসিহতের একটি হেকমত হলো প্রত্যেকটি জিনিসকে যথাস্থানে ব্যবহার করা। তবে কখনও কখনও গরম মেজাজের প্রয়োজন হয় । কোনো কোনো সময় নসিহত করতে গিয়েও গরম মেজাজ ব্যবহার করতে হয়। গরম ছাড়া সবসময় নরম দিয়ে কাজ হয় না।

আর রাসূল ﷺ রাগ করলে একমাত্র দ্বীনী বিষয়েই রাগ করতেন। তিনি কখনও নিজের কোনো বিষয়ে রাগ করেন নি। তবে, আল্লাহর কাছে মর্যাদাপূর্ণ বিষয়গুলোর কোনো বিষয়ের মর্যাদা ক্ষুন্ন হলে সে ক্ষেত্রে তিনি কোনো ছাড় দিতেন না।

একদিন ওমরের রাদিয়াল্লাহু আনহু সাথে এক ইহুদির দেখা হলো। সে তাঁকে তাওরাতের একটি বাণী সম্পর্কে জানালে সেটি ওমরের কাছে খুব ভালো লাগল। তিনি বললেন, আমাকে এটা লিখে দাও। সে লিখে দিল। তিনি এটি নিয়ে সোজা রাসূল ﷺ-এর কাছে চলে এলেন। এরপর তাঁকে পড়ে শোনালেন। রাসূল লক্ষ্য করলেন, ওমর লেখাটি নিয়ে বেশ মুগ্ধ। মনে মনে ভাবলেন, এভাবে যদি আগেকার ধর্মগুলো থেকে গ্রহণের সুযোগ করে দেয়া হয় তাহলে তো কুরআনের স্বকীয়তা বজায় থাকবে না। একটি আরেকটির সাথে মিলে যাবে। রাসূলের অনুমতি ছাড়া ওমর কী করে এমন কাজ করলো? আবার লিখেও নিয়ে আসলো।

তাই রাসূল চরম রেগে গিয়ে বললেন : হে ওমর, আমার শরিয়তের ব্যাপারে সন্দেহ হয় নাকি? এরপর বললেন : সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ আমি তোমাদের কাছে এ শরিয়ত স্বচ্ছ ও পরিস্কার অবস্থায় নিয়ে এসেছি। তাদেরকে (আহলে কিতাবদেরকে) কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না। কারণ, হতে পারে তারা তোমাদেরকে সত্য বিষয়ে অবগত করবে, আর তোমরা তা অস্বীকার করে বসবে। অথবা তারা বলবে মিথ্যা, কিন্তু তোমরা তা সত্য মনে করবে। আরও কোনো সেই সত্তার শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ। যদি মূসা আলাইহিস সালাম ও এখন জীবিত থাকতেন তাহলে তিনিও আমাকে অনুসরণ না করে পারতেন না।

সর্বদা শুধু নম্রতা ও কোমলতা করা যানে না; বরং কখনো কখনো কঠোরতা ও রাগ করারও প্রয়োজন আছে।

তিনি রাগান্বিত ও অনমনীয় হওয়ার আরেকটি ঘটনা শুনুন। নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম দিকের ঘটনা। কোরাইশের বৈঠক চলাকালীন তিনি কাবার চত্বরে আসতেন। নামায পড়তেন। তাদের প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপই করতেন না। তারা তাঁকে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট দিত। তিনি সহ্য করে থাকতেন।

একদিনের ঘটনা। কুরাইশের সম্ভ্রান্ত লোকেরা হাজ্রে আসওয়াদের পাশে একত্রিত হলো। রাসূলকে নিয়ে আলোচনা করলো। তারা বললো, এলোকের যা কিছু আমরা সহ্য করেছি এমন আর কারো কোনো বিষয় আমরা সহ্য করি নি। লোকটা আমাদেরকে নির্বোধ বলার দুঃসাহস দেখিয়েছে। আমাদের পূর্বসুরীদেরকে গালমন্দ করেছে। আমাদের ধর্মকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছে। আমাদের জাতীয় সংহতি ধ্বংস করেছে। আমাদের উপাস্যদের নিন্দা করেছে। তাকে নিয়ে আমরা ভীষণ বিপদে আছি। এরই মাঝে হঠাৎ রাসূল তাদের সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এলেন। কাবার স্তম্ভ চুম্বন করলেন। তওয়াফরত অবস্থায় তাদের পাশ দিয়ে গেলেন। তখন তারা রাসূলের দিকে ইশারা করে যা তা বললো। এতে করে রাসূলের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু তিনি কিছুই না বলে চলে গেলেন। এভাবে যখন দ্বিতীয় বার তাদের পাশ দিয়ে গেলেন তখনও তাই ঘটল। কিন্তু তিনি কিছুই না বলে তওয়াফ করতে থাকলেন। তৃতীয় বারও যখন একই ঘটনা ঘটল, তখন তিনি বুঝলেন, এদের সাথে নম্রতা চলবে না। গিয়ে তাদের সামনে দাঁড়ালেন।

বললেন, হে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ!! আমি তোমাদের মরণ নিয়ে এসেছি। এটা বলে তিনি তাদের সামনে দাড়িয়ে রইলেন।

এরা যখন মৃত্যুর হুমকি শুনল। তখন সবাই কেঁপে উঠল। কেননা, তারা জানতো তিনি একজন সত্যবাদী ও বিশ্বাসী। তারা এমন স্তব্ধ হয়ে গেল যেন তাদের সবার মাথার ওপর পাখি বসে আছে। একেবারে কঠোর লোকটি পর্যন্ত রাসূলের সাথে সদয় আচরণ করতে লাগল। তারা বললো, হে কাসিমের পিতা বুদ্ধিমানের ন্যায় চলে যাও। তুমি তো অবুঝ নও। রাসূল তাদের কাছ থেকে চলে গেলেন।

জনৈক আরবি কবি একথাই বলেছেন-

"যখন কেউ বলবে, নম্র আচরণ কর! তখন তুমি বলে দিবে নম্রতার নিজস্ব ক্ষেত্র রয়েছে। আর অপাত্রে দয়া দেখানো মূর্খতার নামান্তর।"

অনুসন্ধানি দৃষ্টি নিয়ে সীরাত (নবী চরিত্র) অধ্যয়ন করলে দেখতে পাবে যে, তিনি সদয় আচরণকেই প্রাধান্য দিতেন। তবে বুঝতে আবার ভুল করো না। এটা তার দুর্বলতা ও ভীরুতা নয়, সদয় আচরণ মাত্র।

সদয় আচরণের আরো একটি ঘটনা শুনুন। বদর যুদ্ধ শেষ হয়েছে মাস খানেক হলো। নবী-কন্যা যয়নব রাদিআল্লাহু আনহা-এর স্বামী আবূল আস নবী-কন্যাকে মদিনায় বাবার কাছে পাঠাতে চাইলেন। খবর শুনে রাসূল যায়েদ বিন হারেছা ও একজন আনছারীকে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন। সেইসাথে বলে দিলেন। তারা যেন মক্কার অদূরে মদিনার পথে যয়নব রাদিআল্লাহু আনহা-এর জন্য অপেক্ষা করেন। তিনি বললেন, তোমরা বাতনে ইয়াজাজ নামক স্থানে থাকবে। তোমাদের পাশ দিয়ে যয়নব যাবে। তোমরা তাকে নিয়ে আমার কাছে আসবে। উভয়ে ততক্ষনাৎ রওয়ানা হলেন। এদিকে আবূল আস তার স্ত্রীকে তৈরী হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। যয়নব নিজের মালপত্র গোছাতে লাগলেন। এরই মধ্যে হিন্দা তার সাথে দেখা করতে এলো। সে হলো আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী ও ওতবার মেয়ে। সে বললো, হে মুহাম্মদের কন্যা। শুনলাম তুমি নাকি তোমার বাবার কাছে চলে যাচ্ছ? যয়নব ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন, মনে হয় হিন্দা কোনো ষড়যন্ত্র করতে চাচ্ছে। তাই উত্তরে বললেন, নাহ, কে বলেছে? হিন্দা বললো, বোন আমার, তুমি যদি যেতে চাও তাহলে তোমার কোনো কিছু লাগলে বলো। লজ্জা করো না তো। আমি ব্যবস্থা করে দেব। আরে পুরুষদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব মহিলাদের মাঝে যেন না ঢুকে ।

যয়নব রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, আমার বিশ্বাস, সে একথাগুলো সত্যই বলেছে। কিন্তু তারপরও আমার আশংকা হলো। তাই আমি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম।

যয়নবের প্রস্তুতিপর্ব মোটামুটি শেষ হলো। কিন্তু তার স্বামী নিজেই তাকে নিয়ে বের হওয়াটা সমীচীন মনে করলো না। কারণ, এর ফলে কুরাইশ তার বেরিয়ে পড়াটা টের পেয়ে যাবে। তাই তার ভাই কেনানাকে এ কাজের দায়িত্ব দিলো। আদেশ পেয়ে যয়নবের দেবর কেনানা ইবনে রাবী

তার কাছে একটি উট নিয়ে এলো । তিনি এর উপর উঠে বসলেন। কেনানা সাথে তীর-ধনুকও নিয়ে নিলেন। সে তাকে নিয়ে দিনের বেলায়ই বেরিয়ে পড়ল। লোকজন তাকে দেখে ফেলল। কুরাইশের কিছু লোক বলে উঠলো মুহাম্মাদের মেয়ে আমাদের সামনে দিয়ে মুহাম্মাদের কাছে চলে যাবে এটা কেমন কথা? অথচ বদর প্রান্তরে আমাদের সাথে তার আচরণ স্পষ্ট। তারা তার তালাশে বের হলো। যু-তুওয়া নামক স্থানে গিয়ে সর্বপ্রথম হুবার ইবনুল আসওয়াদ নামের এক ব্যক্তি তাকে দেখে বর্শা দিয়ে ভয় দেখালো।

কাফেররা তাদের দিকে ধেয়ে আসল। সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। আর তার সাথে শুধু তার দেবর কেনানা। কেনানা এ দৃশ্য দেখে মাটিতে নামল। তুনীরটি খুলে তীরগুলো সামনে রাখল। এবার গলা ফাটিয়ে বললো, যেই আমার দিকে অগ্রসর হবে আমি তাকে তীর মেরে শেষ করে দেব । সে প্রসিদ্ধ তীরন্দাজ ছিল। তাই লোকেরা ভয়ে কেঁটে পড়ল। ফিরে যাওয়ার ভাব দেখাল। কিন্তু দূর থেকে তার প্রতি দৃষ্টি রাখছিল। ফলে সেও যেতে পারছিল না। আবার তারাও কাছে আসার দুঃসাহস দেখাচ্ছিল না। ইতোমধ্যে আবূ সুফিয়ানের কাছে এ সংবাদ পৌঁছাল। সে কুরাইশের একটি দল নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে এলো। সে এসে দেখলো একদিকে কেনানা তীর ধনুক নিয়ে প্রস্তুত, অপর দিকে তারাও তার সাথে লড়ার জন্য তাড়াহুড়া করছে। সে এসে বললো, হে কেনানা তীর-ধনুক সরাও। আমাদেরকে কথা বলতে দাও। তিনি তীর সরিয়ে ফেললেন।

আবূ সুফিয়ান তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বললো, কাজটা তোমার ঠিক হলো না। কী দরকার ছিল মেয়ে লোকটিকে নিয়ে প্রকাশ্যে লোকজনের সামনে দিয়ে বেরিয়ে আসার। অথচ তুমি বদর প্রান্তরে আমাদের দুরবস্থা ও দুর্ভাগ্যের কথা জানো। তুমি জানো মুহাম্মাদের কারণে আমাদের মাঝে কী অবস্থা বিরাজ করছে। সে আমাদের নেতাদেরকে হত্যা করেছে। নারীদেরকে বিধবা করেছে। অতএব, যখন গোত্রে গোত্রে একথা জানাজানি হয়ে যাবে যে, তুমি তাঁর মেয়েকে আমাদের সামনে দিয়ে সবাইকে উপেক্ষা করে নিয়ে যাচ্ছ। তখন লোকেরা ভাববে আমরা তার বশ্যতা স্বীকার করেছি। আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছি। আমি শপথ করে

বলছি, তাকে তার বাবার কাছ থেকে ফিরিয়ে রেখে আমাদের কোনো লাভ নেই। তাকে বাধা দিয়ে প্রতিশোধ নেয়ারও কিছু নেই।

অতএব, এখনকার মতো তাকে নিয়ে ফিরে যাও। যখন লোকজনের আওয়াজ থেমে যাবে এবং মানুষ বলাবলি করবে যে, আমরা তাকে ফিরাতে সক্ষম হয়েছি তখন তুমি গোপনে তাকে নিয়ে তার বাবার কাছে দিয়ে এসো। কথাটা কেনানার কাছে মন্দ মনে হলো না। সে তাকে নিয়ে ফিরে গেল।

এরপর যয়নব আরও কয়েক রাত মক্কায় অবস্থান করলেন। ধীরে ধীরে যখন এ আওয়াজ থেমে গেল। সুযোগ বুঝে কেনানা একরাতে তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কিছু দূর গিয়ে রাসূল -এর পক্ষ থেকে প্রেরিত যায়েদ বিন হারেছা ও তার সাথির কাছে তাকে হস্তান্তর করলো। এরপর এক রাতে এরা দুজন তাকে নিয়ে রাসূলের দরবারে হাজির হলেন।

আবূ সুফিয়ান কী নম্র আচরণ দেখাল যার ফলে অগ্নিশর্মা কেনানা নিমেষেই বরফের মতো গলে গেল। সাথে সাথে এমন একটি অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি এড়ানো গেল যাতে নবী কন্যার নিহত হওয়ার প্রবল আশংকা ছিল।

মনে রাখতে হবে, এ ঘটনা তখনকার যখন আবূ সুফিয়ান কাফের ছিল। তাহলে সে সময়ে মুসলমানদের অবস্থা কেমন ছিল বলে মনে হয় তোমার?

শিক্ষা

নম্রতা শোভা বর্ধন করে আর কঠোরতা লেপন করে কালিমা।

◈◈◈

৫৪. অনুভূতিহীন

আবেগ ও অনুভূতিহীন মানুষ সহকর্মী, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব এমনকি নিজের পরিবার পরিজনের কাছেও বোঝা স্বরূপ মনে হয়। এ ধরনের মানুষ কারো কোনো আনন্দ বা বেদনায় কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায় না। কারো সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেয় না।

মনে করুন, সে এক সন্তানের বাবা। তার আদরের দুলাল ছোট ছেলেটি খুশিতে নাচতে নাচতে তার কাছে এসে বললো- দেখ বাবা, স্যার আমাকে এ প্লাস মার্ক দিয়েছেন। অদ্ভূত এ বাবা এদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপই করলো না। শুধু বললো: ভালো, ঠিক আছে। বলুনতো, ছেলেটি কি তার বাবার কাছ থেকে এমন নিরস প্রতিউত্তর আশা করেছিল? ছেলে তাকে ডক্টরেট ডিগ্রি এনে দেখালেও তার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাবে না।

ধরুন, সে লোকটি কোনো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক। ক্লাসে তার একজন ছাত্র খুব চঞ্চল প্রকৃতির। একদিন সে লক্ষ্য করলো, ক্লাসের পড়াটা কঠিন। শিক্ষকের চেহারায়ও রুক্ষতার ছাপ। পরিবেশটা ভারি হয়ে আছে। তাই সে একটা কৌতুক বলে পরিবেশটা হালকা করার চেষ্টা করলো। ছাত্ররা সবাই স্বাভাবিকভাবে হাসলো। পরিবেশটাও শান্ত হলো।। কিন্তু শিক্ষকের চেহারাতে কোনোই পরিবর্তন হলো না। তিনি বললেন, আমার সাথে চালাকি করছো?

তার এ আচরণ কি কাম্য ছিল ?

অথবা ধরুন সে একটি মুদি দোকানে গেল। দোকানের সাধারণ কর্মচারিটি তাকে দেখে বললো আল হামদুল্লিাহ, বাড়ি থেকে একটা চিঠি এসেছে। এ কথা শুনে তার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়াই হলো না।

অথচ তার তো নিজ থেকে এ কথা জিজ্ঞেস করা দরকার ছিল যে, লোকটা আমাকে এ সংবাদ কেন শুনালো? নিশ্চয় লোকটি তাকে এ সংবাদ শুনানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে তার আনন্দে সে যেন শরিক হয়।

মনে করুন, এ লোক কোনো বন্ধুর সাথে সাক্ষাত করতে গেলো। বন্ধু তাকে চা ও কফি দিয়ে আপ্যায়ন করলো। কিছুদিন আগে সে বন্ধুর প্রথম সন্তান জন্ম নিয়েছে। অতিথি বন্ধুকে তার সন্তান দেখানোর জন্য

সে ভেতরে গিয়ে নবজাতক শিশুটিকে তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে এলো। সে এতো আবেগাপ্লুত ছিল যে, সম্ভব হলে তাকে চোখের পাতায় জড়িয়ে নিয়ে আসতো।

এরপর স্বাগতিক বন্ধুটি অতিথি বন্ধুটির সামনে দাঁড়িয়ে বললো, বন্ধু, বাচ্চাটা দেখতে কেমন লাগছে? সে শিশুটির দিকে হাল্‌কা একটু দেখে বললো, মাশা আল্লাহ! আল্লাহ তাকে তোমার প্রিয় করে দিন। এতটুকু বলেই চায়ের কাপে চুমুক দিলো। অথচ স্বাগতিক বন্ধুটি এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করেছিল। ছেলেটিকে কোলে নিবে, চুমু খাবে, তার সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থের প্রশংসা করবে! কিন্তু, সে তো নির্বোধ। অনুভূতিহীন।

যখন আপনি অন্যের সাথে কোনো কাজ করবেন তখন আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে তাদের কাছে কোনো কাজটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আপনার কাছে কোনোটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি লক্ষণীয় নয়।

আপনার সন্তানের কাছে এ প্লাস মার্ক এখন ডক্টরেট ডিগ্রির চেয়েও বেশি মূল্যবান। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নবজাতক শিশুটিই আপনার বন্ধুর কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় বস্তু। তাকে দেখা মাত্রই তার মনে চায় কলজে ফেড়ে যদি তাকে সেখানে রাখা যেত তাহলে সে তা করতো। আপনার বন্ধুর প্রতি আপনার ভালোবাসা কি এতটুকুও দাবি করে না যে, তার এমন ভালোবাসার সাথে আপনিও অংশ নিবেন? পরিমাণে তার চেয়ে কম হলেও আপনি প্রকাশ তো করতে পারেন।

যখনো মানুষ কোনো বিষয়ে উৎসাহী থাকে, আপনিও তার সাথে উৎসাহী থাকুন। আপনি একদম স্থবির ও অনুভূতিহীন থাকবেন না; বরং মানুষের সাথে আবেগপূর্ণ আচরণ করুন। সহমর্মিতা দেখান। তাদের সুখে হাঁসুন, তাদের দুঃখে কাঁদুন। কেউ বিস্ময় প্রকাশ করলে আপনিও বিস্ময় প্রকাশ করুন।

এজন্যই আপনি দেখবেন, যারা মানুষের সাথে আবেগপূর্ণ আচরণ করে চলতে জানে না তারা প্রায়ই এই অভিযোগ তোলে যে, আমার সন্তানেরা কেন আমার সাথে কথা বলতে বা গল্প করতে পছন্দ করে না? এর কারণ হচ্ছে, তারা আপনাকে বিভিন্ন কৌতুক শোনায় কিন্তু আপনার মধ্যে এর কোনো প্রভাব দেখে না। তারা আপনাকে তাদের মাদরাসার বিভিন্ন ঘটনা

শোনায়। কিন্তু তারা বুঝে উঠতে পারে না যে, তারা কি কোনো মানুষের সাথে কথা বলছে, না কোনো দেয়ালের সাথে? তখন তারা আপনার কাছে বসার বা কথা বলার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

যদি কোনো ব্যক্তি আপনাকে এমন একটি ঘটনাই শুনায়, যা আপনি আগ থেকে জানেন, তবুও আপনি তার সাথে এমন আচরণই করুন যেন তার আগ্রহ বজায় থাকে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ) বলেন, কখনো এমন হয় যে, কেউ এসে আমাকে এমন হাদিস শোনায় যা আমি তার জন্মের আগ থেকে জানি। তবুও তা আমি এমন ভাবে শুনে থাকি যেন এইমাত্র প্রথম বার শুনেছি। কত চমৎকার ছিল তার চরিত্র মাধুরি! কেমন সুন্দর ছিল তার আচরণ দক্ষতা।

খন্দক যুদ্ধের আগ মুহূর্ত। মুসলমানরা সবাই উৎসাহের সাথে খন্দক খনন কাজে ব্যস্ত। তাদেরই একজনের নাম ছিল জুয়াইল। এ নাম পাল্টে নবীজি ﷺ তার নাম রেখেছেন আমর। এ ব্যস্ততার মাঝেও সাহাবিরা তাকে নিয়ে কবিতা আবৃত্তি করছিলেন।

سَمَّاهُ مِنْ بَعْدِ جُعَيْلٍ عَمْرًا + وَكَانَ لِلْبَائِسِ يَوْمًا ظَهْرًا.

জুয়াইল ছিল তার পূর্বনাম, এখন হয়েছে সে আমর
বিপদগ্রস্তদের স্বার্থে সে মরেও হয়ে থাকবে অমর

রাসূল ﷺ ও তাদের সাথে ছন্দের অন্তে অন্তে সুরে সুরে তাল মিলাচ্ছিলেন। এতে তাদের আগ্রহ উদ্দীপনা আরো বেড়ে গিয়েছিল। রাসূল ﷺ তাদের সঙ্গে আছেন এই ভেবে তাদের মন আনন্দে নেচে উঠেছিল।

সাহাবিরা স্বতস্ফূর্তভাবে খনন কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। দিন শেষ হয়ে যখন রাত এল শীত তখন খুব বেড়ে গেল। কিন্তু তারা শীত উপেক্ষা করে খনন কাজ করে যাচ্ছিল। একসময় রাসূল ﷺ এসে দেখলেন তারা স্বতস্ফূর্তভাবে খনন করছেন। রাসূল ﷺ-এর উপর তাদের চোখ পড়া মাত্রই তারা গেয়ে উঠলেন

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا + عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا.

নবীর হাতে হাত দিয়ে মোরা করেছি দৃপ্ত পণ,
আল্লাহর পথে করবো জিহাদ লড়বো আমরণ ।

এর উত্তরে রাসূল গেয়ে উঠলেন-

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْاٰخِرَةُ + فَاغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ.

কেবল ভোগের লাগি নয় তো জীবন, ভোগ তো পরপারে
ক্ষমা করে দাও প্রভু হে, সকল মুহাজির আর আনসারে ।

সারাদিন এ ভাবেই তিনি তাদেরকে হাঁসি খুশিতে মাতিয়ে রাখলেন। একবার তিনি শুনতে পেলেন তারা ধুলোয় মাখামাখি হয়ে আবৃত্তি করছে-

وَاللّٰهِ لَوْلَا مَا اهْتَدَيْنَا + وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا.

فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا + وَثَبِّتِ الْاَقْدَامِ اِنْ لَا قَيْنَا.

اِنَّ الْاُوْلٰى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا + اِذَا اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا.

যদি না দিতেন মোদের তিনি সঠিক পথের দিশা
উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরিয়া ফিরিতাম মিটিত না মনের আশা ।
দান খয়রাত নামায রোযা বুঝি নাই মোরা কভু,
তুমিই তো দিলে দিশা, দিলে বুঝ হে প্রভু ।
করো দয়া মোদের তরে রহম করো হে,
অটল রাখো অবিচল রাখো সদা সম্মুখ সমরে ।
দ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে যারা আসছে রণাঙ্গণে,
আপোস-রফা করবো না মোরা কখনো তাদের সনে ।

তখন রাসূল তাদের সাথে শেষের শব্দটি এক সঙ্গে বলছিলেন। রাসূলের সাথে যখন কেউ আনন্দ করত তখন তিনিও তার সাথে আনন্দে শরিক হতেন। আবেগ প্রকাশ করতেন। মন খুলে হাসতেন।

একবার ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন স্ত্রীদের ওপর ভীষণ রেগে ছিলেন। কারণ তারা রাসূলের কাছে একটু বেশি খোরপোষের দাবি জানিয়েছিলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন আজ রাসূলকে যেভাবেই হোক হাঁসাতে হবে। তিনি ভেতরে গিয়ে বলে উঠলেন হে আল্লাহর নবী, আমরা কুরাইশরা নারীদের ওপর প্রবল ছিলাম। আমাদের কারো কাছে তার স্ত্রী খোরপোষ চাইলে সে গিয়ে তার গলা টিপে ধরত। এরপর মাদিনায় এসে দেখি এখানকার নারীরা পুরুষদের উপর কর্তৃত্বপরায়ণ। আমাদের নারীরা এটা দেখে তাদের মতো করতে শুরু করেছে। কথাগুলো ওমর এমনভাবে বললেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে না হেসে পারলেন না। এরপর ওমর যতই বলতে থাকলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তত হেসে চললেন।

হাদিসের গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে আপনি দেখবেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে হেসেছেন যে, তার মাড়ির দুপাশের দাঁতগুলোও দেখা যাচ্ছিল। মহান রাব্বুল আলামিন তাঁর ব্যাপারে ঘোষণা দিয়েছেন-

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ.

অর্থ : নিঃসন্দেহে আপনি মহৎ চরিত্রের অধিকারী। (সূরা কালাম : আয়াত-৪)

এরপর আমাদেরকেও লক্ষ্য করে বলে দিয়েছেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ : নিশ্চয় তোমাদের জন্যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ। (সূরা আহযাব : আয়াত-২১)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন মানুষের সাথেও লেনদেন করতেন যাদের মাঝে সভ্যতার নাম গন্ধও ছিল না। এমনকি একজন নবীর সাথে কিরূপ আচরণ করতে হয় তাও জানে না।

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা ও মদিনার মাঝামাঝি অবস্থিত জিইররানাহ নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। সাথে ছিলেন বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু। হঠাৎ রাসূলের কাছে এক বেদুঈন এসে খুব তাড়াহুড়া করে কিছু চাচ্ছিল। তার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কিছু

চেয়েছিল এবং রাসূল ﷺ তা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তা আর দেয়া হয়নি। লোকটি বলছিল, 'হে মুহাম্মাদ যা ওয়াদা করেছিলে তা কি দেবে না?'

রাসূল ﷺ তাকে কোমল ভাষায় বললেন: তুমি সুসংবাদ নাও। কী চমৎকার একটি শব্দ! এর চাইতে ভালো শব্দ আর কী হতে পারে? কিন্তু বেদুঈন লোকটি এটাকে সুন্দরভাবে গ্রহণ করলো না। উল্টো সে ক্ষিপ্ত হয়ে চেচিয়ে উঠল ।এমন কথা আপনি আরো অনেক বলেছেন ... ।

তার এ উক্তি শুনে রাসূলের রাগ চলে আসলো। কিন্তু তিনি তা হজম করলেন। আবূ মূসা ও বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পাশে বসা ছিলেন। তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : 'সুসংবাদটি প্রত্যাখাত হয়েছে। এখন তোমরা গ্রহণ করতে পারো।' তারা দুজন গ্রহণ করলেন। এরপর রাসূল ﷺ এক পেয়ালা পানি আনালেন। তিনি এতে হাত মুখ ধুলেন ও থুথু ফেললেন। এরপর বললেন এ পানি তোমরা পান করো এবং চেহারা ও গলায় ঢালো এবং এর মাধ্যমে সুসংবাদ গ্রহণ করো। অর্থাৎ এ পানির বরকতের সুসংবাদ নাও।

দেরি না করে তারা উভয়ে পেয়ালাটি নিয়ে নির্দেশ মতো আমল করলেন। এদিকে আম্মাজান উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা পর্দার আড়াল থেকেই এটা দেখছিলেন। তিনিও এ সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলেন না। পর্দার আড়াল থেকে ডাক দিয়ে বললেন, তোমাদের মায়ের জন্যেও কিছু রেখে দিয়ো। এ কথা শুনে তারা তার জন্যেও সামান্য পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তা পাওয়া মাত্র রাসূল ﷺ যা বলেছিলেন তা করলেন।

এমনই ছিলেন আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন, চোখের মণি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি ছিলেন আচরণে কোমল সকলের বন্ধু ও অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল। তিনি তিলকে তাল করতেন না।

একদিন রাসূল ﷺ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সাথে বসা ছিলেন। তিনি রাসূলকে কিছু মহিলার কাহিনী শোনাতে লাগলেন। রাসূল মনোযোগসহ শুনতে থাকলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কথা খুব দীর্ঘ করছিলেন। আর রাসূল মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। এভাবে ঘটনার শেষ পর্যন্ত শুনলেন।

কী ছিল সেই ঘটনা? একবার এগারজন মহিলা মিলে একটা গল্পের আসর জমিয়ে তুলল। ঘটনাটি ছিল জাহেলী যুগের। মহিলারা সবাই প্রতিজ্ঞা করলো যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বামীর বিবরণ দিবে, কেউ কিছু গোপন রাখবে না। এরপর একজন একজন করে বলতে শুরু করলো।

প্রথমজন বললো : আমার স্বামী হলেন একটি দুর্গম পাহাড়ের চূড়ায় রাখা জীর্ণকায় একটি উঁটের গোস্তের মতো। দুর্গম হওয়ার কারণে কেউ সেখানে যেতে চায় না এবং গোস্তটি মোটা তাজা না হওয়ার কারণে কেউ তা নিতেও আগ্রহবোধ করে না।

তার কথার অর্থ হলো- আমার স্বামী অহংকারী ও মন্দ স্বভাবের। অহংকারের কারণে তার কাছে কেউ আসতে পারে না। আবার মন্দ স্বভাবের কারণে তার প্রতি কারো আগ্রহও সৃষ্টি হয় না।

দ্বিতীয়জন বললো : 'আমি আমার স্বামীর খবর কাউকে বলবো না। তাকে ছেড়ে যেতেও আমার আশংকা হয়। আমি বলতে শুরু করলে আর থামতে পারবো না।' কিন্তু সে বলতে ভয় পায়। কারণ, তার স্বামী শুনলে তাকে তালাক দিবে। আবার এদিকে সন্তানাদীর মায়ায় শত কষ্ট সত্ত্বেও সে তাকে ছেড়ে যেতে রাজি নয়।

তৃতীয়জন বললো : আমার স্বামী অস্বাভাবিক লম্বা। কিছু বলতে গেলেই তালাকের হুমকি দেয়, আর চুপ থাকলে এভাবে ঝুলেই থাকতে হবে। সে যেন তরবারির অগ্রভাগের মতো ধারালো।

অর্থাৎ সে তার সাথে স্বামীসুলভ আচরণ করে না। ফলে মহিলাটি তার কাছে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। না স্ত্রীর অধিকার নিয়ে বেচে আছে, না তালাকপ্রাপ্ত নারী।

চতুর্থজন বললো : আমার স্বামী তিহামা অঞ্চলের রাতের ন্যায়। না ঠাণ্ডা, না গরম। ভয়ও নেই, বিরক্তিও নেই।

তিহামার রাতে বাতাসও থাকে না ধুলাও উড়ে না ফলে সেখানকার লোকজনের জন্যে সে পরিবেশটা খুবই আনন্দদায়ক। মহিলাটি তার মন্তব্যের মাধ্যমে প্রকারান্তরে নিজের স্বামীর উত্তম আচরণের বিবরণ দিলো।

পঞ্চমজন বললো ঃ আমার স্বামী বাড়ির ভেতরে চিতাবাঘের মতো আর বাইরে সিংহে মতো। ঘরের কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন না। অর্থাৎ সে যখন ঘরে ঢুকে তখন চিতার মতো হয়ে যায়। চিতা একটি প্রসিদ্ধ প্রাণী ভদ্র ও কর্মোদ্যম। আর যখন বাইরে গিয়ে মানুষের সাথে মিশে তখন সিংহের মতো সাহসী ভাব নিয়ে থাকে। আর সে একজন উদার ব্যক্তি। কেউ তার কোনো কিছু নিয়ে গেলে অযথা প্রশ্ন করে না।

ষষ্ঠজন বললো ঃ আমার স্বামী খেতে শুরু করলে সব শেষ করে ফেলে। আর পান করতে শুরু করলে পাত্র শুকিয়ে ফেলে। আর ঘুমাতে গেলে পুরো লেপ নিজের গায়ে জড়িয়ে নেয়। স্ত্রীর জন্য এক শোনাও অবশিষ্ট রাখে না। স্ত্রীর ভালো-মন্দ জানার গরজ বোধ করে না।

সপ্তমজন বললো ঃ আমার স্বামী নির্বোধ ও তার মধ্যে রয়েছে সব ধরনের রোগের সমাহার। কেউ তার সাথে কথা বলতে গেলেই গালি-গালাজ করে। আর কেউ তার সাথে হাসি ঠাট্টা করলে তার মাথা ফাটিয়ে দেয়, অথবা গায়ে আঘাত করে।

অষ্টমজন বললো ঃ আমার স্বামীর স্পর্শ খরগোশের গায়ের মতো মোলায়েম। শরীর থেকে ফুলের সৌরভ আসে। আমি তার উপর প্রবল থাকি। কিন্তু অন্য মানুষের উপর সে প্রবল থাকে।

নবমজন বললো ঃ আমার স্বামী অতিথি সেবায় অনেক অগ্রসর। আমাদের ঘর মেহমানখানার কাছেই। কোনো রাতে মেহমান এলে তিনি পেট ভরে খান না। কোনো রাতে আশংকাজনক কিছু হলে আর ঘুমান না। রাত জেগে আমাদেরকে পাহারা দেন।

দশমজন বললেন ঃ আমার স্বামী অনেক উটের মালিক তার নামও মালিক। উটগুলোর বসার জায়গা পর্যাপ্ত কিন্তু চারণক্ষেত্র সংকীর্ণ।

অর্থাৎ তার স্বামী সব সময় উটগুলোকে তার কাছে কাছে রাখে। চারণক্ষেত্রে পাঠায় না। যেন মেহমান আসামাত্র দুধ দোহন করে অথবা জবাই করে উপস্থাপন করতে পারে। আর উটগুলোও ছুরি শান দেয়ার আওয়াজ শোনামাত্র বুঝতে পারে যে, এখনি তাদের জীবনাবসান ঘটবে।

একাদশজন বললো ঃ আমার স্বামীর নাম আবূ যারা। আমাকে সে স্বর্ণের অলংকার পরিয়েছে। তার কাছে থেকে আমি সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েছি। সে আমার প্রশংসা করে, ফলে আমি নিজের উপর সন্তুষ্ট। আমাকে সে এমন এক পরিবার থেকে এনেছে যাদের কাছে সামান্য কিছু বকরি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আর এখন আমি এমন এক পরিবারে যাদের রয়েছে উট ও ঘোড়ার পাল। এছাড়া অন্যান্য প্রাণী তো আছেই। তার সামনে আমি যা খুশি তাই বলতাম। সে আমার কোনো কথার সমালোচনা করত না। রাতের ঘুমগুলো এতো আরামের মধ্য দিয়ে কাটতো যে কখন সকাল হতো টেরই পেতাম না। পানাহার করেও পরিতৃপ্ত হতাম। আর আবূ যারার মা? তার কথা কী আর বলবো। দেখতে বেশ সুন্দর। তার ঘরটা অনেক প্রশস্ত।

আবূ যারার ছেলেটার কথা শুনতে চাও? তার কথা আর কি বলবো। বেশ শান্ত শিষ্ঠ। ছোট্ট একটু জায়গায় আরাম করে ঘুমাতে পারে। অল্প খাবারেই পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। আর মেয়েটা ? সে তো মা বাবার অনেক অনুগত। নিজেকে আবৃত করে রাখে। তার সুখ ও সৌন্দর্যের কারণে তার সতীনদের ক্ষোভের পাত্র হয়ে আছে।।

আর তার দাসীটাও অভূতপূর্ব। ঘরের কোনো গোপন কথা ফাঁস করে না। কোনো খাবার নষ্ট করে না। ঘর দুয়ার নোংরা করে রাখে না।

এভাবে আমার দিনকাল বেশ সুখে শান্তিতেই কাটছিল। এরপর একদিন কী হলো জানো? একদিন সকালে আবূ যারা কোনো কাজে বের হলো। তখন দুধ থেকে মাখন বের করার জন্য ঘাঁটা হচ্ছিল। যাওয়ার পথে সে এক নারীকে দেখতে পেল। সে নারীর সাথে দোহারা গড়নের সুন্দর দুজন ছেলে ছিল। ছেলে দুটি মায়ের স্তন নিয়ে খেলা করছিল। এ দৃশ্য দেখে আবূ যারা তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। এরপর সে আমাকে তালাক দিয়ে ওই নারীকে বিয়ে করে ফেলে।

এরপর অন্য একজন নেতা টাইপের লোকের সঙ্গে আমার বিয়ে হলো। সে তরবারি হাতে তাজি ঘোড়ায় চড়ে বেড়ায়। আমাকে সে অনেক কিছু দিয়েছে। শুধু তাই নয় সব কিছু জোড়ায় জোড়ায় দিয়েছে। আর বলে

দিয়েছে যতটুকু পারো নিজে খাও আর বাকিটুকু তোমার বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দাও।।

এরপরে মহিলাটি তার প্রথম স্বামী আবূ যারার প্রতি তার আগ্রহের বিবরণ দিতে গিয়ে বললো, আমার দ্বিতীয় স্বামী আমাকে যা কিছু দিয়েছে তার সবগুলোকে যদি একত্র করি তবুও আবূ যারার ছোট্ট পেয়ালাটির সমান হবে না।

এই ছিল এগার নারীর ঘটনা। এ ঘটনাটি রাসূল ﷺ-এর মূল্যবান সময়ের কত বড় অংশ নষ্ট করেছে। কিন্তু তিনি স্ত্রীর আবেগ অনুভূতিকে মূল্যায়ন করে এবং তাকে খুশি করার জন্য তার গল্পের শ্রোতা হয়ে রইলেন।

তিনি যে ঘটনাটির মর্ম বুঝেছেন এ কথা বুঝানোর জন্য গল্পের শেষে বললেন, হে আয়েশা আমি তোমার জন্য কেমন জানো? আবূ যারা উম্মে যারার জন্যে যেমন ছিলেন আমি তোমার জন্য তেমন।

এ ঘটনাটি থেকে বোঝা গেল, মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা এবং তাদের আবেগ অনুভূতিতে শরিক হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মনে করুন, আপনার সন্তান সুন্দর জামা গায়ে সেজেগুজে আপনার কাছে এসে বললো, আব্বু আমাকে কেমন দেখাচ্ছে? তখন আপনি কী করবেন? তার আনন্দে আনন্দিত হয়ে বলুন, মাশাআল্লাহ! খুব চমৎকার লাগছে।

এভাবে ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী, সহকর্মী, সহপাঠি, বন্ধু-বান্ধবদের যাদের সাথেই আপনার উঠাবসা হয় সবার সাথেই প্রাণবন্ত ও উৎফুল্ল আচরণ করুন।

মনে করুন, কেউ আপনাকে বললো। জনাব, একটা সুসংবাদ আছে। আমার বাবা সুস্থ হয়ে গেছেন। তখন আপনি তাকে একথা বলবেন না যে, তিনি অসুস্থ হয়েছিলেন কবে? বরং বলুন, আলহামদুল্লিাহ আল্লাহ তাকে সুস্থতা এবং অসুস্থতার প্রতিদান উভয়টাই দান করুন। তুমি আমাকে আনন্দিত করলে আল্লাহ তোমাকে আনন্দিত করুন।

অথবা কেউ বললো, আমার ভাই জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে। তখন আপনি তাকে একথা বলবেন না যে, হায় আমি তো জানিই না যে, সে জেলে গেছে; বরং তার আনন্দে শরিক হয়ে বলুন, আলহামদুলিল্লাহ! খুশির সংবাদ শুনালে। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালো রাখুন।

বন্ধুগণ উৎসাহ প্রদান ও সহানুভূতি প্রকাশ শুধু মানুষকে নয় প্রাণীদেরকেও অনুপ্রাণিত করে। আবূ বকর আররাক্কী বলেছেন ঃ আমি একবার এক বেদুঈন পল্লীতে আরবের একটি গোত্রের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তাদের একজন আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তার তাবুতে নিয়ে গেল। সে তাবুর ভেতরে আমি একটি কালো দাসকে বন্দী অবস্থায় দেখতে পেলাম। তাবুটির সামনে কতগুলো মৃত উটও দেখলাম। অবশ্য একটি উট এত জীর্ণশীর্ণ ছিল যে, মনে হচ্ছিল এখনই তার প্রাণ বের হয়ে যাবে।

দাসটি আমাকে বললো ঃ আপনি মেহমান। আপনার অধিকার আছে। আমার মুনিবের কাছে আমার জন্য একটু সুপারিশ করুন। তিনি মেহমানের খুব সম্মান করেন। আমার আশা আপনার সুপারিশ তিনি প্রত্যাখ্যান করবেন না। আমি তাকে কিছুই বললাম না।

যখন আমার সামনে খাবার উপস্থিত করা হলো তখন আমি বললাম, এ গোলামের ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ না করা হলে আমি খাবার স্পর্শ করব না। মুনিব বললো ঃ 'ওতো আমাকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। আমার সব সহায় সম্পদ শেষ করে দিয়েছে।'

'সে কী করেছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'এই উটগুলোর মাধ্যমে মালপত্র পরিবহন করে আমার জীবিকার ব্যবস্থা হতো। সে এগুলোকে দিয়ে খুব ভারী বোঝা বহন করিয়েছে। তার গলার স্বর খুব সুন্দর। সে গাইতে গাইতে এগুলোকে নিয়ে যাচ্ছিল। আর উটগুলোও তার সুরের তালে চলে তিনদিনের পথ একরাতে অতিক্রম করেছে। এরপর বোঝাগুলো নামানোর সাথে সাথে এই শীর্ণ উটটি ছাড়া সবগুলো মরে গেছে। কিন্তু আপনি আমার মেহমান। আপনার সম্মানার্থে গোলামটি আপনাকে দিয়ে দিলাম।' এরপর তিনি উঠে গিয়ে গোলামটির বাঁধন খুলে দিলেন।

আবূ বকর বলেন ঃ আমার মনে তার এই আওয়াজ শোনার আগ্রহ জাগল। সকাল হওয়ার সাথে সাথে আমি তাকে একটি উট নিয়ে সেখানকার একটি কুয়ো থেকে পানি পান করিয়ে আনার জন্য বললাম। যেন উটটি সতেজ হয়ে উঠে।

যখন গোলামটি তার সুরযোজন করে গাইতে লাগল তখন উটটি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আত্মহারা হয়ে বাঁধন ছিড়ে ছুটতে লাগল। আমি তার সুর শুনে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম। আমি জীবনে এরচেয়ে সুন্দর কোনো সুর শুনি নি।

যদি প্রাণীরা পর্যন্ত সুন্দর আওয়াজের মাধ্যমে অণুপ্রাণিত হতে পারে তাহলে মানুষের ক্ষেত্রে আপনার কী মনে হয়?

ধীরে ধীরে নিজেকে এগিয়ে নিন...

প্রাণবন্ত ও সতেজ হোন।।

অনুভূতিহীন হয়ে থাকবেন না।

মানুষের মন জয় করুন।



Contents

৫৫. মিষ্টভাষী হোন

জীবনে চলার পথে কিছু ক্ষেত্র এমন আসে যখন অন্যকে উপদেশ দিতে হয়। নিজের ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী, বাবা-মা বা অন্য কাউকে। উপদেশগুলোর শুরু যেমন ভিন্ন হয় শেষও তেমন ভিন্ন হয়।

শুরুটা যদি হয় কোমল ভঙ্গিতে নরম ভাষায় তাহলে শেষটাও তেমনই হয়। আর শুরুটা যদি হয় রূক্ষ স্বরে, গরম মেজাজে তাহলে শেষটাও তেমনই হয়।

আমরা যখন মানুষকে উপদেশ দেই তখন আমরা মূলত তাদের হৃদয়রাজ্যে বিচরণ করি। দেহের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এ জন্য আপনি দেখবেন কিছু কিছু ছেলে-মেয়ে মায়ের উপদেশ মানে কিন্তু বাবারটা মানে না! কারো ক্ষেত্রে আবার এর ব্যতিক্রমও হয়।

আর ছাত্রদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, এক উস্তাদের উপদেশ মানে তো আরেকজনেরটা মানে না। আর উপদেশের ক্ষেত্রে প্রথম করণীয় হলো বেশি কথা না বলা এবং ছোটবড় সব খুটিনাটি বিষয়ে না বলা। যাতে করে সে একথা না ভাবে যে, আপনি তার পিছনে লেগেছেন। ফলে সে আপনাকে সহ্য করতে পারবে না।

তাই আপনি যদি পরামর্শ প্রদানের ভঙ্গিতে উপদেশ দিতে পারেন তাহলে সেটাই করুন।

একটি দৃষ্টান্ত ঃ আপনার স্ত্রী আপনার সামনে খাবার পরিবেশন করলো। খাবার রান্না করে সে এখন বেশ ক্লান্ত। কিন্তু লবণ একটু বেশি হয়েছে। এ মুহূর্তে বলবেন না উফ! কী রান্না করেছো! রান্নাটা একদম বাজে হয়েছে। লবণদানিতে কি আর লবণ ছিল না? লবণ দেয়ার সময় কি পরিমাণবোধ থাকে না? বরং এভাবে নরম স্বরে বলুন ঃ লবণটা একটু কম দিলে তরকারিটা আরো মজা হতো। এমনিভাবে আপনি যদি দেখেন যে, আপনার সন্তান ময়লা কাপড়-চোপড় পরে ঘুরছে তাহলে তাকে আপনি পরামর্শের ভঙ্গিতে বলতে। পারেন বাবা! তোমার পরনের কাপড়গুলো পরিবর্তন করে ধোয়া কাপড় পরলে কেমন হয়?

কোনো ছাত্র যদি মাদরাসায় দেরী করে আসে তাহলে বলুনঃ আর দেরী না করলে ভালো হবে। কেননা, মানুষ অন্যের দ্বারা আদিষ্ট হতে পছন্দ করে না। তাই সর্বদা এ ভঙ্গিতে কথা বলুনঃ এমন করলে কেমন হয়? আমি আপনাকে এমন করার পরামর্শ দিচ্ছি।

'বেয়াদব! তোমাকে কতবার বলেছি। তোমার জ্ঞানবুদ্ধি বলতে কিছুই নেই। তোমাকে আর কতকাল সতর্ক করতে হবে?' এভাবে বলার চেয়ে নরম ভঙ্গিতে বলা অবশ্যই উত্তম ও কার্যকর।

প্রত্যেককে তার মর্যাদা রক্ষা করতে দিন। সে অপরাধী হলেও তাকে তার মূল্য বুঝতে দিন। কারণ, উদ্দেশ্য তো হলো সংশোধন, প্রতিশোধ নেয়া কিংবা অপমান করা নয়। আমার ভাইয়েরা! মোট কথা হচ্ছে কেউ কারো আদেশে আদিষ্ট হতে পছন্দ করে না।

এক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর আদর্শ লক্ষ্য করুন।

একদিন নবীজি ﷺ আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তাহাজ্জুদ নামাযের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে চাইলেন। তিনি তাকে ডেকে একথা বলে দেন নি যে, হে আব্দুল্লাহ! আজ থেকে তুমি তাহাজ্জুদের নামায পড়বে; বরং তিনি পরামর্শের ভঙ্গিতে বলেছেন: 'আব্দুল্লাহ ভালো মানুষ, সে যদি তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত হতো তাহলে অনেক ভালো হতো।'

আরেক বর্ণনায় আছে তিনি বললেন ঃ 'তুমি অমুকের মতো হয়ো না, সে তাহাজ্জুদ পড়তো, কিন্তু এখন ছেড়ে দিয়েছে।'

আর যদি কাউকে বুঝতে না দিয়ে তার দোষের ব্যাপারে তাকে সচেতন করতে পারেন তাহলে তো আরো ভালো।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর সামনে এক লোক হাঁচি দিল কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ বললো না। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন হাঁচি দিলে কী বলতে হয়? সে বললো ঃ আলহামদুলিল্লাহ। এরপর তিনি বললেন ঃ ইয়ারহামুকাল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনই ছিলেন। তিনি আসর নামাযের পর একেক করে তাঁর স্ত্রীদের কাছে যেতেন। কুশল বিনিময় করতেন।

একদিন যায়নাব বিনতে জাহ্‌শ রাদিআল্লাহু আনহা-এর ঘরে গেলেন। তার কাছে মধু ছিল। আর রাসূল মধু ও মিষ্টি দ্রব্য পছন্দ করতেন। তাই মধু খেতে খেতে তার সাথে একটু বেশি সময় কথা বললেন। এর ফলে অন্যদের তুলনায় তার এখানে একটু বেশি সময় কাটলো। এটা আয়েশা এবং হাফসা রাদিআল্লাহু আনহা এর আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত করলো। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিলেন দুজনের যে কারো ঘরে তিনি আসবেন তিনি তাঁকে বলবেন ঃ আপনার মুখ থেকে মাগাফিরের গন্ধ আসছে। মাগাফির মধুর মতো এক প্রকার মিষ্টি পানীয়। কিন্তু দুর্গন্ধযুক্ত। আর রাসূলের জন্যে এটা অসহনীয় ছিল যে, তার মুখ থেকে কোনোরূপ দুর্গন্ধ আসবে। কারণ, জিবরাইল আলাইহিস সালাম এবং অন্যান্য মানুষের সাথে তার একান্তে কথা বলতে হয়।

এরপর যখন তিনি হাফসা রাদিআল্লাহু আনহা-এর ঘরে গেলেন তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কী খেয়েছেন? রাসূল বললেন ঃ যয়নাবের কাছ থেকে মধু পান করেছি। হাফছা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন ঃ আমি তো আপনার থেকে মাগাফিরের গন্ধ পাচ্ছি।

রাসূল বললেন ঃ না, আমি মধুই পান করেছি। এরপর আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা ও এমন বললেন। কয়েকদিন পর আল্লাহ সম্পূর্ণ বিষয়টি রাসূলকে অবগত করলেন।

এরও কিছুদিন পর রাসূল হাফসা রাদিআল্লাহু আনহা-কে একটা গোপন কথা বললেন। কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করে দিলেন।

একদিন তার কাছে গিয়ে দেখলেন শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ তার কাছে বসা। তিনি একজন মহিলা সাহাবী। চিকিৎসাবিদ্যা শিখে মানুষের চিকিৎসা করতেন।

রাসূল পরোক্ষভাবে হাফসার ভুল ধরিয়ে দিতে চাইলেন; যেন বেশি আঘাত না পান। তাই শিফাকে বললেন ঃ তুমি তাকে যেমন লিখা শিখিয়েছ তেমন পিঁপড়ার মন্ত্রটা শেখাতে পারো না?

পিঁপড়ার মন্ত্র তৎকালে আরব নারীদের মধ্যে খুব প্রচলিত ছিল। সবাই জানে এর দ্বারা কারো কোনো লাভ বা ক্ষতি হয় না।

পিঁপড়ার মন্ত্রটি ছিল নিম্নরূপ-

নববধূ ঘোমটা পরে
কলপ লাগায় চুলের পরে
ঠোঁট থেকে তার মুক্তো ঝরে
সুরমা লাগায় চোখে।
সবধরনের কাজ করে সে।
হেসে খেলে ঘর মাতায় সে।
স্বামীর আদেশ ভঙ্গ করে-
দুঃখ দেয় না তার বুকে।

রাসূল একথা বলে হাফসা রাদিআল্লাহু আনহা-কে ইঙ্গিতে শিক্ষা দিতে চাইলেন। এজন্য 'স্বামীর আদেশ ভঙ্গ করে দুঃখ দেয় না তার বুকে' অর্থাৎ স্বামীর অবাধ্যতা করে না এ বাক্যটি বারবার বললেন।

সতর্ক করার এ পদ্ধতি অন্যদের ভুল-ত্রুটি সংশোধনে খুব সুন্দর কাজ করে। এর মাধ্যমে ভালোবাসার বন্ধনও অটুট থাকে। বেশি উপদেশ ভালো বাসাকে ঘোলাটেও করে। এক বুজুর্গের কাছ থেকে একজন লোক একটা কিতাব নিয়েছিল। কিছুদিন পর যখন ফেরৎ দিচ্ছিল তখন তাতে খাবারের দাগ দেখা গেল। হয়ত সে এর উপর রুটি বা আঙ্গুর রেখেছিল। বুজুর্গ তাকে কিছুই বললেন না।

কিছুদিন পর লোকটি আবার আরেকটি কিতাবের জন্যে বুজুর্গের কাছে এলো। তখন বুজুর্গ একটি প্লেটের ওপর কিতাবটি রেখে তাকে দিলেন। লোকটি অবাক হয়ে বললো ঃ আমি তো শুধু কিতাব চেয়েছি সাথে প্লেট দিলেন কেন? তখন বুজুর্গ বললেন ঃ কিতাব দিয়েছি পড়ার জন্য আর প্লেট দিয়েছি খাবার রাখার জন্য। তখন সে কিতাব নিয়ে বলে গেল, আপনি যা বোঝাতে চেয়েছেন আমি তা বুঝেছি।

আরেক ব্যক্তির ঘটনা মনে পড়ে গেল। তিনি রাতে বাড়ি ফিরে জামা খুলে স্ট্যান্ডে রেখে ঘুমিয়ে পড়তেন। স্ত্রী এসে সুযোগ বুঝে পকেটে রক্ষিত মানিব্যাগ থেকে কিছু টাকা নিয়ে নিত।

একদিন সে লোক সকালে ঘুম থেকে উঠে অফিসে চলে গেল। এক দোকানে কিছু টাকা দেয়ার প্রয়োজন হলো। তখন পকেটে হাত দিয়ে দেখেন কিছু টাকা নেই। তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন। ভাবতে লাগলেন, টাকা গেল কোথায়? এরপর রাতে ঘুমের ভান ধরে শুয়ে রইলেন। টাকা কোথায় যায় তা তিনি বুঝে ফেললেন।

পরদিন আসার সময় পকেটে করে ব্যাঙ নিয়ে আসলেন। বরাবরের মতো স্ট্যান্ডে কাপড় ঝুলিয়ে রেখে ঘুমের ভান ধরে নাক ডাকতে লাগলেন। গোপনে কাপড়ের দিকে নজর রাখলেন। তার স্ত্রী আগের অভ্যাসমত ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো। আস্তে করে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। ব্যাঙের গায়ে হাত লাগামাত্র চিৎকার দিয়ে বলে উঠল উহ! আমার হাত গেলো! এবার স্বামীও চোখ খুলে চিৎকার দিয়ে উঠল উহ! আমার পকেট সাবার হলো ।

আহ! কতো ভালো হতো আমরা যদি আমাদের ছেলে-মেয়ে, ছাত্র-ছাত্রী সবার ভুলগুলো এভাবে সংশোধন করার চেষ্টা করতাম!

আমার বন্ধু নায়েফের মা খুব পরহেজগার মহিলা ছিলেন। ঘরে কোনো ছবি থাকুক এটা তিনি একদম পছন্দ করতেন না। কারণ যে ঘরে কুকুর বা প্রাণীর ছবি থাকে তাতে ফেরেস্তা প্রবেশ করে না । তার ছিল একটি ছোট্ট মেয়ে। মেয়েটির হরেক রকমের খেলনা ছিল। ছিল না শুধু পুতুল । মা তাকে পুতুল কিনে দিতেন না। এটা ছাড়া যা সে কিনতে চাইতো তাই কিনে দিতেন। তার খালা একদিন তাকে একটা নববধূর সাজে সজ্জিত একটি পুতুল কিনে দিয়ে বললো ঃ চুপেচুপে তোমার রুমে বসে খেলবে। সাবধান! তোমার আম্মু যেন না দেখে!!

দুদিন পর মা জেনে ফেললেন। সুন্দরভাবে তাকে উপদেশ দিতে চাইলেন। সবাই খাবার টেবিলে বসা। মা হঠাৎ বলে উঠলেনঃ দুদিন ধরে আমার কাছে মনে হচ্ছে আমাদের ঘরে কোনো ফেরেস্তা আসছে না। আমি জানি না, তারা কী জন্য চলে গেল?

নায়েফের ছোট্ট বোনটি নিরবে শুনল। খাবার শেষে তার রুমে গিয়ে পুতুলটি মায়ের কাছে নিয়ে এসে বললো ঃ আম্মু আম্মু এটিই আমাদের ঘর থেকে ফেরেস্তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। তুমি এটাকে যা খুশী করতে পারো।

অন্যদের ভুল সংশোধন করার জন্য এবং কল্যাণকামী হওয়ার জন্যে এটা কত উত্তম পন্থা! । এভাবে বললে সহমর্মিতা প্রকাশ পায়। কেউ বিরক্তও হয় না।

আপনি যাকে উপদেশ দিচ্ছেন তাকে তার সম্মান রক্ষা করতে দিন। যদি মৌচাক না ভেঙ্গে মধু খেতে পারেন তাহলে কষ্ট করার কী দরকার?

কেউ কোনো অন্যায় কাজ করে ফেললে তাকে এমনভাবে উপদেশ দিবেন না যেন, সে কাজটি করে কুফুরী করে ফেলেছে; বরং তার প্রতি ধারণা ভালো রাখুন। মনে করবেন, সে অনিচ্ছায় কিংবা না জেনে ভুল করে ফেলেছে।

ইসলামের সূচনাকালে মদ হারাম ছিল না। এরপর কয়েক ধাপে এটা হারাম হওয়ার বিধান নাযিল হয়েছে। প্রথম ধাপে আল্লাহ মদের প্রতি নিরুৎসাহিত করেছেন, পরিপূর্ণ হারাম করেন নি। এ ব্যাপারে আয়াত নাযিল হলো-

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

অর্থ : তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাস করে। আপনি বলুন: এ দুটিতে রয়েছে বিরাট পাপ। আর মানুষের জন্যে কিছু উপকার।

(সূরা বাকারা : আয়াত-২১৯)

এরপর দ্বিতীয় ধাপে নামাযের পূর্বক্ষণে মদপান হারাম করে দিয়ে বললেন-

لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ

অর্থ : 'হে ঈমানদাররা! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের ধারে কাছে যেয়ো না; যতক্ষণ না তোমরা কী বলছো তা বুঝতে না পারো।

(সূরা নিসা : আয়াত-৪৩)

তখন দেখা গেল মদপানে অভ্যস্ত লোকজন নামাযে ব্যস্ততার কারণে মদ পানের সময়ই পাচ্ছে না।

এরপর সবশেষে আল্লাহ বললেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

অর্থ : 'নিশ্চয় মদ জুয়া প্রতিমা ও তীর দিয়ে নির্ধারণকৃত বস্তু নাপাক ও শয়তানী কার্যকলাপ। অতএব তোমরা এগুলো থেকে দূরে থাকো; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।' (সূরা মায়েদা : আয়াত-৯০)

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সবাই মদপান ছেড়ে দিয়ে তা থেকে চিরতরে তওবা করে ফেলল। অবশ্য মদিনার বাইরে থাকার দরুন কিছু লোক মদ হারাম হওয়ার বিষয়টি অবগত হয় নি। ফলে তারা সাথে সাথে এ আয়াত মোতাবেক আমল করতে পারে নি।

একদিন সাহাবি আমের বিন রাবীয়া সফর থেকে ফেরার সময় এক মশক ভর্তি মদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য উপঢৌকনস্বরূপ নিয়ে এলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়ত প্রাপ্তির আগে কিংবা পরে কখনোও মদ পান করেন নি। কিন্তু সে যুগের প্রচলন অনুযায়ী হাদিয়া শুধু নিজের ব্যবহারের জন্যেই দেয়া হতো না। চাইলে সে অন্যকে হাদিয়াও দিতে পারত কিংবা বিক্রিও করতে পারত। তাই দেখা গেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কেউ কেউ স্বর্ণ বা রেশম হাদিয়া দিতো। কিন্তু তিনি সেগুলোকে ব্যবহার না করে স্ত্রীদেরকে বা অন্য কাউকে হাদিয়াস্বরূপ দিয়ে দিতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মদ হাদিয়া দেয়াতে তিনি অবাক হয়ে মদের দিকে তাকালেন। এরপর আমের বিন রাবীয়ার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, মদ হারাম হয়ে যাওয়ার বিষয়টি কি তুমি জানো নি? তিনি বললেন: না, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি বিষয়টি জানি নি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মদ, হারাম হয়ে গেছে।

এবার আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে থেকে মদের মশক সরিয়ে ফেললেন।

কেউ এসে তাকে গোপনে এটা বিক্রি করে দেয়ার পরামর্শ দিলো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কানে এ কথা পৌঁছামাত্র তিনি বললেন, না আল্লাহ যখন কোনো বস্তুকে হারাম করেন তখন তার মূল্যও হারাম করে দেন।

আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু একথা শুনামাত্র মদগুলো মাটিতে ঢেলে দিলেন।

সাবধান! কাউকে উপদেশ দেয়ার সময় নিজের প্রশংসা করে নিজেকে আসমানে উঠিয়ে ফেলবেন না। আর ঐ বেচারাকে একদম জমিনে ধ্বসিয়ে দেবেন না। এটা কেউ পছন্দ করে না।

কিছু বাবাকে দেখা যায়, ছেলেকে উপদেশ দেয়ার সময় নিজের যারপরনাই প্রশংসা করতে থাকেন। ছোটকালে আমি এমন ছিলাম তেমন ছিলাম। কাউকে উপদেশ দেয়ার সময় যদি কোনো উপমা পেশ করতে হয় তাহলে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে নিজের উপমা পেশ না করে বড় ও বিখ্যাত কারোর উপমা পেশ করতে। নিজের কৃতিত্ব অন্যের সামনে যত না বলা যায় তত ভালো। কারণ এতে আপনি যাকে উপদেশ দিচ্ছেন সে ভাববে, আপনি নিজের প্রশংসা করে তাকে হেয় করছেন।

সংক্ষেপে : উত্তম কথাও একধরনের সদকা।

৫৬. কথা সংক্ষেপ করুন বিতর্ক এড়িয়ে চলুন

অভিজ্ঞরা বলেন ঃ উপদেশদাতা হলেন জল্লাদের মতো। জল্লাদের দক্ষতা ও কৌশলের ওপর নির্ভর করে শাস্তির তীব্রতা ও স্থায়িত্ব। খেয়াল করুন, আমি জল্লাদের দক্ষতা ও কৌশলের কথা বলেছি। জল্লাদের শক্তির কথা বলি নি। কেননা, শক্তিশালী কিন্তু আনাড়ি জল্লাদ সজোরে প্রহার করলেও এর যন্ত্রনা স্থায়ী নাও হতে পারে। কিন্তু অভিজ্ঞ জল্লাদের জোরে মারার দরকার হয় না। জায়গা মতো এক ঘা বসিয়ে দিলেই যথেষ্ট হয়ে যায়। এটা অপরাধীর আজীবন মনে থাকে। উপদেশদাতাও অনুরূপ। বেশি কথা বলা বা দীর্ঘ নসীহত করার দরকার নেই। মানুষ লক্ষ করে কার বলার ভঙ্গিমাটা কেমন। অতএব, যথাসম্ভব কথা সংক্ষেপ করুন।

বিশেষত উপদেশের বিষয়বস্তু নিয়ে যখন কারো কোনো দ্বিমত থাকে না তখন কথা লম্বা করার কোনো প্রয়োজন নেই। যেমন আপনি কাউকে রাগান্বিত না হওয়ার বা মদ পান না করার বা নামায না ছাড়ার বা মা-বাবার অবাধ্যতা না করার ইত্যাদি বিষয়ের উপদেশ দেয়ার সময় রাসূল ﷺ-এর উপদেশগুলো খেয়াল করতে পারেন। দেখবেন রাসূল ﷺ-এর উপদেশগুলো একদুই লাইনের বেশি নয়। নিচে এর কিছু দৃষ্টান্ত দেখুন-

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে রাসূল ﷺ-এর উপদেশ:

'হে আলী, কোনো বেগানা নারীর প্রতি একবার দৃষ্টি পড়ার পরে তুমি দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দিওনা। প্রথম বারের দৃষ্টি মার্জনীয়। কিন্তু দ্বিতীয়বারের অনুমতি নেই।' কত সংক্ষেপ নসিহত।

ওমরের পুত্র আব্দুল্লাহকে নসিহত:

হে ওমরের পুত্র আব্দুল্লাহ! দুনিয়াতে তুমি এমন ভাবে থাকবে যেন একজন মুসাফির, অথবা পথিক।

মুআ'যকে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নসিহত:

মুআ'য আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি প্রত্যেক নামাযের পরে এ দোআ পড়তে ভুলো না-

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّیْ عَلٰی ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

অর্থ : 'হে আল্লাহ আপনি আমাকে আপনার স্মরণ করার, আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার এবং উত্তমরূপে আপনার ইবাদত করার তৌফিক দিন।'

(সুনানে আবূ দাউদ-১৩০১)

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নসিহত:

'ওমর তুমি তো অনেক বলবান পুরুষ। অতএব তুমি হাজরে আসওয়াদের কাছে ভীড় করো না।'

এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরবর্তী মনিষীরাও উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত কথা বলতেন।

নিম্নে এর কিছু নমুনা দেখুন-

একবার আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বিখ্যাত কবি ফারাযদাকের দেখা পেয়ে বললেন ঃ ভাতিজা আমি তোমার পা দুটিকে খুব ছোট দেখতে পাচ্ছি। তুমি তো জান্নাতে এগুলোর জন্য কোনো জায়গা পাবে না। অতএব এখনো সময় আছে, জান্নাতে যাওয়ার কাজ করো এবং তোমার কবিতায় সতী নারীদেরকে অপবাদ দেয়া থেকে বিরত থাকো।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মৃত্যুর শয্যায় তখন লোকেরা একের পর এক তার কাছে এসে তাকে বিদায় জানাচ্ছিল।

এক যুবক এসে বললো ঃ আমীরুল মুমিনীন আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংস্পর্শে ধন্য হয়েছেন। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। এগুলোতো আপনার জানাই আছে। এরপর খেলাফতের দায়িত্ব যথাযথ ইনসাফের সাথে পালন করেছেন। সবশেষে শাহাদাতের মৃত্যু বরণ করছেন। আপনি কত ভাগ্যবান!

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি চাই এগুলো সব যেন সমান সমান হয়ে যায়। আমার পক্ষেও না যাক আবার আমার বিপক্ষেও না যাক। এরপর যখন যুবকটি যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু লক্ষ্য করলেন, যুবকের লুঙ্গি টাখনুর নিচে ঝুলে আছে। তিনি তাকে এব্যাপারে কিছু বলার জন্যে ডেকে পাঠালেন। সে সামনে এসে দাঁড়ানোর পর বললেন, ভাতিজা ঃ কাপড় উঠাও। এতে তোমার কাপড়ও পরিষ্কার থাকবে এবং আল্লাহও সন্তুষ্ট হবেন।

যথাসাধ্য ঝগড়া এড়িয়ে চলুন। বিশেষ করে যখন আপনি আঁচ করতে পারবেন যে, আপনার সামনের লোকটি অহংকারী। তখন উপদেশ দিতে হলে কেবল উপদেশটুকু বলে দিন। ঝগড়ার প্রয়োজন নেই। কারণ আল্লাহ তর্ক অপছন্দ করেন।

মহান আল্লাহ বলেন-

مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا.

অর্থ : তারা কেবল কূটতর্কের জন্যই এ দৃষ্টান্ত আপনার সামনে পেশ করে। (সূরা যুখরুফ : আয়াত-৫৮)

রাসূল ﷺ বলেছেন-

مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوْا عَلَيْهِ اِلَّا اُوْتُوا الْجَدَلَ.

অর্থ : 'যে কোনো জাতির হেদায়েত প্রাপ্তির ঘর পুনরায় পথভ্রষ্ট হওয়ার পিছনে প্রধান কারণ হলো তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়া।' (আহমদ : ২২১৬৪)

এই জন্যই বলা হয়- বিশ্বাসে আল্লাহ মিলে তর্কে বহু দূর।

তিনি আরো বলেছেন-

اَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِىْ رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَاِنْ كَانَ مُحِقًّا.

অর্থ : আমি জান্নাতের উপকণ্ঠে ঐ ব্যক্তির জন্যে একটি প্রাসাদের দায়িত্ব নিচ্ছি যে তর্কের অধিকার রাখা সত্ত্বেও এ থেকে বিরত থাকে।

(আবূ দাউদ : ৪৮০০)

কিছু মানুষ আছে যারা নিজেদের চিন্তা ভাবনা নিয়েই আত্মতুষ্টিতে থাকে। যেমন আল্লাহ তাআলা ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বলেছেন- তারা সত্যকে সত্য হিসেবে জানা সত্ত্বেও অহংকারবশত তা মানতে পারে নি।

তাদের ব্যাপারে আল্লাহতাআলা বলেন–

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّ عُلُوًّا.

অর্থ : 'তারা (আয়াতসমূহকে) মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও অন্যায়ভাবে এবং অহংকারবশত সেগুলোকে অস্বীকার করেছে।' (নামল : আয়াত-১৪)

কাউকে উপদেশ দেয়ার উদ্দেশ্য হলো সে যেন নিজের ভুলটা বুঝতে পেরে ভবিষ্যতে তা থেকে বিরত থাকে। তার ওপর বিজয়ী হওয়া উদ্দেশ্য নয়। আপনারা কোনো লড়াই ক্ষেত্রে লড়াই করছেন না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার রাতে আলী ও ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহুমা-এর কাছে গিয়ে বললেন, তোমরা কি তাহাজ্জুদ পড়বে না? তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমাদের রুহ তো আল্লাহর হাতে। তিনি যখন চান উঠাবেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছ থেকে চলে এলেন। ফিরে আসার সময় নিজের উরুতে আঘাত করতে করতে বলছিলেন-

وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا.

অর্থ : মানুষ তো আসলে অনেক তর্কপ্রিয়। (সূরা কাহাফ : আয়াত-৫৪)

কখনো দেখবেন আপনি যাকে উপদেশ দিচ্ছেন সে নিজের লজ্জা ঢাকার জন্যে এমন যুক্তি ও ওজর উপস্থাপন করছে যা মূলত কোনো ওজর নয়। তখন আপনি কী করবেন? তার ওজর মেনে নিবেন। তার সাথে কঠোরতা করবেন না।

কাউকে উপদেশ দেয়ার সময় একেবারে আষ্ঠেপৃষ্ঠে বেধে ফেলবেন না। তার জন্য এগজিট ওয়ে বা বের হওয়ার পথ খোলা রাখবেন। এমনকি সে যদি কোনো ভুল কথাও বলে ফেলে এবং আপনার তা সংশোধন করার সুযোগ থাকে তাহলে তাই করবেন। প্রথমে তার কথার প্রশংসামূলক কোনো দিক থাকলে সে দিক নিয়ে প্রশংসা করুন। তারপর যা বলার বলুন। এরপর তার কথাকে প্রত্যাখ্যান করুন। যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

এক পলক

ভুলটাকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিন। দীর্ঘ ভাষণে প্রবৃত্ত হবেন না।



৫৭. সবার কথায় কান দিতে নেই

আমার ছেলে আব্দুর রহমান। একদিন একটি প্রবচন কোথা থেকে যেন শিখে বারবার আওড়াচ্ছিল। এটা শুনে আমার খুব ভালো লাগলো। আমার ধারনা, এত অল্প বয়সে সে এ প্রবচনটির অর্থ বুঝতে সক্ষম নয়। সে বলছিল-

طَنِّشْ تَعِشْ تَنْتَعِشْ.

'মানুষের কথায় কান দিয়ো না। সুন্দরভাবে বেঁচে থাকো।'

এ প্রবচনটি নিয়ে আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করলাম। এরপর মানুষের আলোচনা, পর্যালোচনা ও সমালোচনা নিয়ে ভেবে দেখলাম। আমি দেখলাম অন্যের আলোচনা ও সমালোচনার ক্ষেত্রে মানুষ কয়েক প্রকার।

কেউ তো মানুষকে আন্তরিকভাবে উপদেশ দেয় কিন্তু এ বিষয়ে তার পারদর্শিতা না থাকায় কথা বলতে গিয়ে সে শ্রোতাকে যতটা না খুশি করে তার চেয়ে বেশি কষ্ট দিয়ে ফেলে।

আবার কেউ আছে হিংসুক প্রকৃতির। তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে অন্যকে উদ্বিগ্ন করে রাখা। আবার কেউ তো এমন যে তার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বুদ্ধি কম, সে না জেনে না বুঝে অন্ধকারে ঢিল ছুড়তে থাকে। এ ধরনের লোক চুপ থাকাটাই বেশি ভালো। আবার কেউ আছে যার স্বভাবই হচ্ছে অন্যের ছিদ্র অন্বেষণ করা। এ ধরনের লোক সবকিছুই কালো চশমা দিয়ে দেখে।

প্রাচীন কাল থেকে একটা কথা প্রসিদ্ধ আছে, সব মানুষের রুচি এক হয়ে গেলে বৈচিত্র্যময় পণ্যসামগ্রী অচল হয়ে পড়তো।

প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা শুনুন। জুহা নামের এক ভদ্র লোক ছিল। সে একদিন একটি গাধার পিঠে চড়ে কোথাও যাচ্ছিল। তার ছেলে তার পাশে পায়ে হেঁটে চলছিল। তারা কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলো। লোকেরা বললো, দেখো এটা কেমন নির্দয় বাবা! নিজে আরামে গাধায় চড়ে যাচ্ছে আর ছেলেটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

জুহা তাদের কথা শুনে গাধার পিঠ থেকে নেমে ছেলেকে গাধার পিঠে চড়ালো। এরপর নিজে পায়ে হেটে যেতে লাগল। একটু যাওয়ার পর

আবার আরেক দল লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলো। তাদের একজন বললো ঃ দেখেছ ছেলেটা কত বেয়াদব! নিজে আরামে গাধায় চড়ে যাচ্ছে আর পিতাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

জুহা একথা শুনে ছেলের সাথে নিজেও গাধায় চড়ে বসল। কেননা, মানুষের কথা থেকে তো বাঁচতে হবে।

এবার যখন আরেক দল লোকের পাশ দিয়ে গেল তখন তারা বলতে লাগল এদেরকে একটু দেখো! এরা কেমন নির্দয়! ছোট্ট এই প্রাণীটার ওপর কিভাবে তারা চেপে বসেছে।

একথা শুনে জুহা নিজে নেমে পড়ল। এরপর ছেলেকে বললো: বাবা তুমিও নেমে পড়ো।

এবার খালি গাধা নিয়ে দুজনই হেঁটে চলতে লাগল।

চলতে চলতে আবার কিছু লোকের সামনে পড়ল। তারা দেখে বললো দেখো দেখো এরা কত বোঁকা! গাধার পিঠ খালি থাকা সত্ত্বেও এরা হেঁটে যাচ্ছে।

এবার জুহা চিৎকার দিয়ে গাধাটিকে নিজেদের কাঁধে উঠিয়ে নিল। ছেলেকেও বললো তাকে সাহায্য করার জন্য।

জুহার কাহিনী এখানেই শেষ।

আমি যদি তখন তাদের সাথে থাকতাম আর জুহার সে পরিণতি দেখতাম, তাহলে জুহাকে বলতাম ঃ

ভাই, তোমার মন যা চায় তাই করো। লোকে যা বলে তা সব শুনে তুমি চলতে পারবে না। মানুষের সন্তুষ্টি এমন সুউচ্চ অবস্থানে অবস্থিত যেখানে পৌঁছার সাধ্য কারো নেই।

কে আছে এমন যে মানুষের কথা থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে।

সে যদি শকুনের ডানার নিচে গিয়েও লুকায় তবুও মানুষ তাকে খুঁজে বের করে তার সমালোচনা করবে।

কিছু মানুষ আছে চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই মতামত দিতে থাকে। মনে করুন, আপনি বিয়ে করেছেন। বিয়ের পর আপনার কাছে এসে বলবে, এই

মেয়েটাকে বিয়ে করলেন কেন? আপনি তো এর চেয়ে ভালো মেয়ে বিয়ে করতে পারতেন।

আমার পরামর্শ হলো আপনি এমন কারো পাল্লায় পড়লে সোজা তার মুখের ওপর বলে দেবেন: ভাইজান, আমি তো বিয়ে করে ফেলেছি। তোমার কাছে তো আমি কোনো পরামর্শ চাই নি?

আপনি আপনার গাড়িটি বিক্রি করে ফেলার পর কেউ এসে বলছে, আপনি আমাকে জানালেন না কেন? অমুক ত আরো বেশি দামে কিনত। ভাই লোকটার গাড়ি বিক্রি করার প্রয়োজন ছিল। সে বিক্রি করে ফেলেছে। এখন এটা নিয়ে কথা বলার কী দরকার?

আপনি পাহারের চূড়ায় গিয়ে নির্জনতা অবলম্বন করলেও সমালোচনা কারীদের হাত থেকে বাঁচতে পারবেন না।

অতএব, নিজেকে কষ্ট দেবার দরকার নেই।

একটি অভিজ্ঞতা

জনৈক বুজুর্গ বলেন, যে বিতর্ককারীদের পাল্লায় পড়ে
তার মতামত ঘনঘন পাল্টায়।



Enjoy your life-25

৫৮. হাসুন ... প্রাণ খুলে হাসুন

আমার এক সহকর্মী। তাকে আমি অনেক বছর যাবৎ চিনি। একসঙ্গেই আমাদের ওঠাবসা ও চলাফেরা। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, তার মুখে দাঁত আছে কিনা এ ব্যাপারে আমি সন্দিহান। কেননা, সে সবসময় মুখ মলিন করে রাখে। তার ঠোঁটে কখনো হাসির রেখা ফোটে না। আমার ধারণা, সে হয়তো মনে করে, হাঁসলে আয়ু কমে যাবে! কিংবা ধন-সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অথচ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল দেখুন। জারীর বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখলেই মুচকি হাসি দিতেন।'

মুচকি হাসিরও বিভিন্ন স্তর আছে।

তারই একটি হলো, সর্বদা হাসিমুখে থাকা। চেহারায় সব সময় মুচকি হাসির ঝিলিক থাকা।

আপনি যদি শিক্ষক হন, শ্রেণি কক্ষে প্রবেশ করেই মুচকি হাসির আভা দিয়ে ছাত্রদের মন জয় করে দিন। বিমানে চড়েছেন কিংবা ফুটপাথ ধরে হাঁটছেন, মানুষ দেখছে আপনাকে, আপনার চেহারায় যেন থাকে হাসির রেখা। সবজি কেনার জন্য বাজারে গেছেন কিংবা পেট্রোল নেয়ার জন্য ফিলিং স্টেশনে গিয়েছেন। দোকানি বা ম্যানেজারের সাথে হাসিমুখে কথা বলুন। হাসিমুখে পাওনা পরিশোধ করে ফিরে আসুন।

আপনি কোনো সভাকক্ষে উপস্থিত আছেন। সেখানে কেউ প্রবেশ করে উচ্চস্বরে সালাম দিলো এবং উপস্থিত সকলের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে লাগলো। আপনি মিষ্টি হেসে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করুন।

আপনি নিজে কোনো হলরুমে প্রবেশ করেছেন। হাসিমুখে সবার সঙ্গে করমর্দন করুন। একটুখানি মুচকি হাসি ক্ষোভ, ক্রোধ ও সন্দেহের লেলিহান শিখা মুহূর্তের মধ্যে নিভিয়ে দিতে পারে। এর মধ্যে এতো ক্ষমতা রয়েছে যা অন্য কিছুতে নেই। তাই সবসময় চেহারায় হাসির রেখা ছড়িয়ে রাখুন। প্রকৃত বীর তো সে-ই, যে নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং কঠিন পরিস্থিতিতেও ঠোঁটের কোণে নির্মল হাসির আভা ছড়িয়ে দিতে পারে।

একদিন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে হাঁটছিলেন। রাসূল ﷺ-এর পরনে ছিলো মোটা পাড়ের নাজরানী চাদর। হঠাৎ জনৈক বেদুঈন তাদের দু'জনের পিছু নিলো। বেদুঈনটি রাসূল ﷺ-এর নাগাল পাওয়ার জন্য দ্রুতবেগে আসছিল। সে রাসূল ﷺ-এর কাছাকাছি এসে রাসূল ﷺ-এর চাদর ধরে জোরে টান দিলো। আনাস বলেন, 'জোরে টান দেয়ার কারণে আল্লাহর রাসূলের পিঠ প্রকাশিত হয়ে পড়লো এবং আমি দেখলাম, রাসূল ﷺ-এর পিঠে দাগ বসে গেছে।'

কী চায় এই বেদুঈন?

হয়তো আগুন লেগে তার ঘর বাড়ি পুড়ে গেছে। তাই সে সাহায্যের জন্য এসেছে। কিংবা কাফেরদের আক্রমণে তার সহায়–সম্পত্তি সব ধ্বংস হয়ে গেছে তাই সে সহায়তা লাভের আশায় ছুটে এসছে। শুনুন, সে কী বললো।

সে বললো, 'হে মুহাম্মাদ!' (সে কিন্তু 'আল্লাহর রাসূল' বলেও সম্বোধন করেনি)। তোমার কাছে যে সম্পদ আছে, তা থেকে আমাকে কিছু দিতে বলো।'

রাসূল ﷺ তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। এরপর তাকে কিছু সম্পদ দিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন।

কত মহান ছিলেন তিনি! কত প্রশস্ত, কত উদার ছিলো তার মন!

তিনি ছিলেন উদারতার মহান প্রতীক এক বীর পুরুষ। তাই এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতেও নিজেকে তিনি পূর্ণ সংযত রেখেছেন এবং উদারতা দেখিয়েছেন। এক টুকরো হাসি উপহার দিয়ে সবকিছু মেনে নিয়েছেন।

এভাবে সবসময় তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। উদারতা দেখাতেন। যেকোনো কাজের আগে তার পরিণাম নিয়ে ভাবতেন। কঠিন পরিস্থিতিতেও চেহারায় স্নিগ্ধ হাসির আভা জ্বলজ্বল করতো। অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে পেশি ফুলে উঠতো না।

তিনি রাগ করে লোকটাকে ধমক দিলে বা তাড়িয়ে দিলে কী লাভ হতো? রাসূল ﷺ-এর পিঠের ব্যথা কি ভালো হয়ে যেতে? বেদুঈন লোকটির আচার-আচরণ কি ঠিক হয়ে যেতো? কখনোই না।

সবর ও ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা দ্বারা যা অর্জিত হয়, তার কিছুই হতো না। মাঝে মাঝে এমন কিছু কাজ ও আচরণে আমরা উত্তেজিত হয়ে পড়ি, রেগে যাই। অথচ উত্তেজনা ও ক্রোধের মাধ্যমে সমাধান পাওয়া যায় না। কোমল আচরণ, নরম ব্যবহার এবং ছোট্ট একটু মুচকি হাসি দিয়ে আমরা সহজেই অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারি। অন্যের প্রতি সুধারণা, ক্রোধ সংবরণ করে আমরা মানুষের মন জয় করতে পারি।

রাসূল ﷺ বলেছেন-

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

অর্থ : যে মল্লযুদ্ধে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করতে পারে সে প্রকৃত বীর পুরুষ নয়। প্রকৃত বীর তো সে, যে ক্রোধের সময় আত্মসংবরণ করতে পারে।

(সহীহ বুখারী: ৫৬৪৯, সহীহ মুসলিম: ৪৭২৩)

রাসূল ﷺ মুচকি হাসি দিয়ে হাসিমুখে সবাইকে কাছে টেনে নিতেন।

খায়বর যুদ্ধের ঘটনা। যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল রাদিয়াল্লাহু আনহু শত্রুদুর্গ থেকে ঘি-ভর্তি একটি বড় পাত্র সংগ্রহ করলেন। এরপর তিনি তা কাঁধে নিয়ে আনন্দচিত্তে সঙ্গীদের কাছে ফিরতে উদ্যত হলেন।

রাস্তায় গনিমত সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বশীল সাহাবীর সঙ্গে তার দেখা হলো। তিনি পাত্রটি আটকে দিলেন। বললেন, 'এটা দিয়ে দাও। আমি মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দেবো।'

কিন্তু আবদুল্লাহ পাত্রটি শক্ত করে ধরে রাখলেন। তিনি বললেন, 'আমি এটা পেয়েছি। আল্লাহর কসম! কিছুতেই তোমাকে এটা দেবো না।'

দায়িত্বশীল সাহাবীও নাছোড়বান্দা! সে না নিয়ে যাবে না।

দু'জনই পাত্রটি নিয়ে টানাটানি করছেন। ইতোমধ্যে আল্লাহর রাসূল ﷺ সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি দৃশ্যটি দেখলেন।

এরপর মুচকি হেসে দায়িত্বশীল সাহাবীকে বললেন, 'ঠিক আছে, আবদুল্লাহকে এটা দিয়ে দাও।'

রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ মেনে তিনি ছেড়ে দিলেন। আর আবদুল্লাহ পাত্রটি নিয়ে তার সঙ্গীদের কাছে চলে গেলেন। এরপর সবাই মিলে তা খেলেন।

শেষ কথা হলো, কোনো মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতে আপনার একটু মুচকি হাসিও সদকার সমতুল্য সওয়াব বহন করে।

আদর্শ...

রাসূল ﷺ যখনই আমাকে দেখতেন, একটু মুচকি হাসতেন।



৫৯. লাল দাগ অতিক্রম করবেন না

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এক ছাত্র সামাজিকতা রক্ষায় ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরিতে খুব আগ্রহী ছিল। ।

কিন্তু লোকজন তার সাথে সম্পর্ক রাখতে চাইতো না। সবার কাছেই সে ছিলো বিরক্তিকর।

একদিন সে আমার কাছে এসে বললো, 'স্যার! আমার সহপাঠীরা সব সময় আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে। আমি তাদের সাথে হাসি ঠাট্টা করি কিন্তু তারা আমার হাসি ঠাট্টা উপভোগ করে না। আমাকে তারা একদম দেখতে পারে না। আমি এখন কী করবো?'

আমি মনে মনে বললাম, 'আমি তো তোমার নিরব উপস্থিতিই সহ্য করতে পারছি না! তুমি যখন কথা বলবে তখন আমি তা কিভাবে সহ্য করবো? কেননা, তুমি বেফাস কথাবার্তার মাধ্যমে নিজেকে বিরক্তিকর করে তোলো এবং বিব্রতকর হাসিঠাট্টার মাধ্যমে অন্যদেরকে বিষিয়ে তোলো।'

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কোনো ধরনের রসিকতাকে সহপাঠীরা সহ্য করতে পারে না? আমাকে একটা উদাহরণ দাও।'

সে বললো, একবার এক সহপাঠী হাঁচি দিলো। আমি ঠাট্টাচ্ছলে বললাম, 'আল্লাহ তোর ওপর লানত করুন।' এটুকু বলে আমি চুপ রইলাম। যখন সে রেগে গেলো তখন আমি বললাম, 'হে ইবলিস। আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন।'

এবার আমি বুঝলাম, তার রসিকতা কত বিব্রতকর ও যন্ত্রণাদায়ক!

সে কত বোকা! এ ধরনের অশালিন রসিকতা করে সে নিজেকে খুব রসিক ভাবছে। মনে করছে, সহপাঠিরা তার কথায় খুব মজা পাচ্ছে।

মানুষ আপনার ঠাট্টা ও রসিকতাকে তখনই গ্রহণ করবে, যদি তা ভদ্রতার সীমার মধ্যে থাকে। রেড লাইন বা লাল দাগ অতিক্রম করে ফেললে কেউ তা আর মেনে নেবে না। বিশেষত এটা যদি অন্যদের সামনে হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কেউ আপনার মোবাইল ফোন থেকে ইচ্ছামত যেখানে সেখানে কথা বললো। অথবা আপনার ব্যক্তিগত মোবাইলের

Contents

মাধ্যমে বিভিন্ন লোকের কাছে ক্ষুদেবার্তা পাঠালো। অথচ আপনার ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর কেউ জানুক, এটা আপনার পছন্দনীয় নয়।

আপনার অনুমতি ছাড়া কেউ আপনার গাড়ি নিয়ে গেলো । অথবা কেউ আপনাকে গাড়ির জন্য পীড়া-পীড়ি করে বিরক্ত করে ফেললো। শেষে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনি তাকে গাড়ি নেয়ার অনুমতি দিলেন। এসব যারা করে অবশ্যই আপনি তাদেরকে সহ্য করবেন না। তার হাসিঠাট্টাও আপনার কাছে ভালো লাগবে না।

মনে করুন, আপনি ছাত্রাবাসে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঘুম থেকে ওঠার পর দেখেন আপনার কোট গায়ে জড়িয়ে আরেকজন চলে গেছে! জুতাজোড়াও অন্যজনের পায়ে! তখন আপনার কাছে কেমন লাগবে?

অনেককে দেখবেন, সঙ্গী-সাথির সাথে অনর্থক রসিকতা করে বিরক্ত করছে, অন্যদের উপস্থিতিতে বিরক্তিকর প্রশ্ন করে বিব্রত করছে। সীমালঙ্ঘনের এমন অনেক ধরন ও উদাহরণ রয়েছে।

একজন মানুষ আপনাকে যতই পছন্দ করুক না কেন, মনে রাখবেন– সেও একজন মানুষ। তার ব্যক্তিগত পছন্দ যেমন আছে, অপছন্দও আছে। আনন্দ যেমন আছে, রাগও আছে। এটাই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি।

রাসূল যে মাসে তাবুকযুদ্ধ থেকে মদিনায় ফিরেছিলেন, সে মাসেই উরওয়া বিন মাসউদ সাকাফী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলের কাছে আসলেন। তিনি সাকীফ গোত্রের সম্মানিত সরদার। গোত্রের লোকদের ওপর তার বেশ প্রভাব ছিলো।

মদিনায় প্রবেশের আগেই রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। নিজে ইসলাম গ্রহণ করে নিজের গোত্রের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য তিনি রাসূলের কাছে অনুমতি চাইলেন।

রাসূলের আশঙ্কা হলো- এর ফলে ওরওয়া নিজের গোত্রের কাছ থেকে নির্যাতনের শিকার হতে পারেন। তাই রাসূল বললেন, 'তাহলে তো তারা তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে।'

রাসূল জানতেন, সাকীফ গোত্রের লোকদের মাঝে আত্মমর্যাদাবোধ খুব প্রবল। আচার-আচরণে তারা খুবই কঠোর। এমনকি তাদের সরদারদের সঙ্গেও কঠোর হতে তারা দ্বিধা করে না।

উরওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আমি তাদের কাছে নিজেদের ছেলে-মেয়ের চেয়েও বেশি প্রিয়।'

বাস্তবেও তিনি তাদের কাছে খুব প্রিয় ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তারা তার অনুগত ছিল।

তিনি নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তিনি আশা করেছিলেন, কেউ তার বিরোধিতা করবে না। সবাই তার কথা মেনে নিবে।

নিজ এলাকায় গিয়ে উরওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু একট উঁচু স্থানে আরোহণ করে উচ্চ আওয়াজে সবাইকে আহ্বান করলেন। সরদারের আহ্বান শুনে সবাই সমবেত হলো। এবার তিনি সবাইকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। ইসলামের মর্মবাণী তাদের সামনে তুলে ধরলেন এবং নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করলেন। 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।'বারবার পাঠ করতে লাগলেন।

কিন্তু হায়! ওরওয়ার আশার গুড়ে বালি দিয়ে সবাই বিগড়ে গেল। তার কথা শেষ না হতেই সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠলো। সবাই তার প্রতি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে লক্ষ করে তীর বল্লম নিক্ষেপ করতে লাগলো।

তীর আর বল্লমের আঘাতে জর্জরিত হয়ে এক পর্যায়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তার চাচাতো ভাইয়েরা তার দিকে এগিয়ে এলো। তখন তিনি জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। তারা বললো, 'উরওয়া! তোমাকে যারা হত্যা করেছে আমরা কি তাকে হত্যা করবো? তুমি কী বলো?'

প্রত্যুত্তরে উরওয়া বললেন,'ইসলামের ধনে আল্লাহ আমাকে ধনী করেছেন। এরপর শাহাদাতের সুধা পান করিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন। রাসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ করে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের যে মর্যাদা, সে

মর্যাদাই আমি কামনা করি। আমার রক্তের প্রতিশোধস্বরূপ তোমরা কাউকে হত্যা করো না।'

রাসূল তাঁর শহীদ হওয়ার সংবাদ জানার পর বলেছেন, 'তার উপমা সূরা ইয়াসিনে আলোচিত হাবীব আন নাজ্জারের মতো।'

প্রিয় পাঠক! আপনিও এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন।

প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব অনুভব-অনুভূতি আছে। আপনি কারো যত আপনই হোন না কেন তার সাথে রসিকতা ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে সীমারেখা বজায় রাখুন। লাল রেখা অতিক্রম করবেন না। নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করুন। মানুষের কাছে আপনি যতই প্রিয় হোন না কেন, তাদেরকে বিব্রত করা থেকে বিরত থাকুন। এমনকি বাবা ভাইয়ের ক্ষেত্রেও এই উপদেশ মেনে চলুন। রাসূল ও এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং মুমিনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করতে নিষেধ করেছেন।

একদিন রাসূল সাহাবিদের নিয়ে পথ চলছিলেন। সবার সঙ্গে ব্যক্তিগত আসবাবপত্র, অস্ত্র-শস্ত্র, বিছানাপত্র ও খাদ্যদ্রব্য ছিলো। রাস্তায় এক স্থানে কাফেলা যাত্রাবিরতি করলো।

এই অবসরে জনৈক সাহাবী ঘুমিয়ে পড়লেন। এ সময় আরেকজন সাহাবী দুষ্টুমি করে তার একটা রশি লুকিয়ে ফেললেন। ঘুম থেকে জেগে তিনি আসবাবপত্র এলোমেলো দেখে পেরেশান হয়ে সবকিছু খুঁজতে আরম্ভ করলেন।

রাসূল এটা জানতে পেরে বললেন-

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا.

'কোনো মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানকে উদ্বিগ্ন বা সন্ত্রস্ত করা বৈধ নয়।' (সুনানে আবূ দাউদ: ৪৩৫১)

আরেক দিনের ঘটনা। সাহাবীরা রাসূলের সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে হাওদায় বসা অবস্থায় তাদের একজনের তন্দ্রা এসে গেল। এ সুযোগে একজন তার তুনির থেকে একটি তীর টেনে নিতে টান দিল। সেই মুহূর্তে তিনি টের পেলেন। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠলেন।

রাসূল ﷺ অবস্থা জেনে বললেন-

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا.

অর্থ : ‘কোনো মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানকে উদ্বিগ্ন বা সন্ত্রস্ত করা বৈধ নয়।’ (সুনানে আবূ দাউদ: ৪৩৫১)

যে আপনাকে আনন্দ দেয়ার উদ্দেশ্যে আপনার সঙ্গে রসিকতা করে প্রকৃতপক্ষে আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে, আপনার মনে ভয় ও চিন্তা-পেরেশানীর সঞ্চার করছে, তার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

মনে করুন, আপনার একজন পরিচিত লোক দেখলো, রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে আপনি কোনো দোকানে ঢুকছেন। গাড়ির ইঞ্জিন চালু করা ছিল। সে এসে আপনাকে না বলেই গাড়িটা চালিয়ে দূরে কোথাও রেখে দিলো। আপনি চিন্তায় পড়ে গেলেন। ভাবলেন, গাড়িটা চুরি হয়ে গেছে। অথচ সে রসিকতা করার জন্য গাড়িটা নিয়েছে।

অনুরূপ আপনার বন্ধু রসিকতার ছলে ভয়ঙ্কর কোনো কাজ করে আপনাকে হাসানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু দেখা গেলো, সেই রসিকতা বেদনাদায়ক পরিণাম বয়ে আনলো। এটা কখনো মুমিনের কাজ হতে পারে না।

কবির ভাষায় –

ধৈর্যশীলরা নীরবে সব যন্ত্রণা সহ্য করে যায়।
যদিও হৃদয় রক্তক্ষরণ ব্যথার দহনে ভস্ম হয়।
শক্তিশালী বাকশক্তি থাকা সত্ত্বেও নিরব থাকেন
কেননা এতেই তারা আন্তরিক শান্তি অনুভব করেন।

দৃষ্টিভঙ্গি ...

সীমা অতিক্রম করলে সব বস্তু হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়।

কিছু কিছু রসিকতা পরিণামে বিভেদ ডেকে আনে!



৬০. গোপন কথা গোপন রাখুন

এ প্রবচনটি খুবই প্রসিদ্ধ- 'কোনো গোপন কথা যদি দুইজন অতিক্রম করে তাহলে তা আর গোপন থাকে না।'

জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, 'এখানে দুইজন বলে কী বুঝানো হয়েছে?' সে নিজের ঠোঁটজোড়া দেখিয়ে বললো, 'এই দুইজন'!

অর্থাৎ কোনো গোপন কথা যদি আপনার দুই ঠোঁটের ফাঁক গলিয়ে একবার বের হতে পারে তাহলে একে আর বেঁধে রাখা যাবে না। এটা ছড়িয়ে পড়বে দিগ দিগন্তে।

ইতোমধ্যে আমি জীবনের পঁয়ত্রিশটি বছর অতিক্রম করেছি। এ দীর্ঘ জীবনে যখনই কাউকে গোপন কিছু বলেছি এবং তা গোপন রাখতে অনুরোধ করছি, আমার মনে পড়ে না, কেউ আমাকে বলেছে, 'ভাই মুহাম্মাদ ! আমাকে ক্ষমা করো। আমি তোমার এ কথাটি গোপন রাখতে পারবো না; বরং সবাই দৃঢ় শপথ করে বলেছে, আপনার এ কথা কাক পক্ষিও কোনো দিন জানবে না। বাস্তবে যাকেই আপনি কোনো গোপন কথা বলবেন, সে আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, আমার ডান হাতে যদি সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্র রাখা হয় কিংবা আমার গর্দানের ওপর যদি তরবারি উত্তোলন করা হয় তবুও তা কোনো দিন আমার মুখ থেকে বের হবে না।

এরপর আপনি পরম বিশ্বাসে তার কাছে নিজের গোপন কিছু কথা বললেন। এরপর দু'তিন মাস অপেক্ষা করে দেখুন আপনার গোপন কথাটি আর গোপন রয়নি। সারা এলাকা ঘুরে আপনার কাছে ফিরে এসেছে ।

এটা অন্যের দোষ নয়। দোষটা আপনার। ভুল তো আপনিই প্রথম করেছেন। আপনি ভুলে গেছেন, 'কোনো গোপন কথা যদি দুই ঠোঁট অতিক্রম করে তাহলে তা আর গোপন থাকে না।'

আসলে কারো ওপর সাধ্যাতীত কোনো কিছু চাপিয়ে দেয়া উচিত নয়। কবি কী সুন্দর বলেছেন,

তোমার গোপন কথা তুমিই গোপন রাখতে পারলে না
অন্য কেউ তা গোপন রাখবে এ আশা তুমি কিভাবে করো?

আমি বিষয়টি অনেকের ওপর পরীক্ষা করে দেখেছি ফলাফল একই।

সমস্যা হলো, আপনি হয়তো কারো কাছে পরামর্শ চাইতে গিয়ে গোপন কিছু বলতে বাধ্য হলেন। সে আপনাকে পরামর্শও দিলো। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যাবে, সে আপনার গোপন বিষয়টি ফাঁস করে দিয়েছে। ফলে সে চিরদিনের জন্য আপনার কাছে ঘৃণিত হয়ে গেল।

ইতিহাসের একটি আশ্চর্য ঘটনা।

বদরযুদ্ধের আগের ঘটনা। রাসূল ﷺ শাম থেকে কোরাইশের বাণিজ্যিক কাফেলার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এরপর অনতিবিলম্বে তাদের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। কোরাইশ কাফেলার সরদার আবূ সুফিয়ান বিষয়টি আঁচ করতে পেরে গিফার গোত্রের 'যামযাম বিন আমর' নামক জনৈক ব্যক্তিকে এ সংবাদ দ্রুত মক্কায় পৌঁছানোর জন্য পাঠালো। যামযাম তাজাদম উট নিয়ে দ্রুতগতিতে মক্কার পথে অগ্রসর হলো।

সেখান থেকে মক্কা ছিলো কয়েকদিনের পথ। এদিকে মক্কাবাসী এ সম্পর্কে তখনো কিছুই জানে না। এ সময়ের এক রাতের ঘটনা। (রাসূলের ফুফু) আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিব ভয়ঙ্কর একটি স্বপ্ন দেখলেন। রাত শেষে ভোর হতেই তিনি আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবকে ডেকে বললেন, 'ভাই! গত রাতে আমি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটি স্বপ্ন দেখেছি। আমার মনে হচ্ছে, আমাদের সম্প্রদায়ের ওপর কোনো বিপদ আপতিত হবে। আমার স্বপ্নের কথা আমি তোমাকে বলবো। তুমি কিন্তু এটা কাউকে বলবে না।'

আব্বাস বললেন, 'ঠিক আছে। তুমি কি দেখেছো, বলো।' তিনি বললেন:

'আমি জনৈক উট-আরোহীকে দেখলাম দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। সে এসে 'আবতাহ' উপত্যাকায় থেমে গেলো এবং সজোরে চিৎকার করে বললো, 'হে পরিণতির দিকে প্রত্যাবর্তনকারীরা! তিনদিনের মধ্যে নিজ নিজ মৃত্যু উপত্যাকায় যাও!'

আতিকা আরো বললেন, এরপর আমি দেখলাম, আওয়াজ শুনে লোকেরা তার চতুর্পাশে সমবেত হলো। এরপর লোকটি মসজিদে হারামে গেলো। লোকেরাও তার পিছু পিছু গেলো। হঠাৎ তার উটটি তাকে নিয়ে কাবার

ছাদে আরোহণ করলো। সেখানে আরোহণ করে সে আগের মতো আবার চিৎকার করে বললো, 'হে পরিণতির দিকে প্রত্যাবর্তনকারীরা! তিনদিনের মধ্যে নিজ নিজ মৃত্যু উপত্যকায় যাও!'

তারপর সে তার উটটি নিয়ে 'আবূ কুবাইস' পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে আগের ন্যায় আওয়াজ দিলো, 'হে পরিণতির দিকে প্রত্যাবর্তনকারীরা! তিনদিনের মধ্যে নিজ নিজ মৃত্যু উপত্যকায় যাও!' এরপর সে পাহাড়ের চূড়া থেকে একটি পাথর নিয়ে নিচে নিক্ষেপ করলো। পাথরটি গড়িয়ে পড়তে পড়তে পাহাড়ের পাদদেশে এসে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলো এবং ছোট ছোট নুড়িতে পরিণত হলো।

মক্কার এমন কোনো ঘর নেই যাতে সে নুড়ি প্রবেশ করে নি। আব্বাস অস্থির হয়ে বললেন, 'আল্লাহর শপথ! অবশ্যই এটা একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন!'

আব্বাস এ স্বপ্নের কথা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করলেন। তিনি ভাবলেন, স্বপ্নের কথা ছড়িয়ে পড়লে তার সমস্যা হতে পারে। তাই তিনি আতিকাকে সকর্ত করে বললেন, 'তুমি এ স্বপ্নের কথা আর কারো কাছে প্রকাশ করবে না।'

এই স্বপ্নের কথা ভাবতে ভাবতে আব্বাস বেরিয়ে এলেন। পথিমধ্যে বন্ধু ওলীদ বিন ওতবার সঙ্গে তার দেখা হলো। ওলীদকে তিনি স্বপ্নের কথা জানালেন। তবে সে যেন এ স্বপ্নের কথা গোপন রাখে তিনি এ ব্যাপারে তার কাছ থেকে নিশ্চয়তা নিলেন।'

ফেরার পথে ওলিদের সাথে তার পুত্র ওতবার দেখা হলো। পুত্রকে সে স্বপ্নের ঘটনাটি জানিয়ে দিলো। কিছুক্ষণ না যেতেই ওতবা তার কয়েকজন বন্ধুকে স্বপ্নের কথা বললো। এভাবে এ স্বপ্নের কথা মক্কার লোকদের কানে কানে ছড়িয়ে পড়লো। কোরাইশরা তাদের বৈঠকসমূহে এ নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো।

দুপুরে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কাবা ঘর তাওয়াফের উদ্দেশ্যে হেরেমে গেলেন। আবূ জাহেল তখন কোরাইশের কয়েকজন লোকের সঙ্গে কাবা ঘরের ছায়ায় বসে আতিকার স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা করছিলো।

আব্বাসকে দেখে আবূ জাহেল বললো, 'আবূল ফযল! তাওয়াফ শেষ হলে আমার সাথে একটু দেখা করবে।'

আব্বাস চিন্তিত হলেন। আবূ জাহেল তার কাছে কী চায়? আব্বাসের কল্পনাতেও ছিলো না যে, আবূ জাহেল তাকে আতিকার স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারে। তাওয়াফ শেষ করে আব্বাস আবূ জাহেলের কাছে এসে বসলেন। আবূ জাহল তাকে বললো, 'হে আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র! তোমাদের বংশে কখন থেকে আবার মহিলা নবীর আবির্ভাব ঘটলো?'

আব্বাস বললেন, 'আপনি কিসের কথা বলছেন?'

'আতিকার স্বপ্নের কথা।'

আব্বাস শঙ্কিত হলেন। তিনি বললেন, 'আতিকা! আতিকা আবার কী দেখেছে?'

আবূ জাহল বললো, " আবদুল মুত্তালিবের বেটা ! এতদিন পর্যন্ত জানতাম তোমাদের বংশের একজন পুরুষ নবুয়তি দাবি করেছে। তোমরা মনে হয় এতে সন্তুষ্ট নও। তাই এখন তোমাদের একজন নারী 'নবুয়তি' দাবি করতে যাচ্ছে।!

আতিকা নাকি স্বপ্নে জনৈক আগন্তুককে বলতে শুনেছে, 'তিনদিনের মধ্যে তোমরা নিজ নিজ মৃত্যু উপত্যাকায় যাও'।

আমরা তিনদিন দেখবো। এর মধ্যে যদি আতিকার স্বপ্ন বাস্তব হয়, তাহলে তো হলো । আর যদি তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও কোনো কিছু প্রকাশ না পায়, তাহলে তোমাদের নামে 'আরবের শ্রে'মিথ্যাবাদী' উপাধি রটিয়ে দেবো। "

আব্বাস উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। আবূ জাহলকে তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি স্বপ্নের কথা অস্বীকার করলেন।

এরপর সবাই যার যার কাজে চলে গেলো।

আব্বাস সেখান থেকে বাড়িতে ফিরে আসতেই বনু মুত্তালিবের মহিলারা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তাকে ঘিরে ধরলো। তারা বললো, 'এতদিন তোমরা এই পাপি'বদমাশটাকে পুরুষদের ওপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ দিয়েছো। আর এখন সে নারীদের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে শুরু করলো আর তুমি নিরবে তা শুনে চলে আসলে! তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কি আত্মসম্মানবোধ বলতে কিছুই নেই?'

মহিলাদের এসব কথায় আব্বাসের আত্মমর্যাদায় আঘাত হানলো। তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আল্লাহর কসম! আবূ জাহেল যদি আবারো এমন কিছু বলে, তাহলে অবশ্যই আমি এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেব।' আতিকার স্বপ্ন দেখার তিন দিন পার হলো। আব্বাস কাবার দিকে গেলেন। তার মনে তখনো পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ।

মসজিদে হারামে প্রবেশ করেই আবূ জাহেলকে দেখতে পেয়ে তিনি তার দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি মনে মনে চাচ্ছিলেন, আবূ জাহেল যেন সেদিনের কথার পুনরাবৃত্তি করে। তাহলে তিনি আজ তার উচিত জবাব দেবেন!

কিন্তু আবূ জাহেল আচমকা মসজিদের দরজা দিয়ে দ্রুত বের হয়ে গেলো।

আব্বাস এটা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। কেননা, আজ তিনি তর্ক-বিতর্কের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলেন!

আব্বাস মনে মনে বললেন, 'অভিশপ্তটার হলো কী? আমাকে দেখে ভয়েই কি সে পগাড়পাড় হলো?

ঠিক সেই মুহূর্তে আবূ জাহেল যামযাম বিন আমর গিফারীর চিৎকার শুনতে পেলো। সেই যামযাম বিন আমর গিফারী, আবূ সুফিয়ান যাকে কোরাইশদের কাছে সংবাদ দিয়ে পাঠিয়েছিলো। যামযাম উন্মুক্ত উপত্যকায় উটের ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলছিলো। সেকালের রীতি অনুযায়ী বিপদ সংকেত বোঝাতে সে তার উটের নাক কেটে ফেললো। কর্তিত নাকের ক্ষতস্থান থেকে তাজা রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল।

এরপর আসন্ন বিপদের ভয়াবহতা বোঝাতে সে নিজের গায়ের জামা ছিঁড়ে ফেললো। এরপর চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'হে কোরাইশ সম্প্রদায়, বিপদ! মহাবিপদ!! আবূ সুফিয়ানের বাণিজ্যকাফেলায় তোমাদের যে অর্থ-সম্পদ রয়েছে, তা ছিনিয়ে নিতে মুহাম্মাদ তার সঙ্গীদের নিয়ে আক্রমণ করতে যাচ্ছে। তোমরা তা রক্ষা করতে পারবে বলে মনে হয় না!'

এরপর সে আরো উচ্চ আওয়াজে চিৎকার করে বললো, 'সাহায্য ! সাহায্য!'

এ সংবাদ পেয়েই কোরাইশরা যুদ্ধপ্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। আর তাদের জন্য বদরপ্রান্তরে অপেক্ষা করছিল পরাজয় ও লাঞ্ছনা।

ভেবে দেখুন, গোপনীয়তা রক্ষার প্রত্যয় ও পরিপূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও স্বপ্নের বিষয়টি কীভাবে মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো! গোপন তথ্য ছড়িয়ে পড়ার আরেকটি ঘটনা।

ইসলাম গ্রহণ করার পর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি সবাইকে জানাতে চাইলেন। তাই তিনি কথা ছড়ানোতে মক্কার সবচেয়ে দক্ষ ব্যক্তির কাছে গিয়ে বললেন, 'তোমাকে একটি গোপন কথা বলছি। তুমি তা গোপন রাখবে। কাউকে বলবে না।' সে বললো, 'গোপন কথাটা কী?'

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি মুসলমান হয়েছি। সাবধান! কাউকে বলবে না কিন্তু।'

এরপর ওমর তার কাছ থেকে চলে এলেন। এখনো তিনি বেশি দূর যান নি। এরই মধ্যে সেই লোকটি মানুষের কাছে গিয়ে গিয়ে বলতে লাগলো, 'ভাই! শুনেছো, ওমর তো ইসলাম গ্রহণ করেছে। আশ্চর্য! যেন এক ভ্রাম্যমান সংবাদসংস্থা!

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে কোনো প্রয়োজনে কোথাও পাঠালেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তার মায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে কোথায় পাঠিয়েছেন?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোপন বিষয় প্রকাশ করব না।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদেরকে গোপনীয়তা রক্ষার শিক্ষা দিয়েছিলেন যেন তারা দায়িত্ব পালনে যোগ্য হয়ে গড়ে ওঠে। সেই শৈশবেও আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু গোপনীয়তা রক্ষায় যত্নবান ছিলেন। আজকের যুগে আপনি আনাসের দৃষ্টান্ত কোথায় খুঁজে পাবেন?

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, একদিন ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা হেঁটে আসছিলেন। তার হাঁটার ভঙ্গি ছিল হুবহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাঁটার ভঙ্গির মতো! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'স্বাগতম মেয়ে আমার!' এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা-কে তার ডানে বা বামে বসিয়ে গোপনে কিছু বললেন। শুনে ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা কাঁদতে লাগলেন।

আমি (আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা) তাকে বললাম, 'তুমি কাঁদছো কেন বেটি?' সে কিছু বললো না।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আবার কানে কানে কিছু বললেন। এবার ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা হাসতে লাগলেন।

আমি (আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা) বললাম, 'আজকের ন্যায় আনন্দ এবং বেদনার এমন সহাবস্থান আর কখনো আমি দেখি নি!'

আমি ফাতেমাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বললেন?'

তিনি বললেন, 'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোপন কথা প্রকাশ করতে পারবো না।'

এর কিছুদিন পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করলেন। এরপর আমি তাকে পুনরায় বিষয়টি জিজ্ঞেস করলাম।

ফাতেমা বললেন, রাসূল আমাকে বলেছিলেন, জিবরাঈল আ. প্রতিবছর একবার আমাকে পুরো কুরআন শোনাতেন, আমিও কোনোতাম। কিন্তু এ বছর তিনি দু'বার শুনিয়েছেন। আমি এটাকে আমার তিরোধানের পূর্বলক্ষণ বলে মনে করছি। আর আহলে বাইতের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমিই আমার সঙ্গে মিলিত হবে।' রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে আমি কেঁদেছি। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি জান্নাতি নারীদের নেতৃত্ব দিবে?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ কথা শুনে আমি হেসেছি।

মনে রাখবেন, মানুষের একান্ত কথাগুলো আপনি যত গোপন রাখতে পারবেন, তাদের কাছে আপনি তত বেশি আস্থাভাজন হতে পারবেন। আপনার জন্য তারা তাদের মনের দুয়ার খুলে দেবে। আপনি অন্যের গোপন কথা যত গোপন রাখতে পারবেন তাদের কাছে আপনার মর্যাদা তত বৃদ্ধি পাবে। তারা উপলব্ধি করবে, আপনি একজন বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন বন্ধু।

তাই নিজের গোপন কথাগুলি নিজের মাঝে রাখার এবং অন্যের গোপন কথা সংরক্ষণ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

বড়রা বলেছেন ...

যে আপনার গোপন তথ্য জেনে ফেললো,

আপনি তার হাতে বন্দি হয়ে গেলেন।



৬১. মানবসেবায় এগিয়ে যান

আমি যখন মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য থিসিস তৈরি করছিলাম তখন বিভিন্ন দর্শন ও মতাদর্শ সম্পর্কে প্রচুর অধ্যয়ন করেছি। এসব দর্শনের একটি ছিলো প্রয়োগবাদ (pragmatism)।[৩]

আমরা শুনে থাকি, ইউরোপ-আমেরিকায় অনেক ছেলে নিজ পিতাকে ত্যাগ করে । পিতা ও সন্তান কোনো রেস্টুরেন্টে একই সময় উপস্থিত হলেও প্রত্যেকে নিজ নিজ বিল পরিশোধ করে। প্রয়োগবাদী মতবাদ নিয়ে অধ্যয়নের পর আমি বুঝতে পারলাম কেন এমন হয়?

সত্যিই তো! তোমাকে দিয়ে যখন আমার আর কোনো উপকার হচ্ছে না, তখন আমি কেন তোমার সেবা করে যাবো? আমি কেন তোমার পেছনে অর্থ ব্যয় করবো? কোনো স্বার্থ ছাড়া আমার মূল্যবান সময় কেন তোমার জন্য 'নষ্ট' করবো? !

এই হলো বস্তুবাদী দার্শনিকদের স্বার্থবাদী চিন্তাধারা। বিনিময় ও বৈষয়িক স্বার্থ এখানে মুখ্য, আর সবকিছু গৌণ। ইসলাম কিন্তু পার্থিব স্বার্থকে সেবার মানদণ্ড নির্ণয় করে নি। ইসলাম এ বস্তুবাদী চিন্তা চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। কুরআন বলছে-

وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

অর্থঃ তোমরা দয়া করো। নিশ্চয় আল্লাহ দয়ালুদেরকে ভালোবাসেন।

(সূরা বাকারা : আয়াত-১৯৫)

আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'কোনো ভাইয়ের একটি প্রয়োজন পূরণ করা আমার কাছে আমার এ মসজিদে একমাস এতেকাফ করার চেয়েও বেশি প্রিয়।'

তিনি আরো বলেছেন-

مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِهِ.

---

[৩]. প্রয়োগবাদ (pragmatism) হলো- কোনো ভাব, প্রত্যয় বা উক্তির সত্যতা বা মূল্য নির্ভর করে মানবকল্যাণের ক্ষেত্রে তার প্রাসঙ্গিকতার উপর-এই তত্ত্ব বা বিশ্বাস।

'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের কোনো প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রয়োজন পূরণ করবেন।' (সহীহ মুসলিম:৪৬৭৭)

একদিন নবী করিম ﷺ হাঁটছিলেন। পথে জনৈক ক্রীতদাসী তাকে থামিয়ে বললো, 'আপনার সাথে আমার একটু কথা আছে।'

রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে তার কথা শুনলেন। এরপর তার প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য তার মালিকের বাড়ি পর্যন্ত গেলেন।

রাসূল ﷺ তো মানুষের প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে মিশতেন এবং এজন্য তাদের অযাচিত কথা সহ্য করতেন।

কোমল হৃদয়, অশ্রুসজল চোখ আর দাঈর প্রজ্ঞাপূর্ণ ভাষা নিয়ে তিনি মানবকল্যাণে এগিয়ে যেতেন। তিনি সবাইকে একাত্মা মনে করতেন। দরিদ্রের দারিদ্র, দুঃখীর দুঃখ, পীড়িতের মর্মপীড়া ও অভাবীর অভাব তিনি নিজের মতো করে অনুভব করতেন।

অভাবীর অভাব দেখে রাসূল কেমন অস্থির হয়েছিলেন তা একটু দেখুন।

রাসূল ﷺ একদিন মসজিদে নববীতে বসে সাহাবীদের সঙ্গে কোনো বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ দূর থেকে কিছু লোককে এগিয়ে আসতে দেখলেন। রাসূল ভালো করে লক্ষ করে দেখলেন, তারা মুযার গোত্রের কিছু অভাবী লোক। নজদ থেকে রাসূল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাত করতে এসেছে। অত্যধিক দরিদ্রতার কারণে তারা গলায় কাপড় ঝুলিয়ে পরেছিলো। অর্থাৎ তাদের কারো কারো কাছে যদিও সামান্য কাপড় ছিলো কিন্তু সেলাই করার জন্য সুঁই-সুতা যোগাড়ের সামর্থ্যও ছিলো না। তাই তারা কাপড়ের মাঝ বরাবর ছিঁড়ে তাতে মাথা ঢুকিয়ে বাকি অংশ শরীরে ঝুলিয়ে নিয়েছিলো।

তাদের পরনে এই সেলাইহীন কাপড় আর কোমরে ঝোলানো তরবারি। আর কিছুই নেই। লুঙ্গি বা পায়জামা, পাগড়ী বা চাদর কিছুই ছিল না।

তাদের অভাব-অনটন, খাদ্য ও বস্ত্রের এ কষ্ট দেখে রাসূল ﷺ-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে নিজের ঘরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তাদেরকে দেয়ার মতো কোনো কিছু পেলেন না। বের

হয়ে অন্য ঘরে গেলেন। সেখান থেকে বের হয়ে অন্য ঘরে। এভাবে অনেকক্ষণ তালাশ করেও কিছু পেলেন না।

এরপর রাসূল ﷺ মসজিদে গিয়ে জোহরের নামায আদায় করলেন। নামাযের শেষে মিম্বরে বসে প্রথমে হামদ পাঠ করলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

'হে লোকসকল ! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং তার থেকে তার যুগল সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের উভয় থেকে বহু নর-নারী (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহকে ভয় করো, যার ওসিলা দিয়ে তোমরা একে অন্যের কাছে নিজেদের হক চেয়ে থাকো। আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে সচেতন হও। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ তোমাদের সবকিছু দেখছেন।

(সূরা নিসা : আয়াত-১)

এরপর তিলাওয়াত করলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

'হে মুমিনগণ ! আল্লাহকে ভয় করো। আর প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক, আগামীকালের জন্য সে কী পাঠিয়েছে। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু করো, সে সম্পর্কে তিনি পরিপূর্ণরূপে অবহিত। (সূরা হাশর : আয়াত-১৮)

এভাবে রাসূল ﷺ বিভিন্ন আয়াত পড়তে লাগলেন। এরপর উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'তোমরা সদকা করতে অক্ষম হওয়ার আগেই সদকা করো। দানের ওপর প্রতিবন্ধকতা আরোপিত হওয়ার আগেই দান করো। দিনার-

দিরহাম, গম-যব যে যা পারো, দান করো। কোনো দানকেই কেউ তুচ্ছ মনে করবে না।'

রাসূল ﷺ বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য দানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে শেষে বললেন, 'বেশি না পারলে এক টুকরো খেজুর হলেও প্রত্যেকে দান করো।'

রাসূল ﷺ মিম্বরে থাকা অবস্থায় জনৈক আনসারী সাহাবী বড় একটি ঝাকা নিয়ে এলেন। রাসূল ﷺ মিম্বরে বসেই তা গ্রহণ করলেন। এ সময় রাসূল ﷺ পবিত্র চেহারায় খুশির আভা ছড়িয়ে পড়েছিলো।

এরপর রাসূল ﷺ বললেন-

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً عُمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا.

অর্থ : 'যে ব্যক্তি কোনো সুন্দর প্রথা ও আদর্শ চালু করে সেমতে আমল করবে, তাকে তার এ কাজের প্রতিদান দেয়া হবে। পরবর্তীতে অন্য কেউ এ অনুযায়ী আমল করলে সে তার আমলেরও প্রতিদান পাবে। তবে এ কারণে আমলকারীর সাওয়াব কমবে না। আর যে ব্যক্তি কোনো কুপ্রথা চালু করবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে, তাকে তার এ কাজের গোনাহ বহন করতে হবে। পরবর্তীতে অন্য কেউ এর অনুসরণ করলে সে তার বোঝাও বহন করবে। পরবর্তী অপরাধকারীর গোনাহ একটুও কম হবে না। (সুনানে ইবনে মাজাহ:১৯৯)

এক সময় রাসূল ﷺ বয়ান শেষ করলেন। উপস্থিত সাহাবিরা উঠে যার যার ঘরে চলে গেলো এবং বিভিন্ন বস্তু নিয়ে ফিরে এলো। কেউ দীনার নিয়ে এলো, কেউ নিয়ে এলো দেরহাম। কেউ গম আনলো, কেউ নিয়ে এলো কাপড়।

রাসূল ﷺ-এর সামনে দু'টি স্তূপ হয়ে গেলো। একটি খাবারের, অপরটি কাপড়ের। এসব দেখে রাসূল ﷺ-র পবিত্র চেহারা খুশিতে ঝলমল করে উঠলো। যেন তা পূর্ণিমার চাঁদের একটি টুকরা।

এরপর রাসূল ﷺ সবকিছু দরিদ্রদের মাঝে ভাগ করে দিলেন। (মুসলিম)

রাসূল ﷺ মানুষের প্রয়োজন পূরণ করে তাদের মন জয় করে নিতেন। মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য নিজের সবকিছু ব্যয় করতেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে একবার রাসূল ﷺ ঘরে অবস্থানকালীন আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, 'রাসূল ﷺ ঘরে থাকা অবস্থায় পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করতেন। কখনো তাদের কাজে সাহায্য করতেন।'

আপনি একটু চিন্তা করে বলুন, মানুষের মন জয় করার জন্য কি আপনি রাসূল ﷺ-এর এই আদর্শ গ্রহণ করবেন না? মানুষের প্রয়োজনে তাদের পাশে দাঁড়াবেন না?

একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিতে হবে, আপনি তাকে পৌঁছে দিলেন।

বিপদে পড়ে একজন আপনার সহায়তা চাইলো, সাধ্যমতো আপনি তাকে সাহায্য করলেন।

এভাবে যখন কেউ বিপদে আপনাকে পাশে পাবে, প্রয়োজনে আপনার সহায়তা পাবে আর সে অনুভব করবে, এসব অনুগ্রহের বিনিময়ে আপনি কোনো প্রতিদান চান না। তখন নিশ্চয় সে আপনাকে ভালোবাসবে, আপনার জন্য দোয়া করবে। ভবিষ্যতে আপনার যে কোনো বিপদে সহযোগিতার জন্য সে সবার আগে এগিয়ে আসবে।

কবি বলেন-

অন্যের প্রতি দয়া করলে মায়া করলে তার হৃদয়রাজ্যে তুমি স্থান করে নিতে পারবে। যুগে যুগে মানুষ দয়া আর মায়া দিয়েই অন্যের হৃদয়জগৎ জয় করেছে।

অভীক্ষা

মানবতার কল্যাণে যার জীবন কাটে তার কষ্ট হলেও
জীবনে সে হয় মহান, মরেও সে হবে অমর।



৬২. সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব নেবেন না

আমার এক বন্ধু, স্বভাব-চরিত্র, আমল আখলাক, বিচক্ষণতা সবদিক থেকে তিনি ছিলেন একজন ভালো মানুষ। বাড়ির পাশের এক মসজিদে তিনি এমামত করতেন।

কিন্তু আমি অনেকের মুখেই তার সমালোচনা শুনতাম। আমি রীতিমত অবাক হতাম। আমি ভেবে পেতাম না তারা এমন একজন ভালো মানুষের সমালোচনা কেন করে?

একবার তার এক প্রতিবেশী আমাকে এসে বললো, 'জনাব! আপনার বন্ধু মসজিদের ইমাম, কিন্তু তিনি এমামত করেন না এমনকি আমাদের সঙ্গে নামাযও পড়েন না।'

আমি বললাম, কেন?!

সে বললো, 'তা জানি না।' আমি বন্ধুর পক্ষ হয়ে বিভিন্ন ওজুহাত পেশ করার চেষ্টা করলাম। বললাম, 'হয়তো তিনি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত, কিংবা হতে পারে তিনি বাড়িতেই নেই।'

সে বললো, 'জনাব! তার গাড়ি বাড়ির গেটেই আছে। আমি নিশ্চিত, তিনি বাড়িতেই আছেন। কিন্তু তারপরও ইমাম হয়ে তিনি জামাতে আসছেন না।'

আমি বন্ধুকে উপদেশ দেয়ার উদ্দেশ্যে এর প্রকৃত কারণ খুঁজতে লাগলাম এবং একপর্যায়ে তা জানতে সক্ষম হলাম।

ঘটনা হলো, মসজিদের ইমাম হওয়ায় সমাজের নানা শ্রেণির মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে তার কাছে আসতো। আর তাদের অনেকেই সাহায্যের আবেদন করতো।

কেউ এসে বলতো, 'আমার ঘাড়ে বিশাল ঋণের বোঝা। আপনি যদি বিত্তশালী কাউকে বলে তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিতেন।'

কেউ বলতো, 'আমি কলেজের পড়াশোনা সমাপ্ত করেছি। এখন অমুক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চাই। আপনি একটু সুপারিশ করুন।'

কেউ কেউ অসুস্থ আত্মীয়কে হাসপাতালে ভর্তি করানোর জন্য সাহায্য চাইতো।

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা আসতো মেয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্রের খোঁজে।

কেউ এসে বলতো, 'কয়েক মাসের ঘর-ভাড়া জমে গেছে। পরিশোধ করতে পারছি না।'

আবার কেউ আসতো তালাক বা অন্য কোনো বিষয়ের ফতোয়ার আবেদনপত্র নিয়ে।

এভাবে বিভিন্ন লোক এসে তার কাছে বিভিন্ন প্রয়োজনের কথা বলতো। অথচ তিনি সাধারণ একজন ব্যক্তি। সবার প্রয়োজন মেটানোর তো অবস্থা তার ছিলো না। অথচ তিনি কাউকে ফিরিয়ে দিতে পারতেন না। কাউকে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিতেন। কারো মোবাইল নম্বর লিখে রেখে বলতেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে আমি ব্যবস্থা করে দেব। তুমি চিন্তা করো না। কাউকে বলতেন, 'দুই দিন পরে আসুন। হাসপাতালে ভর্তির কাগজপত্র প্রস্তুত পাবেন।'

তারা প্রতিশ্রুত সময়েই আসতো। তিনি বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তাদেরকে পরবর্তীতে আসতে বলতেন। কিন্তু তিনি কথামতো তাদের কাজ করতে পারেন নি। তাই তিনি মোবাইল রিসিভ করা বন্ধ করে দিলেন। একপর্যায়ে তিনি বাড়ি থেকেও বের হতেন না।

মাঝে মধ্যে কারো সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে তির্যক মন্তব্য ও গালমন্দ শুনতেন। মানুষ বলতো, 'আপনি যদি না পারেন তাহলে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন কেন? আপনি প্রতিশ্রুতি না দিলে তো আমি আপনার ওপর ভরসা করে বসে থাকতাম না।'

কেউ বলতো, 'আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলেই তো আমি অন্য কারো সঙ্গে কথা বলি নি।'

সবকিছু জানার পর আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেলো, তিনি নিজেই নিজের জন্য গর্ত খুঁড়েছেন এবং আজ সেই গর্তে পতিত হয়েছেন।

একবার আমি দেখলাম, তিনি জনৈক আগন্তুককে বলছেন, 'দুঃখিত, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারলাম না।' আগন্তুক চেঁচিয়ে বলে উঠলো, 'তাহলে, আমাকে আগে বলেন নি কেন? কেন আমার সময় নষ্ট করলেন?'

তখন আমার জনৈক দার্শনিকের একটি বচন স্মরণ হলো, 'অজুহাত পেশ করতে হলে শেষে নয়, শুরুতেই করো ।'

প্রত্যেকে যদি নিজের সামর্থ্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে বুঝতো, প্রত্যেকের প্রতিশ্রুতি ও বিচরণ যদি তার সামর্থ্যের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলে কত ভালো হতো। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পবিত্র কুরআনে এ শিক্ষাই দিয়েছেন-

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

অর্থ : 'আল্লাহ তাআলা কারো ওপর তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব অর্পণ করেন না।' (সূরা বাকারা:২৮৬)

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰـهَا ؕ

অর্থ : আল্লাহ যাকে যতটুকু দিয়েছেন, তার বেশি ভার তার ওপর অর্পণ করেন না। (সূরা তালাক : আয়াত-৭)

রাসূল ﷺও কাউকে তার সাধ্যাতীত কাজের দায়িত্ব নিতে নিষেধ করেছেন।

এ বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতাও কম নয়।

একবার আমি রিয়াদে এক সামরিক একাডেমিতে বক্তৃতা করেছিলাম। বক্তৃতা শেষে উপস্থিত একজন আমাকে এসে বললেন, 'জনাব! আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

আমি বললাম, 'বলুন, কী বিষয়?

তিনি বললেন, 'এখন আলোচনা করার পর্যাপ্ত সময় নেই। দীর্ঘ সময় নিয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলবো।'

তিনি বিভিন্নভাবে তার বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরলেন। আমিও ধৈর্য ধরে শুনতে লাগলাম।

আমার অভিজ্ঞতা হলো, অধিকাংশ মানুষ অনেক বিষয়কে স্বাভাবিকের চেয়ে বড় করে তুলে ধরে। কোনো বিষয়ে আক্রান্ত ব্যক্তি তা থেকে মুক্তির আগ পর্যন্ত পাগলের মতো হয়ে থাকে।

তিনি আমাকে বললেন, 'আপনার সম্ভবত আগামীকাল অমুক শহরে আলোচনা করার প্রোগ্রাম আছে। শহরটি রিয়াদ থেকে দু'শত মাইল দূরে অবস্থিত।'

আমি বললাম, 'জ্বী! ঠিক বলেছেন।'

তিনি বললেন, 'আমি সেখানে যাবো এবং বক্তৃতার পর আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো।'

আমি তার আগ্রহ দেখে বিস্মিত হলাম।

পরদিন সেই শহরে বক্তৃতা শেষ করে আমি যখন বের হলাম, দেখলাম, বাস্তবেই তিনি সেখানে এসেছেন। আমাকে বের হতে দেখে তিনি খালি পায়েই দ্রুত ছুটে এলেন।

তার হাতে ছিল ছোট একটি কাগজ।

আমি তাকে নিয়ে এক পাশে দাঁড়ালাম। এরপর বললাম, 'আপনার তো প্রচণ্ড আগ্রহ! আসুন আসুন কী কথা বলবেন বলুন।'

তিনি বললেন, 'জনাব! আমার এক ছোট ভাই প্রাইমারি পাশ করেছে। আমি আশা করছি, আপনি তার জন্য একটি চাকুরির তদবীর করবেন।'

আমি বললাম, 'আপনার কথা কি শেষ?!'

'হ্যাঁ, শেষ!' তিনি জবাব দিলেন।

লোকটি ছিল খুবই উৎসাহী। তার চেহারা দেখে খুব মায়া লাগলো। মনে হলো, তার ভাই বাস্তবেই অনেক কঠিন সময় পার করছে।

কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম, এখন যদি তাকে প্রতিশ্রুতি দিই, তাহলে তা পূরণ করতে পারবো না। কারণ, এখনকার যুগে প্রাথমিক ডিগ্রী তো দূরের কথা স্নাতক ডিগ্রীধারী বহু শিক্ষিত মানুষই চাকুরি পাচ্ছে না। আর আমার নিজের সামর্থ্যের পরিধি তো আমার জানা আছে।

পরিস্থিতিটি আমার জন্য অনেক বিব্রতকর ছিলো। মনে মনে ভাবছিলাম, কোনোভাবে যদি এই লোকটির সহযোগিতা করতে পারতাম। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, তার আবেগ ও অনুভূতি বিবেচনায় রেখে উপযুক্ত পন্থায় আমার অপারগতা ও ওজর পেশ করবো।

আমি বললাম, 'ভাই! কসম করে বলছি, আপনাকে সহায়তা করতে আমার মন চাচ্ছে। আপনার ভাই তো আমারও ভাই। আপনি যেমন তার জন্য কষ্ট অনুভব করছেন, আমিও করছি। তা সত্ত্বেও আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারছি না। আশা করি, আপনি আমার অপারগতাকে ক্ষমা করবেন।'

তিনি বললেন, 'জনাব! একটু চেষ্টা করে দেখুন।'

আমি বললাম, 'না ভাই! বাস্তবে আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

তিনি হাতের কাগজটি আমাকে দিয়ে বললেন, 'জনাব! অন্তত এই কাগজটি রাখুন। এতে আমার ফোন নাম্বার আছে। কখনও যদি তার জন্য কোনো চাকুরি পেয়ে যান, তাহলে আমাকে ফোন করার অনুরোধ রইলো।'

আমি বুঝতে পারলাম, তিনি আমাকে একটি প্রত্যাশার রশিতে বাঁধতে চান। এরপর থেকে তিনি আমার ফোনের অপেক্ষায় থাকবেন। আশায় বুক বাঁধবেন। আর ভাইকেও আশা করতে বলবেন।

আমি বললাম, 'তার চেয়ে বরং এক কাজ করুন। কাগজটি আপনার কাছেই রাখুন। আমার নাম্বার নিয়ে যান। তার জন্য উপযুক্ত কোনো চাকুরির সন্ধান পেলে আমাকে ফোন করবেন। আমি সেই পদে তাকে গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বরাবর সুপারিশপত্র লিখে দেবো।'

লোকটি কিছুক্ষণ নিরব রইলেন। আমি তার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার অপেক্ষা করতে লাগলাম।

হঠাৎ তিনি বললেন, 'আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। জনাব! এক বছর পূর্বে .... যুবরাজের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলেছি। কিন্তু তিনি এখনো পর্যন্ত ফোন করেন নি। .... ব্রিগেডিয়ার সাহেবের সঙ্গেও এ ব্যাপারে কথা বলেছি। তিনিও কাগজ রেখে দিয়েছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো ফোন করেন নি।

তারা কেউ বিষয়টিকে গুরুত্বও দেয় নি। তারা দুর্বল ও অসহায়দের কোনো গুরুত্ব দেন না। আল্লাহ এদের বিচার করবেন। আল্লাহ ... ।'

এভাবে তিনি তাদের নামে বিভিন্ন বদদোয়া করতে লাগলেন। আমি মনে মনে বললাম, 'আলহামদুলিল্লাহ! যদি আমিও কাগজটি গ্রহণ করতাম তাহলে আমি হতাম বদদোয়া ও অভিশাপের তৃতীয় টার্গেট।'

তাই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের চেয়ে শুরুতেই অপারগতা প্রকাশ করা উত্তম। যদি আমরা স্পষ্টভাষী হতাম! নিজ সামর্থ্য ও ক্ষমতার পরিধি বুঝে কাজ করতাম তাহলে কত ভালো হতো!

অন্যান্য মানুষের প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য নয়। নিজের স্ত্রী সন্তানদের ক্ষেত্রেও এ নীতি মেনে চলা উচিত।

মাঝে মধ্যে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় স্ত্রী হয়তো বলবে, 'ফেরার সময় দুধ, চিনি, ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও রাতের নাস্তা নিয়ে এসো।'

তখন সতর্ক হোন। যদি মনে করেন যে, আজ কিছু টাকা নেই বা অন্য কোনো কারণে কিছু আনতে পারবেন না, তাহলে আপনিও স্ত্রীকে সরাসরি বলুন, 'আজ পারবো না!'। ফিরে এসে 'সময় ছিলো না', 'দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো', 'ভুলে গিয়েছিলাম'- এসব অজুহাত পেশ করার চেয়ে প্রথমেই না বলা ভালো।

সহপাঠী-সহকর্মী, ভাই বোন সবার সঙ্গেই এই নীতি পালন করুন।

আশা করি, আপনি বুঝে ফেলেছেন।

অভিজ্ঞতা ...

অজুহাত-অপারগতা পেশ করতে হলে শেষে নয়;

শুরুতেই পেশ করা শ্রেয়।



৬৩. বিড়ালটিকে কে লাথি মারলো?!

এ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে পুরো ঘটনাটি শুনুন।

জনৈক ব্যক্তি এক বদমেজাজী পরিচালকের সেক্রেটারি হিসেবে চাকুরি করতো। মানুষের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করার কোনো যোগ্যতা সেই পরিচালকের ছিলো না। সে অনেক কাজ জমা করে রাখতো। সামর্থ্যের চেয়ে অনেক বেশি কাজের দায়িত্ব নিতো।

একদিন সে তার সেক্রেটারিকে ডাকলো। সেক্রেটারি সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললো: স্যার, আমি আপনার কী সাহায্য করতে পারি?

সে তাকে ধমক দিয়ে বললো, 'আমি তোমার অফিসের ফোনে রিং করলাম, তুমি রিসিভ করলে না কেন?'

সে বললো, 'স্যার! দুঃখিত, আমি পাশের রুমে ছিলাম।'

'কিছু হলেই দুঃখিত! দুঃখিত! নাও, এই কাগজপত্রগুলো মেরামত বিভাগের প্রধানের কাছে পৌঁছে দিয়ে দ্রুত ফিরে এসো।'

সেক্রেটারি বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে গেলো। মেরামত বিভাগের প্রধানের কাছে কাগজগুলো দিয়ে বললো, 'কাগজগুলো দিয়ে গেলাম। কাজ শেষ করতে যেন দেরি না হয়।'

সেক্রেটারির আচরণে মেরামত বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা অবাক হলেন। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, কাগজগুলো ভদ্রভাবে রেখে যান।'

'ভদ্রতা আর অভদ্রতার ধার ধারি না। কাজটি গুরুত্বপূর্ণ । দ্রুত করে দিবেন।'

এভাবে উভয়ের মাঝে কতক্ষণ উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় চললো। একপর্যায়ে সেক্রেটারি তার রুমে চলে গেলো।

ঘণ্টাদুয়েক পর মেরামত বিভাগের নিম্নস্তরের এক কর্মচারী বিভাগের প্রধানের কাছে এসে বললো, 'স্যার! আমার সন্তানদের স্কুল থেকে নিয়ে আসার জন্য একটু যেতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো।'

প্রধান কর্মকর্তা তাকে ধমক দিয়ে বললো, 'তুমি দেখছি প্রতিদিনই এভাবে বের হচ্ছো।'

কর্মচারী বললো, 'আমার চাকুরি জীবনের দশ বছর যাবতই তো আমি যাচ্ছি। কিন্তু আপনি এই প্রথম আপত্তি জানালেন।'

প্রধান কর্মকর্তা বললো, 'তোমার মতো লোকদের সঙ্গে চোখ লাল করে কথা না বললে হয় না। যাও, তোমার ডেস্কে ফিরে যাও।'

প্রধান কর্মকর্তার এমন আচরণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সে নিজের ডেস্কে ফিরে এলো। এরপর তার সন্তানদের স্কুল থেকে বাড়িতে পৌঁছে দেয়ার জন্য কাউকে খুঁজে পেতে ফোনে যোগাযোগ করলো। অবশেষে অনেক্ষণ রোদে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার পর তাদের এক শিক্ষক তাদেরকে বাড়িতে পৌঁছে দিলো।

অফিস শেষে কর্মচারী উত্তেজিত হয়ে বাড়ি ফিরলো। বাবাকে দেখেই ছোট ছেলেটি একটি খেলনা হাতে দৌড়ে এলো। সে বললো, 'বাবা! দেখো দেখো, স্যার আমাকে এটা কিনে দিয়েছেন। কারণ, আমি ......'

কিন্তু তার বাবা তার কথা শেষ করতে না দিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। এরপর ধমকের স্বরে বললেন, 'যাও , তোমার আম্মুর কাছে যাও।'

ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে এলো। তাকে কাঁদতে দেখে তার আদরের পোষা বিড়ালছানাটি দৌড়ে এলো এবং অভ্যাসবশত তার দু'পায়ে শরীর ঘষতে লাগলো।

কিন্তু বিরক্ত ছেলেটি রাগে ও ক্ষোভে বিড়ালটিকে এক লাথি দিয়ে দূরে সরিয়ে দিলো। বিড়ালটি উড়ে গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে আঘাত খেলো।

এখন প্রশ্ন হলো, 'এই বিড়ালটিকে লাথি দিলো কে?'

আমার মনে হয় আপনি মুচকি হেসে উত্তর দেবেন, 'পরিচালক।'

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। সেই বদমেজাজী পরিচালকই এর জন্য দায়ী। কারণ, সেই নিজের ওপর সাধ্যাতীত কাজের ভার নিয়েছিলো, যা অতিরিক্ত চাপে বিস্ফোরিত হয়ে গেছে।

আমরা কেন কর্মবণ্টনের বিষয়টি রপ্ত করি না। আমাদের উচিত কাজসমূহকে ভাগ করে নেয়া। আমি নিজে যা পারি না, তা ছেড়ে দেয়া। কারণ এর দায়িত্ব আমার নয়। যেসব কাজ আমরা করতে পারব না পূর্ণ

সাহসিকতার সঙ্গে আমরা বলে দেবো, 'না, আমার পক্ষে এটা সম্ভব নয়।' বিশেষ করে যখন নিজের ওপর কোনো কাজ চাপিয়ে নিলে আপনার কাজকর্মে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে এবং এর ফলে এ কাজে শরিক নয় এমন ব্যক্তিদের উপরও চাপটা সংক্রমিত হবে তখন অবশ্যই স্পষ্ট ভাষায় 'না' করে দিতে হবে।

কেউ যেন আমাকে প্রভাবিত করতে না পারে এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। কারো চাপাচাপিতে আমি এমন কোনো ওয়াদা করব না যা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আপনি চাইলে আমরা একটু সোনার মদিনায় ঘুরে আসতে পারি। দেখতে পারি নবী করিম ﷺ এর জীবনাদর্শের সোনালি এ্যালবাম।

রাসূল বসে আছেন সাহাবীদের নিয়ে মদিনার এক মজলিসে। ইতোমধ্যে আরবের দিগদিগন্তে পৌঁছে গেছে ইসলামের মর্মবাণী, রাব্বুল আলামিনের একত্ববাদের মহান চিরন্তন শিক্ষা। বিভিন্ন গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আসছেন রাসূল ﷺ-এর খেজুর পাতার শাহী দরবারে। কেউ আসছেন ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে। আবার কেউ আসছেন ইসলামের নবীর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে। আবার কেউ আসছে অপদস্থ হয়ে কিংবা বিদ্বেষ নিয়ে।

একদিনের ঘটনা। আরবের এক গোত্রপ্রধান নবী করিম ﷺ-এর দরবারে এলো। তার নাম আমর বিন তুফাইল। নিজ গোত্রের ওপর তার প্রভাব প্রতিপত্তি সীমাহীন। আরবের সবখানে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা দেখে একদিন তার গোত্রের লোকেরা তাকে বললো, 'আমর! সবাই তো ইসলাম গ্রহণ করেছে, আমরাও ইসলাম গ্রহণ করে নিই। আর কিসের অপেক্ষা করবো?'

আমর ছিলো বড় দাম্ভিক ও অহঙ্কারী। সে তাদেরকে বললো, 'শপথ আল্লাহর! আমি তো শপথ করেছি, যতদিন না আরববাসী আমাকে তাদের নেতৃত্বের আসনে বসাবে, যতদিন না তারা আমার বশ্যতা স্বীকার করবে, ততদিন আমার মৃত্যু হবে না। আর তোমরা বলছো আমাকে তার আনুগত্য করতে? আমি এই কোরাইশ যুবকের আনুগত্য করবো?'

কিন্তু আমর যখন দেখলো দিন দিন ইসলাম সুসংহত হচ্ছে এবং রাসূল ﷺ-এর প্রতি মানুষের আনুগত্য বেড়েই চলছে তখন সে তার কয়েকজন অনুচর নিয়ে উটের পিঠে চড়ে রাসূলের সাথে সাক্ষাত করতে এলো।

রাসূল ﷺ সাহাবিদের নিয়ে মসজিদে বসে আছেন। আমের মসজিদে প্রবেশ করলো। এরপর সে রাসূলের সামনে দাঁড়িয়ে বললো, 'মুহাম্মদ! আমি তোমার সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাই।' রাসূল এ ধরনের দুষ্ট প্রকৃতির লোক থেকে সবসময় সতর্ক থাকতেন। তাই তিনি বললেন, 'না। আল্লাহর শপথ! যতক্ষণ না তুমি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনছো, তোমার সঙ্গে একান্তে কথা বলব না।'

সে আবার বললো, 'মুহাম্মদ! আমি একান্তে কথা বলতে চাই।'

রাসূল ﷺ এবারও তার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন।

সে বারবার একই কথা বলতে লাগলো।

ভদ্রতার খাতিরে এক পর্যায়ে রাসূল তার সঙ্গে কথা বলতে মজলিস থেকে উঠে তার সাথে গেলেন।

আমর ইতিপূর্বে ইরবাদ নামক তার এক অনুচরকে বলে রেখেছিলো, 'আমি মুহাম্মদকে কথায় ব্যস্ত রেখে অমনোযোগী করে ফেলবো। তুমি এই সুযোগে তরবারির আঘাতে তাকে শেষ করে দেবে।'

রাসূল একটি প্রাচীরের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন। ইরবাদ তরবারির বাঁটে হাত রেখে অপেক্ষা করছিলো কাঙ্খিত মুহূর্তের। কিন্তু যতবারই সে তরবারি কোষমুক্ত করতে যাচ্ছিলো, সঙ্গে সঙ্গে তার হাত অবশ হয়ে আসছিলো। ফলে কিছুতেই সে তরবারি কোষমুক্ত করতে পারলো না।

আমর রাসূলকে কথায় ব্যস্ত রেখে বারবার ইরবাদের দিকে তাকাতে লাগলো। কিন্তু ইরবাদ যেন নিষ্প্রাণ জড়বস্তু! তার মধ্যে কোনো নড়াচড়া নেই।

রাসূল ﷺ ইরবাদের দিকে তাকিয়ে বুঝে ফেললেন সে কী করতে চাচ্ছে। রাসূল আমরকে বললেন, 'আমর! ইসলাম গ্রহণ করে নাও।'

আমর বললো। 'মুহাম্মদ! আমি ইসলাম গ্রহণ করলে তুমি আমাকে কী দেবে।' 'অন্যান্য মুসলমান যে অধিকার লাভ করে, তুমিও তাই লাভ করবে। অন্যদের ওপর যা বর্তায়, তোমার ওপরও তাই বর্তাবে।' রাসূল উত্তর দিলেন।

আমর বললো, 'আমি যদি ইসলাম গ্রহণ করি তাহলে কি তুমি তোমার মৃত্যুর পর এই রাজত্ব আমাকে দেবে?

রাসূল ﷺ আমরকে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দিলেন না। তিনি তাকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন, 'না, নেতৃত্ব ও রাজত্ব তোমার জন্যও নয়, তোমার সম্প্রদায়ের জন্যও নয়।'

এবার আমর তার দাবি কিছুটা শিথিল করলো। সে বললো, 'আমি এ শর্তে ইসলাম গ্রহণ করতে পারি যে, আমি হবো পল্লি এলাকার কর্ণধার, আর তুমি হবে শহরাঞ্চলের শাসক।'

কিন্তু এবারও রাসূল আমরকে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী হলেন না, যা বাস্তবায়ন হবে কিনা, তা তিনি জানেন না। তাই তিনি আবারও স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন- না, এটাও সম্ভব নয়।

এ উত্তর শুনে আমর খুব উত্তেজিত হলো। রাগে তার চেহারা অগ্নিশর্মা হয়ে গেলো। সে চিৎকার করে বললো, 'আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ! আমি অবশ্যই তোমার বিরুদ্ধে তেজী ঘোড়া আর নওজোয়ান এক পদাতিক বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত থাকবো। প্রতিটি খেজুর গাছের সঙ্গে একটি করে ঘোড়া বাঁধা থাকবে। একহাজার বাজ, আর একহাজার সুগঠিত সৈন্য দিয়ে গাতফানে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবো।'

এ কথা বলে রাগে আর ক্ষোভে বজ্রের ন্যায় শব্দ করতে করতে সে বের হয়ে গেলো।

রাসূল ﷺ আমরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এরপর আকাশের দিকে মুখ করে বললেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমরের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাও। আর তার সম্প্রদায়কে হেদায়াত দাও।'

আমর তার অনুচরদের নিয়ে বেরিয়ে গেলো। মদিনা ছেড়ে নিজ এলাকার উদ্দেশে রওয়ানা হলো। মনে ক্ষোভের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে মদিনায় আক্রমণ করার দৃঢ় সংকল্প করছে। পথ চলতে চলতে আমর ক্লান্ত হয়ে পড়লো। একটু বিশ্রামের জন্য সে কোনো জায়গা খুঁজছিল। পথিমধ্যে তার সাক্ষাৎ হলো 'সালুলিয়া' নামক এক মহিলার সঙ্গে । মহিলাটি তার তাবুতে ছিল। সে ছিল এমন মন্দ স্বভাবের যে, কেউ তার তাঁবুতে ঢুকলে সবাই তার ওপরও অন্যায় আর পাপের অপবাদ দিতো।

ক্লান্ত-শ্রান্ত আমর অন্য কোনো জায়গা না পেয়ে বিশ্রামের জন্য সালুলিয়ার তাঁবুতেই আশ্রয় নিলো এবং সেখানে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুমের মধ্যেই তার গলায় একটি অর্বুদ (টিউমার) দেখা দিলো। এ ধরণের রোগ সাধারণত উটের ঘাড়ে হয়ে থাকে। উটের কণ্ঠনালি ফুলে যায় এবং অতিসত্বর উটটি মারা যায়।

আমর খুব ভীত ও অস্থির হয়ে পড়লো। সে বারবার গলার টিউমারটি স্পর্শ করে বলতে লাগলো, 'হায়! উটের মতো টিউমার আর সালুলিয়ার ঘরে মৃত্যু!' অর্থাৎ বড় অসম্মানের মৃত্যু! অসম্মানের স্থানে মৃত্যু!

তার কামনা ছিলো- মৃত্যু হলে রনাঙ্গণে সাহসী বীর যোদ্ধাদের তরবারির আঘাতে তার মৃত্যু হবে। কিন্তু আজ তার মৃত্যু হচ্ছে পশুরোগে আক্রান্ত হয়ে! তাও এক পতিতার ঘরে!

হায়! ধিক্কার! হায় লাঞ্ছনা!

সে চিৎকার করে তার অনুচরদের ডাকলো। তাদেরকে সে তার ঘোড়াটি কাছে নিয়ে আসতে বললো। তারা ঘোড়া নিয়ে আসতেই সে লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়লো এবং বর্শা হাতে তুলে নিলো। ঘোড়াও তাকে নিয়ে চলতে শুরু করলো। অসহ্য যন্ত্রণায় সে বারবার চিৎকার করছিলো।

বারবার গলা স্পর্শ করে সে বলছিলো, 'হায়! উটের মতো অর্বুদ! আর সালুলিয়ার ঘরে মৃত্যু! ঘোড়া তাকে নিয়ে চলছিলো আর সে যন্ত্রণায় চিৎকার করছিলো। এরই মধ্যে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। তার লাশ ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলো।

অনুচরেরা তার লাশ পথেই ফেলে রেখে চলে গেল। তারা যখন নিজেদের এলাকায় পৌঁছলো, সবাই ইরবাদকে ঘিরে ধরে জানতে চাইলো, 'ইরবাদ! বলো, কী হয়েছিল?'

সে বললো, 'না, তেমন কিছু নয়। মুহাম্মদ আমাদেরকে একজনের ইবাদত করতে বলেছে। আল্লাহর শপথ! সে যদি এখন আমার নাগালে থাকতো, আমি তাকে বল্লম মেরে হত্যা করতাম।'

সুবহানাল্লাহ ! পবিত্র সত্তা আল্লাহ ! সুমহান সত্তা আল্লাহ! আল্লাহর বিরুদ্ধে কত বড় ধৃষ্টতা! এ কথা বলার একদিন বা দু'দিন পর সে তার একটি উট বিক্রি করতে বাড়ি থেকে বের হলো। পথেই আল্লাহ তাআলা তাকে তার উটসহ বজ্রাঘাতে জ্বালিয়ে দিলেন।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এই আমর ও ইরবাদের পরিণতি বর্ণনা করে ইরশাদ করেছেন-

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ؕ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ. عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ. سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ. لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ. هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ. لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ.

অর্থ : 'প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং মাতৃগর্ভে যা বাড়ে ও কমে তাও আল্লাহ জানেন এবং তার কাছে প্রত্যেক জিনিসের এক নির্দিষ্ট

পরিমাণ আছে। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সব কিছুই জানেন। তাঁর সত্তা অনেক বড়, তাঁর মর্যাদা অনেক উচ্চ। তোমাদের মধ্যে কেউ চুপিসারে কথা বলুক বা উচ্চস্বরে, কেউ রাতের বেলা আত্মোগোপন করুক বা দিনের বেলা চলাফেরা করুক, তারা সকলে (আল্লাহর জ্ঞানে) সমান।

প্রত্যেকের সামনে পেছনে এমন প্রহরী (ফেরেশতা) নিযুক্ত আছে, যারা আল্লাহর নির্দেশে পালাক্রমে তার হেফাজত করে। নিশ্চিত জেনে রেখো, আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আল্লাহ যখন কোনো জাতির উপর কোনো বিপদ আপতিত করার ইচ্ছা করেন, তখন তা রদ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আর তিনি ছাড়া তাদের কোনো রক্ষাকর্তা নেই। তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে বিজলীর চমক দেখান, যা দ্বারা তোমাদেরকে সতর্ক করা হয় এবং এর দ্বারা (বৃষ্টির) আশাও সঞ্চার হয় এবং তিনিই পানিবাহী মেঘ সৃষ্টি করেন।

বজ্র তাঁরই তাসবীহ ও হামদ জ্ঞাপন করে এবং তাঁর ভয়ে ফেরেশতারাও তাসবীহ পড়তে থাকে। তিনিই বিজলী পাঠান তারপর যার উপর ইচ্ছা বিপদরূপে পতিত করেন। আর তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) অবস্থা এই যে, তারা আল্লাহর সম্বন্ধেই তর্ক-বিতর্ক করছে, অথচ তাঁর শক্তি সীমাহীন।

তিনিই সেই সত্তা, যার কাছে দোয়া করা যথার্থ। তারা তাকে ছেড়ে যাদেরকে (দেব-দেবীদেরকে) ডাকে তারা তাদের দোয়ার কোনো জবাব দিতে পারে না। তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মতো, যে পানির দিকে দুই হাত বাড়িয়ে আশা করে যে, পানি নিজে নিজে তার মুখে পৌছে যাবে। অথচ তা কখনো নিজে নিজে তার মুখে পৌঁছতে পারে না। আর (দেব-দেবীদের কাছে) কাফেরদের দোয়া কোনো ফল বয়ে আনবে না।

(সূরা রা'দ:৮-১৪)

যে বিষয়ে আপনার পূর্ণ আস্থা আছে যে, আল্লাহর রহমতে আপনি তা সম্পাদন করতে পারবেন, কেবল সে বিষয়ের দায়িত্বই আপনি নেবেন।'

রাসূল ﷺ একদিন জনসম্মুখে কিছু বলার জন্য দাঁড়ালেন। তিনি আখিরোতের ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। একপর্যায়ে স্বর উঁচু করে বলতে লাগলেন– 'হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা! তুমি

আমার সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা নিয়ে নাও। আল্লাহর শাস্তি থেকে আমি তোমাকে বিন্দুমাত্রও রক্ষা করতে পারবো না।'

এ বিষয়ে শেষ কথা এটাই, আপনি কোনো বিষয়ে অক্ষম হলে, বিষয়টি সম্পাদনের পূর্ণ আস্থা না থাকলে অবশ্যই তার দায়িত্ব নেবেন না, কাউকে এ বিষয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি দেবেন না। তবে, আপনার অক্ষমতা প্রকাশের ভঙ্গি ও ধরন যেন সুন্দর ও আবেগঘন হয়। উদাহরণস্বরূপ কেউ আপনার কাছে তার ভাইয়ের জন্য চাকুরির খোঁজে এলো। আপনি নিশ্চিত যে, এ মুহূর্তে আপনি তার কোনো সাহায্য করতে পারবেন না। তাহলে আপনি তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলুন, যেন তার মুখের হাসি বহাল থাকে। সে যেন উপলব্ধি করে যে, তার দুঃখ ও চিন্তায় আপনিও শরিক আছেন।

আপনি তাকে বলুন, 'ভাই! আমি তোমার কষ্ট ও দুঃখ পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারছি। তোমার ভাইকে আমি আমার ভাইয়ের মতোই মনে করি। আমার যদি পাঁচ ভাই থাকে, সে আমার ষ'ভাই। কিন্তু সমস্যা হলো, এ ব্যাপারে আমি এখন কিছু করতে পারছি না। আমার এ অপারগতা তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন তোমার ভাইয়ের জন্য ভালো কোনো চাকুরির ব্যবস্থা করে দেন।'

এ কথাগুলো আপনি তাকে বলুন খুব কোমল স্বরে, মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে। প্রতিটি বাক্য বলার সময় আপনার থেকে যেন আবেগ আর ভালোবাসা ছড়িয়ে পড়ে।

আপনার এই সুন্দর প্রত্যাখানের পরও তার মনে হবে, আপনি তাকে ফিরিয়ে দেন নি। আপনি তার প্রতি সত্যিই আন্তরিক।

তাই নয় কি?

দৃষ্টিভঙ্গি ...

নিজের সঙ্গে স্পষ্টবাদী হোন। মানুষের সঙ্গেও স্পষ্টভাষী হোন।
নিজের সামর্থ্যকে জানুন এবং সামর্থ্যের সীমার মধ্যেই চলুন।



Contents

৬৪. বিনয়ী হোন

একবার বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে এক বৈঠকে বসে আলোচনা করছিলাম। অহংকারী এক ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে অনেক কিছু বলছিলো। এ লোকটি এক পর্যায়ে বলে উঠলো, 'একবার আমি এক শ্রমিকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সে আমার সঙ্গে মোসাফাহা করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলো। আমি প্রথমে ইতস্তত করলাম। পরে অবশ্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে তার সঙ্গে মোসাফাহা করেছিলাম।' এরপর সে বললো, 'আমি সাধারণত কারো সঙ্গে মোসাফাহা করার জন্য হাত বাড়াই না।'

কী সুন্দর মনোভাব! অথচ রাসূল ﷺ-এর আদর্শ দেখুন। দুর্বল এক ক্রীতদাসী রাস্তার মধ্যেই রাসূলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার মালিকের জুলুম কিংবা সাধ্যাতীত কাজ চাপানোর অভিযোগ করলো। রাসূল নিজের কাজ রেখে তার পক্ষে সুপারিশ করতে তাকে সঙ্গে নিয়ে মালিকের বাড়িতে চলে গেলেন।

রাসূল ﷺ বলেছেন-

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ.

'যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।
(সহীহ মুসলিম: ১৩১)

আমরা কতজনকে বলতে শুনেছি, 'ভাই ! অমুক ব্যক্তি তো অনেক অহঙ্কারী।' 'অমুক তো নিজেকে অনেক বড় মনে করে।'

অহঙ্কারের কারণে মানুষ তাকে ঘৃণা করে, তার নিন্দা করে।

মনে করুন, আপনি কাউকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি তোমার অমুক প্রতিবেশীকে কোনো কাজে সাহায্য করো না কেন?'

সে বলবে, 'সে তো সবার সাথে বড়ত্ব দেখায়। অহঙ্কারের কারণে সে তো আমাদের সাথে মুখোমুখি কথাও বলে না। তাকে কী সাহায্য করবো?'

হায়! অহঙ্কার ও দাম্ভিকতা প্রকাশের কারণে মানুষের কাছে সে কত ঘৃণিত! কতটা অপাঙক্তেয়! সমাজচ্যুত! অথচ এরা নিজেকে অমুখাপেক্ষী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে!

কেউ মানুষকে দেখলে গাল কুঞ্চিত করে ফেলে কিংবা দম্ভভরে পথ চলে।

আবার কেউ শ্রমিক, চাকর ও দরিদ্র শ্রেণির মানুষের সঙ্গে অহঙ্কার দেখায়। এদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে, করমর্দন করতে এমনকি একসঙ্গে বসতেও নাক ছিটকায়।

অথচ আমাদের নবী করিম ﷺ-এর আদর্শ কেমন ছিল তা একটু দেখুন।

বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশের পর নবী করিম ﷺ মক্কার পথে প্রান্তরে, অলিতে-গলিতে হাঁটতে লাগলেন।

এসব পথে তার প্রতি হয়েছে কত নির্যাতন-নিপীড়ন। সয়েছেন কত কটূক্তি। এই পথে কতবার তিনি শুনেছেন, 'হে পাগল!', 'হে যাদুকর!', 'হে জ্যোতিষী', 'হে মিথ্যাবাদী!'

আজ তিনি সেই মক্কায় প্রবেশ করেছেন একজন প্রতাপশালী ও ক্ষমতাবান নেতা হিসেবে। আর মক্কাবাসীকে আল্লাহ তাআলা তারই সামনে পরাভূত ও অপদস্থ করে হাজির করেছেন।

বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশের সময় রাসূলের অনুভূতি কেমন ছিলো?

আবদুল্লাহ বিন আবি বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'রাসূল ﷺ বাহনের ওপর ছিলেন। যী-তুওয়া নামক স্থানে পৌঁছে বিনয়ের সাথে থেমে গেলেন। রাসূল তখন একটি লাল চাদর আবৃত ছিলেন। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তাকে যে মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছেন, তা প্রকাশার্থে রাসূল মাথা নত করে ফেললেন। তখন তিনি এতো নুয়ে পড়লেন যে, তাঁর দাড়ি উটের হাওদার কাঠ স্পর্শ করার উপক্রম হয়েছিলো।'

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল ﷺ যখম মক্কায় প্রবশে করেন, তখন তার চিবুক নিচু হতে হতে হাওদার কাঠের সঙ্গে লেগে গিয়েছিলো।'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হয়ে কোনো বিষয়ে কথা বলছিলো। ভয়ে তাকে কাঁপতে দেখে রাসূল বললেন, 'শান্ত হও। আমি তো শুকনো গোশত আহারকারিণী কোরাইশি মহিলার সাধারণ এক সন্তান!'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, 'আমি বসি ক্রীতদাসের মতো, আর আহার করি ক্রীতদাসের মতো।'

সারকথা ...

আল্লাহর জন্য যে বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। বিনয়ের কারণে আল্লাহ বান্দার সম্মান বৃদ্ধি করেন।



৬৫. নির্জন ইবাদত

দশ বছর আগের কথা। এক শীতের রাতে আমরা কয়েক বন্ধু মরুভূমিতে সফর করছি। হঠাৎ আমাদের গাড়িবহরের একটি গাড়ি নষ্ট হয়ে গেলো। বাধ্য হয়ে রাতটা মরুর বুকেই কাটাতে হলো। আমরা আগুন জ্বালিয়ে চারপাশে গোল হয়ে বসে ছিলাম। হাড়কাঁপানো শীতের রাতে আগুনের পরশে বসে গল্প করার অভিজ্ঞতা খুবই আনন্দদায়ক! গল্প চলছিল অনেকক্ষণ ধরে। হঠাৎ আমাদের মাঝ থেকে এক বন্ধু কাউকে কিছু না বলে চুপিসারে উঠে গেলো।

এ বন্ধুটি ছিলো অনেক পরহেজগার মানুষ। সে নির্জনে ইবাদত করতে ভালোবাসতো। জুমার নামাযের জন্য সে খুব ভোরে মসজিদে চলে যেতো। কখনো কখনো দরজা খোলার আগেই মসজিদে উপস্থিত হতো।

সে আমাদের থেকে একটু দূরে গিয়ে একটি পানির পাত্র হাতে নিলো। আমি ভাবলাম, সে হয়তো প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেছে।

অনেকক্ষণ হয়ে গেলো, কিন্তু সে ফিরে আসছে না। তাই আমি তাকে খুঁজতে বের হলাম। গিয়ে দেখলাম, এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে একটি চাদর মুড়ি দিয়ে সে মহান আল্লাহর দরবারে সেজদায় পড়ে আছে। রাতের অন্ধকারে প্রিয়তম প্রভুর সঙ্গে একান্ত 'আলাপচারিতায়' নিমগ্ন হয়ে আছে। কেঁদে কেঁদে নিজের দীনতা ও হীনতা প্রকাশ করে চলছে।

সে যে আল্লাহকে ভালোবাসে আর আল্লাহও যে তাকে ভালোবাসে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই গোপন ইবাদতের প্রতিদানস্বরূপ শুধু আখিরাতে নয় আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেও বান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।

এরপর বহু বছর কেটে গেছে।

আল্লাহ তাআলা তাকে অনেক সম্মান দান করেছেন। সবার মধ্যে সে অনেক প্রিয়। ছোট বড় সবাই তাকে ভালোবাসে।

মানুষের হেদায়েত ও দীনের দাওয়াতের কাজে তার রয়েছে অনেক অবদান। ঘরে- বাইরে, বাজার-সমজিদে যেখানেই যায়, ছোট বড় সকলেই; বরং বড়দের আগে ছোটরা তার সাথে একটু মোসাফাহার জন্য ছুটে আসে।

ধনী ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, রাজনৈতিক নেতা ও সমাজের কর্ণধাররা মানুষের ভালোবাসা ও জনপ্রিয়তা লাভ করার জন্য কত কিছু করে! সবাই তার মতো সম্মান, ভালোবাসা ও জনপ্রিয়তা লাভ করতে চায়। কিন্তু সেটা কি সম্ভব? সম্মান আর মানুষের ভালোবাসা তো টাকা আর ক্ষমতার বলে লাভ করা যায় না। সম্মান আর ভালোবাসা লাভ করতে হয় নেক আমলের মাধ্যমে। কবি বলেন– গভীর রজনীতে আমি জেগে জেগে মাওলাকে ডাকি আর তুমি আরামের ঘুমে বিভোর থাকো। এরপরও তুমি আমার নাগাল পেতে চাও। এটা কি সম্ভব?

পবিত্র কুরআনের ভাষ্য হলো-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا.

অর্থ :'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, নিশ্চয় দয়াময় (আল্লাহ) তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালোবাসা।' (সূরা মারইয়াম:৯৬)

সৃষ্টিকুলের হৃদয়ে তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা অকৃত্রিম ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন।

আল্লাহ যখন কাউকে ভালোবাসেন, পৃথিবীবাসীর মাঝেও তার ভালোবাস ও গ্রহণযোগ্যতা ছড়িয়ে দেন।

রাসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন জিবরাঈলকে ডেকে বলেন, 'আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাসো।' তখন জিবরাঈল তাকে ভালোবাসতে থাকেন। এরপর জিবরাঈল আ. আসমানবাসী ফেরেশতাদের মাঝে ঘোষণা করেন, 'আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসে, তোমরাও তাকে ভালোবাসো।' তখন আসমানবাসীরা তাকে ভালোবাসতে থাকে।"

রাসূল বলেন, 'এরপর পৃথিবীবাসীদের অন্তরে তার ভালোবাসা দিয়ে দেয়া হয়।'

এরপর নবী করিম ﷺ বলেছেন, "আর আল্লাহ যখন কোনো বান্দার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তখন জিবরাঈলকে ডেকে বলেন, 'আমি অমুককে ঘৃণা করি, তুমিও তাকে ঘৃণা করো।' তখন জিবরাঈল তাকে ঘৃণা করতে থাকেন। এরপর জিবরাঈল আ. আসমানবাসী ফেরেশতাদের মাঝে ঘোষণা

করেন, 'আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে অপছন্দ করেন, তোমারও তাকে অপছন্দ করো।' তখন আসমানবাসী তাকে অপছন্দ করতে থাকে। এরপর পৃথিবীবাসীদের অন্তরে তার প্রতি ঘৃণা ঢেলে দেয়া হয়।" (মুসলিম:৪৭৭২)

কী চমৎকার জীবন! আপনি বিচরণ করছেন মাটির পৃথিবীতে, সবার মতো আহার-নিদ্রা করছেন, আর আকাশের অধিপতি আসমান-জমিনের অধিবাসীদের ডেকে আপনার নাম নিয়ে বলেছেন, 'আমি অমুককে ভালোবাসি। তোমরাও তাকে ভালোবাসো।'

পৃথিবীর মানুষের জন্য এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কী হতে পারে! এর চেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে!

যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'কেউ যদি একান্তে ও গোপনে কোনো নেক আমল ও সৎ কাজ করার সুযোগ পায় তাহলে সে যেন তা করে ফেলে।' গোপন আমল ও ইবাদত বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন-

ক. নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়া। প্রতিরাতে বেশি না হোক দুই চার রাকাতই পড়ুন। এ নামায এশার পর ঘুমের আগে বা সুবহে সাদিকের পূর্বে, যে কোনো সময় পড়তে পারেন। যখনই পড়েন না কেন, আপনার নাম তাহাজ্জুদগুযারদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা বেজোড়। তিনি বেজোড় পছন্দ করেন। তাই হে কুরআনের বাহকগণ! তোমরা বেজোড় ইবাদত করো।'

খ. মানুষের পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ নিরসন করা। স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ, দুই প্রতিবেশীর ঝগড়া অথবা বন্ধু-বান্ধব কিংবা সহকর্মীদের মনোমালিন্য দূর করতে পারেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে নামায, রোযা ও দান-সদকা থেকেও উত্তম আমল সম্পর্কে বলবো?'

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল!'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দেয়া। কেননা, পরস্পর ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি করা ধ্বংসাত্মক কাজ।' (আহমদ: ২৬২৩৬)

গ. রাসূল ﷺ একদিন সাহাবায়ে কিরামকে সম্বোধন করে বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন আমল সম্পর্কে অবহিত করবো, যা আল্লাহর কাছে শ্রে'ও পবিত্র আমল হিসেবে গণ্য হবে! এটা তোমাদের মর্যাদাকে অনেক উপরে নিয়ে যাবে! যা আল্লাহর পথে সোনা রূপা ব্যয় করার চেয়েও উৎকৃষ্ট! জিহাদের ময়দানে দুশমনের মুখোমুখি হয়ে শহীদ হওয়ার চেয়েও উত্তম।

সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন, সেই নেক আমলটি কী?'

রাসূল ﷺ বললেন 'তা হলো আল্লাহ তাআলার জিকির।'

(সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৭৮০ মুআত্তা মালিক: ৪৪১)

ঘ. গোপন ইবাদতের আরেকটি প্রকার হলো গোপনে দান করা। গোপনে কৃত দান আল্লাহর ক্রোধের আগুন নিভিয়ে দেয়।

খলিফাতুল মুসলিমীন আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতিদিন ফজরের নামায পড়ে মরুভূমিতে যেতেন। সেখানে কিছু সময় কাটিয়ে আবার মদিনায় চলে আসতেন।

এটা দেখে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বেশ অবাক হলেন। একদিন তিনি গোপনে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পিছে পিছে গেলেন। দেখলেন, আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনা থেকে বের হয়ে মরু এলাকার পুরোনো একটি তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি পাথরের পেছনে লুকিয়ে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কিছু সময় তাঁবুর ভেতরে অবস্থান করার পর বের হয়ে এলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবার পাথরের আড়াল থেকে বের হয়ে সোজা সেই তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, সেখানে দৃষ্টিশক্তিহীন, দুর্বল ও বৃদ্ধ এক মহিলা ছোট ছোট কয়েকটি শিশু সন্তান নিয়ে বসবাস করে।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রতিদিন আপনাদের কাছে যে লোকটি আসেন, তাকে কি আপনি চেনেন?'

মহলিা বললো, 'না, আমি তাকে চিনি না। তবে এটুকু জানি, তিনি একজন মুসলমান। কয়েকদিন যাবৎ খুব ভোরে তিনি আমাদের কাছে আসেন।'

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, 'তিনি এসে কী করেন?'

মহিলা বললো, 'তিনি এসে আমাদের ঘরদুয়ার ঝাড়ু দেন। আশপাশ পরিষ্কার করেন। ময়দা খামিরা করে দেন। পশুর দুধ দোহন করে দেন। এরপর চলে যান।'

এ কথা শুনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বগতোক্তি করতে করতে বের হলেন, 'আবূ বকর! আপনার পরবর্তী খলিফাদের দায়িত্ব অনেক কঠিন করে ফেললেন!

এর অর্থ এই নয় যে, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও এখলাসের ক্ষেত্রে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু- এর চেয়ে অনেক পিছিয়ে ছিলেন।

একবার তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে রাতের অন্ধকারে বের হয়ে যেতে দেখলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ঘরে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে বের হয়ে আরেক ঘরে প্রবেশ করলেন। সেখান থেকে বের হয়ে আরেক ঘরে। তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নির্জন রাতে এ সব ঘরে কী করতে যান?

তালহার মধ্যে খুব কৌতূহল জাগলো। কিন্তু তিনি তা বুকে চেপে রেখে কোনো মতে রাত কাটালেন। ভোর হওয়ার সাথে সাথে তিনি প্রথম ঘরটিতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, সেখানে দৃষ্টিশক্তিহীন ও চলাফেরা করতে অক্ষম এক বৃদ্ধ বসে আছে! তার পাশেই একজন মহিলা।

তিনি সে মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'রাতে আগন্তুক লোকটি আপনার কাছে কেন আসেন?'

মহিলা বললো, 'তিনি অনেকদিন যাবৎ আমাদের দেখাশোনা করেন। আমাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করেন।'

তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বেরিয়ে এলেন আর নিজেকে বলতে লাগলেন, 'আরে তালহা! হায়রে পোড়া কপাল! ওমরের ভুল-ত্রুটি খুঁজতে তার পিছু নিয়েছ?!'

আরেক রাতে খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনার উপকণ্ঠের উদ্দেশে বের হলেন। হঠাৎ দেখলেন, জনৈক পথিক পথের ধারে পুরোনো একটি তাঁবু গেড়ে অস্থির চিত্তে তাঁবুর দরজায় বসে আছে।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকটিকে জিজ্ঞেষ করলেন, 'কে আপনি?'

লোকটি বললো, 'আমি এক বেদুঈন। আমীরুল মুমিনীনের অনুগ্রহ লাভের আশায় মদিনায় এসেছি।' হঠাৎ ওমর তাঁবুর ভেতর থেকে একজন মহিলার কান্নার হালকা আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি লোকটিকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর দিলো, 'ভাই! আপনি নিজের কাজে যান। আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। অযথা অন্যের কাজে নাক গলাবেন না।'

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'দয়া করে বলুন, কী হয়েছে? আমি আপনার কোনো সাহায্য তো করতেও পারি।'

লোকটি বললো, 'আমার স্ত্রীর প্রসববেদনা শুরু হয়েছে। এ কঠিন সময়ে আমার কাছে না আছে কোনো অর্থ-সম্পদ, না কোনো খাদ্য দ্রব্য, না তাকে সাহায্য করার মতো কেউ।'

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্রুত বাড়ি ফিরলেন। স্ত্রী উম্মে কুলসুমকে বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে নেক কাজে অংশগ্রহণের একটি সুযোগ করে দিয়েছেন। তুমি কি তাতে অংশ নিতে রাজি আছো?'

স্ত্রী বললেন, 'কী সে কাজ?'

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু স্ত্রীকে সবকিছু খুলে বললেন। সব শুনে তিনি আনন্দচিত্তে রাজি হয়ে গেলেন।

এরপর তিনি সন্তানপ্রসবের কাজে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সঙ্গে নিলেন। আর খলিফা নিজে খাদ্যভর্তি একটি থলে, একটি হাঁড়ি ও লাকড়ির বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিলেন।

উম্মে কুলসুম তাঁবুর ভেতরে মহিলার কাছে চলে গেলেন। আর ওমর লোকটির কাছে বসলেন।

খলিফা ওমর নিজ হাতে আগুন জ্বালালেন। এরপর লাকড়িতে ফুঁক দিতে লাগলেন। লাকড়ির চুলায় হাঁড়ি বসিয়ে খাবার রান্না করতে শুরু করলেন। ধোয়া তার নাকে মুখে ও দাড়িতে প্রবেশ করলো।

বেদুঈন পথিক বসে বসে ওমরের রান্না করার দৃশ্য দেখছিলো। হঠাৎ তাঁবুর ভেতর থেকে আওয়াজ এলো, 'আমীরুল মুমিনীন! আপনার সঙ্গীকে পুত্র-সন্তানের পিতা হওয়ার সুসংবাদ দিন।'

'আমীরুল মুমিনীন' সম্বোধন শুনেই লোকটি চমকে উঠলো। পুত্র হওয়ার সু-সংবাদের চেয়ে এ বিষয়টি যেন তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিল।

তাই সে প্রশ্ন করলো–

'আপনি খলিফা ওমর বিন খাত্তাব?'

'হ্যাঁ'। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন।

লোকটি যেন আসমান থেকে পড়লো। সে দ্রুত উঠে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছ থেকে কিছুটা দূরে সরে বসলো। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'সরে বসার দরকার নেই। আগের জায়গাতেই বসে থাকুন।' এরপর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ হাতে হাঁড়িটি উঠিয়ে তাঁবুর কাছে নিয়ে গেলেন এবং তার স্ত্রী উম্মে কুলসুমকে ডেকে বললেন, 'প্রসূতিকে ভালো করে খাবার খাইয়ে দাও।'

বেদুঈন মহিলার আহার শেষ হলে উম্মে কুলসুম অবশিষ্ট খাবারটুকু তাঁবুর বাইরে এনে রাখলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খাবারটুকু লোকটির সামনে রেখে বললেন, 'একটু খেয়ে নিন। সারা রাতই তো জেগে ছিলেন।'

এরপর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উম্মে কুলসুমকে ডেকে বিদায় নিলেন।

বিদায়ের সময় তিনি লোকটিকে বললেন, 'আগামীকাল আমার কাছে আসবেন। আমি আপনার নামে উপযুক্ত বরাদ্দ দেয়ার জন্য বলে দেবো।'

আল্লাহ ওমরকে রহম করুন। তার মাঝে ছিলো বিনয়ের মতো মহৎ গুণ, গোপনে ইবাদতের মহান চেতনা ও গরিব দুঃখির সেবা করার ঐশী প্রেরণা। সর্বোপরি সব কিছুর পেছনে লক্ষ্য ছিলো আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের একান্ত কামনা।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাতের আঁধারে রুটিভর্তি থলে পিঠে তুলে নিতেন আর ঘরে ঘরে গিয়ে নিজ হাতে সেগুলো পৌঁছে দিতেন।

তিনি বলতেন, 'নিশ্চয় গোপন দান আল্লাহর ক্রোধকে নিভিয়ে দেয়।'

ইন্তেকালের পর লোকেরা তার পৃষ্ঠদেশে কালো কালো দাগ দেখতে পেলো। সকলে বলাবলি করতে লাগলো, 'এতো বোঝা বহনের দাগ! কিন্তু তাকে তো আমরা কখনো কুলিগিরি করতে দেখিনি।'

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ইন্তেকালের পর মদিনায় এতিম শিশু ও বিধবা মহিলাদের শত শত ঘরে খাবার বন্ধ হয়ে গেলো। এসব ঘরে প্রতি রাতে খাবার পৌঁছে যেতো। এতদিন তারা জানতো না, 'কে তাদের খাবার পৌঁছিয়ে দেয়?'

এখন সবাই বুঝতে পারলো, খলিফা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুই রাতের আঁধারে খাবার বহন করে তাদের ঘরে পৌঁছে দিতেন। এ কারণেই তার পিঠে বোঝা বহনের দাগ পড়েছিল।

পূর্ববর্তী জনৈক মনীষী একাধারে বিশ বছর রোযা রেখেছেন। এই বিশ বছর তার অভ্যাস ছিলো একদিন পরপর রোযা রাখা। অথচ তার পরিবারের কেউ এ সম্পর্কে কখনো জানতে পারে নি।

তার একটি দোকান ছিলো। সূর্যোদয়ের সময় তিনি সকাল ও দুপুরের জন্য কিছু খাবার নিয়ে দোকানে যেতেন। যেদিন রোযা রাখার পালা, সেদিনের খাবার দান করে দিতেন। পরের দিন নিজে খাবার খেতেন। সূর্যাস্তের পর বাড়িতে ফিরে পরিবারের সঙ্গে রাতের খাবার খেতেন।

তারাই ছিলো প্রকৃত পরহেজগার। আল্লাহর ভালোবাসায় সিক্ত। সর্বাবস্থায় তারা আল্লাহর দাসত্বের চেতনা হৃদয়ের মণিকোঠায় লালন করতেন।

এদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا. حَدَآئِقَ وَ اَعْنَابًا. وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا. وَّ كَأْسًا دِهَاقًا. لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا. جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا.

অর্থ : নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সফলতা। রয়েছে উদ্যানারাজি ও আঙুরগুচ্ছ। সমবয়স্কা নব যৌবনা তরুণী। কানায় কানায় পূর্ণ পানপাত্র। সেখানে তারা না কোনো অনর্থক কথা শুনবে, না কোনো মিথ্যা কথা। এসবই আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে পুরস্কার, এমন দান মানুষের কর্মের প্রতিদানস্বরূপ দেয়া হবে। (সূরা নাবা : আয়াত-৩১-৩৬)

তাই আপনি স্রষ্টার ভালোবাসায় সিক্ত হোন। অবগাহন করুন তার মহব্বতের অকূল দরিয়ায়।

সৃষ্টিকুলের হৃদয়ে আপনার ভালোবাসার বীজ বপণের দায়িত্ব তিনিই নেবেন।

আলোকরশ্মি ...

মানুষ যেন আপনাকে শুধু উপরে উপরে ভালো না বাসে
বাহ্যিক ভালোবাসার পাশাপাশি তাদের অন্তরও যেন আপনার জন্য কাঁদে।



৬৬. অন্যকে বিব্রতকর পরিস্থিতি হতে রক্ষা করুন

মনে করুন, লোকজনের সামনে হঠাৎ একজন আপনাকে গালাগালি করলো। কিংবা আপনার পোশাক-আশাক, কথা-বার্তা, চলা-ফেরার ধরন ইত্যাদি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আপনাকে উপহাস করলো। লজ্জায় আপনার চেহারা লাল হয়ে গেলো। আপনি বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়লেন। কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। এমন এক মুহূর্তে কেউ আপনার সাহায্যে এগিয়ে এলো। আপনার পক্ষ হয়ে উত্তরে দিয়ে উপহাসকারীর মুখ বন্ধ করে দিলো। তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আপনার মন ভরে গেলো। আপনার মনে হলো, প্রথমজন আপনাকে আচমকা ধাক্কা দিয়ে আস্তাঁকুড়ে ফেলে দিচ্ছিল আর দ্বিতীয়জন এসে আপনাকে উদ্ধার করলো।

আপনি যদি এ ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে থাকেন তাহলে অন্যদের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করে দেখতে পারেন। আমি আশা করি আপনি এর যাদুকরি প্রভাব দেখতে পাবেন।

মনে করুন, আপনি কারো বাসায় বেড়াতে গেলেন। স্বাগতিক তথা মেজবানের ছোট ছেলেটি নাশতা ভরা ট্রে নিয়ে এলো। কিন্তু তাড়াহুড়ার কারণে ট্রেটি তার হাত থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো।

সঙ্গে সঙ্গে মেজবান তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'এতো তাড়াহুড়া করছো কেন? তোমাকে আর কতবার বলতে হবে?'

হঠাৎ বাবার ধমক খেয়ে ছেলেটি খুব ভয় পেলো। লজ্জায় সে এতটুকু হয়ে গেলো।

এমন সময় আপনি বলে উঠলেন, 'না, কী বলেছেন আপনি? ও তো মাশাআল্লাহ অনেক কর্মতৎপর ছেলে। এটা সে একাই আনতে পারে। হয়তো কোনো কারণে একটু তাড়াহুড়া করে ফেলেছে। আর মানুষ মাত্র তো ভুল হয়। এতে আর দোষের কী আছে?'

আপনার এতটুকু সান্ত্বনা পেয়ে ছেলেটির মন আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে যাবে। আপনার প্রতি সে দুর্বল হয়ে পড়বে।

আপনার ছোট্ট একটি কথার প্রভাবে একটি ছোট ছেলে যদি আপনার প্রতি দুর্বল হতে পারে তাহলে বড়দের সঙ্গে এরূপ আচরণ করা হলে তার ফলাফল কেমন হতে পারে?

মনে করুন, আপনার এক সহকর্মীকে সবাই তিরস্কার করছিল, ফলে বেচারা লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আপনি করলেন কি তাদের সামনেই তার বিভিন্ন গুণের প্রশংসা করলেন। তাদের তিরস্কারের জবাব দিলেন। সে কি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে না?

ধরুন, কোনো ভুলের কারণে পরিবারের সবাই মিলে আপনার এক ভাইকে বকাঝকা করছে কিন্তু আপনি তার ভালো দিকগুলো তুলে ধরে তার প্রশংসা করলেন। এ কারণে আপনার প্রতি আপনার ভাইয়ের ভালোবাসা কি আগের চেয়ে বাড়বে না?

জনৈক যুবককে কেউ জনসম্মুখে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিলো। সে তাকে প্রশ্ন করলো, 'ভার্সিটিতে তুমি গড়ে কত নম্বর পেয়েছ?'

আচ্ছা বলুন, বুদ্ধি ও বিবেচনাসম্পন্ন কোনো মানুষ কি অন্যের সামনে এ ধরনের প্রশ্ন করে?

এ বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে ছাত্রটিকে উদ্ধার করার জন্য আপনি প্রশ্নকর্তাকে বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'জনাব! আপনি তার ভার্সিটির রেজাল্ট জানতে চাচ্ছেন কেন? আপনি কি তার বিয়ের ব্যবস্থা করবেন? নাকি আপনার কাছে তার জন্য ভালো কোনো চাকরি আছে?'

আপনার কথা শুনে সবাই হেসে উঠলো। ফলে একটু পূর্বের সেই বিব্রতকর প্রশ্নের কথা সবাই ভুলে গেলো।

একজনকে কেউ তার ফলাফল নিয়ে তিরস্কার করলো। আপনি তখন তিরস্কারকারীকে বুঝিয়ে বললেন, 'ভাই! বেচারাকে বকবেন না। তার বিষয়টি খুবই কঠিন। ইনশাআল্লাহ, আগামী সেমিস্টারে তার ফলাফলের গড় আরো ভালো হবে।'

মানুষের হৃদয় জয় করার বিভিন্ন সুযোগ কখনো কখনো সামনে আসে। বুদ্ধিমানেরা সেগুলো কাজে লাগিয়ে বাজিমাত করে ফেলে। কবি বলেন-

বাতাস যখন অনুকূলে বয় তখন এ সুযোগটাকে কাজে লাগাবে।
কেননা বাতাস সব সময় অনুকূলে বয় না।

একবার আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে একটি গাছ পড়লো। রাসূল মিসওয়াক বানানোর জন্য তাকে গাছে উঠে একটি ডাল কেটে আনতে বললেন।

তিনি গাছে উঠে একটি ডাল কাটতে লাগলেন। ইতোমধ্যে বাতাস এসে তার গায়ের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে দিলো এবং উভয় পায়ের নলা দেখা গেলো।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন হালকা-পাতলা গড়নের। তার পায়ের নলা ছিলো চিকন। উপস্থিত লোকজন তার এই চিকন নলা দেখে হেসে উঠলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা হাসলে কেন? তার চিকন নলা দেখে?'

'যার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার শপথ! তার এ নলা দু'টি মিজানের পাল্লায় ওহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি ভারী।'

(মুসনাদে আহমদ: ৩৭৯২)

দৃষ্টিভঙ্গি ...

মানুষের হৃদয় জয় করার বিভিন্ন সুযোগ কখনো কখনো সামনে আসে। বুদ্ধিমানেরা সেগুলো কাজে লাগিয়ে বাজিমাত করে ফেলে।



৬৭. বাহ্যিক বেশভূষায় সচেতন হোন

ইমাম আবূ হানিফা রহ. একদিন মসজিদে বসে ছাত্রদেরকে পাঠদান করছিলেন। তখন তার হাঁটুতে কিছুটা ব্যথা ছিলো। তাই তিনি পা দু'টো একটু ছড়িয়ে দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসেছিলেন।

কিছুক্ষণ পর জনৈক ব্যক্তি তার দরসে উপস্থিত হলো। পরনে তার সুন্দর পোশাক। মাথায় চমৎকার পাগড়ি। সে হাঁটছিল গম্ভীরভাবে। কদম ফেলছিল খুব মেপে মেপে। তার ভাবভঙ্গিও ছিল রাশভারী।

উপস্থিত ছাত্ররা তার জন্য জায়গা করে দিলো। সে ইমাম আনু হানিফা রহ.-এর পাশে গিয়ে বসলো। ইমাম আবূ হানিফা রহ. তার বাহ্যিক অবয়ব, ব্যক্তিত্ব ও গম্ভীরতা দেখে তাকে বড় কোনো ব্যক্তি মনে করে তার সামনে এভাবে পা ছড়িয়ে বসতে সংকোচবোধ করলেন। প্রচণ্ড ব্যথা সত্ত্বেও তিনি পা গুটিয়ে বসলেন।

আবূ হানিফা রহ. পাঠদান অব্যাহত রাখলেন। আগন্তুকও গভীর মনোযোগসহকারে সব শুনছিল।

একসময় পাঠদান শেষ হলো। পাঠের শেষে ছাত্ররা ইমাম আবূ হানিফা রহ. কে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগলো। আগন্তুক ব্যক্তিটিও প্রশ্ন করার অনুমতি চেয়ে হাত ওঠালেন।

আবূ হানিফা রহ. তাকে প্রশ্ন করার অনুমতি দিলেন।

তিনি বললেন, 'জনাব! মাগরিবের সময় শুরু হয় কখন?'

ইমাম আবূ হানিফা রহ. বললেন, 'সূর্য যখন অস্ত যায় তখন থেকেই তো মাগরিবের সময় শুরু হয়!'

'আচ্ছা, যদি রাত হয়ে যায় আর সূর্য তখনও অস্ত না যায় তখন আমরা কী করবো?' লোকটি পাল্টা প্রশ্ন করলো।

লোকটির এ মুর্খতাসুলভ প্রশ্ন শুনে আবূ হানিফা রহ. বললেন, 'আবূ হানিফার পা ছড়িয়ে বসার সময় হয়ে গেছে!' এ কথা বলে তিনি পা ছড়িয়ে বসলেন। তিনি লোকটির এ অযৌক্তিক প্রশ্নের উত্তরে কিছুই বললেন না। কারণ, রাত হয়ে যাবে অথচ সূর্য ডুববে না, তা তো সম্ভব নয়?

Contents

অভিজ্ঞজনেরা বলে থাকেন, প্রথম দর্শনেই দর্শকের মস্তিস্কে আপনার মনোছবি বা ভাবমূর্তির ৭০% অঙ্কিত হয়ে যায়। এ মনোছবির ওপর ভিত্তি করেই আপনার ব্যাপারে তার মনে একটি ধারণা সৃষ্টি হয়। আরেকটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, প্রথম দর্শনেই দর্শকের মস্তিস্কে আপনার মনোছবির ৯৫% বসে যায়। পরবর্তীতে কথাবার্তা ও পরিচয় হওয়ার পর তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

আপনি হাসপাতাল বা অফিসের করিডোর ধরে হেঁটে যাচ্ছেন। আপনার পাশেই পরিচ্ছন্ন-পরিপাটি পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি যাচ্ছে। তার হাঁটার ভঙ্গি ও পোশাক পরিচ্ছদে শালিনতা ফুটে উঠেছে। করিডোর পার হয়ে রুমের দরজায় পৌঁছে দেখবেন, আপনি হয়তো অবচেতন মনেই তাকে বলবেন: 'আপনি আগে যান।'

পক্ষান্তরে আপনি আপনার এক বন্ধুর গাড়িতে চড়লেন। উঠেই দেখতে পেলেন সবকিছু এলোমেলো। এখানে একপাটি জুতা আর ওখানে মোড়ানো কাগজ পড়ে আছে। একদিকে চাদর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আরেক দিকে ক্যাসেটের ফিতা বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে।

এ অবস্থা দেখে তাৎক্ষণিকভাবে আপনার মনে এ ধারণা তৈরি হবে যে, এ লোকটি অগোছালো স্বভাবের।

মানুষের পোশাক-আশাক ও সাধারণ চলা-ফেরা দেখেও আমাদের মনে এ ধরনের ধারণা তৈরি হতে পারে।

পাঠক, আমি এখানে মূলত বাহ্যিক বেশভূষার ক্ষেত্রে পরিপাটি চলার গুরুত্ব বোঝাতে চাচ্ছি। আমি পোশাক-পরিচ্ছদ, গাড়ি বাড়ি ও আসবাপত্রের প্রদর্শনীর বা অপচয় করার কথা বলছি না।

আমাদের রাসূল ﷺ এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। দুই ঈদ ও জুমার দিন পরিধান করার জন্য রাসূলের সুন্দর একজোড়া কাপড় ছিলো। বাহির থেকে আগত বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় পরিধানের জন্য ছিলো ভিন্ন আরেকজোড়া সুন্দর ও মানানসই পোশাক।

বাহ্যিক পরিপাটি ও সুগন্ধি ব্যবহারে রাসূল অনেক যত্নবান ছিলেন। তিনি সুগন্ধি পছন্দ করতেন।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন উজ্জ্বল গৌর বর্ণের অধিকারী। তার পবিত্র দেহের স্বেদবিন্দুগুলো মুক্তার দানার মতো চকচক করতো। তিনি হাঁটার সময় সামনের দিকে একটু ঝুঁকে হাঁটতেন। রাসূলের হাতের তালুর চেয়ে কোমল কোনো রেশমী বস্ত্র আমি কখনো স্পর্শ করি নি। রাসূলের শরীর থেকে নির্গত সুঘ্রাণের চেয়ে অধিক সুগন্ধিময় কোনো মেশক বা আম্বরের ঘ্রাণ আমি কখনো গ্রহণ করি নি।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মোবারক হাত সব সময় সুবাসিত থাকতো। যেন এইমাত্র আতর ব্যবসায়ীর থলে থেকে হাত বের করেছেন। ছড়িয়ে পড়া সুঘ্রাণ শুঁকে অনুভব করা যেত যে, রাসূল এদিকেই আসছেন।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেন, 'কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সুগন্ধি হাদিয়াস্বরূপ দিলে তিনি তা ফিরিয়ে দিতেন না।'

রাসূল ছিলেন সবচেয়ে সুন্দরতম চেহারার অধিকারী। তার মুখমণ্ডল সবসময় সূর্যের ন্যায় আলোকোজ্জ্বল থাকতো। আনন্দিত হলে তার চেহারা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। মনে হতো স্নিগ্ধ আলোকময় এক টুকরো চাঁদ।

জাবের বিন সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'জোসনাগলা এক পূর্ণিমার রাতে আমি রাসূলের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলাম। আমি একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-র চেহারা মোবারকের দিকে তাকাচ্ছিলাম, আর একবার পূর্ণিমার চাঁদের দিকে। রাসূলের গায়ে ছিলো লাল ডোরাকাটা একটি চাদর। তখন রাসূলকে আমার কাছে চাঁদের চেয়েও সুন্দর মনে হচ্ছিলো।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে বাহ্যিক বেশভূষা ও চাল-চলনে পরিপাটি থাকতে বলতেন।

আবুল আহওয়াস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-র কাছে উপস্থিত হলাম। আমার পরনে ছিলো একটি কমদামি চাদর।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 'তোমার কি কোনো ধন-সম্পদ নেই?'

'হ্যাঁ, আছে।' আমি বললাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কী আছে?'

আমি বললাম, 'উট, গরু, ছাগল, ঘোড়া, দাস-দাসী সবই আছে।'

রাসূল ﷺ, বললেন, 'আল্লাহ যেহেতু তোমাকে নিয়ামত দিয়েছেন তাই তোমার মধ্যে যেন এটা প্রকাশ পায়।'

তিনি আরো বললেন, 'আল্লাহ তাআলা যাকে নিয়ামত দিয়েছেন, তার মধ্যে তিনি সে নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ দেখতে ভালোবাসেন।'

জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার রাসূল ﷺ আমাদের বাড়িতে এলেন। তিনি এলোমেলো চুলওয়ালা এক ব্যক্তিকে দেখে বললেন, 'তার কি চুল পরিপাটি করে রাখার মতো কিছু নেই?

আরেক ব্যক্তিকে অপরিচ্ছন্ন কাপড় পরিহিত দেখে তিনি বললেন, 'সে কি কাপড় ধোয়ার মতো পানি পাচ্ছে না।'

নবী করিম ﷺ চাল-চলনে গাম্ভীর্যতা ও পোশাক-পরিচ্ছদে রুচিশীলতা বজায় রাখতে এবং নিয়মিত সুগন্ধি ব্যবহারে অনুরাগী ছিলেন।'

বিভিন্ন মসলিসে রাসূল প্রায়ই বলতেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন।' (সহীহ মুসলিম:১৩১)

অভিজ্ঞতা ...

প্রথম দর্শনেই দর্শকের মস্তিস্কে আপনার ছবির ৭০% অঙ্কিত হয়ে যায়।



৬৮. সত্য কথা বলুন

একদিন আমি পরীক্ষার হলে পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করছিলাম। সেদিন ছিলো বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতিবার আমাদের মূলত ছুটির দিন। কিন্তু সেশনজট এড়াতে এবং সাবজেক্ট বেশি হওয়াতে আমরা ছুটির দিনেও পরীক্ষা নিতে বাধ্য হয়েছিলাম।

পরীক্ষা শুরু হওয়ার কয়েক মিনিট পর এক ছাত্র হলে উপস্থিত হলো। তাকে বেশ অস্থির মনে হচ্ছিল।

আমি তাকে বললাম, 'দুঃখিত, তুমি দেরী করে এসেছো? আমি তোমাকে পরীক্ষার হলে প্রবেশের অনুমতি দিতে পারবো না।'

সে অনুনয় বিনয় করে আমার কাছে অনুমতি চাইতে লাগলো।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'দেরী হলো কেন?'

সে বললো, 'স্যার! আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জাগতে পারি নি।'

ছেলেটির সত্যবাদিতা আমাকে মুগ্ধ করলো। আমি বললাম, 'আচ্ছা, যাও।'

এর কয়েক মিনিট পর আরেকজন ছাত্র এলো। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার দেরী হলো কেন?'

ছাত্রটি বললো, 'স্যার, বিশ্বাস করুন, রাস্তায় প্রচণ্ড যানজট ছিলো। আপনি তো জানেন, সকাল বেলা সব মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।

কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়।

কেউ যায় অফিসে।

আবার কেউ ....।

এভাবে সে আমার সামনে মানুষের ব্যস্ততার এক দীর্ঘ বিবরণ দিল।

আসলেই রাস্তায় প্রচণ্ড যানজট ছিলো সে এ মর্মে আমাকে নিশ্চিত করতে চাইল।

কিন্তু সে ভুলেই গেছে যে, আজ ছুটির দিন। আজ রাস্তায় আমাদের ছাত্ররা ছাড়া আর কেউই ছিলো না।

আমি তাকে বললাম, 'তুমি বোঝাতে চাচ্ছো রাস্তায় অনেক গাড়ির জটলা। গাড়িতে গাড়িতে রাস্তা ভরে গেছে ।'

সে বললো, 'হ্যাঁ, স্যার! আপনি ঠিকই ধরেছেন। সুবহানাল্লাহ! আপনি এমনভাবে বললেন, যেন পুরো পথ আমার সঙ্গেই ছিলেন!'

আমি বললাম, 'আরে ধোঁকাবাজ! মিথ্যা যদি বলতেই চাও, তাহলে এমনভাবে বলবে যেন ধরা না পড়ো। আজ তো বৃহস্পতিবার। সরকারি ছুটির দিন। এ দিন না কোনো অফিস খোলা থাকে, না চাকুরীজীবিদের ব্যস্ততা থাকে। আজ যানজট হবে কিভাবে?!'

সে বললো, 'ও স্যার! আসলে আমি বলতে ভুল করেছি। আসলে... গাড়ির একটা টায়ার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ওটা ঠিক করতে দেরি হলো, তাই ... ।' বেচারা আসলে বিরাট বিপদে পড়ে গেছে। অনুমতি পেতে সে অস্থির হয়ে পড়েছে। তার অস্থিরতা দেখে আমি হেসে ফেললাম। এরপর তাকে পরীক্ষা দিতে হলে প্রবেশ করার অনুমতি দিলাম।

এভাবে মানুষের কাছে নিজের মিথ্যা প্রকাশ পেয়ে যাওয়া লজ্জাজনক। মিথ্যা আপনাকে মানুষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। মানুষের কাছে আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা থাকবে না ।

কেউ কোনো বিপদে পড়লে আপনার কাছে প্রকাশ করবে না। আপনার সাহায্য চাইবে না। আপনি কিছু বললে তা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করবে না।

মিথ্যা অনেক নিকৃষ্ট স্বভাব ও সবচেয়ে মন্দ অভ্যাস?

রাসূল ﷺ বলেছেন, 'খিয়ানত ও মিথ্যা ছাড়া মুমিনের মধ্যে সব ধরনের স্বভাব দেয়া হয়েছে।' (মুসনাদে আহমদ: ২১১৪৯)

একবার রাসূলকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'মুমিন কি কখনো ভীরু হয়?'

রাসূল বললেন, 'হতে পারে'।

আবার জিজ্ঞেস করা হলো, 'মুমিন কি কখনো কৃপণ হয়?'

'হ্যাঁ, হতে পারে।' রাসূল জবাব দিলেন।

আবার জিজ্ঞেস করা হলো, 'মুমিন কি কখনো মিথ্যাবাদী হতে পারে?'

রাসূল বললেন, 'না, মুমিন কখনো মিথ্যাবাদী হতে পারে না।'

(মুআত্তা মালিক:১৫৭১)

আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার আমার মা আমাকে ডাকলেন। রাসূল তখন আমাদের ঘরেই বসা ছিলেন । মা আমাকে বললেন, 'এদিকে এসো! তোমাকে একটি জিনিস দেবো।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি তাকে কী দিতে চাচ্ছো?'

আমার মা বললেন,'আমি তাকে একটি খেজুর দেবো।'

রাসূল বললেন, 'তুমি যদি তাকে কিছুই না দিতে, (কেবল কাছে ডাকার জন্য তাকে এ কথা বলতে), তাহলে তোমার আমলনামায় মিথ্যার একটি গোনাহ লেখা হতো।' (সুনানে আবূ দাউদ: ৪৩৩৯)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ পরিবারের কারো সম্বন্ধে যদি জানতেন যে, সে মিথ্যা বলেছে তাহলে খুবই অসন্তুষ্ট হতেন।

অনেক সময় মানুষ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজেকে অন্যের সামনে বড় করে প্রকাশ করে। তাই কখনো নিজেকে নিয়ে সাহসিকতার গল্প ফাদে। কখনো নতুন আবিষ্কারের দাবি করে বসে।

কখনো মিথ্যার রঙে রাঙিয়ে কোনো ঘটনাকে জনপ্রিয় করে তুলতে চেষ্টা করে।।

আর কখনো নিজেকে উপস্থাপন করে বহুমুখি যোগ্যতার অধিকারী হিসেবে। নিজের মধ্যে যে যোগ্যতা নেই তাও প্রচার করে।

মিথ্যুককে দেখবে ওয়াদা করেই তা ভঙ্গ করবে। যখন কোনো জটিলতায় পড়ে যাবে, বিভিন্ন রকম ওজর আপত্তি ও কৈফিয়ত নিয়ে হাজির হবে। কিন্তু এমন করে কোনো লাভ নেই। একটু পরেই মানুষের সামনে তার সব ভাওতাবাজি প্রকাশ হয়ে পড়বে।

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত তাবেয়ী হাদিস শাস্ত্রের ইমাম, ইমাম যুহরী রহ. (১২৫ হি.) এর একটি ঘটনা ।

একদিন তিনি সমকালিন বাদশাহর কাছে গেলেন। তিনি সেখানে কোনো বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন। বাদশাহ বলে উঠলেন, 'আপনি তো মিথ্যা বললেন।'

সঙ্গে সঙ্গে ইমাম যুহরী গর্জন করে উঠলেন, তিনি বললেন- ‘নাউযুবিল্লাহ! আপনি কী বলছেন? আমি মিথ্যা বললাম! আল্লাহর কসম! আকাশ থেকে কোনো ফেরেশতাও যদি ঘোষণা করে যে, মিথ্যা বলা জায়েজ তাহলেও তো আমি মিথ্যা বলবো না। আর মিথ্যা বলা হারাম অবস্থায় আমি মিথ্যা বলবো?

বাস্তবতা ...

মিথ্যা সবসময়ই কালো।
এর মধ্যে নেই কোনো ভালো।
যদিও কেউ কেউ দেখে এর মধ্যে
আত্মরক্ষার আলো।



৬৯. সাহসী হোন

একদিন আমরা এক ওলিমার দাওয়াত থেকে ফিরছিলাম। পথে জনৈক বন্ধু আমাকে বললো, 'তোমরা যে সাহাবীর ঘটনা আলোচনা করছিলে কিন্তু তার নাম স্মরণ করতে পারছিলে না, আমি তার নাম জানতাম।'

আমি বললাম, 'আশ্চর্য! তুমি জানতে?

'হ্যাঁ আমি জানতাম।' সে দৃঢ়তার সাথে জবাব দিল।

'তাহলে তখন তার নাম বললে না কেন? তুমি তো দেখেছো, বিষয়টা নিয়ে আমরা বেশ পেরেশান ছিলাম।' আমি তাকে বললাম।

সে মাথা নিচু করে বললো, 'আমি কথা বলতে লজ্জাবোধ করছিলাম।'

আমি মনে মনে বললাম, 'ধিক তোমার এই লজ্জাকে! তুমি আসলেই একটা কাপুরুষ।'

আরেক বন্ধু আমার সঙ্গে মাধ্যমিক শেষ বর্ষের ছাত্রদেরকে পড়াতো। একদিন তার সঙ্গে দেখা হতেই সে বললো, "আমি দু'দিন আগে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, ছাত্ররা সবাই নিরব। শ্রেণিশিক্ষকও চেয়ারে চুপচাপ বসে আছেন। আমি তার পাশের সিটে বসে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার? কী হয়েছে?'

এক ছাত্র বললো, 'আমাদের এক সহপাঠী 'আসসাফ' গত রাতে মারা গেছে।'

শ্রেণিতে আসসাফের অনেক বন্ধুই ছিল। তারা ঠিকমতো নামায পড়তো না। বিভিন্ন অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকতো। এই দুঃসংবাদে তাদের মধ্যেও শোকের ছায়া নেমে এলো। তাদের সবার মন এখন নরম ও বিগলিত। তাই আমার মন চাইলো, আমি তাদেরকে এ পরিবেশে কিছু উপদেশমূলক কথা বলি, যেন তারা নামায পড়া, পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার ও আত্মসংশোধনের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়। "

একটু পরে পরিবেশ যখন স্বাভাবিক হলো তখন আমি এক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, তোমাকে যা বলতে বলেছিলাম তা কি তুমি বলেছিলে?'

সে স্পষ্ট করে বললো, 'না, আমি বলতে পারি নি। আমার খুব লজ্জা লাগছিল।'

তার কথা শুনে আমি আমার ক্রোধ সংবরণ করলাম, আর মনে মনে বললাম, 'ধিক তোমার কাপুরুষতাকে!'

মনে করুন, স্বামীর সাথে কোনো মহিলার কোনো বিষয় নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি চলছিল। আপনি তাকে বললেন, 'আপনি আপনার স্বামীর কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেন নি কেন?'

সে বললো, 'আমি লজ্জাবোধ করছিলাম। ভয় পাচ্ছিলাম, তিনি হয়তো মনে কষ্ট পাবেন। হয়তো আমাকে ছেড়ে দেবেন। হয়তো ... ।'

ধিক এই ভীরুতা ও সংকোচবোধকে !

কোনো যুবককে প্রশ্ন করলেন, 'সমস্যাটি জটিল আকার ধারণ করার আগে তোমার বাবাকে জানাওনি কেন?'

তখন সে বললো, 'ভয় করছিলো। কিভাবে বলি?'

'আমার হাঁসতে খুব লজ্জা লাগে। তার প্রশংসা করতে আমার সংকোচবোধ হয়। আমার মনে হয়, মানুষ বলবে, অমুক ব্যক্তি লোকদেখানো ভদ্রতা প্রদর্শন করে। কিংবা বলবে, সে অযাচিত রসিকতা করে।' এ ধরনের কথা বলে কেউ কেউ আপনার রক্তচাপ বাড়িয়ে দিতে পারে।

আমি এ ধরনের কথা জীবনে অনেক শুনেছি। আমার মনে চায় চিৎকার করে বলি, 'হে ভীরুর দল! আর কত কাল এভাবে ভীরুতা প্রদর্শন করবে?!'

ভীরুরা কোনোদিন মহত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে না। সে সবসময় পেছনে পড়ে থাকে। কোনো সভা-সমিতিতে উপস্থিত হলে সে এক কোণে পাথরের মতো চেপে বসে থাকে। সে কোনো অভিমত পেশ করতে পারে না। কোনো কথা বলে না।

কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা হলে অন্যরা সক্রিয়ভাবে তাতে অংশ নেয়, বিভিন্ন মন্তব্য পেশ করে, কিন্তু সে মাথা নিচু করে বসে বসে কেবল মুচকি হাসে।

কোনো প্রোগ্রামে উপস্থিত হলে কেউ তার উপস্থিতি সম্পর্কে টেরই পায় না। এর চাইতেও কঠিন অবস্থার সৃষ্টি হয় যদি সে হয় একজন পিতা, স্বামী বা একজন পরিচালক, অথবা কারো স্ত্রী বা মা।

ভীরু মানুষকে কেউ ভালোবাসে না সবাই ঘৃণা করে। মানুষের কাছে তার কোনো মর্যাদা নেই। তাই নিজেকে উপস্থাপন করুন। সাহসিকতার অনুশীলন করুন। ভয় আর জড়তা পায়ে দলে সামনে এগিয়ে চলুন দৃপ্ত পদে।

সাহসী হোন উপদেশ দানের ক্ষেত্রে।

সাহসী হোন উপস্থাপনায়।

সাহসী হোন মানুষের সঙ্গে আচরণিক দক্ষতা প্রয়োগে।

দৃষ্টিভঙ্গি ...

আচরণদক্ষতার অনুশীলনে সচেষ্ট হোন।

সামান্য সময়ের ধৈর্যের অপর নাম বিজয়।



৭০. নীতির ওপর অটল থাকুন

দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে নীতির ওপর অটল থাকা জীবনে সফল হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মনে করুন, ঘুষ গ্রহণ না করা আপনার নীতি। অতএব, আপনার চারপাশের লোকেরা নাম পরিবর্তন করে হাদিয়া, বখশিশ, স্পিড-মানি বা কমিশনের নামে আপনাকে তা দিতে চাইলেও আপনি আপনার নীতিতে অটল থাকুন।

কোনো স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে মিথ্যা না বলার নীতি গ্রহণ করলো। সুতরাং অন্যরা যতই মিথ্যার পক্ষে কথা বলুক, পরিস্থিতির দাবি কিংবা স্বামীর সঙ্গে মিথ্যা বলাকে 'সাদা মিথ্যা' বলে আখ্যায়িত করুক না কেন– স্ত্রীর কর্তব্য হলো তার নীতিতে অটল থাকা।

কিছু নীতি হলো, পরকিয়া না রাখা, মদ পান না করা ইত্যাদি।

অধুমপায়ী ব্যক্তি যখন তার সাথিদের সঙ্গে বসে তখন সে যেন আপন নীতিতে অটল থাকে। বন্ধুদের সঙ্গদোষে সে যেন তার নীতি থেকে বিচ্যুত না হয়।

নীতিতে অটল ব্যক্তির সঙ্গীরা যদিও কখনো তার নিন্দা ও সমালোচনা করে, সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে না তিরষ্কার করে, কিন্তু আপনার ব্যাপারে তাদের মনের অনুভূতি হলো– আপনি একজন আদর্শ ও নীতিবান মানুষ।

আর তাই দেখা যায়, কোনো বিপদে পড়লে তারা সাধারণত তার কাছেই চলে আসে। ব্যক্তিগত বিভিন্ন সমস্যায় তার কাছেই পরামর্শ চায়। অন্য সঙ্গীদের চেয়ে তাকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

এ কথা শুধু পুরুষ বা শুধু মহিলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এমন নয়; বরং সবার ক্ষেত্রেই সমানভাবে বাস্তব। অতএব, আপনি আপনার নীতির উপর অটল থাকুন। কখনোই নীতি হতে বিচ্যুত হবেন না। আজ কিংবা কাল একসময় অবশ্যই অন্যরা আপনাকে স্বীকৃতি দেবে। আপনাকে তাদের হৃদয়ের মধ্যমণি হিসেবে বরণ করে নেবে।

যখন ইসলামের শান-শওকত ছড়িয়ে পড়লো। তখন রাসূল ﷺ-এর কাছে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিরা আসতে শুরু করলো। এরই ধারাবাহিকতায় এলো সাকীফ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল। এ দলের সদস্যসংখ্যা ছিলো তেরোজন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে তাদের অবস্থানের ব্যবস্থা করলেন, যেন তারা কুরআনে কারীম শুনতে পারে।

তারা রাসূল ﷺ-কে সুদ, যিনা ও মদের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল ﷺ তাদেরকে জানালেন, এগুলো হারাম।

তাদের বিশেষ একটি মূর্তি ছিলো। বাপ-দাদার যুগ থেকেই তারা সেই মূর্তির উপাসনা করতো। মূর্তিটির নাম ছিলো 'রাব্বা'। আর তারা একে ডাকতো 'তাগিয়া' বলে।

তারা এই মূর্তির শক্তি ও ক্ষমতা নিয়ে বিভিন্ন কাল্পনিক কেচ্ছা-কাহিনী রচনা করে বলে বেড়াতো। তারা রাসূল ﷺ-কে 'রাব্বা' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, 'এটির ব্যাপারে কী করবো?'

রাসূল ﷺ কোনো প্রকার দ্বিধা ছাড়াই বললেন, 'তোমরা তা ভেঙ্গে ফেলবে।'

এ কথা শুনে তারা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো, 'অসম্ভব! 'রাব্বা' যদি জানতে পারে যে, আপনি তাকে ভাঙতে চাচ্ছেন তাহলে সে সবাইকে ধ্বংস করে ফেলবে'!

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মূর্তি ভাঙতে তাদের দ্বিধা-সঙ্কোচ ও ভয় দেখে তিনি অবাক হলেন। তিনি বললেন, 'হে সাকীফ গোত্র! ধিক তোমাদের! তোমরা এখনো সেই মূর্খতাপূর্ণ বিশ্বাস লালন করছো? আরে! 'রাব্বা' তো পাথরের টুকরা মাত্র। এটি মানুষের লাভ-ক্ষতি কিছুই করতে পারে না।'

ওমরের কথা শুনে তারা রেগে গেলো। তারা বললো, 'খাত্তাবের বেটা! আমরা তো তোমার কাছে আসি নি।'

তাদের এ কথা শুনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু চুপ হয়ে গেলেন।

Contents

তারা রাসূল ﷺ-কে বললো, 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করবো। তবে আমাদের একটা শর্ত আছে। তাগিয়াকে আমরা আরো তিন বছর রাখবো। তারপর আপনি চাইলে সেটা ভেঙ্গে ফেলতে পারেন।'

রাসূল ﷺ দেখলেন, তারা আকিদা-বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয়ে নমনীয়তা চাচ্ছে। অথচ একজন মুসলমানের জীবনে তাওহীদ ও একত্ববাদই হলো সবচেয়ে বড় বিষয় । একত্ববাদই ইসলামের মূল। তাই যারা ইসলাম গ্রহণ করবে, মূর্তির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক রাখার দাবি কি কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

রাসূল ﷺ বললেন, 'না' এটা সম্ভব নয়।

তারা বললো, 'তাহলে কেবল দু'বছরের জন্য সুযোগ দিন। তারপর ভেঙ্গে ফেলুন।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'না'।

তারা বললো, 'তাহলে অন্তত এক বছর।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'না'।

তারা বললো, 'তাহলে কেবল এক মাসের জন্য অনুমতি দিন।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'না'।

তারা যখন দেখলো, রাসূল তাদের মূর্তি রাখার দাবি কিছুতেই মেনে নিচ্ছেন না তখন তারা বুঝতে পারলো যে, এটা মূলত শিরক ও ঈমানের প্রশ্ন। এক্ষেত্রে সংলাপের মাধ্যমে কোনো ছাড় নেয়ার সুযোগ নেই।

তারা বললো, 'আল্লাহর রাসূল! তাহলে আপনিই তা ভেঙ্গে ফেলার দায়িত্ব নিন। আমাদের ভয় হয়, আমরা তা ভাঙতে পারবো না।'

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'ঠিক আছে। ভাঙ্গার জন্য তোমাদের এলাকায় আমি লোক পাঠাবো।'

তারা বললো, 'আরেকটি কথা, আমরা নামায পড়তে চাই না। কেউ তার নিতম্বকে মাথাসমতলের ওপরে ওঠাবে, এটা আমাদের কাছে পছন্দনীয় নয়।' প্রচণ্ড আমিত্বের কারণে সেজদার সময় শরীরের পেছনের অংশ মাথার ওপরে উঠে যাবে এতে তারা সম্মত নয় ।

রাসূল ﷺ বললেন, 'নিজ হাতে মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার বিষয়টি না হয় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু নামাযে কোনো ছাড় দেয়া যাবে না। কেননা, যে দ্বীনে নামায নেই সে দ্বীনে কোনো কল্যাণ নেই।'

তারা বললো, 'ঠিক আছে, অবমাননাজনক হলেও আমরা আপনার এ হুকুম দু'টি পালন করবো।'

এরপর তারা রাসূলের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলো। তারা নিজ সম্প্রদায়ের লোকজনকে ইসলামের দাওয়াত দিলে অনেকটা নিমরাজী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো।

কিছুদিন পর কয়েকজন সাহাবি মূর্তি ভাঙ্গার জন্য তাদের এলাকায় গেলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ, মুগিরা বিন শো'বা সাকাফি প্রমুখ।

সাহাবীরা মূর্তি ভাঙ্গতে গেলে সাকীফের লোকেরা ভয়ে কেঁপে উঠলো। নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে বের হয়ে এলো মূর্তির অলৌকিক ক্ষমতা দেখতে। তাদের অকাট্ট ধারণা ও দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, কিছুতেই এটাকে ভাঙ্গা যাবে না। মূর্তিই নিজেকে রক্ষা করতে পারবে।

মুগীরা বিন শো'বা দাঁড়ালেন। কুঠার হাতে নিয়ে তিনি তার সঙ্গী সাহাবিদের দিকে ফিরে বললেন, 'আমি সাকিফ গোত্রের সঙ্গে একটু মজা করবো।'

মুগীরা বিন শো'বা মূর্তির দিকে অগ্রসর হয়ে মূর্তিটিকে কুঠার দিয়ে আঘাত করে নিজে ভূপাতিত হয়ে গেলেন। এরপর তিনি ক্রমাগত মাটিতে পা আছড়াতে লাগলেন।

মুগীরাকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে সাকীফ গোত্রের লোকেরা খুশিতে চিৎকার করতে লাগলো।

তারা বললো, 'আল্লাহ মুগীরাকে ধ্বংস করুন। রাব্বা তাকে শেষ করে দিয়েছে। তারা মুগীরার সঙ্গে আসা অন্য সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমাদের কারো সাহস থাকলে যাও তো রাব্বার কাছে'!

এ সময় মুগীরা হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আরে সাকীফ গোত্র! ধিক তোমাদের প্রতি! আমি তো কেবল একটু রসিকতা করেছি!

তোমাদের রাব্বা তো পাথর ও মাটির গড়া একটি মূর্তি ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহর নিরাপত্তা গ্রহণ করো। কেবল তাঁরই ইবাদত করতে থাকে।'

এরপর তিনি একটি একটি করে মূর্তির সবগুলো পাথর ভেঙ্গে ফেলতে লাগলেন। তাকে দেখে অন্যরাও মূর্তি ভাঙতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যে পাথরের মূর্তি ধুলায় পরিণত হলো।

নববী বাণী ...

'যে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়,
আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।
আর তিনি মানুষকেও তার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেন।
আর যে মানুষের অসন্তুষ্টির পরোয়া না করে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে,
আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন
এবং মানুষকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেন।'



৭১. মিথ্যা প্ররোচনা

বৃটেনের জনৈক মুসলিম যুবকের ঘটনা। একবার সে একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির সংবাদ পেলো। একটি কোম্পানীতে সিকিউরিটি গার্ড পদে কিছু লোক নেয়া হবে।

চাকুরী প্রার্থীদের সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হয়ে সে দেখতে পেলো, মুসলিম অমুসলিম অনেক চাকুরী প্রার্থীই সেখানে ইন্টারভিউয়ের জন্য উপস্থিত হয়েছে।

তারা একে একে ইন্টারভিউ রুমে প্রবেশ করছে। যখনই সাক্ষাৎ শেষে কেউ বেরিয়ে আসছিলো, অপেক্ষারত ব্যক্তিরা তাকে জিজ্ঞেস করছিল,

'ভাই ! আপনাকে কী জিজ্ঞেস করলো?'

'আপনি কী উত্তর দিলেন?'

চাকুরী প্রার্থীদের কাছে ইন্টারভিউ কমিটির সবচেয়ে কমন প্রশ্ন ছিলো, 'দৈনিক কয় গ্লাস মদ পান করো?'

একপর্যায়ে সেই মুসলিম যুবকের পালা এলো। সে ভেতরে প্রবেশ করলো এবং তাকেও একের পর এক প্রশ্ন করা হলো। অবশেষে তারা তাকে প্রশ্ন করলো, 'দৈনিক কয় গ্লাস মদ পান করো?'

যুবকটি দ্বিধায় পড়ে গেলো। সে কি মিথ্যা দাবি করবে যে, অন্যান্য যুবকদের ন্যায় সেও মদ পান করে? যেন তারা এ কথা না বলতে পারে যে, তুমি তো কট্টর মুসলমান। নাকি সে সত্য বলবে যে, 'আমি মুসলমান। তাই আমি মদ পান করি না।'

একটু ভেবে সে সিদ্ধান্ত নিলো, 'চাকরি হোক বা না হোক, সে সত্য বলবে।'

সে বললো, 'আমি মদ পান করি না।'

তারা জিজ্ঞেস করলো, 'কেন? তুমি কি অসুস্থ?'

সে বললো, 'আমি তো মুসলমান। আর আমাদের ধর্মে মদপান নিষিদ্ধ।'
তারা বললো, 'তুমি উইকেন্ডে মানে সপ্তাহশেষে ছুটির দিনেও মদ পান করো না?।'

'না আমি ছুটির দিনেও মদ পান করি না।' সে জবাব দিল।

অবাক হয়ে তারা একে অন্যের দিকে তাকালো।

ইন্টারভিউ শেষে যখন ফলাফল প্রকাশিত হলো, তখন দেখা গেলো, তার নাম চাকুরী প্রাপ্তদের মধ্যে সবার ওপরে।

সে কাজ শুরু করলো। কেটে গেলো কয়েক মাস।

একদিন তার সাক্ষাৎ হলো ইন্টারভিউ গ্রহণকারী এক কর্মকর্তার সঙ্গে। সে তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা! আপনারা সবাইকে মদপানের ব্যাপারে কেন প্রশ্ন করছিলেন?

সে উত্তরে বললো, 'এখানে কাজ হলো পাহারা দেয়া। ইতিপূর্বে যাকেই এ কাজে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, দেখা গেছে, সে মদ পান করে মাতাল হয়ে পড়ে রয়েছে। এর ফলে চোর-ডাকাতরা সুযোগ পেতো।

যখন আমরা জানলাম, তুমি মদ পান করো না, তখন বুঝতে পারলাম যে, আমরা আমাদের কাঙ্খিত ব্যক্তিকে পেয়েছি। তাই আমরা তোমাকেই নিয়োগ দিয়েছি।'

শত প্রলোভন সত্ত্বেও নীতির ওপর অটল থাকার কী চমৎকার নমুনা!

অবশ্য আমরা এমন সমাজে বসবাস করি যেখানে নীতি আঁকড়ে থাকার মতো মানুষের বড় অভাব। এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া বড় কঠিন, যে নীতির ওপর চলার জন্যই বেঁচে থাকে, নীতির ওপর অটল থাকতে প্রয়োজনে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়। শত প্রলোভন সত্ত্বেও যে নীতিবিবর্জিত কাজ করে না।

যখন আপনি সৎ ও সঠিক পথে চলবেন এবং সত্যকে আঁকড়ে ধরবেন তখন ভিন্ন নীতির লোকেরা আপনাকে ছাড়বে না। আপনি যদি ঘুষ গ্রহণ না করেন তাহলে ঘুষখোররা আপনার প্রতি ক্ষুব্ধ হবে। আপনি ব্যভিচার থেকে বিরত থাকলে ব্যভিচারকারীরা আপনার বিরুদ্ধে একাট্টা হবে।

ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এক রাতে টহল দিচ্ছিলেন। রাতের অন্ধকারে এক বাড়ির পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তিনি ভেতর থেকে হাস্যরসের শব্দ শুনলেন। বুঝতে পারলেন, এটা নেশাখোরদের শব্দ।

তিনি রাতের বেলা দরজা নক করা ভালো মনে করলেন না। তাছাড়া তার ধারণা ভুলও তো হতে পারে।

তিনি বিষয়টি যাচাই করে নিশ্চিত হতে চাইলেন।

তাই তিনি এক টুকরো কয়লা নিয়ে বাড়িটির দরজায় একটি চিহ্ন দিয়ে ফিরে যেতে উদ্যত হলেন।

এদিকে বাড়ির মালিক দরজার কাছে আওয়াজ শুনতে পেলো। বের হয়ে দরজায় চিহ্ন দেখে এবং প্রত্যাবর্তনরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পিঠ দেখে সে সব বুঝে ফেললো।

স্বাভাবিক বুদ্ধির দাবি ছিলো, চিহ্নটি মুছে ফেলা। এতেই বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু লোকটি তা করলো না।

সে একটি কয়লার টুকরা নিয়ে তার আশেপাশের প্রতিবেশীদের বাড়িতেও চিহ্ন দিয়ে দিলো। যেন সে নিজে অন্যদের স্তরে উন্নীত হতে চাচ্ছে না! নিজের চিহ্নটি মুছে সে ভালো মানুষের কাতারে শামিল হতে চাচ্ছে না! বরং অন্যদেরকে তার স্তরে নিয়ে যেতে চাচ্ছে।

প্রবাদে আছে,'পরকিয়া নারী চায় সবাই তার মতো হয়ে যাক।'

বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা হলো– কোনো স্ত্রী যদি সবসময় স্বামীর সঙ্গে মিথ্যা বলে। কেউ তাকে এ বিষয়ে সতর্ক করলেও সে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলে, 'পুরুষদের সঙ্গে এমন আচরণই করতে হয়। তাদের সঙ্গে সত্য বললে শান্তিতে থাকতে পারবে না।'

এভাবে সে সৎ মহিলাদেরকেও নিজের দলে ভেড়াতে চায়। সে অবিরাম চেষ্টা চালাতে থাকে। ফলে অনেক নীতিবান মানুষ একসময় নীতিহীন হতে বাধ্য হয়।

মনে করুন, রফিক সাহেব একজন ভালো ম্যানেজার। সে কর্মচারীদের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করে। সে বিশ্বাস করে, এর মাধ্যমে কোম্পানীর উন্নতি হবে এবং কর্মকর্তাদের মনও কাজের প্রতি আন্তরিক থাকবে। ফলে পণ্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। এ কারণে কর্মকর্তা ও মালিকপক্ষ সবাই রফিক সাহেবকে খুব ভালোবাসেন।

কিন্তু শফিক সাহেব একজন বদমেজাজি ম্যানেজার। তিনি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন না। ফলে কেউ তাকে ভালোবাসে না। একদিন রফিক সাহেবের সঙ্গে শফিক সাহেবের দেখা হলো। তাকে দেখে শফিক সাহেব হিংসায় জ্বলে উঠলো। সে রফিক সাহেবের মতো হওয়ার চেষ্টা না করে উল্টো তাকেও নিজের মতো হতে প্ররোচিত করতে লাগল। সে চায় তার আচরণ-উচ্চারণও তার মতো হয়ে যাক। সে তাকে 'উপদেশ' দিতে থাকে, 'কর্মচারীদের সঙ্গে এমন করতে নেই। ওদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলবেন না। তাহলে ওরা বেশি প্রশ্রয় পেয়ে আপনার মাথায় উঠে যাবে।'

একজন দোকানদার তার দোকানে সিগারেট বিক্রি করে না। তার সঙ্গীরা এসে তাকে সিগারেট বিক্রির জন্য ফুসলাতে থাকে। বলে, 'সিগারেট বিক্রি করলে তোমার ব্যবসা ভালো হবে, মুনাফা বেড়ে যাবে। সিগারেট নিতে যখন তোমার দোকানে আসবে, কিছুক্ষণ থাকবে তখন স্বাভাবিকভাবেই আরো কিছু কেনার প্রতি উৎসাহি হবে।'

এভাবেই বিভিন্নভাবে নীতি হতে বিচ্যুত করতে নীতিহীনিরা নীতিবানদেরকে প্ররোচনা দিতে থাকে। তাই আপনি সাহসী হোন । নীতির ওপর অটল থাকুন। সাহসের সাথে বলুন, 'না, কি-ছু-তে-ই না! কোনো প্রলোভনেই আমি আমার নীতি থেকে একচুল নড়বো না।'

কাফেররা রাসূল ﷺ-কে ঈমান ও তাওহিদের নীতি থেকে বিচ্যুত করতে অনেক চেষ্টা করেছিলো । তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে নীতির ওপর অটল থাকার ব্যাপারে সতর্ক করে ইরশাদ করেছেন-

وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ

অর্থ : 'তারা চায় আপনি শীথিলতা প্রদর্শন করেন, তাহলে তারাও শীথিল হবে। (সূরা ক্বলাম : আয়াত-৮)

কাফেররা হলো মূর্তিপূজক। তাদের কোনো নীতি ও আদর্শ নেই। আর তাই তাদের নীতির ওপর থাকারও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এবং নীতি থেকে সরে আসতেও কোনো সমস্যা নেই।

সুতরাং সব সময় সতর্ক থাকুন, কেউ যেন আপনাকে আপনার নীতি থেকে বিচ্যুত করতে না পারে।

জীবনের অটল নীতি...

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ. وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ.

অর্থ : 'যারা (আপনাকে) মিথ্যাবাদী বলে, আপনি তাদের অনুসরণ করবেন না। তারা চায় আপনি শীথিলতা প্রদর্শন করেন, তাহলে তারাও শীথিল হবে।' (সূরা ক্বলাম:৮-৯)

৭২. অন্যকে ক্ষমা করুন

এমন কাউকে খুঁজে পাবেন না যে, জীবনে কারো কাছ থেকে সে দুঃখ পায় নি।

কেউ হয়তো কখনো অসহ্যকর রসিকতা করেছে।

কেউ অকথ্য ভাষায় কোনো কথা বলেছে।

কেউ হয়তো আপনার ব্যক্তিগত বিষয়ে অনধিকার চর্চা করেছে।

কারো সাথে হয়তো ঝগড়া হয়েছে। কিংবা কারো সাথে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা, বা মতের অমিল হয়েছে।

কেউ কেউ তো তুচ্ছ ঘটনাকে অনেক বড় করে দেখে। তিলকে তাল করে ফেলে। কোনো ঘটনা ভুলে যাওয়া কিংবা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার মতো যোগ্যতা তাদের নেই।

কেউ কেউ এমনও আছেন যে, অন্যের ওজর আপত্তি গ্রহণ করতে রাজি নয়।! মনের সংকীর্ণতার কারণে অন্যকে ক্ষমা করতে তার কষ্ট হয়!

কেউ কেউ তো অন্যকে ক্ষমা না করে নিজেই যন্ত্রণায় ভুগতে থাকে। হিংসার আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। হিংসার আগুন এমন মর্মন্তুদ যে অন্যকে (হিংসিতকে) না জালিয়ে, হিংসুককে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়।

তাই নিজেকে কষ্ট দেবেন না। এমন কিছু বিষয় আছে, যেগুলোর জন্য কাউকে শাস্তি দেয়া যায় না। এ বিষয়টি মেনে নিন। নিজেকে কষ্ট না দিয়ে উদার হোন, অতীত ভুলে বর্তমান নিয়ে ভাবুন। জীবনকে উপভোগ্য করে তুলুন।

মক্কাবিজয় পরবর্তী ঘটনা।

রাসূল ﷺ বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন। সকলে নিশ্চিন্ত। রাসূল কাবা ঘরে তাওয়াফের উদ্দেশ্যে বের হলেন। নিজ বাহনে চড়ে কাবা ঘরে সাতবার তওয়াফ করলেন।

তাওয়াফ শেষ করে ওসমান বিন তালহাকে ডাকলেন। তালহার কাছ থেকে চাবি নিয়ে তিনি কাবার ভেতরে প্রবেশ করলেন। সেখানে ফেরেশতা ও মহান ব্যক্তিদের কাল্পনিক ছবি অঙ্কন করা ছিল। মক্কার মুশরিকরা অজ্ঞতা আর কুফরির বশে এগুলো অঙ্কন করেছিল।

তিনি দেখলেন ইবরাহিম আ.-এর একটি ছবি আঁকা। তার হাতে ভাগ্যনির্ণয়ক তীর! রাসূল বললেন, 'আল্লাহ ওদের ধ্বংস করুন! ওরা মহান নবী ইবরাহীম আ.-এর হাতে ভাগ্যনির্ণায়ক তীর তুলে দিয়েছে! ভাগ্যনির্ণায়ক তীরের সাথে ইবরাহীম আ.-এর কী সম্পর্ক?'

'তিনি ইহুদি কিংবা খৃষ্টান ছিলেন না এবং মুশরিকও ছিলেন না । তিনি তো ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলমান।'

এরপর রাসূল ﷺ ছবিগুলো মুছে ফেলার নির্দেশ দিলেন।

রাসূল সেখানে কাঠের তৈরী একটি কবুতর পেয়ে নিজের হাতে তা ভেঙ্গে ফেললেন। এরপর তিনি এসে দাঁড়ালেন কাবার দরজায়। মুসলমান-কাফের সবাই কাবা প্রাঙ্গণে উপস্থিত। সবাই তাকিয়ে আছে মহানবীর দিকে।

রাসূল দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। এরপর চললেন জমজম কূপের দিকে। জমজমের কাছে গিয়ে তাতে উকি দিয়ে দেখলেন। এরপর জমজমের পানি আনতে বললেন। পানি আনা হলে তিনি পান করলেন এবং অযু করলেন। সাহাবীরা রাসূলের অযূর পানির অবশিষ্ট অংশের বরকত লাভের জন্য প্রতিযোগিতা করতে লাগলেন।

মক্কার মুশরিকরা এটা দেখে তো অবাক। তারা বলাবলি করলো, 'আশ্চর্য! আমরা এমন কোনো বাদশাহ ইতিপূর্বে দেখি নি, এমনকি এমন কোনো বাদশাহর কথা ইতিপূর্বে শুনিও নি।

এরপর রাসূল মাকামে ইবরাহীমের দিকে গেলেন। মাকামে ইবরাহীম কাবার সাথে ঘেঁষে ছিলো, রাসূল তা একটু দূরে সরিয়ে দিলেন।

এরপর রাসূল কাবার দরজায় দাঁড়িয়ে উপস্থিত জনতার মাঝে দৃষ্টি দিতে লাগলেন।

যারা সেখানে উপস্থিত ছিলো কত সৌভাগ্য তাদের!

হায়! আমি যদি তাদের একজন হতাম!

রাসূল সকলের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন,

'আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তার কোনো শরীক নাই।

আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্যে পরিণত করেছেন। তিনি তার বান্দাকে সাহায্য করেছেন। সকল কুফরী শক্তিকে পরাজিত ও পরাভূত করেছেন।

হে লোকেরা শুনে রাখো, অতীতের সকল অপকর্ম, সকল রক্তপণ আমার পায়ের নিচে সমাহিত করে দিলাম। কেবল কাবাঘরের খেদমত আর হাজীদের পানিপানের ঐতিহ্য আগের অবস্থায় বহাল থাকবে।' এরপর রাসূল শরিয়তের কিছু বিধান বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, 'চাবুক বা লাঠি দ্বারা অনিচ্ছাকৃত হত্যার জন্য একশত উট দিয়তরূপে প্রদান করতে হবে, এর চল্লিশটাই হতে হবে গর্ভবতী।'

এরপর প্রিয়নবী কোরাইশ সরদারদের দিকে তাকালেন এবং স্বর উঁচু করে বললেন, 'কোরাইশ সম্প্রদায়! শোনো, মহান আল্লাহ তোমাদের জাহেলী যুগের আমিত্বভাব ও পিতৃপুরুষ নিয়ে অহঙ্কার নিঃশেষ করে দিয়েছেন। শোনো, সকল মানুষ এক আদম থেকে তৈরি আর আদম হলেন মাটির তৈরী।'

এরপর রাসূল তিলাওয়াত করলেন-

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

অর্থঃ হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বহু জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। (এটা শুধু এ জন্য) যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে মর্যাদাবান সে-ই, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন। (সূরা হুজরাত : আয়াত-১৩)

রাসূল আবার কাফেরদের দিকে তাকালেন। তিনি আজ মর্যাদা ও সম্মানের শীর্ষচূড়ায় অধিষ্ঠিত হয়ে কাবার দরজায় দাঁড়ানো।

আর মক্কার কাফিরদল আজ লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হয়ে সেই মাটিতে দাঁড়ানো, যেখানে তারা রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, অপমানিত

করেছিল। এই মাটিতে নবীজি ﷺ যখন সেজদারত ছিলেন তখন এ পাপিষ্টরা তাঁর মাথায় আর্বজনা ফেলেছিল!

সেদিনের অত্যাচারী কোরাইশরা আজ কাবা চত্বরে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তারা পরাজিত! অপদস্থ! লাঞ্ছিত! রাসূল তাদেরকে বললেন, 'হে কোরাইশ সম্প্রদায়! আজ আমি তোমাদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করবো?' তোমাদের কী মনে হয়?

তারা এবার নড়েচড়ে উঠলো। তারা বললো, 'আপনি আমাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করবেন। আপনি তো মহানুভব এক ভাই। আপনি! মহান এক ভাইয়ের পুত্র!'

আশ্চর্য!

তারা কি ভুলে গেছে এই মহানুভব ভাইয়ের সঙ্গে অতীতে তারা কী আচরণ করেছিলো?

আজ কোথায় তাদের সেই উপহাস? কোথায় সেই বিদ্রূপ? পাগল, যাদুকর জ্যোতিষী বলে দেয়া গালি!

তিনি মহানুভব এক ভাই, এক মহান ভাইয়ের পুত্র । তাহলে কেন তোমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে?

কেন দুর্বল মুসলমানদের ওপর চালালে নির্যাতনের স্টীম রোলার?

এই তো সেই বেলাল দাঁড়িয়ে আছে! আজো তার পিঠ বহন করে চলছে প্রচণ্ড প্রহারের দাগগুলো! আজও মুছে যায় নি উত্তপ্ত মরুভূমির প্রচণ্ড রোদে হেঁচড়ানোর ফলে সৃষ্ট বুকের সেই ক্ষতগুলো!

ওই তো সেই খেজুর বৃক্ষটি, যার পাশে নির্মমভাবে শহীদ করেছিলে সুমাইয়াকে, শহীদ করেছিলে তার স্বামী ইয়াসিরকে। এই যে তাদের পুত্র আম্মার, নিজ চোখে সে দেখেছে প্রিয়তম পিতা-মাতার নির্যাতনের লোমহর্ষক দৃশ্য।

আজ তোমরা বলছো, 'মহানুভব ভাই'?

এই মহানুভব ভাইকেই তোমরা বয়কট করে 'শিয়াবে আবি তালিবে' তিন বছর অবরুদ্ধ করে রেখেছিলে! দুর্বল–অসহায় মুসলমানদেরকেও তোমরা বয়কট করেছিলে! ক্ষুধার তাড়নায় তারা গাছের পাতা খেতে বাধ্য

হয়েছিলো। ছোট ছোট শিশুর করুণ কান্না তোমাদের হৃদয়কে গলাতে পারে নি।

বয়োজ্যাষ্ঠদের সকাতর অনুনয়ও তোমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে নি। গর্ভধারিনী মায়ের আহাজারি, দুগ্ধ পোষ্য শিশুর কান্না শুনেও তোমরা এগিয়ে আসো নি।

তোমরা কি বদর আর ওহুদের যুদ্ধের কথা ভুলে গেছ? ভুলে গেছ মুসলমান্নদেরকে নিশ্চিহ্ন করে [illegible] চূড়ান্ত প্রস্তুতি খন্দক অভিযানের কথা– কোথায় সেসব? আজ বলছো, 'মহানুভব ভাই!

এই তো দুই বছর আগের কথা। তিনি এসেছিলেন ওমরাহ পালন করতে। কিন্তু তোমরা তাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দাও নি। হোদাইবিয়াতে অবরুদ্ধ করে রেখে সেখান থেকেই তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিলে মদিনায়। সন্ধিচুক্তির নামে এক অসম চুক্তিতে তাকে উপনীত হতে বাধ্য করলে।

তোমরাই তো মৃত্যুশয্যায় তার চাচাকে ইসলাম গ্রহণ করতে দাওনি।

আজ কি সে সব ভুলে গেলে?

বেদনা ও যন্ত্রণার এক সুদীর্ঘ ও কালো এ্যালবাম রাসূলের চোখের সামনে ভেসে উঠলো। তিনি তাকালেন উপস্থিত কোরাইশদের দিকে। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠল পর্বতময় মক্কার দিগন্ত, মক্কার অলি-গলি, পথ-ঘাট, পাহাড়-পর্বত। সর্বত্র কষ্টের সেই দুঃসহ স্মৃতিগুলো আজো জীবন্ত। কেবল রাসূলই নন; আবূ বকর-ওমর, ওসমান-আলী, বেলাল আম্মার-সবার চোখের সামনেই দেদীপ্যমান কষ্টের সেই দিনগুলোর যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতি। কোরাইশ কাফেরদের সঙ্গে প্রত্যেকেরই আছে দুঃখের স্মৃতি, আছে কষ্টের উপাখ্যান। রাসূল ইচ্ছা করলে এখন এসকল কোরাইশদের কঠোর শাস্তি দিতে পারেন, নিতে পারেন নির্মম প্রতিশোধ। তারা তো শত্রুপক্ষ! তারা তো সীমালঙ্ঘনকারী! তারা তো বিশ্বাসঘাতক!

হ্যাঁ, তারা বিশ্বাসঘাতক! তারা হোদাইবিয়ার সন্ধির চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

অপরাধী কোরাইশ কাফের সম্প্রদায় আজ ভীত-সন্ত্রস্ত, চিন্তিত, উদ্বিগ্ন। তারা আজ তাদের পরিণাম নিয়ে শঙ্কিত?

কিন্তু দয়ার নবী, মায়ার নবী, ভালোবাসার মূর্ত ছবি অতীতের সব কষ্ট ভুলে গেলেন। শত্রুতা ও প্রতিশোধের আগুন নিভিয়ে দিয়ে তিনি এক ঐতিহাসিক ঘোষণা দিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, 'যাও, তোমরা সবাই আজ মুক্ত, তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই।'

রাসূলের কথা শুনে কাফেররা যেন নিজেদের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে তাদের কিছুটা সময় লাগল। এরপর তাদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল।। আনন্দে তারা যেন হাওয়ায় উড়ছে!

এরপর রাসূল কাবাঘরের চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। কাবার আশেপাশে তখন তিনশত ষাটটি মূর্তি স্থাপিত ছিলো। আল্লাহর পবিত্র ঘরের সন্নিকটে আল্লাহর পরিবর্তে দেব-দেবির উপাসনা করা হয়।

রাসূল নিজ হাতে এই মূর্তিগুলো ভাঙলেন। একদিকে মূর্তিগুলো ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে, অপরদিকে রাসূলের পবিত্র কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে-

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ.. وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ.

অর্থ : 'সত্য এসেছে, মিথ্যা ও অন্যায় পরাভূত হয়েছে। মিথ্যা ও অন্যায় না পারে কিছু সৃষ্টি করতে, না পারে কোনো কিছুর পুনরাবৃত্তি করতে।
(সূরা ইসরা/বনী ইসরাঈল : আয়াত-৮১)

যেসব অত্যাচারী, সীমালঙ্ঘনকারী কুরাইশ মুসলমানদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালিয়েছিল তাদের অনেকে মক্কা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তাদেরই একজন সাফওয়ান বিন উমাইয়া।

কিন্তু যাবে কোথায়? থাকবে কোথায়? সাফওয়ান পরিকল্পনা করলো জেদ্দায় পৌঁছে নৌযানে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইয়েমেনে চলে যাবে।

মক্কাবাসী যখন দেখলো রাসূল সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, বেদনাদায়ক অতীত ভুলে সকলকে বরণ করে নিয়েছেন। ওমায়ের বিন ওয়াহাব নামক জনৈক কাফের নবীজির দরবারে হাজির হলো। সে বললো, 'আল্লাহর নবী! সাফওয়ান বিন উমাইয়া তার গোত্রের সরদার। সে আপনার ভয়ে পালিয়ে গেছে। সে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাবে। আপনি দয়া করে তাকে নিরাপত্তা দিন।'

এ কথা শুনে রাসূল উদারতার সাথে বললেন, 'তাকে জানিয়ে দাও, সে নিরাপদ।'

ওমায়ের বললো, 'আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কিছু দিন, যা দেখিয়ে আমি তাকে বিশ্বাস করাতে পারবো যে, আপনি তাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন।'

রাসূল যে পাগড়ি পরিধান করে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন, নিজের সেই পাগড়িটি খুলে তাকে দিলেন। সাফওয়ান যেন পাগড়িটি দেখেই বুঝতে পারে যে, আসলেই রাসূল তাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন।

রাসূলের পাগড়ি নিয়ে ওমায়ের রওয়ানা হলো। সাফওয়ানের কাছে পৌঁছে সে দেখলো, সাফওয়ান সমুদ্র পাড়ি দেয়ার জন্য প্রস্তুত।

ওমায়ের বললো, সাফওয়ান! তোমার জন্য উৎসর্গিত আমার জান! আমার মাতা-পিতা! কসম আল্লাহর! নিজেকে তুমি ধ্বংস করো না। আল্লাহর রাসূল তোমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। এই যে দেখো তার পাগড়ি। প্রমাণস্বরূপ আমি নিয়ে এসেছি।'

সাফওয়ান উত্তর দিলো, 'ধ্বংস হও তুমি! দূরে সরে যাও আমার কাছ থেকে! তুমি তো মিথ্যাবাদী!

মুসলমানদের সঙ্গে কৃত আচরণের পরিণাম–চিন্তায় সে ছিলো ভীত-সন্ত্রস্ত ও শঙ্কিত। সে কল্পনাও করে নি যে, এতকিছুর পরও কেউ ক্ষমা করতে পারে।

ওমায়ের চেঁচিয়ে বললো, সাফওয়ান! বিশ্বাস করো। তিনি তো আল্লাহর রাসূল। শ্রে'মানব । সবচেয়ে দয়াশীল।

তিনি তো তোমার জ্ঞাতি ভাই! তার সম্মান তোমারই সম্মান ! তার রাজত্ব তোমারই রাজত্ব!

সাফওয়ান বললো, 'আমি আমার জীবনের ব্যাপারে শঙ্কিত।' ওমায়ের বললো, 'তিনি অনেক মহান, তিনি অনেক উদার।'

ওমায়েরের আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে সাওয়ান তার সঙ্গে মক্কায় ফিরে এলো। ওমায়ের তাকে নিয়ে উপস্থিত হলো রাসূল ﷺ-এর দরবারে।

Contents

সাফওয়ান বললো, 'সে বলেছে, আপনি নাকি আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, সে সত্য বলেছে।' রাসূল বললেন।

'আমি ইসলাম গ্রহণ করবো কিনা– এ বিষয়ে ভাবার জন্য আমাকে দু'মাস সময় দিন।' সাফওয়ান বললো।

অর্থাৎ আমাগী দু'মাস সে নিজ মক্কায় অবস্থান করে মূর্তিপূজা করবে! আর এরই মধ্যে ভাববে যে, ইসলাম গ্রহণ করবে কি না।

রাসূল বললেন, 'দুই মাস নয়, তোমাকে চার মাসের সময় দেয়া হলো।'

কিছুদিন পর সাফওয়ান ইসলাম গ্রহণ করলো। ক্ষমার সুযোগ লাভে ধন্য হয়ে সাফওয়ান বিন উমাইয়া হলেন সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু।

ক্ষমার কি অপূর্ব নজীর! বেদনাবিধুর অতীত ভুলে যাওয়ার কি অনুপম দৃষ্টান্ত।

নিঃসন্দেহে একমাত্র মহান ও মহানুভব ব্যক্তিরাই পারেন এমন ক্ষমা ও ঔদার্য দেখাতে। তারাই পারেন হিংসা ও ক্রোধ সংবরণ করে ক্ষমা ও মানবতাবোধের নিশান উড়াতে।

ক্ষণকালের এই জীবনকে হিংসা আর বিদ্বেষ দিয়ে কলুষিত করার সময় কোথায়! ব্যক্তিগত পর্যায়েও রাসূল ছিলেন উদার ও বিনম্র।

মিকদাদ বিন আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি ও আমার দু'জন সঙ্গী মদিনায় এলাম। বিভিন্নজনের কাছে গেলাম, কিন্তু কেউ আমাদেরকে মেহমানরূপে গ্রহণ করলো না। অবশেষে আমরা নবী দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাদেরকে তার নিজের ঘরে অতিথি হিসেবে বরণ করে নিলেন।

রাসূলের কাছে চারটি বকরি ছিলো। তিনি বললেন, 'মিকদাদ! এগুলো দোহন করে চারভাগে ভাগ করে চারজনকে যার যার অংশ দিয়ে দেবে।'

মিকদাদ বলেন, 'রাসূলের নির্দেশমত আমি তাই করলাম। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমি বকরিগুলো দোহন করতাম। আমি ও আমার সঙ্গীরা যার যার অংশ পান করে এক অংশ রাসূলের জন্য রেখে দিতাম। রাসূল উপস্থিত থাকলে তা পান করতেন। তিনি উপস্থিত না থাকলে তা রেখে দেয়া হতো। তিনি যখন আসতেন তখন তা পান করতেন।

এক রাতের ঘটনা। যথারীতি মেকদাদ দুধ দোহন করে নিজে পান করলেন, সঙ্গীদেরকে পান করালেন এবং রাসূলের অংশ রেখে দিলেন। রাসূল ফিরে এসে এই দুধ পান করবেন।

অনেক্ষণ হয়ে গেলো রাসূল ফিরছেন না। অনেক রাত হয়ে গেছে। মিকদাদ শুয়ে আছেন। শুয়ে শুয়ে ভাবছেন, হয়তো রাসূল আজ কোনো আনসারী সাহাবীর বাড়িতে গেছেন। তিনি সেখানে আহার করে ফেলেছেন। তাই রাসূলের অংশটুকু আমি পান করে ফেলতে পারি।

এটা ভেবে মিকদাদ রাসূলের অংশটা পান করে ফেললেন। মিকদাদ বলেন, দুধটুকু পেটে গিয়ে স্থির হতেই আমি বুঝতে পারলাম, কী ভুলটা না আমি করেছি। আমি খুব লজ্জিত হলাম। ভাবলাম, এখনি হয়তো রাসূল ফিরে আসবেন ক্ষুধার্ত, পিপাসিত অবস্থায়। এসে দেখবেন পেয়ালা খালি। এরপর তিনি হয়তো বদদোয়া করবেন। এসব ভেবে দুশ্চিন্তায় আমি কম্বল দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললাম। ধীরে ধীরে রাত যখন আরো গভীর হলো, রাসূল ফিরে এলেন। এমন অনুচ্চ আওয়াজে সালাম করলেন, যেন জাগ্রত ব্যক্তিই শুনতে পায়, ঘুমন্ত কারো ঘুম না ভাঙ্গে। মিকদাদ বিছানায় শুয়ে ঘুমের ভান করে তাকিয়ে আছেন রাসূলের দিকে। রাসূল কী করেন তা দেখছেন। রাসূল দুধের পাত্রের কাছে এসে ঢাকনা সরালেন। দেখলেন, তাতে কিছুই নেই। রাসূল এবার তাকালেন আকাশের দিকে।

মিকদাদ ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন, এখন হয়তো তিনি বদদোয়া করবেন। তিনি কান পেতে শুনতে লাগলেন, রাসূল কী বলতে যাচ্ছেন। তিনি শুনলেন, রাসূল দোয়া করছেন, 'হে আল্লাহ ! আমাকে যে পান করায়, তুমি তাকে পান করাও। আমাকে যে আহার করায় তুমি তাকে আহার করাও।'

মিকদাদ এ কথা শুনে মনে মনে ভাবলেন, রাসূলের এই দোয়াকে আমি কাজে লাগাবো। তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে ধারালো একটি ছুরি নিলেন। এরপর বকরিগুলোর কাছে গেলেন। এগুলোর একটি জবাই করে রাসূলকে আহার করাবেন।

কোনো বকরিটি বেশি পেশিবহুল ও হৃষ্টপুষ্ট, তা অনুমান করার জন্য মিকদাদ যখন হাত বাড়ালেন, তার হাত একটি বকরির ওলান স্পর্শ

করলো। তিনি অনুভব করলেন, বকরিটির ওলান দুধে পূর্ণ। এরপর হাত দিয়ে দেখলেন, সবগুলোর ওলান দুধে পরিপূর্ণ। জবাইয়ের চিন্তা বাদ দিয়ে তিনি একটি বড় পাত্র নিয়ে দুধ দোহন করতে লাগলেন। পাত্রটি দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো এবং দুধের ফেনা উপচে পড়তে লাগলো। দুধের পাত্র নিয়ে তিনি রাসূলের কাছে এসে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! পান করুন।' স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিমাণ দুধ দেখে রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, 'মিকদাদ! তোমরা কি আজ রাতে দুধ পান করো নি?' মিকদাদ বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আপনি পান করুন।'

রাসূল বললেন, 'মিকদাদ! কী ব্যাপার? একটু বলো তো।'

মিকদাদ আরজ করলেন, 'আল্লাহর রাসূল! আগে পান করুন। পরে বলছি।' রাসূল পান করলেন। এরপর পাত্রটি এগিয়ে দিলেন মিকদাদের দিকে। মিকদাদ বললেন-

'আল্লাহর রাসূল! আরো পান করুন।'

রাসূল আবার পান করলেন এবং মিকদাদের দিকে পাত্রটি এগিয়ে দিলেন। মিকদাদ আবারো বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আরো পান করুন।'

মিকদাদ বলেন, আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, রাসূল পরিতৃপ্ত হয়েছেন এবং রাসূলের সেই দোয়া (হে আল্লাহ! আমাকে যে পান করায়, তুমি তাকে পান করাও। আমাকে যে আহার করায় তুমি তাকে আহার করাও।) লাভ করার সুযোগ আমি পেয়ে গেছি তখন আমি হাসতে হাসতে মাটিতে গড়িয়ে পড়লাম।

আমার অবস্থা দেখে রাসূল বললেন, 'মিকদাদ! এটা তুমি কী করছো?!'

আমি বললাম, 'আল্লাহর রাসূল! আজ রাতে আপনি ফিরতে দেরি করছিলেন। এদিকে আমার ক্ষুধা লেগেছিল। মনে মনে ভাবলাম, হয়তো আল্লাহর রাসূল রাতের খাবার কোথাও খেয়ে ফেলেছেন।'

এভাবে মিকদাদ পুরো ঘটনা রাসূলকে বললো। জানালেন, কীভাবে বকরিগুলো অস্বাভাবিকভাবে এক রাতে দুইবার দুধ দিলো!

রাসূল আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কীভাবে এত দ্রুত বকরিগুলোর ওলান দুধে ভরে গেলো! এক রাতে তো বকরি দুইবার দুধ দেয় না!

রাসূল বললেন, 'এ তো আল্লাহর বিশেষ রহমত। মিকদাদ! তুমি আমাকে আগে জানালে না কেন? তোমার সঙ্গীদেরকে জাগালে তারাও কিছু পান করতে পারতো, তারাও এই রহমতের কিছু অংশ লাভ করতে পারতো।'

মিকদাদ বললেন, 'সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন! আপনি আল্লাহর রহমতে সিক্ত হয়েছেন আর আমিও তার কিছু অংশ লাভ করতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের ছাড়া আর কেউ লাভ করতে পারলো কি পারলো না তা আমার মাথায় আসে নি।

দৃষ্টিভঙ্গি ...

জীবনে লেনদেন সদা চলমান।

আপনার দান যেন গ্রহণের চেয়ে বেশি হয়।



৭৩ .উদার হোন

রাসূল ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের নেতা কে?'

উত্তরে তারা বললো, 'আমাদের নেতা অমুক। তবে আমরা তাকে কৃপণ বলেই জানি।'

রাসূল ﷺ বললেন: 'কৃপনতার চেয়ে কঠিন রোগ কি আর আছে? তোমাদের নেতা তো সাদা ও কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট অমুক ... ।'

নওমুসলিম এক আরব গোত্রের সঙ্গে এভাবেই রাসূল ﷺ-এর কথা হচ্ছিলো। রাসূল ﷺ জানতে চেয়েছিলেন তাদের নেতা কে? উদ্দেশ্য ছিলো যে, তাদের ইসলাম গ্রহণের পর বর্তমান নেতাকেই বহাল রাখবেন, নাকি তাকে পরিবর্তন করে দেবেন এটা ঠিক করা।

প্রকৃতপক্ষে কৃপণতার চেয়ে কঠিন কোনো ব্যাধি নেই।

চরম নিন্দনীয় ও ঘৃণিত একটি স্বভাব হলো কৃপণতা। কৃপণকে মানুষ ঘৃণা করে। তার উপস্থিতিই বিশাল বোঝা।

কৃপণের বাড়িতে খানার অনুষ্ঠান হয় না। বন্ধু-বান্ধবও তার বাড়িতে আসে না। কেউ ভালোবাসে না। তার জন্য কারো মন কাঁদে না।

কাউকে সে কখনো উপহার-উপঢৌকনও দেয় না। নিজের বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রকাশেও সে দুই টাকা খরচ করতে চায় না।

হীনমনা হওয়ার কারণে সুগন্ধি ব্যবহারেও তার আগ্রহ নেই।

পক্ষান্তরে উদার ও দানশীল ব্যক্তিকে দেখুন।

বন্ধুদের কাছে তিনি খুবই প্রিয়পাত্র। আত্মীয়স্বজনের কাছে তার সম্মান ও মর্যাদা অনেক উর্দ্ধে।

বন্ধুরা পরস্পর মিলিত হতে চাইলে তার বাড়িকেই সবাই পছন্দ করে। বন্ধুদের কোনো কিছুর অভাব হলে তিনি তা পূরণ করে দেন।

উদারতার মাধ্যমে তিনি সবার হৃদয় জয় করে নেন। অনুগ্রহের মাধ্যমে সবাইকে নিজের করে নেন।

কবির ভাষায়,

'মানুষের প্রতি দয়া করে তুমি তাদের হৃদয় জয় করতে পারবে।

Contents

এহসান ও দয়া ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তুমি কারো মন জয় করতে পারবে না।'

তবে খাঁটি নিয়তে অন্যের উপকার করতে হবে। মুসলিম ভাইদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করবেন আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়তে। সবার প্রতি হৃদ্যতা ও ভালোবাসা পোষণ করবেন আল্লাহর ভালোবাসা লাভের উদ্দেশ্যে।

আপনার দয়া ও অনুগ্রহের পেছনে যেন সুনাম ও খ্যাতি অর্জনের অভিলাস কিংবা নেতৃত্ব লাভ, মানুষের প্রশংসা ও জনপ্রিয়তা অর্জনের সুপ্ত বাসনা না থাকে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'সর্বপ্রথম জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে তিন শ্রেণির লোক।'-এর মধ্যে এক শ্রেণির কথা রাসূল ﷺ বলেছেন, দানবীর খেতাব পাওয়ার আশায় যারা দান করে। তারা স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দান করে না। তারা শুধু সৃষ্টির সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়। তারা মানুষকে দেখানোর জন্যই কেবল দান করে। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত পুরো হাদিসটি এখানে উপস্থাপন করছি।

সুফিয়ান রহ. বলেন, আমি মদিনায় প্রবেশ করার পর দেখতে পেলাম, অনেক মানুষ এক ব্যক্তির কাছে সমবেত হয়ে বসে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ইনি কে?'

লোকেরা বললো, 'ইনি আল্লাহর রাসূলের বিশিষ্ট সাহাবী আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু।'

আমি তার কাছে গিয়ে বসলাম। সবাইকে তিনি হাদিস শোনাচ্ছিলেন।

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু এক সময় হাদিস বর্ণনা শেষ করলেন। সবাই যার যার গন্তেব্যে চলে গেলেন। তিনি একাকী থেকে গেলেন। তাকে একাকী পেয়ে আমি বললাম, 'হযরত! আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে এমন একটি হাদিস কেন বলছেন না, যা আপনি সরাসরি আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে শুনেছেন এবং মুখস্থ করেছেন?'

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বললেন, 'আমি তোমাকে একটি হাদিস শোনাবো, যা আমি রাসূল ﷺ-এর মোবারক মুখ থেকে সরাসরি শুনেছি, ভালোভাবে বুঝেছি এবং মুখস্থ করেছি।

এ কথা বলার পর আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নীরব ও আনমনা হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকলেন।-এরপর স্বাভাবিক হয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে সে হাদীসটি শোনাবো, আল্লাহর রাসূল যা আমার কাছে এ ঘরেই বর্ণনা করেছেন। এ ঘরে তখন আমি ও আল্লাহর রাসূল ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিল না।'

এরপর তিনি আরেকটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। আমি তাকে আমার গায়ের সাথে ঠেস দিয়ে ধরে রাখলাম। এভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেল। জ্ঞান ফিরে আসলে তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বান্দাদের হিসাব নিকাশ করার জন্য বান্দাদের প্রতি মনোনিবেশ করবেন। সবাই সেদিন নতজানু অবস্থায় থাকবে। আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম একজন আলেমকে ডাকবেন।-এরপর ডাকবেন, আল্লাহর রাস্তায় জীবন দানকারী একজন শহীদকে।-এরপর এক সম্পদশালীকে ডাকবেন।

আলেমকে লক্ষ করে বলবেন, আমি আমার রাসূলের ওপর যে কুরআন অবতীর্ণ করেছি, তা কি তোমাকে শেখাইনি?'

সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! অবশ্যই আপনি আমাকে শিখিয়েছেন।'

আল্লাহ তখন বলবেন, 'তাহলে তুমি কী সে অনুযায়ী আমল করেছো?'

সে উত্তর দেবে: 'হে আল্লাহ! আমি দিনরাত তা নামাযে তিলাওয়াত করেছি।'

তার উত্তর শুনে আল্লাহ বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলেছো।'

ফেরেশতারা বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলেছো।'

এরপর আল্লাহ বলবেন, 'মানুষ তোমাকে ক্বারী বলবে, তোমাকে আলেম বলবে, এ আশায় তুমি দিনরাত ইবাদত করেছো, এলেম চর্চা করেছো। (মানুষকে দেখানোর জন্য তুমি আমল করেছো। দুনিয়াতেই মানুষ তোমার প্রশংসা করেছে। মানুষ বলেছে, 'অমুক কারী সাহেব', 'অমুক অনেক বড় আলেম। তুমি তোমার প্রাপ্য দুনিয়াতে পেয়েছ।)

এরপর সম্পদশালীকে ডাকা হবে।

আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, 'আমি কি তোমাকে সম্পদের প্রাচুর্য দেইনি? তোমাকে অমুখাপেক্ষী করিনি?'

সে উত্তর দেবে, 'অবশ্যই হে আমার রব।'

'তাহলে আমার দেয়া সম্পদ দিয়ে তুমি কী আমল করেছো?' আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞেস করবেন।

সে উত্তর দিবে, 'আমি আত্মীয়তার হক আদায় করেছি, দান সদকা করেছি।'

তার উত্তর শুনে আল্লাহ বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলেছো।' ফেরেশতারাও বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলেছো।'

এরপর আল্লাহ বলবেন, 'মানুষ তোমাকে দানশীল বলবে– এজন্য তুমি দান করেছো।'

তোমাকে তো দুনিয়াতে দানশীল বলা হয়েছে। তোমার প্রতিদান তোমাকে দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হয়েছে।'

সর্বশেষে উপস্থিত করা হবে আল্লাহর জন্য জীবন দানকারী মুজাহিদকে।

তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কেন তুমি তোমার জীবন দিয়েছো?'

সে উত্তর দেবে, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার পথে নিজের জীবন বাজি রেখে জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে গেছি।'

তার উত্তর শুনে আল্লাহ বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলেছো।'

ফেরেশতারাও বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলেছো।'

এরপর আল্লাহ বলবেন, 'তুমি তো আমার জন্য জিহাদ করোনি, বরং তোমাকে মানুষ বীরপুরুষ বলবে– এজন্য তুমি জিহাদ করেছো। আর তোমাকে তো দুনিয়াতে তা বলা হয়েছে। দুনিয়াতেই তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত প্রতিদান পেয়ে গেছো।'

হজরত আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,-এরপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দুই হাঁটুতে মৃদু আঘাত করে বলেন, 'আবূ হোরায়রা! এদের মাধ্যমেই কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম জাহান্নামের আগুন জ্বালানো হবে।'

(তিরমিযী শরীফ: ২৩০৪)

তাই প্রিয় পাঠক! আপনার অনুগ্রহ ও দান যদি হয় বিশুদ্ধ নিয়তে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাহলে সুসংবাদ গ্রহণ করুন।

আপনার সর্বোত্তম ব্যবহার, ভরণ-পোষণ, দান-খয়রাত অনুগ্রহ এবং ভালোবাসা পাওয়ার সবচেয়ে বেশি অধিকার হলো আপনার মা, বাবা-মা, স্ত্রী ও সন্তানের। এরপর আপনার নিকটাআত্মীয় ও স্বজন। এরপর তুলনামূলক দূরবর্তী আত্মীয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে।

সর্বপ্রথম তো নিজের জন্য সম্পদ ব্যয় করতে হবে। এরপর যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আপনার ওপর ন্যাস্ত, তাদের জন্য ব্যয় করুন।

অধীনস্থদের ভরণ-পোষণে অবহেলা করা গোনাহের কাজ।

অবশ্য দান ও অপচয়-অপব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য কী তা জানতে হবে।

একদিন একটি প্রাচীন পথ ধরে জনৈক লোক হেঁটে যাচ্ছিলো। পথের ধারে সে একটি পুরনো জীর্ণ-শীর্ণ বাড়ি দেখতে পেল। বাড়িটি যেকোনো মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে। ছোট্ট একটা মেয়ে পুরনো কাপড় পরিধান করে সে বাড়ির আঙ্গিনায় বসে ছিল। মেয়েটির চেহারায় অভাব-অনটনের ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছিল।

লোকটি তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কে তুমি?'

'আমি হাতেম তাইয়ের কন্যা।' সে উত্তর দিলো।

লোকটি আশ্চর্য হয়ে বললো, 'দানবীর হাতেম তাইয়ের কন্যার এ অবস্থা!' মেয়েটি বললো, 'আমার পিতার দানশীলতার কারণে আমরা আজ এ পরিণতির সম্মুখীন।'

এ জন্য দান-অনুদানে মধ্যপন্থা অবলম্বন সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا.

অর্থ ঃ (কৃপণতাবশত) আপনি আপনার হাত গ্রীবাসংলগ্ন করে রাখবেন না এবং (অপব্যয়ী হয়ে) তা একেবারে খুলে দেবেন না। তাহলে আপনি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বেন। (সূরা বনী ইসরাঈল:২৯)

দানশীল ব্যক্তি প্রশংসার যোগ্য। অপচয়কারী ভর্ৎসনার যোগ্য। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা যেমন হাতকে সংকোচন করে রাখতে নিষেধ করেছেন, তেমনি পরিপূর্ণরূপে খুলে দিতেও নিষেধ করেছেন। তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বনের আদেশ করেছেন। লাঠির মাঝখানে ধরতে হবে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে উদার ও সর্বশে'দানশীল। অন্যের কল্যাণের প্রতি লক্ষ না করে স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের চিন্তায় কখনো ব্যস্ত থাকতেন না।

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ঐ সত্তার শপথ যিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই! ক্ষুধার কারণে আমি মাটিতে পড়ে থাকতাম। অতিরিক্ত ক্ষুধার কারণে কখনো পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম।

একদিন আমি ক্ষুধার তাড়নায় মসজিদ থেকে বের হওয়ার পথে বসে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সে পথ ধরে যাচ্ছিলেন। আমি কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে তার কাছে জানতে চাইলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিলো, তিনি আমাকে সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে যাবেন। কিন্তু তিনি চলে গেলেন, আমাকে সঙ্গে নিলেন না।

একটু পর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এলেন। তাকেও একটি আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। উদ্দেশ্য ছিলো, তিনি যেন আমাকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যান। কিন্তু তিনিও চলে গেলেন। ক্ষুধার তাড়নায় আমি সেখানেই বসে থাকলাম।

সাহাবীরা সবাই তখন ক্ষুধা ও কঠিন অভাবের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। আপ্যায়ন করার মতো খাবার কারো কাছেই ছিল না।

এরপর আমার পাশ দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিক্রম করছিলেন। আমাকে দেখে তিনি মুচকি হাসলেন। আমার চেহারার দিকে তাকিয়ে আমার মনের অবস্থা তিনি বুঝতে পারলেন। তিনি আমাকে সংক্ষেপে 'আবূ হির' বলে ডাক দিলেন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়ে বললাম, 'লাব্বাইকা হে আল্লাহর রাসূল! আমি উপস্থিত।'-এরপর তিনি বললেন, 'চলো আমার সঙ্গে।'

এ বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলতে লাগলেন। আমিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছে পিছে চললাম।

তিনি ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। তার সামনে এক পেয়ালা দুধ পরিবেশন করা হলো। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'এ দুধ কোথেকে এসেছে?'

ঘরের লোকেরা বললো, 'অমুক আপনার জন্য হাদিয়া পাঠিয়েছে।'

এ কথা শুনে রাসূল আমাকে ডাকলেন। আমি বললাম, 'আমি উপস্থিত, হে আল্লাহর রাসূল!'

রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, 'সুফফার সাথিদের কাছে যাও এবং তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে দাওয়াত দিয়ে এসো।'

আহলুস সুফফা হলেন ইসলামের মেহমান। তারা ইসলাম গ্রহণ করে বাড়ি–ঘর সবকিছু ত্যাগ করে মসজিদে নববীকেই নিজেদের আবাসস্থল বানিয়ে নিয়েছেন। সংসার সম্পদের প্রতি তাদের কোনো মোহ নেই।

রাসূল ﷺ তাদেরকে ভালোবাসতেন, তাদের প্রতি খেয়াল রাখতেন। সদকা এলে তাদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন, নিজে খেতেন না। আর হাদিয়া এলে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে খেতেন।

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ-এর কথা শুনে আমার কষ্ট লাগলো। আমি চিন্তা করতে লাগলাম, এতটুকু দুধে আসহাবুস সুফফার কী হবে? আমি একাই তো এ দুধ পান করতে পারি। তাদের ডেকে নিয়ে এলে রাসূল ﷺ তো আমাকেই বলবেন তাদেরকে দুধ পান করানোর জন্য। তখন আমার ভাগে আর কতটুকু পড়বে?

কিন্তু আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের নির্দেশের সামনে আর কিছু করার অবকাশ নেই। আমি তাদেরকে ডেকে নিয়ে এলাম। তারা এসে অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে বসে পড়লেন।

রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, 'দুধের পেয়ালাটি নিয়ে সবাইকে দুধ পান করাও।'

রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ পেয়ে আমি দুধের পেয়ালাটি হাতে নিয়ে তাদের একজনকে দিলাম। সে দুধ পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে পেয়ালাটি আমার কাছে ফিরিয়ে দিলো।-এরপর আমি আরেকজনকে দিলাম। সেও দুধ পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে পেয়ালাটি আমার কাছে ফেরত দিলো।-এরপর দিলাম

আরেকজনকে, সেও পরিতৃপ্ত হয়ে আমার কাছে পেয়ালা ফেরত দিলো। সবাই পান করে পরিতৃপ্ত হলে আমি পেয়ালাটি নিয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে এলাম। রাসূল ﷺ পেয়ালাটি হাতে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন।-এরপর আমাকে 'আবূ হির!' বলে ডাক দিলেন।

আমি বললাম, 'আল্লাহর রাসূল! আমি উপস্থিত।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'এখন শুধু আমি আর তুমিই বাকি।'

আমি আরজ করলাম, 'জ্বী, আল্লাহর রাসূল! আপনি সত্য বলেছেন।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'এখন তুমি বসে পান করে নাও।'

রাসূল ﷺ-এর আদেশ পেয়ে আমি বসে পান করলাম।

তিনি আমাকে বললেন, 'আরো পান করো।'

আমি আবার পান করলাম।

এরপর আবার বললেন। আমি আবার পান করলাম।

এভাবে তিনি যতবার বললেন, আমি ততবার পান করলাম এবং পরিপূর্ণ তৃপ্ত হয়ে গেলাম।

এরপরও তিনি আমাকে বললেন, 'আরো পান করো।' আমি বললাম, 'আল্লাহর শপথ! আমার পক্ষে আর পান করা সম্ভব নয়।'

রাসূল ﷺ তখন বললেন, 'তাহলে আমাকে দাও।'

আমি রাসূল ﷺ-এর হাতে পেয়ালাটি দিলাম। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন। এরপর বিসমিল্লাহ বলে অবশিষ্ট দুধটুকু পান করে নিলেন।

(সহীহ বুখারী:৫৯৭১)

মহানুভবতার ক্ষেত্রেও মানুষের বিভিন্ন রকম নীতি থাকে।

মনে করুন, কোনো ব্যক্তির সঙ্গে আপনি হয়তো সরাসরি তেমন কোনো উদার আচরণ করেননি; উদার আচরণ করছেন তার কোনো প্রিয়জনের সঙ্গে। দেখা যাবে, সেও আপনাকে ভালোবাসছে।

একদিন আমার এক বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। একটি বাক্সে করে নিয়ে এলেন বিভিন্ন মিষ্টান্ন ও খেলনা। এতে নিশ্চয় তার অনেক টাকা

খরচ হয়েছে। তিনি এগুলো আমার হাতে দিয়ে বলেন, 'এগুলো আপনার ছেলেমেয়েদের জন্য।'

বাচ্চারা এসব উপহার পেয়ে খুব খুশী হলো। আমিও খুশী হলাম। কারণ আমি অনুভব করেছি, তিনি আমার সন্তানদের খুশি করতে চান। আর তাদের চেহারায় খুশির আভা দেখে আমারও খুশি লাগে। এ জন্য বলা হয় ছেলের হাতে কলা দিলে বুড়োর মন পাওয়া যায়।

পূর্ব যুগের একজন আলেমের ঘটনা। তিনি ছিলেন খুব দরিদ্র। তাই তার ছাত্ররা বিভিন্ন সময় তাকে নানা রকম হাদিয়া দিতো।

কেউ যখন তাকে হাদিয়া দিতো, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতেন। যতদিন হাদিয়াটি থাকতো, ততদিন তার প্রতি একটু বিশেষ মনোযোগ রাখতেন। হাদিয়াটি শেষ হয়ে গেলে আবার আগের মতো আচরণ করতেন।

তার এক ছাত্র ভাবছিলো, কী হাদিয়া দিতে পারে সে। সে চাইছিলো এমন কোনো জিনিস হাদিয়া দিতে, যার মূল্য হবে কম, কিন্তু থাকবে অনেক দিন। অনেক ভেবে সে তার উস্তাদের জন্য এক প্যাকেট লবণ হাদিয়া হিসেবে নিয়ে গেলো।

লবণ্যের মূল্যও কম; আর এক প্যাকেট শেষ হতে লাগেও অনেক দিন। কখনো কখনো তো বড় এক প্যাকেটে এক দু' বছরও কেটে যায়।

যদি আপনি আপনার কোনো প্রিয় বন্ধুকে মূল্যবান সুগন্ধি বা আপনার নাম লেখা দেয়ালঘড়ি এ দু'টির কোনো একটি হাদিয়া দিতে চান এবং কোনোটি দিলে ভালো হবে, সে বিষয়ে আমার কাছে পরামর্শ চান, তাহলে আমি বলবো, আপনি ঘড়ি হাদিয়া দিন। কেননা, তা হবে অধিক স্থায়ী, সবসময় চোখে পড়বে, আবার মূল্যও অনেক কম।

আমার এক ছাত্রকে আমার নাম লেখা একটি দেয়ালঘড়ি হাদিয়া দিয়েছিলাম।

এরপর কেটে গেছে কয়েক বছর। ইতোমধ্যে সে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করেছে।

Contents

একবার আমি আলোচনা করার উদ্দেশ্যে এক শহরে গেলাম। হঠাৎ দেখি, আমার সে ছাত্র সেখানে উপস্থিত। সে আমাকে তার বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে গেলো।

তার বাড়িতে প্রবেশ করতেই সে আমাকে ড্রয়িংরুমের ঘড়িটি দেখিয়ে বললো, 'এ ঘড়িটি আমার কাছে অনেক মূল্যবান।'

দীর্ঘ সাত বছর পরও সে ঘড়িটির কথা ভুলে নি।

ভেবে দেখুন, ঘড়িটির বাজারমূল্য তো খুবই কম, কিন্তু-এর প্রতীকী মূল্য অনেক অনেক বেশি।

দৃষ্টিভঙ্গি ...

হৃদয়রাজ্য জয় করার সুযোগ বারবার আসে না।



৭৪. কেউ যেন কষ্ট না পায়

সবাই তাকে অনেক ঘৃণা করতো। ঘৃণা করবে না কেন, কারো সাথে সে সদ্ব্যবহার করতো না। কেউ তার দুর্ব্যবহার থেকে নিরাপদ ছিলো না। আপনি তার হাত থেকে রক্ষা পেলেও জিহ্বা থেকে রক্ষা পাবেন না। আপনার উপস্থিতিতে সে আপনাকে কিছু বলতে পারলো না, তাতে কী হয়েছে আপনার অনুপস্থিতিতে সে আপনাকে কষ্ট দিতে ভুল করবে না।

এ জন্যই লোকটা ছিলো সবার কাছে ঘৃণিত। আর অস্তিত্বের কাছে জগদ্দল পাথরের চেয়েও ভারী ছিলো।

মানুষের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করলে আপনি স্বাভাবিকভাবেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবেন যে, সাধারণত যার কোনো বিষয়ে কৃতিত্ব রয়েছে এমন ব্যক্তিই দুর্বল ও অসহায়দের ওপর জুলুম করে। সবলরাই দুর্বলদেরকে কষ্ট দেয়ার সাহস দেখায়। সে তাকে হাত দিয়ে আঘাত করে, পা দিয়ে লাথি মারে। অকথ্য ভাষায় কথা বলে অপমানিত ও অপদস্থ করে। নিঃস্ব অসহায় ও দুর্বলদের জন্য সিংহের ন্যায়। কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানে সে উটপাখী!

ধনীরা গরিবদের ওপর অত্যাচার করে। সভা-সমিতিতে তাদের অপমান করে। কথার মাধ্যমে কষ্ট দেয়।

আল্লাহ যাদেরকে মান-মর্যাদা, পদ, ক্ষমতা বা আভিজাত্য দিয়েছেন তারা অসহায় দুর্বলদের সঙ্গে নির্দয় ও কঠোর আচরণ করে।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ একদিন উপস্থিত সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি বলতে পারো অসহায় ও নিঃস্ব ব্যক্তি কে?'

সাহাবীগণ বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! অসহায় ও নিঃস্ব তো সে যার টাকা পয়সা, সহায়-সম্পত্তি কিছুই নেই।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'না, বড় অসহায় ঐ ব্যক্তি, হাশরের মাঠে যে অনেক নামায, অনেক রোযা এবং অনেক সদকার সাওয়াব নিয়ে হাজির হবে। কিন্তু দেখা যাবে, কাউকে সে গালি দিয়েছে। কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। কারো সম্পদ জোরপূর্বক দখল করেছে। কাউকে হত্যা করেছে। কাউকে প্রহার করেছে।'

'এবার তাদের প্রত্যেককে তার সাওয়াবের অংশ দিয়ে দেয়া হবে। অভিযোগকারীদের একজনকে কিছু সাওয়াব দেয়া হবে। আরেকজনকে কিছু দেয়া হবে। তার অপকর্মের বদলা দেয়ার আগেই যদি তার সাওয়াব শেষ হয়ে তাহলে সে যাদেরকে কষ্ট দিয়েছে, সেই অভিযোগকারীদের গোনাহসমূহ তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে।-এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' (মুসলিম শরীফ: ৪৬৭৮)

এজন্যই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে কোনোভাবেই কষ্ট দিতেন না।

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে কখনো নিজ হাতে প্রহার করেননি। তবে শরিয়তের কোনো বিধান লঙ্ঘিত হলে ভিন্ন কথা। নির্যাতিত হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো থেকে প্রতিশোধও গ্রহণ করেননি।' (মুসলিম শরীফ:৪২৯৬)

আল্লাহর দেয়া নেয়ামত কেউ মানুষকে কষ্ট দেয়ার কাজে ব্যবহার করলে মানুষ তাদের ঘৃণা করে। আখেরাতে শাস্তি দেয়ার আগে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়াতেও শাস্তি দেন।

আমার এক বন্ধুর কথা মনে পড়ে। সে ছিলো কোরআনের হাফেজ। মুত্তাকী ও পরহেজগার মানুষ। বিভিন্ন সময় বহু লোকজন নানা রোগ নিয়ে তার কাছে আসতো। সে পবিত্র কোরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে শরীয়তসম্মত তদবির করতো। মহান আল্লাহ তার মাধ্যমে অনেক রোগীকে শেফা দিয়েছেন।

একদিন তার কাছে এক লোক এলো। লোকটার আকার অবয়বে প্রাচুর্যের ছাপ ছিলো। সে আমার বন্ধুর কাছে এসে বললো, 'শায়খ! দীর্ঘদিন যাবত আমি হাতের ব্যথায় ভুগছি। অসহ্য ব্যথায় আমার জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। রাতে ঘুমাতে পারি না। দিনের বেলায় একটু বিশ্রামও নিতে পারি না। অনেক বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েছি। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং চিকিৎসা করেছি। কিন্তু কোনো উপকার পাইনি। দিন দিন ব্যথার মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। আমার জীবন থেকে শান্তি দূর হয়ে গেছে।

'আমি একজন ব্যবসায়ী। আমার অনেক মিল ফ্যাক্টরি ও বিল্ডিং আছে। মনে হচ্ছে, আমার ওপর কোনো হিংসুকের বদ নজর পড়েছে কিংবা কোনো দুষ্ট লোক আমাকে যাদু করেছে।'

শায়খ বলেন,-এরপর আমি সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস, আয়াতুল কুরসী, সূরা ফালাক ও সূরা নাস তিলাওয়াত করে তাকে ফুঁক দিলাম। তার অবস্থার তেমন পরিবর্তন হলো না।

কিছুদিন পর সে আবার এলো। আবার সে ব্যথার কথা বললো। আমি কিছু সূরা তিলাওয়াত করে এবারও ফুঁক দিলাম। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। দিন দিন ব্যথা বেড়েই চললো।

একদিন আমি তাকে বললাম, 'ভালোভাবে চিন্তা করে দেখুন তো, আপনি কখনো কারো হক নষ্ট করেছেন কিনা? কিংবা কোনো দুর্বলের ওপর জুলুম করেছেন কিনা? হয়তো এ কারণে আপনি এ শাস্তি ভোগ করছেন। যদি এমন কিছু করেই থাকেন তাহলে দ্রুত তাওবা করুন। সম্পদের মালিককে তার হক ফিরিয়ে দিন এবং অতীত অন্যায়ের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।'

আমার কথা শুনে সে জোর গলায় বললো: না না , আমি কখনো কারো ওপরে কোনো জুলুম করিনি। কোনো মানুষের হকও আমি নষ্ট করিনি। এ কথা বলে সে চলে গেল।

দীর্ঘদিন তার সঙ্গে আমার কোনো দেখা সাক্ষাৎ হলো না। আমি মনে মনে কিছুটা লজ্জিত হলাম। ভাবলাম, লোকটা হয়তো আমার কথায় কষ্ট পেয়েছে। আমার নসিহতের কারণে হয়তো সে আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছে।

অনেকদিন পর একদিন হঠাৎ তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে আমার সঙ্গে দেখা করলো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আরে ভাই! কী খবর?'

সে বললো, 'আলহামদু লিল্লাহ! এখন আমি পুরোপুরি সুস্থ। কোনো চিকিৎসা ছাড়াই আমার হাত ভালো হয়ে গেছে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম,'কীভাবে ভালো হলো?'

সে বললো, আপনার কাছ থেকে ফিরে আপনার উপদেশ নিয়ে আমি বহু চিন্তা ভাবনা করেছি। বারবার স্মরণ করতে চেষ্টা করেছি, আমি কখনো কারো হক নষ্ট করেছি কিনা। কখনো কারো ওপর জুলুম করেছি কিনা।

হঠাৎ মনে পড়ে গেলো, বহুদিন আগে আমি একটি ভবন নির্মাণ করছিলাম। তার পাশেই একখণ্ড জমি ছিলো। জমিটিকে আমার জমির সঙ্গে মিলিয়ে বাড়ি করলে দেখতে ভালো লাগবে। আমি ভাবলাম, যে কোনো মূল্যে এ জমি আমার কিনতে হবে। জমির মালিক ছিলো একজন বিধবা মহিলা। কয়েক বছর আগে তার স্বামী মারা গেছে এবং কয়েকজন এতিম সন্তান রেখে গেছে। আমি তাকে অনুরোধ করলাম, সে যেন আমার কাছে জমিটা বিক্রি করে দেয়। কিন্তু সে বিক্রি করতে চাইলো না। মহিলা বললো, 'নগদ টাকা দিয়ে আমি কী করবো?-এর চেয়ে বরং জমিটা এভাবেই থাকুক। এতিমের সম্পদ। বড় হয়ে ওরা এটাকে কাজে লাগাতে পারবে। বিক্রি করে ফেললে টাকা শেষ হয়ে যাবে।'

তারপরও আমি তার কাছে বারবার লোক পাঠালাম জমিটা আমার কাছে বিক্রি করার জন্য। কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হলো না।

শায়খ বলেন, এবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর কী করলেন?'

সে বললো, 'এরপর আমি আমার বিশেষ কৌশলে জমিটা তার থেকে নিয়ে নিলাম।'

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কীভাবে?'

সে বললো, 'আমার হাত অনেক লম্বা। বিভিন্ন চ্যানেলের সাথে আমার রয়েছে বিশেষ সম্পর্ক। সেটাকে কাজে লাগিয়ে আমি তার জমির ওপরে বিল্ডিং নির্মাণের একটি (জাল) অনুমতিপত্র যোগার করে ফেললাম। এভাবে তার জমিটিকে আমার জমির সঙ্গে মিলিয়ে ফেললাম।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আর এতিমের মা সে বিধবা নারী তখন কী করেছিল?!'

সে বললো, 'জমি দখলের খবর শোনার পর প্রায়ই সে মহিলা জমির কাছে আসতো। কাজ বন্ধ করার জন্য শ্রমিকদের সঙ্গে চিৎকার করতো। আমার ভবনের সে শ্রমিকরা পাগল মনে করে তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতো। বস্তুত এই মহিলা নয়; বরং আমি নিজেই পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।'

অসহায় এ বিধবা নারী, নির্যাতিত এ এতিম জননী দু'হাত তুলে কাতর হয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতো। তাকে এ অবস্থায় আমি স্বচক্ষে

দেখেছি। হয়তো নিশিরাতে প্রভুর দরবারে তার ফরিয়াদ ছিলো আরো করুণ এবং আরো হৃদয়বিদারক।'

আমি বললাম, 'এটাই আপনার কষ্টের কারণ হয়েছিল।'

সে বললো, 'আপনার নসিহত শোনার পর আমি সে মহিলার খোঁজে বের হলাম। খুঁজতে খুঁজতে একদিন তার সন্ধান পেলাম। তাকে সামনে পেয়েই আমি তার কাছে কান্নাকাটি শুরু করে দিলাম। বিনয়ের সঙ্গে তার কাছে ক্ষমা চাইলাম। তাকে তার জমির বিনিময়ে অন্য একটা জমি দেয়ার প্রস্তাব করলাম। অবশেষে সে রাজি হলো। জমি গ্রহণ করে আমাকে ক্ষমা করে দিলো। এরপর আমার জন্য দোয়া করলো। আল্লাহর কসম! আল্লাহর কাছে তার হাত-তোলার সঙ্গে সঙ্গে আমি সুস্থ হয়ে গেলাম।'

এ কথাগুলো বলে ব্যবসায়ী মাথা নীচু করলো। কিছুক্ষণ পর মাথা উঠিয়ে বললো, 'সত্যি, তার দোয়ায় মহান আল্লাহর রহমতে আমি সুস্থ হয়ে গেছি। অথচ বড় বড় ডাক্তাররাও আমার কিছু করতে পারেনি।'

বড়রা বলেছেন ...

গভীর রাতে যখন তুমি গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে থাকো,

তখন কিন্তু মজলুমেরা জেগে জেগে তোমার জন্য বদদোয়া করে। আর স্রষ্টা মজলুমের দোয়া কবুল করতে বিলম্ব করেন না।



৭৫. জীবন শত্রুতার জন্য নয়

সব মানুষের আচার-আচরণ এক রকম নয়। একেক জনের আচার আচরণ একেক ধরনের। রুচি-প্রকৃতিও বিভিন্ন ধরনের।

কেউ খুব রগচটা প্রকৃতির আবার কেউ খুব শান্ত স্বভাবের। কেউ মেধাবী, কেউ মেধাহীন। কেউ শিক্ষিত, কেউ মূর্খ। কেউ সব বিষয়কে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে, আবার কেউ ছোটো-খাটো ভুলকেও অনেক বড় মনে করে। এ জন্য কবি বলেছেন, মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হলে অন্যের সীমালঙ্ঘন সহ্য করতে হবে।

অত্যাচারী নিজের অত্যাচারকে অত্যাচারই মনে করে না। নিজেকে সে ভাবে ন্যায়পরায়ণ মানুষ হিসেবে। নির্বোধ লোকটিও নিজেকে অনেক মেধাবী ভাবে। আর অপদার্থ- নিজেকে যুগের শ্রেষ্ঠদার্শনিক মনে করে।

আমার নিজের একটি ঘটনা। আমি তখন যুবক ছিলাম। অবশ্য এখনো আমি নিজেকে তেমনই মনে করি। তখন মাধ্যমিক স্তরের কোনো শ্রেণিতে পড়তাম।

আমাদের বাসায় একজন রাশভারী প্রকৃতির দুর্বহ মেহমান এলো। সে প্রাইমারী স্তরের পড়াশোনাও শেষ করেছে কিনা এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। তবে এতটুকু নিশ্চিত যে, সে লেখতে ও পড়তে পারে।

সে যখন উপস্থিত হলো, আমি তখন একটি মাসআলার সমাধান নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু মাসআলাটির কোনো উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সে আসার পর আমি তার আপ্যায়নের জন্য নাস্তা পরিবেশন করলাম। এরপর মাসআলাটির সমাধান জানতে ফোনে বারবার শায়খ আবদুল আযীয বিন বায রহ.- এর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু ফোনে তাকে পেলাম না।

মেহমান আমাকে এত ব্যস্ত দেখে জিজ্ঞেস করলো,'আপনি কার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন?'

বললাম, 'শায়খ বিন বাযের সঙ্গে।'

'কেন কী হয়েছে।' সে জানতে চাইল।

'তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ একটি মাসআলার জবাব জানতে চাচ্ছি।' আমি জবাব দিলাম। .

সঙ্গে সঙ্গে সে পূর্ণ আস্থার সঙ্গে বললো, 'সুবহানাল্লাহ! কী বলেন, আমি উপস্থিত থাকতে বিন বাযকে মাসআলা জিজ্ঞেস করছেন?'

জীবনের বাঁকে বাঁকে এমন অনেক মানুষের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হবে। তাদের এ ধরনের কষ্টদায়ক আচরণ আপনাকে সহ্য করতে হবে। আপনি তাদের সঙ্গে বিনম্র আচরণ করুন। তাদের হৃদয়ে স্থান করে নিতে চেষ্টা করুন। যথাসম্ভব চেষ্টা করুন, যেন কেউ আপনার শত্রু না হয়। সবাইকে সংশোধন করা আপনার দায়িত্ব নয়। আপনাকে এ দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়নি। স্বাভাবিকভাবে যাকে রক্ষা করতে পারেন তাকে রক্ষা করুন। অন্যদের বিষয় নিয়ে চিন্তিত বা পেরেশান হয়ে নিজেকে কষ্ট দিতে যাবেন না।

মতামত ...

জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত ও ক্ষণকালিন,

এ সংক্ষিপ্ত সময়ে শত্রুতা সৃষ্টি করার মতো সময় কোথায়?



৭৬. আপনার জিহ্বা আপনার বাদশাহ

পরস্পরে কেন ক্ষোভ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়? কেন কিছু মানুষের আচার আচরণ অন্যদের কাছে জগদ্দল পাথরের চেয়েও ভারী মনে হয়? কেন তাদেরকে অন্যরা পছন্দ করে না? কেন তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত ও সাহচর্য সবাই এড়িয়ে চলে? কেন তাদের সঙ্গে কেউ কোথাও যেতে চায় না? এমনকি যে অনুষ্ঠানে তারা আমন্ত্রিত হয়, সে অনুষ্ঠানকেও অন্যরা এড়িয়ে চলে কেন?

আমি খুব চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছি, অধিকাংশ মানুষকে এ অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার পেছনে মূল কারণ হয় তার জিহ্বা। তার অসংলগ্ন কথাবার্তা।

ভাইয়ে-ভাইয়ে ঝগড়া, স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব এবং এ জাতীয় আরো যত কিছু আছে সবকিছুর পেছনে জিহ্বার অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারকেই খুঁজে পাবেন।

আমরা চাইলে আমাদের নিজেদের চিন্তা-ভাবনা ও মনের কথাকে সুন্দরভাবে অন্যের কাছে পৌঁছাতে পারি। সুতরাং কেন আমরা অসুন্দর পদ্ধতি অবলম্বন করতে যাব?

একটি ঘটনা। এক বাদশাহ একবার স্বপ্নে দেখলেন, তার সবগুলো দাঁত পড়ে গেছে। তিনি একজন ব্যাখ্যাকারকে ডেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন।

স্বপ্ন শুনে ব্যাখ্যাকারীর চেহারার রং পাল্টে গেলো। বারবার সে নাউযুবিল্লাহ বলতে লাগলো। তার হাবভাব দেখে বাদশা ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা কী?' সে বললো, 'এখন থেকে আগামী কিছু দিনের মধ্যে আপনার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি সবাই মরে যাবে। আপনার আত্মীয়স্বজনরাও মারা যাবে। কেবল আপনি একা বেঁচে থাকবেন।'

তার এ কথা শুনে বাদশাহ চিৎকার করে উঠলেন। তিনি প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়লেন। এরপর তিনি ব্যাখ্যাকারকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে বন্দি করতে বললেন। বন্দী করার পর তাকে চাবুক মারার আদেশ দিলেন।

এরপর বাদশাহ আরেক ব্যাখ্যাকারকে ডাকলেন। স্বপ্ন শুনে তার চেহারায় আনন্দের আভা ফুটে উঠলো। সে মুচকি হেসে বললো,'বাদশাহ! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনার স্বপ্ন খুব ভালো।'

বাদশাহ খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বলো, বলো, আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা কী?' সে বললো, 'এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো, আপনি অনেক দীর্ঘ জীবন লাভ করবেন। আপনার স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন সবার চেয়ে আপনি দীর্ঘায়ু হবেন। আর আজীবন আপনি বাদশাহ থাকবেন।'

এ ব্যাখ্যা শুনে বাদশাহ খুব খুশি হলেন। তাকে বিভিন্ন উপহার-উপঢৌকন দিলেন।

একটু চিন্তা করে দেখলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, বাস্তবে ব্যাখ্যা দুটির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, প্রথম জনের উপস্থাপনরীতি ছিলো নেতিবাচক, আর দ্বিতীয় জনের উপস্থাপনরীতি ছিল ইতিবাচক।

এভাবে জিহ্বা বহুলাংশে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। জিহ্বা অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ করে।

হাদিস শরিফে আছে, 'বনী আদম সকালে যখন ঘুম থেকে ওঠে, শরীরের সকল অঙ্গ জিহ্বাকে সম্বোধন করে বলে, 'তুমি আল্লাহকে ভয় করো। আমাদের পরিচালনা তো তোমার মাধ্যমেই হয়। তুমি যদি সোজা পথে থাকো, আমরাও সোজা পথে থাকবো। আর তুমি যদি বাঁকা পথে যাও, আমরাও বাঁকা পথে যাবো।' (তিরমিযী শরীফ:২৩৩১)

এ জিহ্বাই জুমার খুতবা ও বয়ানের মূল কেন্দ্রবিন্দু। পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে জিহ্বাই মূল চালিকাশক্তির ভূমিকা পালন করে। লেনদেনের ক্ষেত্রেও মূল ভূমিকা পালন করে জিহ্বা। ঝগড়া বিবাদ নিরসন ও আত্মপক্ষ সমর্থন করার ক্ষেত্রেও জিহ্বার ভূমিকাই প্রধান। অন্যকে সহায়তা করার ক্ষেত্রেও বাকশক্তিই পালন করে মূল ভূমিকা।

আমি এ কথা বলতে চাচ্ছি না যে, কারো যদি বাকশক্তি না থাকে, তাহলে তার জীবনটাই মিছে। না, বিষয়টি এমন নয়। যোগ্যতার যতই অভাব

থাকুক; সফল হওয়ার স্বপ্ন ও উদ্যম থাকলে মানুষ যেকোনো বাধা ডিঙ্গিয়ে সফলতার শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করতে পারে।

আবূ আবদুল্লাহ নামক আমার এক বন্ধু ছিল। আমার অন্যান্য বন্ধুদের চেয়ে সে ব্যতিক্রম ছিল না। তবে ভালো কাজে সে সবার চেয়ে একধাপ এগিয়ে থাকতো। তার বিশেষ কিছু দাওয়াতী প্রোগ্রাম ও কর্মসূচী আছে। এগুলো সে তার মূল কাজের ফাঁকে ফাঁকে করতো। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে, সে মূক ও বধিরদের একটি প্রতিষ্ঠানে তাদের অনুবাদকের দায়িত্ব পালন করতো।

একদিন সে ফোনে আমাকে বললো, 'আচ্ছা! আমি যদি একদিন তোমার মসজিদে আমাদের মূক ও বধির সংস্থার দু' একজনকে বয়ান করতে নিয়ে আসি তাহলে কেমন হয়? তার কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, 'বধির ও নির্বাক মানুষ কিভাবে বয়ান করবে?

সে বললো, 'আসলেই দেখতে পারবে। আমরা আগামী রোববার আসবো।'

আমি অধীর আগ্রহে রোববারের অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অবশেষে রোববার হলো। আমি তাদের অপেক্ষায় মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। একটু পরে আবূ আবদুল্লাহ গাড়ি নিয়ে এলো। মসজিদের দরজার কাছেই গাড়ি থামলো। গাড়ি থেকে তার সঙ্গে আরো দু'জন নামলো।

একজন হেঁটে আসছিলো, আর অন্যজনকে আবূ আবদুল্লাহ হাত ধরে নিয়ে আসছিলো।

আমি প্রথম জনের দিকে তাকালাম। সে ছিলো বোবা ও বধির; শুনতে পারে না, বলতেও পারে না, তবে দেখতে পায়। দ্বিতীয় জন বোবা, বধির ও অন্ধ। শুনতে পারে না, বলতে পারে না, এমনকি দেখতেও পায় না।

আমি আমার হাত বাড়িয়ে আবূ আবদুল্লাহর সঙ্গে মোসাফাহা করলাম। আবূ আবদুল্লাহর ডান পাশে যে ছিলো সে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছিলো। আমি পরে জেনেছি, তার নাম আহমদ। আমি তার দিকে মোসাফাহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলাম।

আবূ আবদুল্লাহ হাত ধরে থাকা লোকটির দিকে ইশারা করে আমাকে বললো, 'ফায়েজকেও সালাম দাও।'

আমি বললাম, 'আসসালামু আলাইকুম, ফায়েজ!'

আবূ আবদুল্লাহ বললো, 'তুমি তার হাত ধরো। সে তোমার কথা শোনে না, তোমাকে দেখেও না। আমি আমার হাত ফায়েজের হাতে রাখলাম। সে আমার হাত ধরে ঝাকি দিলো।

সবাই একে একে সমজিদে প্রবেশ করলো। আবূ আবদুল্লাহ নামাযের পর চেয়ারে বসলো। তার ডানে আহমদ আর বামে ফায়েজ।

শ্রোতারা সবাই হতবাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। কারণ, বয়ানের মিম্বরে কোনো বধির ব্যক্তিকে দেখে তারা অভ্যস্ত নয়। আবূ আবদুল্লাহ আহমদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলো। আহমদ ইশারার ভাষায় ভাব প্রকাশ করতে লাগলো। উপস্থিত সকলে হা করে তাকিয়ে আছে। তারা কিছুই বুঝছে না। আমি ইঙ্গিতে আবূ আবদুল্লাহকে আহমদের ইশারা ভাষার মর্ম ব্যাখ্যা করতে বললাম। কারণ, তার ইশারার মর্ম বধির কিংবা বধিরদের ভাষা জানা ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ বুঝবে না।

আবূ আবদুল্লাহ লাউড স্পিকারের সামনে এসে বললো, আহমদ আপনাদেরকে তার হেদায়াত লাভের কাহিনী শোনাচ্ছে। সে বলেছে, 'আমি জন্ম থেকেই বধির। আমার শৈশব কেটেছে জেদ্দায়। পরিবারের লোকদের অবহেলার শিকার ছিলাম। তারা কেউ আমার প্রতি যত্নবান ছিল না। কেউ আমার খোঁজ-খবর নিতো না। আমি মানুষকে মসজিদে যেতে দেখতাম। কিন্তু কেন তারা মসজিদে যায়, তা বুঝতাম না!'

'আমার পিতাকে দেখতাম জায়নামায বিছিয়ে নামায পড়ছেন, রুকূ-সেজদা করছেন। আমি বুঝতাম না, তিনি কেন এমন করছেন!'

'পরিবারের কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলে তারা কোনো উত্তর দিতো না।'

এতটুকু বলে আবূ আবদুল্লাহ থেমে গেলো এবং আহমদকে পুনরায় ভাব প্রকাশ করতে ইঙ্গিত করলো।

আহমদ পুনরায় ভাব প্রকাশ করতে লাগলো। হাত দ্বারা বিভিন্ন রকম ইঙ্গিত করতে লাগলো। একটু পর তার চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে গেলো। সে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়লো।

এদিকে আবূ আবদুল্লাহ মাথা নীচু করে ফেললো। এরপর আহমদ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। মানুষ তার এ অবস্থা দেখে খুব প্রভাবিত হলো। অথচ সে কেন কাঁদছে কেউ তা জানে না। কেউ কিছু না বুঝলেও আহমদের ভাব-ভঙ্গি ও ইশারা ইঙ্গিত তাদের মধ্যে অনেক প্রভাব ফেললো। কিছুক্ষণ পর আহমদ থেমে গেলো।

আবূ অবাদুল্লাহ বললো, আহমদ এতক্ষণ আপনাদেরকে তার জীবনের মোড় পরিবর্তনের কাহিনী শোনালো। কিভাবে রাস্তায় দেখা হওয়া একজন মানুষের মাধ্যমে তার জীবন পাল্টে গেছে। কিভাবে সে মানুষটি তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাকে আল্লাহর পরিচয় দিয়েছে, নামায পড়তে শিখিয়েছে, সে কাহিনী আপনাদেরকে শুনিয়েছে। নামায শুরু করার পর থেকে দিন দিন কিভাবে সে আল্লাহর নৈকট্য লাভের অনুভূতি অর্জন করছে সে অনুভূতির কথাও সে আপনাদেরকে বলেছে, অন্ধত্বের এ কষ্টের বিনিময়ে মহা প্রতিদান লাভের দৃঢ় বিশ্বাস সে লাভ করেছে। এসবের মাধ্যমে সে লাভ করেছে ঈমানের অবর্ণনীয় স্বাদ।

এরপর আবূ আবদুল্লাহ আহমদের বদলে যাওয়া জীবনের বাকি অংশও বলে গেলো।

অধিকাংশ শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবাক বিস্ময়ে তার কথা শুনছিলো।

কিন্তু আমি ছিলাম অন্যমনস্ক!

আমি একবার তাকাচ্ছিলাম আহমদের দিকে, আরেকবার ফায়েজের দিকে। মনে মনে ভাবছিলাম, আহমদ তো অন্তত দেখতে পারে, ইশারার ভাষা বুঝতে পারে। তাই আবূ আবদুল্লাহ ইশারার সাহায্যে তার মনের ভাব বুঝতে সক্ষম হচ্ছে। কিন্তু ফায়েজ তো দেখতেও পারে না আবার শুনতেও পায় না। তার সাথে আবূ আব্দুল্লাহ কিভাবে ভাব বিনিময় করবে? আমি বারবার এ কথাই ভাবছিলাম।

আহমদ তার কথা শেষ করে চোখে জমে থাকা অশ্রু মুছতে লাগলো।

আবূ আবদুল্লাহ এবার ফায়েজের দিকে তাকালো। এরপর সে তার আঙুল দিয়ে ফায়েজের হাঁটুতে মৃদু আঘাত করলো। সঙ্গে সঙ্গে ফায়েজ তীরের মতো সোজা হয়ে বসলো।-এরপর শুরু করলো তার হৃদয়গ্রাহী 'বক্তব্য'। কিন্তু প্রিয় পাঠক! আপনি কি ভাবতে পারছেন, কীভাবে সে তার মনের ভাব প্রকাশ করেছিলো?

কোনো শব্দ উচ্চারণ করে?

না, সে তো বাকশক্তিহীন। সে তো কথা বলতে পারে না।

আকার-ইঙ্গিতে? অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে? ইশারা ভাষায়?

না, সেভাবে নয়। সে তো দৃষ্টিশক্তিহীন। ইশারায় ভাষা শেখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে তার মনের ভাব প্রকাশ করছিলো স্পর্শের মাধ্যমে!

স্পর্শই ছিলো তার মনোভাব প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম।

আবূ আবদুল্লাহ ফায়েজের সামনে তার হাত রাখলো। ফায়েজ বিভিন্নভাবে তার হাত স্পর্শ করে নিজের মনোভাব আবূ আবদুল্লাহকে বোঝাতে লাগলো।

আর আবূ আবদুল্লাহ আমাদেরকে তা শোনাতে লাগলো। কখনো একটানা পনের মিনিট পর্যন্ত আবূ আবদুল্লাহ আমাদেরকে শুনিয়ে যেতো, আর ফায়েজ নীরবে বসে থাকতো। সে বুঝতো না, অনুবাদকের কথা শেষ হয়েছে কিনা। কারণ সে শুনেও না এবং দেখেও না।

আবূ আবদুল্লাহ কথা শেষ করে ফায়েজের হাঁটুতে মৃদু আঘাত করলো। ফায়েজ আবার তার হাত উঠালো। আবূ আবদুল্লাহ ফায়েজের হাতের মাঝে তার হাত রাখলো। ফায়েজ তার হাত স্পর্শ করে তার মনের ভাব ব্যক্ত করতে লাগলো।

শ্রোতারা অবাক হয়ে একবার ফায়েজের দিকে তাকায়, আরেকবার তাকায় আবূ আবদুল্লাহর দিকে। কখনো অবাক হয়, কখনো হয় অভিভূত।

ফায়েজ উপস্থিত সবাইকে তওবার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলো।

কখনো সে তার দুই কান স্পর্শ করছিলো, কখনো জিহ্বা, আবার কখনো চোখের ওপর হাত রাখছিলো। আবূ আবদুল্লাহ বুঝিয়ে বলার আগে ফায়েজ কী বোঝাতে চাচ্ছে আমরা কিছুই বুঝলাম না।

আবূ আবদুল্লাহ আমাদেরকে জানালো, সে সবাইকে চোখ-কান ও জিহ্বাকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখতে বলছে। আমি উপস্থিত লোকদের দিকে তাকালাম। তাদের অনুভূতি বিভিন্ন রকম দেখতে পেলাম।

কেউ কেউ মৃদু স্বরে সুবহানাল্লাহ! বলছিলো। আবার কেউ পাশের জনকে কানে কানে কি যেন বলছিলো। কেউ কেউ একমনে শুনে যাচ্ছিলো।

কেউ কেউ নিরবে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছিল।

আর আমি? ভাবনার জগতে বিচরণ করতে করতে চলে গিয়েছিলাম অনেক দূরে। আমি ফায়েজ ও আহমদের যোগ্যতা এবং সামনে বসে থাকা মানুষগুলোর যোগ্যতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করছিলাম। তুলনা করছিলাম ফায়েজ ও আহমদের দ্বীনি খেদমত আর সামনে বসে থাকা মানুষগুলোর দ্বীনি খেদমতের মাঝে। এরা দ্বীনের জন্য কী করছে আর তারা কী করছে?

এই ফায়েজ একজন অন্ধ, মুক ও বধির। সে তার জীবনে দুঃখ-বেদনার যে বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে, হয়তো তা এখানে উপস্থিত সকলের জীবনের দুঃখ-বেদনার সমান হবে।

সীমাবদ্ধ যোগ্যতার একজন লোক সে, কিন্তু দ্বীনের খেদমতের জন্য সবসময় কেমন নিবেদিতপ্রাণ। নিজেকে সে ইসলামের একজন সৈনিক, একজন দাঈ হিসেবে ভাবে। সে মনে করে, প্রত্যেক গোনাহগার ও দ্বীন পালনে উদাসীন প্রতিটি ব্যক্তির ব্যাপারে সে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে।

সে তার হাত নাড়িয়ে হৃদয়ের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলছে। সে যেন বলছে,

হে নামায পরিত্যাগকারী ! আর কত দিন নামায ত্যাগ করবে?

হে হারাম বস্তুতে দৃষ্টি নিক্ষেপকারী! আর কত দিন এভাবে চলবে?

হে পাপাচারে মগ্ন ! আর কতকাল তুমি এতে লিপ্ত থাকবে?

হে হারাম ভক্ষণকারী ! তুমি কি ফিরে আসবে না ?

হে শিরক আর বিদআতে মগ্ন ! আর কতদিন তুমি এগুলোতে নিমজ্জিত থাকবে?

আর কতদিন এ নির্লজ্জতা? আর কতদিন এ উদাসিনতা? আর কতদিন চলবে খোদাদ্রোহিতা?

ইসলামের বিরুদ্ধে দুশমনদের যুদ্ধই কি যথেষ্ট নয়? ! নাকি আমরাও নামব ইসলাম ধ্বংসের যুদ্ধে?

তার অস্থির ও উদ্বিগ্ন চেহারার রং ক্ষণে ক্ষণে পাল্টে যাচ্ছিলো। হৃদয় নিংড়ে সে মানুষকে বোঝাতে চাচ্ছিলো তার মনের অব্যক্ত অনুভূতি।

তার 'বয়ান' উপস্থিত শ্রোতাদের মনে খুব প্রভাব ফেললো।

আমি তাদের কান্না ও তাসবীহ ধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম।

ফায়েজ তার 'কথা' শেষ করলো। আবূ আবদুল্লাহ তার হাত ধরে দাঁড় করালো। মানুষ তার সঙ্গে সালাম-মোসাফাহা করতে ভিড় করলো।

আমি দেখলাম, সেও মানুষকে সালাম করে চলছে। আমার মনে হলো, তার অনুভব ও উপলব্ধিতে সব মানুষ সমান। সবাইকে সে সালাম করছে। রাজা-প্রজা, নেতা-কর্মী, ধনী-গরিব সবাই তার কাছে সমান।

আমি মনে মনে বলছিলাম, 'ফায়েজ! আমাদের সমাজের সুবিধাবাদী মানুষগুলো যদি তোমার মতো হতো!

আবূ আবদুল্লাহ ফায়েজের হাত ধরে তাকে মসজিদের বাইরে নিয়ে চললো। আমি তাদের পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম। তারা গাড়ির দিকে যাচ্ছিলো। আবূ আবদুল্লাহ এবং ফায়েজ একে অপরের সাথে ভাব বিনিময় করছিল।

আহ! কত তুচ্ছ এ দুনিয়া! ফায়েজ তার জীবনে যে পরিমাণ দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছে, পৃথিবীতে কত মানুষ তার চারভাগের একভাগেরও শিকার হয়নি। অথচ তারা ফায়েজের মতো দুঃখ ও বেদনাকে জয় করতে পারেনি।

কিডনির অকার্যকারিতা, প্যারালাইসিস, হার্টের ব্লক, বিভিন্ন রকম প্রতিবন্ধকতা ও ডায়াবেটিসের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্তরা কোথায়? আহমদ ও ফায়েজের কথা চিন্তা করে কি তারা জীবনকে উপভোগ করতে পারে না?

তারা কি জীবনের বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না?

আল্লাহ যদি কোনো বান্দাকে বিপদে ফেলে পরীক্ষা করেন, আর সে বান্দার মনে অভিযোগের পরিবর্তে কৃতজ্ঞতা, সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব লাভের প্রত্যাশা থাকে তাহলে-এর চেয়ে সুন্দর আর কিছুই হতে পারে না।

সে ঘটনার পর কেটে গেছে কত দিন। কিন্তু আজও আমার চোখের সামনে ফায়েজের সে মুখচ্ছবি যেন জীবন্ত হয়ে আছে।

ফায়েজ দৃষ্টিহীন, শ্রবণ ও বাকশক্তিহীন হয়েও যদি জীবনে সফল হতে পারে, মানুষের ভালোবাসা অর্জন করতে পারে তাহলে আল্লাহ যাকে জড়তাহীন বাকশক্তি, স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তি আর স্পষ্ট শ্রবণশক্তি দিয়েছেন সে কি পারবে না জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত সয়ে এগিয়ে যেতে দূর থেকে বহুদূরে। পারবে না মানুষের হৃদয়জগতে স্থায়ী আসন গড়তে?

অতএব, এখন থেকেই চেষ্টা শুরু করুন। আপনার জিহ্বাকে ব্যবহার করে মানুষের হৃদয় জয় করুন, অর্জন করুন সবার ভালোবাসা।

বাস্তবতা ...

মানুষ এক টুকরা মাংসপিণ্ডের নাম নয় যা খেয়ে ফেলা হবে!

মানুষ নাম নয় ত্বক ও চামড়ার যাকে কাপড়ের মতো

গায়ে জড়ানো যাবে!

মানুষের বৈশিষ্ট্য তো ভাষার ব্যবহারে।

ভাষার সুন্দর ব্যবহার ছাড়া মানুষ মানুষ হয় কিভাবে?



৭৭. জিহ্বা সংযত রাখুন

'মানুষ নির্দ্বিধায় অনেক কথা বলে ফেলে। কখনো কখনো তার অজান্তে মুখ ফসকে মারাত্মক ভুল কোনো কথা বা মন্তব্য বেরিয়ে যায়। অথচ সে একে খুবই সাধারণ মনে করে। কিন্তু এই সাধারণ কথাই আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। এ সাধারণ কথার কারণে আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত তার ওপর ক্রোধ চাপিয়ে দিয়ে থাকেন।'

যারা পরিণাম চিন্তা না করে কথা বলে, তাদের সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই কঠিন ভাষায় সতর্ক করেছেন।

জিহ্বাকে সংযত না রাখলে কখনো তা মানুষকে চরম ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। জনৈক আরব কবির কাব্য দেখুন। তিনি জিহ্বাকে সাপের সঙ্গে তুলনা করে একটি বাস্তব সত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেছেন-

হে আদম সন্তান! জিহ্বাকে সংযত রেখো,

কেননা, জিহ্বা সাপের মতো বিষাক্ত।

বীরপুরুষরাও যাদের ভয়ে সদা কাঁপত,

তারা আজ জিভের দংশনে কবরে সমাহিত।

স্ত্রীর অসংযত কথার কারণে পৃথিবীতে কত দেশে কত সংসার ভেঙ্গেছে তার ইয়ত্তা নেই। সামান্য কোনো বিষয়ে মতবিরোধ হলে, স্ত্রী বারবার বলতে থাকে, 'দাও! তালাক দাও! আমি চ্যালেঞ্জ করলাম, তুমি যদি আসলে পুরুষ হয়ে থাকো তাহলে এক্ষুণি তালাক দাও। সাহস থাকলে তালাক দাও!'

স্বামী তাকে চুপ থাকতে বলে, কখনো জোর আওয়াজে, কখনো ধমকের সুরে। একপর্যায়ে বিষয়টি আরো জটিল আকার ধারণ করে, স্বামী আর ধৈর্য ধরতে পারে না। ভেঙ্গে যায় দাম্পত্যের বন্ধন। সে তালাক দিয়ে বসে। একটি মাত্র শব্দ। কিন্তু তা ধ্বংসাত্মক বোমার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক। মুহূর্তে ধ্বসিয়ে দেয় দীর্ঘ দাম্পত্যের সোনালি সৌধ। কিন্তু- এরপর কী হয়? উভয়ে সারাজীবন অনুতাপের অনলে দগ্ধ হয়। এতে কি কোনো লাভ হয়?

এ কারণেই রাসূল ﷺ রাগের সময় চুপ থাকতে বলেছেন। এ ক্ষেত্রে নীরব থাকাই নিরাপদ। কেননা, জিহ্বাকে যে সংযত রাখতে পারে না, তার জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। কবি বলেন-

পায়ের স্খলনে কারো মৃত্যু হয় না।

জিভের স্খলন হলে কেউ বাঁচে না।

কিছুদিন আগে আমি দু'টি পরিবারের মধ্যে জমি-জমা নিয়ে সৃষ্ট একটি সমস্যা নিরসনের জন্য গিয়েছিলাম। বিষয়টি নিয়ে উভয় পরিবারের মধ্যে চরম বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিলো। সে ঘটনার মূল কারণ এখন আপনাদেরকে শোনাচ্ছি।

বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন একজন বয়স্ক মানুষ। জীবনের ষাটটি বসন্ত তিনি পাড়ি দিয়ে এসেছেন। একবার তিনি কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে শিকারে বের হলেন। তারা সবাই ছিলেন প্রায় সমবয়সী। শিকারের ফাঁকে তাদের মধ্যে বিভিন্ন কথাবার্তা ও শৈশবের স্মৃতিচারণ শুরু হলো। একপর্যায়ে তারা বাপ-দাদাদের জায়গা-জমি ভিটেমাটি নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। আলোচনা চলাকালে কোনো একটি জমি প্রসঙ্গে দু'জন ব্যক্তির মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলো। একজন তা নিজের জমি বলে দাবি করছেন আর অন্যজন তার দাদার বলে দাবি করছে।

তাদের কথা কাটাকাটি তীব্র আকার ধারণ করলো। একপর্যায়ে জমির মূল মালিক শিকারের বন্দুকের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'আল্লাহর কসম! তোকে যদি আমার জমির আশেপাশে দেখি, তাহলে এটা দিয়ে তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো।'-এরপর সে বন্দুকটি হাতে নিয়ে তার প্রতিপক্ষের মাথা থেকে দু'তিন মিটার ওপরে তাক করে একটি ফাঁকা গুলি ছুঁড়লো। এরপর উভয়ে আরো উত্তেজিত হয়ে পড়লো এবং একে অন্যকে মারার উপক্রম হলো। কিন্তু তাদের সঙ্গীরা কোনো মতে তাদেরকে শান্ত করলো এবং যে যার বাড়িতে চলো গেলো।

যার দিকে লক্ষ করে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল সে ক্ষোভে সারারাত শুধু এপাশ ওপাশ করতে লাগলো। প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সে পাগলপ্রায় হয়ে গেল। সকাল হতে না হতেই সে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল।

এরপর সে ক্লাসিনকোভ নিয়ে তাকে খুঁজতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরই সে তাকে খুঁজে পেলো। সে লোকটি একটি বালিকা মাদরাসার কাছে গাড়িতে বসা ছিলো। কিছুদিন পূর্বে সে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছে। এখন সে মাদরাসার শিক্ষিকাদের যাতায়াতের গাড়ি চালায়।

অন্যান্য দিনের মতো মাদরাসার গেটের সামনে গাড়ি থামিয়ে সে শিক্ষিকাদের অপেক্ষায় গাড়িতেই বসা ছিলো। তার পাশেই ছিল আরো অনেক গাড়ি। গাড়িগুলো সব ছিল একই রঙের। আর সবগুলোই শিক্ষিকা কিংবা ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য বরাদ্দ করা।

ক্লাসিনকোভ নিয়ে লোকটি দূরে একটি গাছের পেছনের লুকিয়ে রইলো, যাতে কেউ টের না পায়। বয়সের কারণে তার দৃষ্টিশক্তি ছিলো ক্ষীণ। সে দূর থেকে অনুমান করে টার্গেট ঠিক করলো। এরপর ঠিক তার মাথা বরাবর ক্লাসিনকোভ তাক করলো এবং ট্রিগারে চাপ দিলো।

ভীষণ শব্দে গুলি বের হলো। চালকের মাথায় পরপর তিনটি গুলি বিদ্ধ হলো। পুরো ক্যাম্পাসে হইচই পড়ে গেলো। ছাত্রীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক-সেদিক ছোটাছুটি শুরু করলো। চারিদিকে মানুষের চিৎকার-ধ্বনি!

পুলিশ এসে পুরো এলাকা ঘিরে ফেললো। গুলিতে লোকটির মাথার খুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে এবং ঘটনাস্থলেই সে মারা গেছে।

এদিকে হত্যাকারী নিজেই থানায় গিয়ে হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে পুলিশ অফিসারকে বললো, 'আমিই অমুককে খুন করেছি এবং আমার মনের জ্বালা মিটিয়েছি। এখন আপনারা আমাকে হত্যা করতে পারেন, পুড়িয়ে ফেলতে পারেন কিংবা চাইলে বন্দী করেও রাখতে পারেন। আপনাদের যা ইচ্ছা করতে পারেন। এখন আমার আর কোনো আক্ষেপ নেই।'

পুলিশ অফিসার তাকে হাজতখানায় নিয়ে গেলো। থানার ওসি সরেজমিনে ঘটনাস্থল প্রত্যক্ষ করার জন্য বের হলেন। নিহত ব্যক্তির পরিচয়পত্র চেক করে জানা গেলো, নিহত ব্যক্তি ঐ লোক নয় যাকে মেরে সে তার মনের জ্বালা মিটাতে চেয়েছিলো। সে ছিল ভিন্ন গাড়ির অন্য একজন চালক। ঘটনার সঙ্গে তার ন্যূনতম সম্পর্কও নেই।

ওসি দ্রুত থানায় এলেন। যাকে সে হত্যা করেছে বলে দাবি করেছে তাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি হত্যাকারীর লকারের সামনে এসে বললনে, 'এ যে! তুমি কি একে হত্যা করতে চেয়েছিলে? গুলি তো অন্য একজনের শরীরে লেগেছে।'

তার উদ্দীষ্ট ব্যক্তিকে জীবিত দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গেলো। সে সজোরে চিৎকার করে মৃগী রোগীর মতো ছটফট করতে লাগলো। একটু পরে সে বেহুশ হয়ে গেলো। এভাবেই কয়েকদিন কেটে গেলো। এরপর তার হুশ ফিরে এলো। সে সুস্থ হলো। পরবর্তীতে বিচারে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল।

আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সত্যিই বলেছেন, 'জিহ্বার চেয়ে বেশি বন্দী থাকার প্রয়োজন আর কারো নেই।'

এক খলিফার ঘটনা আমি কখনো ভুলতে পারি না। একদিন সে তার এক বন্ধুর সঙ্গে বসে হাসি-ঠাট্টা করছিলো। সুযোগ পেয়ে শয়তান তাদের মস্তিষ্কে ঢুকে পড়লো। এরপর সে তার কাজ শুরু করে দিলো। একপর্যায়ে তারা মদ পান করলো এবং মদের নেশায় তারা মাতাল হয়ে গেলো। তাদের হুশ জ্ঞান লোপ পেলো।

এরপর তারা গাধার চেয়েও নিম্নস্তরে উপনীত হলো। এ পর্যায়ে বাদশাহ তার প্রহরীকে ডেকে বন্ধুর দিকে ইশারা করে বললো, 'একে হত্যা করো!'

খলিফার আদেশ অলজ্ঘনীয়। তাই প্রহরী তার কাছে গিয়ে তার পা ধরে টেনে নিয়ে উপুড় করে শোয়ালো। বন্ধুটি চিৎকার করে কাতর স্বরে খলীফার কাছে জীবনভিক্ষা চাচ্ছিলো।

মাতাল খলীফা বিবেক ও বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি শুধু উচ্চস্বরে হাসছিলেন আর বলছিলেন, 'একে হত্যা করো! হত্যা করো!'

প্রহরী তাকে হত্যা করে লাশটি একটি পরিত্যক্ত কূপে ফেলে দিলো।

পরদিন সকালে খলিফা তার সে বন্ধুকে ডাকতে বললেন।

প্রহরীরা বললো, 'আমরা তো তাকে হত্যা করে ফেলেছি।'

'হত্যা করে ফেলেছো?!' খলিফার চোখে রাজ্যের বিস্ময়।

'কে হত্যা করলো?'

'কেন হত্যা করলো?'

'কার নির্দেশে হত্যা করলো?'

হতবিহ্বল হয়ে খলিফা একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন।

উত্তরে তারা বললো, 'গতরাতে আপনিই তো তাকে হত্যা করতে বলেছিলেন'।

এরপর তারা খলিফাকে পুরো ঘটনা খুলে বললো।

সব শুনে খলিফা একেবারে নীরব ও নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি মাথা নিচু করে ফেললেন। বন্ধুর বিয়োগব্যথায় তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো। এরপর তিনি স্বগতোক্তি করলেন: 'কিছু কথা এমন আছে, যে কথা তার বক্তাকে বলে, 'তুমি আমাকে উচ্চারণ করো না।'

আবারও বলছি, কেবল কথাকে নিয়ন্ত্রণ না করার কারণে বহু মানুষ অন্যের কাছে ঘৃণিত হয়ে যায়। এমনকি এর মাধ্যমে অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়।

ইবনুল জাওযী রহ. বলেন, 'আশ্চর্যের বিষয় হলো কিছু মানুষ হারাম-ভক্ষণ, চুরি-ব্যাভিচার থেকে সংযত হয়ে থাকতে পারে কিন্তু নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। জিহ্বা দিয়ে মানুষের সম্মানে আঘাত করতে পারে কিন্তু জিহ্বাকে সংযত রেখে নিজের সম্মান রক্ষা করতে পারে না।'

আশ্চর্য ...

জীব-জন্তুর জিভ কত দীর্ঘ, তা সত্ত্বেও তারা কথা বলতে পারে না।

আর মানুষের জিহ্বা কত ছোট কিন্তু সে কথা না বলে থাকতে পারে না।



৭৮. হৃদয় জয়ের চাবিকাঠি

প্রশংসা হলো মানুষের হৃদয় জয় করার চাবিকাঠি। সুন্দরভাবে কথা বলতে পারার দক্ষতাসমূহের মধ্যে অন্যতম দক্ষতা হলো অন্যের ভালো দিকগুলো খুঁজে বের করা এবং প্রশংসা করতে অভ্যস্ত হওয়া। কারো ভুল-ত্রুটি সংশোধন করার ক্ষেত্রে প্রথমে এ কাজটি করতে হয়।

অভিভাবক শ্রেণির মানুষ মাত্রই নিজের অধীনস্থদের উপদেশ দিতে ও ভুল সংশোধন করার চেষ্টা করে। কিন্তু অন্যের উপদেশ সবাই গ্রহণ করে না। অহঙ্কার, ভুলকে ভুল মনে না করা কিংবা ভুলের ওপর অটল থাকার হীন মানসিকতাই-এর একমাত্র কারণ নয়; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপদেশ প্রদান ও সংশোধনের পদ্ধতিগত ভুলই-এর প্রধান কারণ হয়ে থাকে।

মনে করুন, চিকিৎসার জন্য আপনি কোনো সরকারি হাসপাতালে গিয়েছেন। অভ্যর্থনাকক্ষে দেখতে পেলেন, কাঁচঘেরা কাউন্টারের অপর প্রান্তে দায়িত্বশীল যে যুবক বসে আছে সে অন্যমনস্ক হয়ে পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে। তার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। আশেপাশে কে আসছে কে যাচ্ছে সেদিকে তার কোনো খেয়াল নেই।

এদিকে এক অন্ধ ও বয়োবৃদ্ধ লোক কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ডান হাতে ছোট্ট একটি শিশু, আর বাম হাতে প্রেসক্রিপশন ও চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র। অভ্যর্থনাকক্ষের দায়িত্বশীল তা ডাক্তারের কাছে পৌঁছে দেবে এ অপেক্ষায় সে দাঁড়িয়ে আছে।

তার পাশেই দাঁড়ানো এক বৃদ্ধ মহিলা। হাতে ধরে আছে ছোট একটি মেয়ে। মেয়েটি জ্বরে কাঁপছে। বৃদ্ধাও একই অপেক্ষায়, কখন এ যুবক তার প্রিয় দলের খবর পড়া শেষ করে তার মেয়েটিকে কোনো শিশু-বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠাবে।

এ দৃশ্য দেখে আপনার শরীরের পেশিগুলো ফুলে উঠলো। এটা অবশ্য দোষের কিছু নয়। আপনি যুবককে লক্ষ করে চিৎকার করে উঠলেন।

'এ মিয়া! আপনি কি হাসপাতালে বসে আছেন, নাকি আপনার বাসার ড্রয়িংরুমে? আপনি কি আল্লাহকে ভয় করেন না?'

'রোগীরা ব্যথায় কষ্ট করছে আর আপনি বসে বসে পত্রিকা পড়ছেন! শুধু তাই নয় আবার উদাসিনতার সাথে সিগারেটও টানছেন!'

'আপনার মতো লোকের বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়কের কাছে অভিযোগ না দিয়ে উপায় নেই। ঠিকমতো দায়িত্ব পালন না করতে পারলে চাকরি ছেড়ে চলে যান।'

এভাবে আপনি তাকে এ জাতীয় কথা একের পর বলেই চললেন।

মনে করুন, আপনি যদিও সবার সামনে তাকে উদ্দেশ্য করে জোরে জোরে বিভিন্ন কথা বলেছেন কিন্তু সে আপনার কথার কোনো উত্তর দিলো না কিংবা আপনার মতো উত্তেজিতও হলো না। অথবা আপনার কথা শুনে সে পত্রিকা রেখে দিলো এবং রোগীদেরকে ডাক্তারের কাছে পাঠাতে লাগলো।

কিন্তু বলুন, এভাবে কি আপনি সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে পেরেছেন?

কখনো নয়। বর্তমান পরিস্থিতিটুকু সামাল দিতে পারলেও আপনি সমস্যার স্থায়ী কোনো সমাধান করতে পারেননি। আজ যদিও সে আপনার কথা মেনে নিয়েছে কিন্তু আগামীকাল বা পরশু তো সে আবার এ জাতীয় কাজ করবে। তখনও কি আপনি সেখানে উপস্থিত থাকবেন?

আপনি যদি সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে চান তাহলে কিছুক্ষণের জন্য আপনার রাগটাকে হজম করুন এবং আবেগের পরিবর্তে বিবেক দিয়ে পরিস্থিতিটাকে বিবেচনা করুন। তার উদাসিনতার কারণে আপনার মনে যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে আপনি তা চাপা দিয়ে রাখুন। এরপর তার কাছে যান।

তার কাছে গিয়ে প্রথমেই আপনি সুন্দর করে হাসুন। আপনার ভেতরটা যদিও রাগে ফেটে যাচ্ছে তবুও আপনি মুচকি হাসুন। আপনার হাসিটা যদিও কিছুটা নিরস হয় তবুও আপনি হেসে বলুন, 'আসসালামু আলাইকুম!'

একটু অপেক্ষা করুন। এরপর তাকে এমন কিছু বলুন যা তাকে আপনার প্রতি মনোযোগী করবে। আপনি বলতে পারেন, 'ভাইজান! কেমন আছেন? আল্লাহ আপনার মনের সব আশা পূর্ণ করুক।'

এখন সে অবশ্যই মাথা উঠিয়ে বলবে, 'আলহামদু লিল্লাহ! ভালো আছি।'

ইতোমধ্যেই আপনি অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছেন। এ পর্যায়ে আপনি কোনো প্রশংসাসূচক বাক্য বলে তাকে আপনার আরো কাছে টেনে নিতে পারেন। আপনি বলতে পারেন, 'বাস্তবেই, আপনার মতো যোগ্য লোকদেরই হাসপাতালের অভ্যর্থনাকক্ষে কাজ করা উচিৎ!'

দেখবেন, মুহূর্তের মধ্যে তার চেহারা পাল্টে যাবে এবং সে বলে উঠবে, 'কেন?'

আপনি বলুন, 'আপনার নুরানি চেহারা দেখলে তো রোগী এমনিতেই সুস্থ হয়ে যাবে। ডাক্তারের কাছে যাওয়ার আর প্রয়োজন হবে না!'

আপনার সাহস দেখে সে অবশ্যই অবাক হবে। খুশিতে তার চেহারা আলোকিত হয়ে উঠবে। বস্তুতঃ এখন সে আপনার উপদেশ শোনার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত।

সে বলবে, 'আমি আপনার জন্য কী করতে পারি?'

তখন আপনি বলুন, 'ভাইজান! দেখুন এ বয়স্ক লোকটি এবং ঐ অসহায় বৃদ্ধ মহিলাটি কীভাবে দাঁড়িয়ে আছে। যদি তাদেরকে একটু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতেন?'

এবার সে শীঘ্রই তাদের প্রেসক্রিপশন নেবে এবং তাদেরকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে। এরপর আপনার কাজটাও নেবে।

যখন আপনার সিরিয়াল আসবে এবং সে আপনাকে আপনার কাগজপত্র দেবে তখন আপনি বলুন, 'সুবহানাল্লাহ! আপনার সঙ্গে আমার এটাই প্রথম সাক্ষাৎ। প্রথম সাক্ষাতেই আপনি আমার মনে জায়গা করে নিয়েছেন। কিভাবে এমন হলো আমি বুঝতে পারছি না।'

আল্লাহর শপথ, আপনি আমার কাছে হাজারও মানুষের চেয়ে প্রিয়।' (আর বাস্তবে আপনি সত্য বলেছেন। কেননা সে একজন মুসলমান আর একজন মুসলমান তো নিঃসন্দেহে আপনার কাছে লক্ষ লক্ষ কাফেরের চেয়ে প্রিয়।)

এ কথায় সে অনেক খুশি হবে এবং আপনার কোমল আচরণে মুগ্ধ হয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে। এরপর আপনি বলুন, 'আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। আপনি যদি রাগ না করেন তাহলে বলতে পারি।'

তখন সে অবশ্যই বলে উঠবে, 'না, না, আমি রাগ করব কেন? আপনি বলতে পারেন।'

এবার আপনি তাকে উপদেশ দিন।

'এ চাকুরির ব্যবস্থা করে আল্লাহ তাআলা আপনার ওপর অনুগ্রহ করেছেন। হাসপাতালের প্রবেশ দ্বারেই আপনি আছেন। আপনি তো অন্যদের জন্য আদর্শ। আপনি যদি রোগীদের সঙ্গে একটু কোমল আচরণ করেন, গুরুত্ব দিয়ে তাদের সহায়তা করেন তাহলে খুব ভালো হতো। হতে পারে আপনার ছোট্ট এ অনুগ্রহে সিক্ত হয়ে কোনো বৃদ্ধ সাধক বা বৃদ্ধ নারী রাতের শেষ প্রহরে আপনার নাম নিয়ে দোয়া করবে আর তার দোয়ায় আপনার জীবন সুখময় হবে।'

আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, মাথা নিচু করে সে আপনার কথা শুনতে থাকবে আর বারবার বলতে থাকবে, 'শুকরিয়া! আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।'

আপনি যাকেই সংশোধন করতে চান এ পদ্ধতি অবলম্বন করুন। কেউ নামাযে অবহেলা করে, কোনো পিতা তার কন্যাদের পর্দার ব্যাপারে শিথিলতা করে আর তার মেয়েরা অবাধে খোলামেলা চলাফেরা করে কিংবা কোনো যুবক পিতা-মাতার সঙ্গে অবাধ্য আচরণ করে, এদের সংশোধনের জন্য আপনাকে উপযুক্ত পদ্ধতি ও সুন্দর ব্যবহার অনুশীলন করতে হবে।

অন্যের সংশোধনের ক্ষেত্রে আপনি কোমল ও নরম ভাষায় বলুন। শালীন আচরণ করুন এবং তার মতামতকে সম্মান করুন। আপনি তাকে বলুন, 'আমি জানি আপনি বড়দের উপদেশ গ্রহণ করেন। এই জন্য আমি আপনাকে কিছু কথা বলছি।'

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً.

অর্থ: তোমরা রাসূলের সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাইলে-এর আগে সদকা দিবে। (সূরা মুজাদালাহ: ১২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের সংশোধনের লক্ষ্যে এমন সব পদ্ধতি ও দক্ষতা প্রয়োগ করতেন, যার ফলে তারা আল্লাহর রাসূলের উপদেশ গ্রহণ না করে পারতো না।

একবার তিনি মুআয বিন জাবালকে নামাযের পর পড়ার জন্য একটি দোয়া শেখাতে চাইলেন। তিনি মুআযকে বললেন, মুআয! শপথ আল্লাহর! আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি প্রত্যেক নামাযের পর কিছুতেই এ দোয়া পড়তে ভুল করবে না-

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে আপনাকে স্মরণ করার, আপনার কৃতজ্ঞ হওয়ার ও যথাযথভাবে আপনার ইবাদত আদায়ের তাওফিক দিন।

(সুনানে আবূ দাউদ: ১৩০১)

বলুন তো, হাদীসের শেষ অংশ 'তুমি প্রত্যেক নামাযের পর কিছুতেই এ দোয়া পড়তে ভুল করবে না' এর সঙ্গে কথার প্রথম অংশ 'শপথ আল্লাহর! আমি তোমাকে ভালোবাসি' এর কী সম্পর্ক? 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' এ কথা বলার পর তো যথাযথ ছিল এ জাতীয় কথা বলা যে, 'আমি তোমার কাছে আমার মেয়ে বিয়ে দিতে চাই; কিংবা 'তোমাকে কিছু টাকা পয়সা দিতে চাই' অথবা 'তোমাকে খাবারের দাওয়াত দিতে চাই'। কিন্তু এসব কিছু না বলে 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' বলার পর দোয়ার কথা কেন বললেন? কিংবা বলা যায়, দোয়ার কথা বলার আগে ভালোবাসার কথা কেন বললেন? এতে চিন্তার খোরাক রয়েছে।

গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়, 'শপথ আল্লাহর! আমি তোমাকে ভালোবাসি' এ কথা বলে রাসূল ﷺ শ্রোতাকে সাগ্রহে উপদেশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করলেন। 'শপথ আল্লাহর! আমি তোমাকে ভালোবাসি' এ কথা শোনার পর যখন শ্রোতার মনে খুশির ঢেউ খেলে গেল তখন তিনি তাকে উপদেশ দিলেন।

এ জাতীয় আরেকটি ঘটনা। রাসূল ﷺ ডান হাতে আবদুল্লাহ বিন মাসউদের ডান হাত ধরলেন। এরপর আবেগের সাথে তার ডান হাতের

ওপর নিজের বাম হাত রাখলেন। তারপর বললেন, 'আবদুল্লাহ, তাশাহহুদের বৈঠকে এ দোয়া পড়বে-

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ...

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ তা মুখস্থ করলেন। এর কয়েক বছর পর রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করেন।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ সবসময় গর্ব করে বলতেন, 'আমাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন তাশাহহুদ শিখিয়েছিলেন তখন আমার হাতের তালু তার উভয় হাতের তালুর মাঝে ছিলো।

আরেকদিন রাসূল ﷺ লক্ষ করলেন যে, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ভীড়ের মধ্যে কা'বা শরিফ তাওয়াফ করেন তখন, কখনো কখনো হাজারে আসওয়াদে চুমু খাওয়ার জন্য অন্যদের ধাক্কা দেন। ওমর ছিলেন শক্ত-পুষ্ট শরীরের অধিকারী। অনেক সময় দুর্বলদের শরীরেও তার ধাক্কা লাগতো।

হুজুর ﷺ তাকে এ বিষয়ে সতর্ক করতে চাইলেন। প্রথমে তিনি ওমরের মনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত বললেন, 'ওমর! তুমি তো অনেক শক্তিশালী পুরুষ।' রাসূল ﷺ-এর প্রশংসা শুনে ওমর অত্যন্ত খুশি হলেন।

এরপর রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি হাজরে আসওয়াদের কাছে ধাক্কা-ধাক্কি করবে না।'

একবার রাসূল আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের উপদেশ দিতে চাইলেন। তাই তিনি বললেন, 'আবদুল্লাহ তো অনেক ভালো মানুষ। সে যদি তাহাজ্জুদ নামায পড়তো তাহলে তো আরো ভালো হতো!' (সহীহ বুখারী: ১০৫৪)

আরেক বর্ণনামতে রাসূল বলেন, 'আবদুল্লাহ! তুমি অমুকের মতো হয়ো না। সে আগে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতো কিন্তু তা এখন ছেড়ে দিয়েছে।'

(সহীহ বুখারী: ১০৮৪)

হুজুর ﷺ সকল মানুষের সঙ্গে বিশেষ করে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে- এ চমৎকার পদ্ধতি অবলম্বন করতেন।

নবুওয়াতের শুরু যুগের ঘটনা। অনেকে রাসূলের দাওয়াত কবুল করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছেন। আবার কেউ কেউ ফিরে যাচ্ছে। মদীনায় সুআইদ বিন সামিত নামে একজন ব্যক্তি ছিলো। সে ছিলো জ্ঞানী, কবি এবং নিজ গোত্রের অন্যতম সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। জ্ঞানীজনদের অনেক বাণী ও উক্তি তার মুখস্থ ছিলো। কথিত আছে, সে দার্শনিক লোকমান হাকিম থেকে বর্ণিত সকল উক্তি মুখস্থ করে ফেলেছিল। লোকেরা তার জ্ঞান-গরিমা, কাব্য-প্রতিভা ও বংশ-মর্যাদায় মুগ্ধ হয়ে তাকে 'কামেল' উপাধি দিয়েছিল।

নীচের প্রজ্ঞাপূর্ণ পংক্তিমালা তারই রচিত-

'যাকে তুমি অতি আপন, পরম বন্ধু মানো,
পেছনে তোমার বলছে যে কী তার কিছু কি জানো?
সামনে তোমার মধুর ভাষণ, পেছনে দোষচর্চা,
সুযোগ পেলে তব শত্রুর সাথে, গড়ে তোলে সে মোর্চা।
বক্ষে তাহার কুটিলতা, ঠোঁটের কোনে হাসি
দেখলে তোমায় জড়িয়ে ধরে বলবে 'ভালোবাসি'।
অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যদি তাকাও তাহার দিকে
দেখবে তুমি দিব্য চোখে সবই তাহার ফিঁকে।
ভালো মানুষের ভান ধরেছে বুকের মাঝে গরল
এ দুনিয়া বড় জটিল, যদিও ভাবো সরল।'

একবার সে হজ্ব কিংবা ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় এলো। মক্কার লোকেরা তার সংবাদ পেয়ে তাকে দেখতে এলো। হুজুর ﷺ ও জানতে পেরে তার সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তাকে তাওহীদ-রিসালাতের কথা বললেন। তাকে আরো জানালেন যে, তিনিই প্রতিশ্রুত সে নবী যার ওপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এ কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। এতে রয়েছে অনেক সদুপদেশ ও জীবনবিধান।

সুআইদ বললো, 'আপনার কাছে যা আছে, তার মতো জ্ঞানগর্ভ বাণীসমগ্র আমার কাছেও আছে।' হুজুর ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কাছে কী আছে?'

সে বললো, 'লোকমান হাকিমের সারগর্ভ বাণীসমগ্র!'

সে যদিও মানুষের কথাকে আল্লাহর কালামের সঙ্গে তুলনা করেছে তবুও হুজুর ﷺ তাকে কিছু বলেননি। তিনি তার সাথে ভদ্রতাপূর্ণ আচরণ করে বললেন, 'আমাকে তা শোনান তো।'

সুআইদ লোকমান (আ.)-এর হেকমতপূর্ণ বাণীসমগ্র শোনাতে লাগলো, আর হুজুর ﷺ মনোযোগসহ শুনতে লাগলেন। যখন তার কথা শেষ হলো, হুজুর ﷺ তাকে বললেন, 'নিঃসন্দেহে এগুলো অনেক সুন্দর ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা।'

এরপর রাসূল তার মনে আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য বললেন, 'আমার কাছে যা আছে তা-এর চেয়েও প্রজ্ঞাপূর্ণ ও মূল্যবান। এগুলো আল্লাহ তাআলা আমার ওপর অবতীর্ণ করেছেন। কুরআন মানবতার স্থায়ী দিকনির্দেশনা ও সঠিক পথের আলোকবর্তিকা।'

এরপর তিনি তাকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনালেন এবং ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সুআইদ মনোযোগসহ নিরবে শুনলো।

রাসূল ﷺ-এর আচার-আচরণ ও কুরআনি আকর্ষণে সুআইদ অত্যন্ত প্রভাবিত হলো। সে বললো, 'নিঃসন্দেহে এগুলো অতি উত্তম বাণী।'

এরপর সে মদীনায় চলে গেল। কিন্তু সে যা শুনলো-এর দ্বারা সে প্রভাবিত হলো। কিন্তু তার মদীনায় ফেরার কিছুদিন পরেই আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হলো। সে ছিলো আওস গোত্রের। খাজরাজ গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করলো।

এটা হিজরতের পূর্বের ঘটনা। সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো কিনা, তা জানা যায়নি। তবে তার গোত্রের লোকেরা বলতো, 'আমাদের ধারণা সে মুসলমান অবস্থায়ই মারা গেছে।'

এক কথায়....

অন্যের প্রশংসায় হোন উচ্চকণ্ঠ
আর সমালোচনায় হোন ভারসাম্যপূর্ণ।



৭৯. ভালোবাসার ব্যাংক ব্যালান্স

আমাদের আচার-আচরণের ওপর ভিত্তি করেই অন্যদের মানসপটে আমাদের মনোছবি ও ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে।

মনে করুন, বাজারে কারো সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হলো আর সে ভ্রু-কুঞ্চিত করে আপনার দিকে তাকালো। পরে তার সঙ্গে সবজির দোকানে দেখা হলো। সেখানেও সে ভ্রু-কুঞ্চিত করে আপনার দিকে তাকালো। এরপর সাক্ষাৎ হলো কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে। সেখানেও সে মলিন চেহারায় আপনার দিকে তাকালো।

আপনি নিশ্চয় আপনার মানসপটে তার একটি মলিন ছবি এঁকে রাখবেন। পরবর্তীতে যখনই তার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হবে কিংবা কখনো তার নাম শুনবেন, তখনই আপনার মানসপটে তার সে ভ্রু-কুঞ্চিত মলিন চেহারা ভেসে উঠবে।

এমন নয় কি? অবশ্যই।

পক্ষান্তরে জনৈক ব্যক্তি প্রথম দেখাতেই আপনার সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করলো। পরের সাক্ষাতেও সে আপনাকে দেখে একটু মুচকি হাসলো। এরপর আরেকদিন দেখা হওয়া মাত্রই হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় আপনার কাছে এগিয়ে এলো। আপনার সাথে যখনই তার সাক্ষাত হয় তখনই তার ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসির রেখা ফুটে ওঠে। এখন বলুন তো আপনার স্মৃতিপটে তার কেমন ছবি অঙ্কিত হবে? অবশ্যই হাস্যোজ্জ্বল ও প্রিয়দর্শন ছবি। পরবর্তীতে যখনই তার কথা আপনার স্মরণ হবে, তখন তার সে হাস্যোজ্জ্বল ছবিটা আপনার স্মৃতিপটে ভেসে উঠবে।

এভাবে একজন মানুষের আচার-আচরণের কারণে তার যে ছবি হৃদয়ে অঙ্কিত হয় পরবর্তীতে তার সে ছবিই আমাদের মনের ক্যানভাসে মূর্ত হয়ে ওঠে।

যাদের সঙ্গে আমাদের সাময়িক সম্পর্ক কিংবা ক্ষণিকের সাক্ষাৎ ঘটে তাদের ক্ষেত্রে বিষয়টিতো এমনই হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যাদের সঙ্গে আমাদের সবসময় সাক্ষাৎ হয়; যেমন স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, সহপাঠি বা অফিসের সহকর্মী, এলাকার প্রতিবেশী তাদের সঙ্গে আচরণ নিশ্চয়

সবসময় একরকম হয় না। কখনো তারা আমাদেরকে মুচকি হাসতে দেখে আবার কখনো দেখে রাগান্বিত অবস্থায়। কখনো ভ্রু-কুঞ্চিত অবস্থায় যেমন দেখে তেমনি কখনো হয়তো ঝগড়া করতে কিংবা গালি দিতেও দেখে। কেননা, আমরা তো মানুষ। মানবীকতার উর্দ্ধে উঠা তো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ কারণে আমাদের আচরণের ভালো-মন্দের মাত্রা অনুযায়ী তাদের অন্তরে আমার অবস্থান তৈরি হয়ে থাকে। আমার আচার-আচরণ যত বেশি ভালো হবে, আমার প্রতি তাদের মনোভাব ততই সুন্দর হবে।

মনে করেন, আপনি অন্যদের হৃদয়ের ব্যাংকে একটি হিসাব খুলেছেন। আপনার প্রতিটি ভালো ব্যবহার সে অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স বৃদ্ধি করতে থাকবে। অনুরূপভাবে আপনার প্রতিটি অসদাচরণ সে অ্যাকাউন্টে আপনার প্রতি তার ভালোবাসার ব্যালেন্স কমিয়ে দিতে থাকবে।

যদি তার হৃদয় অ্যাকাউন্টে আপনার প্রতি ভালোবাসার ব্যলেন্স পরিমাণে পর্যাপ্ত হয় এবং ঘটনাক্রমে কোনোদিন আপনার পক্ষ থেকে অশোভনীয় কোনো আচরণ প্রকাশ পেয়ে যায়, তবুও তা তেমন প্রভাব ফেলবে না। কারণ তার হৃদয় অ্যাকাউন্টে আপনার অ্যামাউন্ট অনেক বেশি পরিমাণে জমা আছে।

কবির ভাষায়-

'তোমার প্রিয় বন্ধু যদি হঠাৎ কোনো ভুল করে বসে, তাহলে তার সদাচরণগুলো হাজার হাজার সুপারিশকারীরূপে তোমার সামনে হাজির হবে।'

পক্ষান্তরে তার হৃদয় অ্যাকাউন্টে আপনার ভালোবাসার অ্যামাউন্ট যদি অল্প পরিমাণে থাকে, তাহলে ছোট কোনো অশোভনীয় আচরণের কারণেও ভালোবাসার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে। আপনার প্রতি তার হৃদয়ে ঘৃণা জন্ম নিতে পারে কিংবা আপনাকে তার কাছে ভারী মনে হতে পারে।

তালাকপ্রাপ্ত কোনো মহিলাকে তালাকের কারণ জিজ্ঞেস করুন। সে বলবে, 'একেবারেই তুচ্ছ কারণে আমাকে তালাক দিয়েছে। সে আমাকে তার সঙ্গে তার বোনের বাড়িতে বেড়াতে যেতে বলেছিলো। আমি রাজি না হওয়াতে সে রেগে যায় এবং গালমন্দ করতে থাকে। একপর্যায়ে সে আমাকে তালাক দিয়ে দেয়।'

আপনি যদি একটু বিচক্ষণতার সঙ্গে ভাবেন তাহলে বুঝতে পারবেন, এই তুচ্ছ বিষয়টি তালাকের কারণ হতে পারে না। এ তো সে খড়ের শেষ আঁটিটির ভারে উটের কোমর ভেঙ্গে যাওয়ার গল্পের মত অসার অজুহাত।

কথিত আছে, জনৈক ব্যক্তির হৃষ্টপুষ্ট একটি উট ছিলো। একবার সে সফরে বের হওয়ার ইচ্ছা করলো। সে তার সফরের যাবতীয় আসবাবপত্র উটের পিঠে উঠিয়ে বাঁধতে লাগলো। লোকটি একের পর এক বোঝা উটটির পিঠে চাপাতে লাগলো। এভাবে তার পিঠে প্রায় চারটি উটের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হলো। বোঝার ভারে উটটি বারবার কেঁপে উঠছিলো। উপস্থিত লোকেরা বারবার তাকে সতর্ক করে বলতে লাগলো, 'যা উঠিয়েছো, তাই ঢের বেশি। আর কোনো কিছু দিয়ো না।'

কিন্তু সে কারো কথা শুনলো না। সে খড়ের ছোট্ট একটি আঁটি উটের পিঠে চাপিয়ে বললো, 'এটিই শেষ, এটা বেশ হালকা'! খড়ের আঁটিটি রাখতে না রাখতেই উটটি ধপাস করে মাটির ওপর পড়ে গেলো। এই ঘটনা পরবর্তীতে প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে 'খড়ের ছোট্ট আঁটি উটের কোমর ভেঙ্গে ফেলেছে!'

বিষয়টি নিয়ে একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন, খড়ের আঁটিটি এখানে উপলক্ষ মাত্র। খড়ের আঁটিটি মূলত উটের কোমর ভাঙ্গেনি; বরং বড় বড় বোঝার ভারই তার কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। বোঝা ওঠানোর শুরু থেকেই উটটি ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। একসময় যখন তার সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে তখন সামান্য জিনিসের ভারেই তার কোমর ভেঙ্গে গেছে।

তালাকপ্রাপ্ত মহিলাটির অবস্থাও অনুরূপ। আমি তো পূর্ণ আস্থার সঙ্গে বলতে পারি, শুধু স্বামীর সঙ্গে বোনের বাড়িতে যেতে অস্বীকার করাই তালাকের মূল কারণ নয়; বরং পূর্বের কৃত আরো অনেক অন্যায় ও অবাধ্যতা পুঞ্জীভূত হয়েছিল। যেমন

স্বামীর আদেশ অমান্য করা ...

তার ইচ্ছা পূরণ না করা ...

তার সঙ্গে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ না করা ...

অহঙ্কার প্রকাশ করা ...

তার মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা না জানানো ইত্যাদি।

নিয়মিত এ জাতীয় আচরণের কারণে স্বামীর হৃদয় অ্যাকাউন্টে তার প্রতি স্বামীর ভালোবাসা ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়েছে। অধিকন্তু সুন্দর আচরণের মাধ্যমে নতুন কিছু যোগ হয়নি। আহত হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে কিন্তু ভালোবাসার মলম লাগানো হয়নি।

স্বামী ধৈর্য ধরে সব কিছু সহ্য করছিলো। অবশেষে যখন সহ্যের সীমা পার হয়ে গেছে তখন সামান্য বিষয়ই তালাকের কারণ হয়ে গেছে এবং 'খড়ের ছোট্ট আঁটিতে উটের কোমর ভেঙ্গে গেছে।'

স্ত্রী যদি ভালো আচরণের এ্যামাউন্ট স্বামীর হৃদয়ের একাউন্টে জমা করতো। স্বামীর সাথে হৃদ্যতা ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করতো, মনভুলানো গল্প করতো, স্বামীর পানাহার ও পোশাক পরিচ্ছদের প্রতি যত্নবান হতো এবং তার মতামতকে শ্রদ্ধা জানাতো তাহলে স্বামীর হৃদয় অ্যাকাউন্টে স্ত্রীর প্রতি ভালো লাগার ব্যালান্স অনেক বেশি জমা হতো। পরবর্তীতে ঘটনাক্রমে যদি সে স্বামীর বোনের বাড়িতে যেতে অস্বীকারও করতো, তাতে তেমন কিছু ঘটতো না। তার এ একটি দোষ বহু গুণের সাগরে ডুবে যেতো।

একই কথা ঐ দুষ্ট ছাত্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যার সামান্য কোনো অপরাধে শিক্ষক অত্যন্ত রাগান্বিত হয়েছেন এবং তাকে মেরে শ্রেণিকক্ষ থেকে বের করে দিয়েছেন। আর সে অভিযোগ করে বলেছে, 'আমার অমুক সহপাঠী তো আমার চেয়েও বড় অপরাধ করেছিল। কিন্তু স্যার তো তাকে কিছুই বলেননি। আর আমি তেমন কিছুই করলাম না। অনুমতি ছাড়া একটি ধাঁধাঁ বললাম আর অমনি আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।'

তার 'সামান্য' এ অপরাধ তো ঐ খড়ের ছোট্ট আঁটির মতো যা উটের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। এতোদিন সে স্যারের হৃদয়ে কেবল কষ্টের ক্ষতই তৈরি করছে, কোনো প্রতিষেধক দেয়নি।

পরস্পর ঝগড়ারত সহপাঠীদ্বয় কিংবা পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত প্রতিবেশীদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

তাই আমাদের সকলের উচিত যার সঙ্গেই আমার সাক্ষাৎ হয়, তার হৃদয়ের অ্যাকাউন্টে যেন কিছু অ্যামাউন্ট জমা রাখি। স্বামীকে স্ত্রীর অন্তরে কিছু জমা রাখার সুযোগ খুঁজতে হবে আর স্ত্রীরও উচিৎ স্বামীর অন্তরে সদাচরণ জমা রাখার চেষ্টা করা। সন্তানেরও উচিৎ পিতার হৃদয়ের একাউন্টে ভালো কিছু জমা রাখা। শিক্ষকেরও উচিৎ ছাত্রদের মনের হিসাবে কিছু জমা রাখা। ভাই-ভাই এমনকি পরিচালক ও অধীনস্থ কর্মচারী সবারই এ বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা উচিৎ।

সংক্ষেপে ...

'তোমার প্রিয় বন্ধু যদি হঠাৎ কোনো ভুল করে বসে,
তাহলে তার সদাচরণগুলোহাজার হাজার
সুপারিশকারীরূপে তোমার সামনে হাজির হবে।'



৮০. কথার যাদুকর হোন

'কথা বলতে তো কোনো পয়সা লাগে না। তাই মিষ্টি কথা বলুন।'

এমন শব্দেই জনৈক স্ত্রী তার স্বামীকে তিরস্কার করছিলো। স্বামী তার স্ত্রীর উপাদেয় অন্ন, রুচিশীল বস্ত্র ও সুন্দর বাসস্থান দিতে কোনো ত্রুটি করেনি ঠিক; কিন্তু সে স্ত্রীকে মিষ্টি কথা বলে কখনো মুগ্ধ করেনি।

মিষ্টি কথা দিয়ে ক্রেতাকে মুগ্ধ করা একজন দক্ষ সেলসম্যান ও বিক্রেতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিক্রেতার কথা যত সুন্দর হবে তার মূল্য ততই বেশি হবে। আর সুন্দর ব্যবহারের সঙ্গে যদি পণ্যের গুণগত মানও ভালো হয় এবং ক্রেতাকে সন্তুষ্ট করার পারদর্শিতাও থাকে তাহলে তো বলাই বাহুল্য। একেই তো বলে 'সোনায় সোহাগা'।

অভিজ্ঞজনদের মত হলো, একজন প্রাইভেট সেক্রেটারির যেসব গুণ থাকা উচিত সেসবের অন্যতম হচ্ছে– আকর্ষণীয় উপস্থাপনা ও মিষ্টি ভাষা। মানুষ যেন তার কথা শুনেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সে কথায় কথায় বলবে: 'জ্বি স্যার, ঠিক আছে। আপনার জন্য আর কী করতে পারি? আমরা তো আপনার সেবায় নিয়োজিত ইত্যাদি।

অনেক সময় দেখা যায়, স্বামী যেমন কৃপণ, তেমন অসুন্দর। তারপরও স্ত্রী তার প্রতি সন্তুষ্ট, বরং বলা যায় আসক্ত। কারণ, স্বামী কথার যাদু দিয়ে তাকে মুগ্ধ করে রেখেছে।

কৈশোরের গণ্ডি এখনো পার হয়নি এমন এক যুবকের কথা আমি জানি। সে সুন্দরী তরুণীদের সঙ্গে খুব চুটিয়ে প্রেম করতে দক্ষ ছিল। মেয়েদের আকৃষ্ট করার মতো আশ্চর্য ক্ষমতা ছিলো তার। কত তরুণী যে তার প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছে তার হিসাব নেই। আশ্চর্যের বিষয় হলো, মেয়েদেরকে প্রলোভন দেখানোর মতো ছেলেটির কাছে অত্যাধুনিক কোনো গাড়ি ছিল না। পছন্দসই উপহার দেয়ার মতো মানিব্যাগ ভর্তি টাকাও ছিল না। এমনকি রাজপুত্রের মতো আকর্ষনীয় চেহারাও ছিল না। কিন্তু তার ছিলো কথাবলার এক আশ্চর্য ক্ষমতা। এমন মধুর কথা সে বলতে পারতো যা শুনলে পাথরও গলে যেতো।

কথার যাদু দিয়ে সে তরুণীদের শিকার করতো। তরুণীরা তার পিছে ঘুরঘুর করতো।

সিরাত ও ইতিহাসের পাতা উল্টালে একটি আশ্চর্য ঘটনা পাওয়া যায়।

একবার রাসূল ﷺ-এর দরবারে তিনজন ব্যক্তি উপস্থিত হলো। কায়েস বিন আসেম, যাবারকান বিন বদর ও আমর বিন আহতাম। তিনজনই বনু তামীম গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

তারা প্রত্যেকেই রাসূল ﷺ-এর সামনে নিজের প্রশংসা করতে লাগলো।

প্রথমে যাবারকান বললো, 'আল্লাহর রাসূল! আমি বনু তামীম গোত্রের সরদার। বনু তামিমে আমি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী। আমি তাদের অধিকার রক্ষায় সচেতন।'

এটুকু বলে সে আমর বিন আহতামের দিকে ইশারা করে বললো, 'এ আমর আমার সম্পর্কে অনেক কিছু জানে।'

আমরও তার কথার সমর্থন করে বললো, 'সত্যিই হে আল্লাহর রাসূল! ইনি অনেক প্রভাবশালী। অনেক ক্ষমতাবান। সভা-সমিতিতে সবাই তার সিদ্ধান্ত একবাক্যে মেনে নেয়।'

এটুকু বলেই আমর ক্ষ্যান্ত হলো। প্রশংসায় সে অতিরঞ্জন করলো না। যাবারকান আমরের মুখ থেকে আরো কিছু শোনার আশা করছিলো। আমরের সুসংক্ষিপ্ত মন্তব্য তাকে ক্ষুব্ধ করলো। তার মনে হলো, আমর সম্ভবত তার নেতৃত্ব সহ্য করতে পারছে না। এ কারণে সে হিংসার বশবর্তী হয়ে প্রশংসার ক্ষেত্রে এত কৃপণতা করেছে!

তাই সে সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমর আমার ব্যাপারে হিংসার বশবর্তী হয়ে সে অনেক কিছু গোপন করেছে।'

এ কথা শুনে আমরও খুব রেগে গেলো। সে বললো, 'আমি আপনার প্রতি হিংসা করব কেন?! আল্লাহর শপথ! হে যাবারকান, তুমি তোমার বোন ও তাদের সন্তানদের সাথে নির্মম আচরণকারী, নতুন ধনী, এক নির্বোধ পিতার সন্তান ও কবিলার পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্টকারী।'

এরপর আমর রাসূল ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বললো, 'আল্লাহর রাসূল! আমি শুরুতে যা বলেছি, তাও সত্য; এখন যা বলেছি, তাও অসত্য নয়।

তবে আমার স্বভাব হলো– কাউকে ভালো লাগলে তার ভালো গুণগুলো বলে বেড়াই। আর কেউ আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করলে তার দোষ ত্রুটি গোপন রাখি না।'

রাসূল ﷺ তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বর্ণনার দৃঢ়তা ও ভাষার সৌকর্যে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'কিছু কিছু কথা যাদুর মতো প্রভাবশালী।'

(মুসতাদরাকে হাকিম:৬৬৪৫)

তাই প্রিয় পাঠক! আপনিও হোন প্রিয়ভাষী, মিষ্টিভাষী ও সুবচনা।।

কেউ এসে যদি আপনাকে বলে, 'ভাই! আমাকে একটা কলম দিন।' আপনি তাকে আন্তরিকতার সঙ্গে হাসিমুখে বলুন, 'জ্বী ভাই! নিন।'

কেউ যদি আপনাকে বলে, 'ভাই, আমার একটা কাজ আছে, করে দিবেন?' তাহলে আপনি বলুন, 'অবশ্যই, অবশ্যই! বলুন, আপনার জন্য আমি কী করতে পারি।' 'আপনি তো অনেক বড় মানুষ। আপনার পায়ের সমানও নয় এমন কত মানুষের কাজ করে দিয়েছি।'

মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তান, বন্ধু-বান্ধব সবার সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ ও কোমল ভাষায় কথা বলুন। এতে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না; বরং অন্যরা মুগ্ধ হবে, তাদের মনে দ্বিধা বা সংশয় থাকলে তা দূর হবে।

হুনাইন যুদ্ধের পর আনসারদের অবস্থা লক্ষ করুন।

আনসাররা রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে থেকে প্রতিটি জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। জিহাদের প্রতিটি আহ্বানে হাসিমুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। বদরপ্রান্তরে জীবনবাজি রেখে লড়াই করেছেন। ওহুদ প্রান্তরে কঠিন পরিস্থিতিতেও রণক্ষেত্রে টিকে ছিলেন। খন্দক যুদ্ধে শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়েও হতাশ হননি। মক্কাবিজয়ের অভিযানেও তারা ছিলেন সবার আগে। মক্কাবিজয়ের পর মুসলমানরা হুনাইন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

বুখারী ও মুসলিমের ভাষ্যে বর্ণিত সে যুদ্ধের একটি ঘটনা।

সামরিক কলাকৌশল ও অস্ত্র-শস্ত্রের দিক থেকে প্রতিপক্ষ ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী। শুরুতেই যুদ্ধ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করলো। শত্রুবাহিনীর আকস্মিক ও কৌশলী আক্রমণে মুসলিমবাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলো এবং

রাসূল ﷺ-কে নিঃসঙ্গ রেখে পেছনে ফিরে গেলো। মুসলমানদের পরাজয় প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেল।

রাসূল ﷺ সাহাবীদের দিকে তাকালেন। তার চোখের সামনে দিয়েই সকলে দৌড়ে পালাচ্ছে! রাসূল ﷺ উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ দিলেন, 'হে আনসারগণ!'

রাসূলের আহবানে সকলে 'লাব্বাইক' বলে সাড়া দিলেন। সাথে সাথে ফিরে এলেন। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন রাসূল ﷺ-এর সামনে। শত্রুবাহিনীর প্রতিটি আঘাত ফিরিয়ে দিলেন ততোধিক আঘাতে। রাসূল ﷺ-এর জন্য নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিলেন।

এবার কাফেররা পালাতে লাগলো। মুসলমানরা বিজয়ী হলেন।

যুদ্ধশেষে রাসূল ﷺ-এর সামনে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ একত্র করা হলো। আনসাররা নীরবে তাকিয়ে থাকলেন। তাদের কারো কারো স্মৃতির এ্যালবামে ভেসে উঠলো মদীনায় রেখে আসা ক্ষুধার্ত পরিবার ও সন্তানদের মুখচ্ছবি। অনেকে এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে পরিবারের অভাব দূর হওয়ার মতো অংশ পাওয়ার আশা করছিলেন।

এমন সময় রাসূল ﷺ আকরা ইবনে হাবিস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ডাকলেন। তিনি কিছুদিন আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। রাসূল ﷺ তাকে একশত উট দিয়ে দিলেন। এরপর আবূ সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ডেকে তাকেও একশত উট দিয়ে দিলেন।

এভাবে রাসূল ﷺ মক্কাবাসীদের মাঝে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করতে লাগলেন।

অথচ তারা ইসলামের জন্য আনসারদের ন্যায় ত্যাগ স্বীকার করেনি। আনসারদের ন্যায় জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েনি। এ তো কিছুদিন আগে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে।

আনসাররা সম্পদবণ্টনের এ অবস্থা দেখে পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন, 'আল্লাহ তার রাসূলকে ক্ষমা করুন! তিনি আমাদের রেখে

কোরাইশদের মাঝে গনীমতের মাল বণ্টন করছেন। অথচ আমাদের তরবারি থেকে এখনো তাদের রক্ত ঝরছে!'

এ অবস্থা দেখে আনসারদের সরদার সাদ ইবনে উবাদা রাসূল ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! কিছু আনসারি সাহাবী যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের পদ্ধতি দেখে মনে কষ্ট পেয়েছে।'

রাসূল ﷺ আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'কেন?! তারা কেন কষ্ট পেয়েছে?!'

সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আপনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিজ সম্প্রদায়ের মাঝে বণ্টন করেছেন। আরব গোত্রগুলোকে অনেক সম্পদ দিয়েছেন। অথচ আনসাররা সেখান থেকে কোনো অংশ পায়নি। এটাই তাদের মনোকষ্টের কারণ।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'সাদ! এ বিষয়ে তোমার অবস্থান কী?'

তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো আমার গোত্রেরই একজন।'

রাসূল ﷺ অনুভব করলেন, বিষয়টির সমাধানে এমন একটি পদ্ধতি প্রয়োজন, যাতে আনসারি সাহাবীদের অর্থ-সমস্যার সমাধান না হলেও মনের কষ্ট দূর হয়ে যাবে।

রাসূল ﷺ সাদকে বললেন,'তোমার গোত্রের লোকদের সমবেত হতে বলো।'

সকলে সমবেত হলে রাসূল ﷺ উপস্থিত হলেন। তিনি প্রথমে আল্লাহ তাআলার হামদ পাঠ করলেন। এরপর বললেন, 'হে আনসারগণ! তোমাদের কিছু কথা আমার কানে এসেছে?'

উপস্থিত আনসারী সাহাবীগণ বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আমাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা কিছুই বলেননি। অল্প বয়সের কয়েকজন যুবক বলে ফেলেছে।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'হে আনসারগণ! তোমরা কি পথহারা ছিলে না? আল্লাহ কি আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন?'

তারা জবাবে বললো: 'অবশ্যই! আমাদের ওপর সকল অনুগ্রহ অনুদান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের।'

'তোমরা কি পরস্পরে শত্রুতা পোষণ করতে না?-এরপর আল্লাহ কি তোমাদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করেন নি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। আমাদের ওপর আল্লাহ ও তার রাসূলের দয়া ও অনুগ্রহ সীমাহীন।'

এরপর রাসূল ﷺ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। পুরো মজলিস জুড়ে সবাই নীরব। রাসূল অপেক্ষা করছেন। অন্যরাও অপেক্ষা করছে।

নীরবতা ভেদ করে রাসূল ﷺ বলে উঠলেন, 'হে আনসারগণ! তোমরা কি আমাকে উত্তর দেবে না?'

আনসারী সাহাবীরা বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আমরা কী উত্তর দেবো? যাবতীয় দয়া ও অনুদান তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেরই।'

রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম! তোমরা ইচ্ছা করলে অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত কিছু বলতে পারতে। যা বলতে, সত্যই বলতে এবং সবাই তা সত্য বলে মেনে নিতো।

তোমরা বলতে পারতে, 'মক্কাবাসী আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পর আপনি আমাদের কাছে এসেছিলেন। আমরাই তখন আপনাকে সত্যায়ন করেছি। আপনি উদ্বাস্তু অবস্থায় এসেছিলেন, আমরা আপনাকে স্থান দিয়েছি। আপনি বিতাড়িত ছিলেন, আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। আপনি নিঃস্ব ছিলেন, আমরা সহমর্মিতা দেখিয়েছি।'

এরপর রাসূল ﷺ তাদের অনুভূতিকে জাগিয়ে তুললেন। তিনি বললেন, 'হে আনসারগণ! তোমরা পার্থিব তুচ্ছ সম্পদের জন্য আল্লাহর রাসূলের ওপর মনঃক্ষুণ্ন হয়েছো? আমি তো এ সম্পদ দিয়ে একটি কওমকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছি। আর তোমাদেরকে তোমাদের ইসলামের কাছে সোপর্দ করেছি। তোমরা জানো, কোরাইশরা এই তো কিছুদিন আগেও ছিলো মুর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। আমি শুধু চেয়েছি তাদেরকে ইসলামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে এবং তাদের অন্তঃকরণে ইসলামের প্রতি মায়া মমতা সৃষ্টি করতে।'

'হে আনসারগণ! তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তারা উট-বকরি নিয়ে বাড়ি ফিরবে, আর তোমরা বাড়ি ফিরবে আল্লাহর রাসূলকে সঙ্গে নিয়ে?!'

'শুনে রেখো, আমি তোমাদেরকে ভালোবাসি। তাই যদি সবাই এক গিরিপথ বা উপত্যাকায় চলে আর আনসাররা চলে অন্য গিরিপথ বা উপত্যকায়, তাহলে আমি অবশ্যই আনসারদের গিরিপথ বা উপত্যাকায় চলবো।'

'সে সত্তার শপথ, যার কুদরিত হাতে মুহাম্মদের জান! হিজরতের ফয়সালা না হয়ে থাকলে আমি আনসারি হওয়াকেই প্রাধান্য দিতাম।'

'হে আল্লাহ! আপনি আনসারদের প্রতি রহম করুন। আনসারদের সন্তানদের প্রতি দয়া করুন। তাদের পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিও দয়া করুন।'

রাসূলের মর্মস্পর্শী বয়ানে সকলের হৃদয় বিগলিত হলো, নয়ন অশ্রুসজল হলো। আবেগজড়িত কান্নায় তাদের দাড়ি সিক্ত হলো।

আনসারী সাহাবীরা বলতে লাগলেন, 'আল্লাহর রাসূলকে পেয়ে আমরা সন্তুষ্ট, আমরা আনন্দিত।'

আল্লাহু আকবার! সত্যি মুগ্ধ হওয়ার মতো কথা! কী চমৎকার ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা! বরং ভাষার মাধুর্য দিয়ে কখনও কখনও মানুষকে সম্মোহিত ও অনুভূতিশূন্যও করে ফেলা যায়।

কথিত আছে, অনেক দিন পূর্বে মিশরে একজন জমিদার বাস করতো। প্রভাবশালী এ ব্যক্তিটি 'পাশা' নামে মানুষের কাছে পরিচিত ছিলো। সে অনেক ফসলি জমির মালিক ছিলো। এ কারণে সে বেশ অহঙ্কার করতো। গরিব চাষীদেরকে সে অবজ্ঞা করতো। তাদেরকে নানাভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতো।

যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে একবার সে দুর্যোগের শিকার হলো এবং জমিজমা সব হারিয়ে নিঃস্ব ও দরিদ্র হয়ে গেলো। ঘরে কোনো খাবার না থাকায় তার সন্তানরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিন কাটাতে লাগলো। ফসলি জমি ছাড়া তার আয়ের অন্য কোনো উৎসও ছিলো না। সে নিজেও চাষাবাদ ছাড়া অন্য কোনো কাজ কর্ম জানতো না। কিন্তু তার সমস্ত জমি তো হাতছাড়া হয়ে গেছে! নিরুপায় হয়ে সে কাজের তালাশে বের হলো।

অত্যন্ত দীনতা ও হীনতার সঙ্গে কাজ খুঁজতে লাগলো। প্রথম একজনের কাছে গিয়ে সে বললো, 'আপনার কাছে কোনো কাজ আছে? গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করা, শস্যদানা মাড়াই ও পরিষ্কার করা, আগাছা পরিষ্কার করা, অথবা অন্য যে কোনো কাজের কথা বলুন, আমি করতে রাজি আছি।'

এ কৃষক একসময় ঐ সাবেক জমিদারের লাঞ্ছনার শিকার হয়েছিলো। তাই সে পাশার কথায় উত্তেজিত হয়ে বললো, 'আমি কাজ করাবো তোমাকে দিয়ে! আর লোক নেই? তুমিই তো সে অহঙ্কারী জমিদার! আল্লাহর লাখো শোকর! তিনি আমাদের দোয়া কবুল করে তোমাকে লাঞ্ছিত করেছেন।'

এসব বলে সে তাকে বাগান থেকে তাড়িয়ে দিলো।

হতাশ মনে ভারী পাদুটো টানতে টানতে সে আরেকটি বাগানে প্রবেশ করলো। তার সাথে এ বাগানের মালিকেরও আছে কষ্টদায়ক স্মৃতি। তাই সেও প্রথম কৃষকের মতো তাকে তাড়িয়ে দিলো।

পাশা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। কিন্তু সে শূন্য হাতে সন্তানদের কাছে ফিরে যেতেও প্রস্তুত নয়। তাই সে নিজের ভাগ্যকে আরেকবার যাচাই করতে অনেক আশা নিয়ে তৃতীয় আরেক চাষীর বাগানে গেলো। চাষী তাকে দেখে যারপরনাই অবাক হলো। এ চাষীও একসময় পাশার হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিলো।

পাশা চাষীকে খুব মিনতি করে বললো, 'আমি একটি কাজ খুঁজছি। আমার সন্তানেরা ক্ষুধার্ত। বাসায় খাবার বলতে কিছু নেই।'

চাষী তাকে কৌশলে লাঞ্ছিত করতে এবং প্রতিশোধ নিতে মনে মনে পরিকল্পনা করলো। তাকে সম্বোধন করে বললো, 'আসুন পাশা সাহেব! স্বাগতম আপনাকে। আপনার আগমনে আমার বাগান আজ ধন্য! আজ আমার চেয়ে বড় সৌভাগ্যবান আর কে আছে! মহান পাশা আমার বাগানে এসেছেন! আপনি বড় মহান! আপনি অভিজাত ও মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ!' এভাবে চাষী কথার যাদুতে পাশাকে সম্মোহিত করে ফেললো।

কিছুক্ষণ পর চাষী বললো, 'আপনাকে স্বাগতম পাশা! আপনি একবারে ঠিক সময়ে এসেছেন। আমার কাছে একটা কাজ আছে। কিন্তু কাজটা আপনার উপযোগী হয় কিনা ...?'

পাশা জিজ্ঞেস করলো, 'কি কাজ'?

চাষী বললো, 'আমি জমিতে হালচাষ করবো। লাঙল টানতে তো দুটি ষাঁড় লাগে। আমার দুটি ষাঁড়ও আছে। একটা সাদা, আরেকটা কালো। ঘটনাক্রমে কালো ষাঁড়টা আজ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সাদা ষাঁড়টা তো একা একা লাঙল টানতে পারবে না। আমি চাচ্ছিলাম, আপনি যদি কালো ষাঁড়টার দায়িত্ব পালন করতেন! আপনি তো শক্তিশালী পুরুষ। উপরন্তু আপনি নেতা মানুষ, সবসময় সামনে থাকার লোক। সামনে তো আপনাকে ভালো মানায়!'

পাশা লাঙ্গল টানার জন্য সাদা ষাঁড়টার পাশে দাঁড়িয়ে গেলো! চাষী এসে সর্বপ্রথম সাদা ষাঁড়টাকে রশি দিয়ে বাঁধলো। এরপর পাশাকেও লাঙলের সঙ্গে বাঁধলো। এ সময় চাষী বারবার বলছিল: 'বাহ! চমৎকার পাশা! শক্তিতে–বীরত্বে, সৌন্দর্যে আপনার সমকক্ষ আর কে আছে!'

পাশাও ঘাড় ফিরিয়ে এদিক–সেদিক তাকাতে লাগলো!

অবশেষে তার কাঁধে রশি বাঁধা হলো। চাষীও মইয়ের ওপর চড়ে বসলো। তার হাতে ছিলো একটি চাবুক। সে হাল-চালনাতে আওয়াজ দিলো।- এরপর চাষী একটু পরপর ষাঁড়ের পিঠে চাবুক দিয়ে আঘাত করলো। পাশাও চলতে শুরু করলো। চাষী বারবার বলতে লাগলো, 'বাহ পাশা! চমৎকার পাশা! অভিনব পাশা!'

এভাবে সে ষাঁড়ের পিঠে আঘাত করতে লাগলো আর বলতে লাগলো, 'আপনি তো বেশ শক্তিশালী পাশা ভাই! আপনি তো খুব কর্মঠ ও কাজের লোক!'

বেচারা পাশা এসব কাজে কখনও অভ্যস্ত ছিলো না। তবু সে কষ্ট করে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাল টানলো।

কাজ শেষে চাষী তার বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে বললো, 'আল্লাহর শপথ! আপনার কাজ খুবই চমৎকার হয়েছে। আমার জীবনে এত সুন্দর দিন আর কখনো আসেনি।'

এরপর চাষী তাকে কিছু নগদ অর্থ দিয়ে বিদায় দিলো। পাশাও বাড়ির পথ ধরলো।

পাশা বাড়িতে সন্তানদের কাছে ফিরে এলো। তার উভয় কাঁধ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। পায়ের তালু ফেটে রক্ত ঝরছিলো। ঘামে ভিজতে ভিজতে কাপড়-চোপড় বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তখনও সে সম্মোহিত, চাষীর প্রশংসায় ব্যস্ত!

তার সন্তানরা তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'বাবা! কোনো কাজ পেয়েছো?'

সে গর্বভরে উত্তর দিলো, 'আরে আমি পাশা! আমি কোনো কাজ পাবো না!'

'কী কাজ করছো, বাবা?'

'কী কাজ করেছি? ... কী কাজ করেছি?... ।'

এতক্ষণে সে তার চেতনা ফিরে পেলো। অবশেষে সে অনুভব করতে পারলো, সারাদিন সে কী কাজ করেছে!

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর সে বললো, 'আমি ষাঁড় হিসেবে কাজ করেছি'!

সিদ্ধান্ত ...

সবচেয়ে প্রিয় কথাটি বাছাই করুন, যেমন ফল কেনার সময়
সবচেয়ে ভালো ফলটি বেছে নেন।



৮১. মানুষের আশা পূরণ করতে না পারলেও কথা দিয়ে মুগ্ধ করুন

বিপদগ্রস্ত কোনো ব্যক্তি আপনার কাছে সাহায্যের আশায় এসে বিফল হয়ে ফিরে যাওয়ার চেয়ে কষ্টের মুহূর্ত মনে হয় আর নেই।

মানুষের প্রয়োজন পূরণ করতে পারা অনেক বড় পূণ্যের কাজ। এ বিষয়ে যদি আর কোনো ফজিলতের ঘোষণা নাও থাকতো, তবু আমার মনে হয় নিচের হাদিসটি ফজিলত হিসেবে যথেষ্ট হতো।

নবী কারীম ﷺ বলেছেন, 'আমার এ মসজিদে বসে একমাস ইতেকাফ করার চেয়ে কোনো ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করতে যাওয়া বেশি পছন্দনীয়।'

কিন্তু মানুষের এমন কিছু প্রয়োজনও থাকে, যা পূরণ করা সম্ভব নয়। মনে করুন, যারা আপনার কাছে ঋণ চায়, তাদের সবাইকে ঋণ দেয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়।

যারা সফরে বের হওয়ার সময় আপনাকে সফরসঙ্গী হিসেবে পেতে চায়, তাদের সবার ডাকেও আপনি সাড়া দিতে পারবেন না। কেউ কোনো প্রয়োজনে আপনার কাছে ছোটখাটো কিছু চাইতে পারে, যেমন আপনার কলম, ঘড়ি অথবা অন্য কিছু, আপনি সবার প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম নাও হতে পারেন।

কিন্তু সমস্যা হলো, অধিকাংশ মানুষের স্বভাব হচ্ছে– যদি আপনি তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে না পারেন তাহলে তারা মনে কষ্ট পায়। পরিস্থিতি বুঝতে চেষ্টা করে না। মানুষের কাছে আপনার সমালোচনা করে, কখনো কৃপণ বলে অপবাদ দেয়, কখনো অহংকারী বলে।

এ সমস্যার সমাধান কী? এ ক্ষেত্রে আপনার করণীয় কী?

এ জাতীয় পরিস্থিতি থেকে আপনাকে দক্ষতার সঙ্গে বেরিয়ে আসতে হবে। কেউ যদি কখনো আপনার কাছে কিছু চায় আর আপনি তার প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম না হন তাহলে প্রথমে কোমল ভাষায় আপনার অপরাগতার কথা তাকে জানান।

কবি যেমন বলেছেন-

'তোমার কাছে দেয়ার মতো কোনো বাহন কিংবা সম্পদ নেই তাতে কী হয়েছে। মিষ্টি ভাষা তো আছে। তা দিয়েই প্রার্থীকে সন্তুষ্ট করে দাও।'

মনে করুন, কোনো ব্যক্তি জানতে পারলো আপনি নির্দিষ্ট এক শহরে সফরে যাচ্ছেন। এটা শুনে সে এসে বললো, 'আপনি যেখানে যাচ্ছেন সেখান থেকে আমার জন্য এ জিনিসটা কিনে আনবেন।' যে কোনো কারণে আপনি তার কাজটি করতে ইচ্ছুক নন। তখন আপনি নিজের অপরাগতার কথা তাকে কীভাবে জানাবেন?

আপনি তাকে সাহায্য করতে না পারেন, কমপক্ষে কথা দিয়ে তাকে খুশি করুন।

তাকে বলুন, 'ভাইজান! আমি আপনার কোনো সেবা করতে পারলে আন্তরিকভাবে খুশি হবো। কারণ, আপনি আমার কাছে বহু মানুষের চেয়ে প্রিয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কাজের চাপ ও সময়ের সংকীর্ণতার কারণে আপনার জিনিসটা আনা মনে হয় সম্ভব হবে না।'

অথবা মনে করুন, কেউ আপনাকে বিয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষে দাওয়াত করলো, আর আপনি তার কাছে অপারগতা প্রকাশ করতে চাচ্ছেন। কিন্তু আপনার ভয় হচ্ছে, ওজর পেশ করলে তিনি মনোক্ষুণ্ন হবেন। তাহলে অপারগতা পেশ করার আগে ভূমিকাস্বরূপ কিছু বলুন। আপনি এভাবে বলতে পারেন, 'ভাই! আমি তোমাকে নিজের ভাইয়ের মতো মনে করি। আর আমার হৃদয়ে আপনার মর্যাদা অনেক বেশি। কিন্তু কী করবো, আমি তো সে রাতে জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকবো।'

বিশেষ কোনো ব্যস্ততা থাকলে তো ভালো। তবে বিশেষ কোনো ব্যস্ততা না থাকলেও বাস্তবেও আপনি মিথ্যা বলেননি। কেননা, সে রাতে তো আপনি ব্যস্তই থাকবেন। হয়তো সে ব্যস্ততা হতে পারে ছেলেমেয়েদেরকে সময় দেয়া, অথবা কোনো বই পড়া কিংবা ঘুমানো!-এর সবগুলোই তো ব্যস্ততা।

আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের হৃদয়রাজ্য জয় করে নিতেন উত্তম চরিত্র দিয়ে।

নীচের ঘটনাটি-এর একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত।

একদিন রাসূল ﷺ সাহাবীদের সঙ্গে বসে কাবাঘর সম্পর্কে কথা বলছিলেন। ওমরাহ এবং ইহরামের ফজিলত বর্ণনা করছিলেন। রাসূল ﷺ-এর আলোচনা শুনে বাইতুল্লাহ জিয়ারতের আকাঙ্ক্ষায় সবাই উদ্বেলিত হলো।

রাসূল ﷺ সবাইকে সফরের প্রস্তুতি নিতে বললেন। সফরে প্রতিযোগিতার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করলেন। অল্প সময়ে সবাই নিজ নিজ প্রস্তুতি সম্পন্ন করলো।

রাসূল ﷺ চৌদ্দশ' সাহাবীর এক কাফেলা নিয়ে ওমরার এহরাম বেঁধে তালবিয়া পড়তে পড়তে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। মক্কার পর্বতসমূহের কাছে পৌঁছার পর রাসূল ﷺ-এর উটনী 'কাসওয়া' হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। রাসূল ﷺ তাকে উঠাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু উট সামনে চললো না। লোকজন বলাবলি করতে লাগলো, 'কাসওয়া অবাধ্য হয়ে গেছে!'

রাসূল ﷺ বললেন, 'না, সে অবাধ্য হয়নি। অবাধ্যতা তার স্বভাবও নয়। তবে 'হস্তিবাহিনীর গতিরোধকারী' (আল্লাহ তাআলা) তাকে আটকে রেখেছেন।'

(অর্থাৎ আবরাহার হাতি যখন বাইতুল্লাহ ধ্বংসের উদ্দেশ্যে এসেছিলো, আল্লাহ তাকে আটকে দিয়েছিলেন।)

এরপর রাসূল ﷺ বললেন, 'কসম সে সত্তার যার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ! যদি তারা আমার কাছে এমন কোনো ভূখণ্ড চায় যেখানে তারা আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়িত করবে, যেখানে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করবে তাহলে তাদের এমন ভূখণ্ড দিয়ে দিতে একটুও বিলম্ব করবো না। এর বিপরীতে কেউ যদি কোনো ভূখণ্ডে আল্লাহর নাফরমানি করে, তাহলে আমি কিছুতেই তাদের হাতে সেটা ছেড়ে দেব না।'

এরপর রাসূল ﷺ ধমক দিতেই উটনিটি লাফিয়ে উঠলো। রাসূল ﷺ সাহাবীদের নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন।

মক্কার কাছাকাছি হোদাইবীয়া নামক স্থানে পৌঁছে মুসলমানরা অবস্থান নিলেন। মক্কার কাফেরদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছতেই তাদের গোত্র প্রধানরা এ কাফেলাকে বাধা দেয়ার জন্য বের হলো। মুসলমানদের পক্ষ থেকে জানানো হলো, আমরা শুধু ওমরার জন্যই মক্কায় প্রবেশ করতে চাই।

উভয় দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে অনেক আলোচনা চললো।

সবশেষে কোরাইশদের পক্ষ থেকে সুহাইল বিন আমর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে এই মর্মে সন্ধিচুক্তি করলো যে, মুসলমানরা এ বছর মদীনায় ফিরে যাবে এবং আগামি বছর ওমরা করবে।

এরপর সন্ধির ধারাসমূহ লেখা হলো।

সুহাইল শর্তারোপ করলো, মক্কার কোনো দুর্বল মুসলমান যদি মদিনায় চলে যায়, তাহলে তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু যদি কোনো মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করে মদিনা থেকে মক্কায় চলে আসে, তাহলে তাকে মদিনায় ফেরত দেয়া হবে না।

এটা শুনে মুসলমানরা বললো, 'সুবহানাল্লাহ! এ কেমন শর্ত! কোনো মুসলমান আমাদের কাছে আসলে আমরা তাকে কাফেরদের কাছে ফিরিয়ে দেবো! কীভাবে আমরা তাকে ফিরিয়ে দেবো, অথচ সে মুসলমান হয়ে আমাদের কাছে এসেছে!'

এ আলোচনা চলাকালেই শৃঙ্খলাবদ্ধ জনৈক যুবক উত্তপ্ত বালুর ওপর পা টেনে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে এলেন। তিনি চিৎকার করে 'ইয়া রাসূলাল্লাহ!' 'ইয়া রাসূলাল্লাহ!' বলে ডাকলেন। সাহাবীরা তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন সে সুহাইলের পুত্র আবূ জানদাল। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে তার পিতা তার ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে তাকে শেকল দিয়ে বেধে রেখেছে।

মুসলমানদের আগমনের কথা শুনে তিনি বন্দীদশা থেকে পালিয়ে পায়ে শেকল নিয়ে চলে এসেছেন। তার শরীরের বিভিন্ন ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছিলো আর চোখ বেয়ে পড়ছিলো বেদনার তপ্ত অশ্রু। আবূ জানদাল তার ভেঙ্গে পড়া শরীর নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে ঢলে পড়লেন। মুলমানরা তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

সুহাইল তাকে দেখে উত্তেজিত হয়ে বললো, 'এ যুবক কীভাবে বন্দীদশা থেকে পালিয়ে এলো!'-এরপর সে চিৎকার করে বলে উঠলো, 'মুহাম্মদ! এ যুবক প্রথম বন্দী, যাকে সন্ধির শর্ত অনুযায়ী আমার কাছে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'আমরা তো এখনো সন্ধিচুক্তিতে স্বাক্ষর করিনি ... ।'

সুহাইল বললো,'আল্লাহর কসম! তাহলে আমরা তোমার সঙ্গে কোনো চুক্তিই করবো না।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'আবূ জানদালের ব্যাপারে অনুমতি দাও।'

সুহাইল উত্তর দিলো, 'না, আমি অনুমতি দিতে পারব না।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমার তো এ অধিকার আছে।'

সে উত্তর দিলো, 'থাকলেও আমি করবো না।'

তার এ উত্তর শুনে রাসূল ﷺ নীরব হয়ে গেলেন।

রাসূল ﷺ কোরাইশদেরকে ইসলামের নিকটবর্তী করতে যথাসম্ভব চেষ্টা করছিলেন। একজন মুসলমানের জন্য তিনি পুরো সন্ধিচুক্তিকে ভেঙ্গে দিতে চাচ্ছিলেন না।

এদিকে সুহাইল তার ছেলের শেকল ধরে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগলো। আর আবূ জানদাল চিৎকার করে মুসলমানদের সাহায্য চাইতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন, 'হে মুসলিম ভাইয়েরা! মুসলমান হওয়ার পরও আমাকে মুশরিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে! তোমরা কি আমার কষ্ট উপলব্ধি করতে পারছো না? তোমরা কি আমার শরীরে অত্যাচারের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছো না?' এভাবে সাহায্য চাইতে চাইতে একসময় তিনি দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেলেন।

বেদনাবিধুর এ দৃশ্য দেখে সাহাবীদের অন্তর গলে যাচ্ছিলো। তারা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না।

টগবগে এক যুবক। মাত্র যৌবনে পা রেখেছে। এ সময় তাকে ভোগ করতে হচ্ছে কী নির্মম ও বর্বর শাস্তি! আনন্দময় জীবনের পরিবর্তে সে পোহাচ্ছে কঠিন যন্ত্রণা! সে তো মক্কার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ও নেতৃস্থানীয় লোকের ছেলে। তার জীবন কত সুখের ছিল। আনন্দ আর

উচ্ছলতায় কেটেছে তার বাধনহারার শৈশব আর দূরন্ত কৈশোর। চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে ছিল না কোনো ফারাক। অথচ আজ মুসলমানদের সামনে থেকে তাকে শেকল ধরে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নির্মম শাস্তির অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। অজানা গন্তব্যে। শত শত মুসলমান এখানে উপস্থিত। তারা কিছুই করতে পারছেন না। আবূ জানদাল একা মক্কায় থেকে গেলেন এবং আল্লাহর কাছে শিরক থেকে মুক্ত থাকার এবং দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করার তাওফিক চাইতে লাগলেন।

মুলমানগণ রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে মদিনায় ফিরে এলেন। অন্তরে তাদের অত্যাচারী কাফেরদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা আর ক্রোধ। অসহায় দুর্বল মুসলমানদের জন্য উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা।

এদিকে মক্কায় দুর্বল মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেলো। এক সময় তা চলে গেলো ধৈর্যসীমার বাইরে।

আবূ জানদাল, তার সঙ্গী আবূ বাসির এবং মক্কায় অবস্থিত দুর্বল মুসলমানরা বন্দীদশা থেকে পলায়ন করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। একপর্যায়ে আবূ বাসির চেষ্টায় সক্ষম হলেন। তিনি কালবিলম্ব না করে মদীনার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। রাসূল ﷺ ও তার সঙ্গীদের সান্নিধ্যলাভের আশায় সে ব্যাকুল হয়ে গেছে। তাদেরকে একনজর দেখার জন্য সে উদগ্রীব হয়ে আছে। তাদের আকর্ষণে সে ছুটে চলছে-মরুর বুক চিরে। আশায় বুক বেঁধে।

মরুর সফরের কষ্ট-ক্লেশ অতিক্রম পর অবশেষে তিনি মদীনায় পৌঁছলেন। মদীনায় পৌঁছে দ্রুত ছুটে চললেন মসজিদে নববীর উদ্দেশে।

সাহাবীদের নিয়ে রাসূল ﷺ তখন মসজিদে বসে ছিলেন। আবূ বাসীর মসজিদে প্রবেশ করলেন। শরীরজুড়ে তার নির্যাতনের চিহ্ন, দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি; জীর্ণ-শীর্ণ কাপড় ধুলোমলিন অবয়ব আর এলোমেলো চুল।

আবূ বাসির মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে এখনো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারেননি,-এরই মধ্যে কোরাইশ কাফেরদের দু'জন প্রতিনিধি এসে উপস্থিত। তারাও এসে মসজিদে ঢুকলো। আবূ বাসীর তাদের দেখে ভয়ে কেঁপে উঠলেন। মুহূর্তে তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো অমানুষিক নির্যাতনের সে করুণ দৃশ্য।

মসজিদে ঢুকেই লোকদু'টি চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'মুহাম্মদ! সন্ধিচুক্তির ধারা অনুযায়ী তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দাও।'

'মক্কা থেকে কোনো মুসলমান মদিনায় এলে তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দিতে হবে'। কাফেরদের সঙ্গে সন্ধির এ শর্তের কথা রাসূল ﷺ-এর মনে পড়লো। তিনি আবূ বাসীরকে মদীনা থেকে বেরিয়ে যেতে ইঙ্গিত করলেন। আবূ বাসীর তাদের সঙ্গে বের হয়ে গেলেন।

মদিনার সীমানা অতিক্রম করে বাইরে এসে এক জায়গায় তারা পানাহারের জন্য কিছুক্ষণ নামলো। একজন আবূ বাসীরের কাছে থাকলো, আর অন্যজন একটু দূরে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলো।

আবূ বাসীরের কাছের লোকটি তার তরবারি বের করে নাড়াচাড়া করছিলো, আর আবূ বাসীরকে বিদ্রূপ করে বলছিলো, 'আমি এ তরবারি দিয়ে আওস ও খাযরাজের বিরুদ্ধে একদিন যুদ্ধ করবো।'

আবূ বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, 'বাহ! তোমার তরবারিটা খুব চমৎকার'।

সে জবাব দিল: 'আমি এটা অনেক জায়গায় পরীক্ষা করে দেখেছি।'

আবূ বাসীর বললেন, 'আমাকে তরবারিটা একটু দেখতে দেবেন?'

অবচেতন মনে সে আবূ বাসীরের হাতে তরবারিটি তুলে দিলো। তরবারি হাতে নিয়ে তিনি আর দেরি করলেন না। এক আঘাতে মালিকের ঘাড় থেকে ধরটা নামিয়ে দিলেন। অপর লোকটি ফিরে এসে দেখলো তার সঙ্গীর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে। ভীত ও শঙ্কিত অবস্থায় পালিয়ে সে পুনরায় মদীনায় ফিরে এলো এবং দৌড়ে মসজিদে প্রবেশ করলো।

রাসূল ﷺ তাকে ভীত প্রকম্পিত অবস্থায় দৌড়ে আসতে দেখে বললেন, 'নিশ্চয় সে ভীতিকর কিছু দেখেছে।'

রাসূল ﷺ-এর সামনে এসে সে ভয়ে চিৎকার করে বলে উঠলো, 'আল্লাহর কসম! আমার সঙ্গী নিহত হয়েছে, আমাকেও মেরে ফেলবে।'

আবূ বাসীরও এসে উপস্থিত। তার চোখ থেকে যেন আগুন ঝরছিলো, হাতের তরবারি থেকে ঝরে পড়ছিলো ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত।

তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আমাকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর আল্লাহ আমাকে তাদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন। সুতরাং আমাকে আপনাদের সঙ্গে রেখে দিন।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'না, আবূ বাসীর! এটা তো সম্ভব নয়।'

এ কথা শুনে আবূ বাসীর উচ্চ স্বরে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমার সঙ্গে কয়েকজন লোক দিন। আমি আপনার জন্য মক্কা বিজয় করে আনবো।' রাসূল ﷺ তার বীরত্বে মুগ্ধ হলেন। কিন্তু তিনি তো তার দাবী পূরণ করতে পারেন না। কেননা, মক্কাবাসীর সঙ্গে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ।

কিন্তু রাসূল ﷺ তাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন না। তিনি তাকে কোমল ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন। কারো আব্দার রক্ষা করতে না পারলেও সুন্দর কথা দিয়ে তাকে খুশি করা উচিত।

রাসূল ﷺ সাহাবীদের দিকে তাকালেন। তারপর আবূ বাসিরের প্রশংসা করে বললেন, 'তার সঙ্গে যদি আরো কয়েকজন লোক থাকতো তাহলে তো আবূ বাসীর মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধ শুরু করে দিতে পারতো।'

রাসূল ﷺ একথা বলে আবূ বাসীরের কষ্ট কিছুটা হালকা করলেন। পাশাপাশি তার অনুরোধ গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করলেন।

কিন্তু আবূ বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু নাছোড়বান্দা। তিনি মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। তিনি মদীনায় অবস্থানের অনুমতির প্রতীক্ষায় ছিলেন।

কিন্তু রাসূল ﷺ সন্ধির কথা স্মরণ করে আবূ বাসীরকে মদীনা হতে বের হয়ে যাওয়ার জন্য বললেন।

আবূ বাসীর অবনত মস্তকে রাসূল ﷺ-এর হুকুম মেনে নিলেন।

তিনি বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ মেনে নিয়েছিলেন। আর রাসূলের এ আদেশের কারণে তার অন্তরে ইসলাম ও ইসলামের নবীর প্রতি কোনো খারাপ ধারণাও সৃষ্টি হয়নি, মুসলমানদের প্রতি শত্রুতাও সৃষ্টি হয়নি।

তিনি পরম দয়াময় ও মহা ধৈর্যশীল সত্তা আল্লাহ তাআলার কাছে কেবল মহা প্রতিদান কামনা করেন। আল্লাহর প্রতিদান লাভের আশায়ই তো তিনি

পরিবারের মায়া ত্যাগ করেছেন, সন্তানের বিচ্ছেদ মেনে নিয়েছেন, সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক কষ্ট–ক্লেশ হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছেন।

আবূ বাসীর মদীনা থেকে বের হয়ে গেলেন। কোথায় যাবেন, কার কাছে আশ্রয় নেবেন এ ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। মক্কায় রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক নির্যাতন ও বন্দীত্ব। আর মদীনায় সুন্ধিচুক্তি ও প্রতিশ্রুতির দুর্লঙ্ঘ বাধা। অনেক ভেবে চিন্তে তিনি ভিন্ন একটি সিদ্ধান্ত নিলেন। লোহিত সাগরের তীরবর্তী জঙ্গল 'সীফুল বাহরে'। সেখানে তিনি আস্তানা গাড়লেন। বিজন সে-মরুতে একাকি ও সঙ্গিহীন এক নতুন জীবন শুরু করলেন তিনি।

এ সংবাদ পৌঁছে গেল মক্কার অসহায় নির্যাতিত মুসলমানদের কাছে। মদীনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে গ্রহণ করতে পারছেন না, আর মক্কাতেও তারা অকথ্য নির্যাতনের শিকার। তারা ভাবলেন, আল্লাহ তাদের জন্য মুক্তির একটা পথ খুলে দিয়েছেন। কিছুদিন পর আবূ জানদাল বন্দিদশা থেকে পালিয়ে আবূ বাসীরের সঙ্গে মিলিত হলেন। ধীরে ধীরে অন্যান্য মুসলমানরা সেখানে আসতে লাগলেন। একসময় তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলো, শক্তিও বেড়ে গেলো। এরপর যখনই কোনো কোরাইশ বণিক কাফেলা সমুদ্রতীর ঘেষে অতিক্রম করতো, তারা তাদের ওপর হামলা করতেন। তাদের ক্ষতিসাধন করতেন।

কোরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা যখন বারবার এ ধরনের হামলার শিকার হলো তখন নিরূপায় হয়ে তারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে দূত পাঠিয়ে অনুরোধ জানালো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন আবূ বাসীরের বাহিনীকে মদীনায় নিয়ে যান।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মদীনায় আসার জন্য পত্র পাঠালেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংবাদ পেয়ে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন।

কিন্তু আবূ বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু?

আবূ বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। অস্ফূট স্বরে তিনি বারবার আওড়াচ্ছিলেন, 'আমার মহান প্রতিপালক আল্লাহ। যে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী হবে, অতি সত্বর সে আল্লাহর সাহায্য লাভ করবে।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বার্তা নিয়ে সবাই তার শিয়রের কাছে গিয়ে জানালেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মদীনায় বসবাসের অনুমতি দিয়েছেন। তাদের নির্বাসন ও কষ্টের দিন শেষ হয়ে গেছে। তাদের আশা পূর্ণ হয়েছে এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে।

আবূ বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু সুসংবাদ গ্রহণ করলেন। মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর অবস্থায় তিনি বললেন, 'তোমরা আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্রটি দেখাও।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্রটি তার কাছে দেয়া হলো। তিনি প্রিয় নবীর চিঠিটি হাতে নিয়ে চুমু খেলেন। এরপর তা বুকের ওপর রেখে বলতে লাগলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি– আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি–মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি– আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার রাসূল।'

এভাবে কালিমা পাঠ করতে করতেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। আল্লাহ তাআলা আবূ বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে রহম করুন, তার প্রতি দয়া করুন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর দয়া শান্তি বর্ষণ করুন।

কথার রসে মানুষকে আকৃষ্ট করা এবং মুখের ভাষায় মন্ত্রমুগ্ধ করার ক্ষেত্রে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, আপনি যার সঙ্গে কথা বলছেন, তার আচরণের প্রতি লক্ষ রাখা। তাহলেই আপনি অবস্থাভেদে উপযুক্ত কথা বলতে পারবেন। কেউ যখন আপনার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করবে, তার সঙ্গে আপনিও কোমল ও সর্বোত্তম আদর্শ প্রদর্শন করুন।

কথিত আছে, জনৈক গরিব মহিলা পুরোনো এক কুঁড়েঘরে তার স্বামীর পাশে পুরোনো একটি বিছানায় শুয়ে ছিল। ঘরের দেয়াল ছিল জরাজীর্ণ, ছাদ ছিল খেজুর কাণ্ডের। মহিলা শুয়ে শুয়ে ঘরের দেয়ালে দৃষ্টি ফেরাতে লাগলো। একপর্যায়ে তার দৃষ্টি আটকে গেলো ঘরের ছাদে। ছাদের দিকে তাকিয়ে সে ডুবে গেলো ভাবনার সাগরে।

স্বামীকে সে বললো, 'আপনি বলতে পারবেন, আমি কী কল্পনা করছি?'

স্বামী বললো, 'না। কী কল্পনা করছো?'

স্ত্রী বললো, 'আমি কল্পনা করছি– আমরা বিশাল এক অট্টালিকার মালিক হবো। সন্তান সন্ততি নিয়ে সেখানে সুখে জীবন যাপন করবো। আপনি আপনার বন্ধুদেরকে সে অট্টালিকায় দাওয়াত করবেন। আমরা বিলাসবহুল একটি গাড়ির মালিক হবো। আপনি মনের আনন্দে গাড়ি চালাবেন। আপনার বেতন তখন বেড়ে দ্বিগুণ হবে। আপনি আপনার সব ঋণ পরিশোধ করে ফেলবেন। ...'

আশাবাদী মহিলা এভাবে তার কল্পনার কথা বলে স্বামীর হতাশা দূর করে সফল হওয়ার চেতনা জাগিয়ে তুলতে চাচ্ছিল। অথচ স্বামী ডুবে আছে নিরাশার অথৈ সাগরে। তার মনে কোনো আশা নেই, নেই সফল হওয়ার স্বপ্ন। তার মধ্যে নেই কোনো আচরণদক্ষতা কিংবা কথার রসে অন্যকে মোহিত ও সিক্ত করার যোগ্যতা। মহিলা নিজের কল্পনার কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে স্বামীকে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা! আপনি কী কল্পনা করেন?'

লোকটা দীর্ঘক্ষণ ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকলো। তারপর বললো, 'আমি কল্পনা করি, ছাদ থেকে যদি একটা খেজুরকাণ্ড ভেঙ্গে তোমার মাথায় পড়বে আর তোমার মাথাটা ফেটে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়!'

হাদিস ...

'সাহাবীরা রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো জিনিস মানুষকে জাহান্নামে অধিক প্রবেশ করাবে? রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন, 'এটি এবং এটি'। অর্থাৎ জিভ ও লজ্জাস্থান।' (সুনানে ইবনে মাযাহ :৪২৩৬)

৮২. দোয়ার বিস্ময়কর প্রভাব

দোয়ার ফজিলত বা আদব কী কী, দোয়া কবুল হওয়ার জন্য শর্ত কী কী–এ অধ্যায়ে এসব আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কারণ, আমাদের এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় 'আচরণ দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো'–-এর সঙ্গে উক্ত বিষয়ের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। এ অধ্যায়ে আমার উদ্দেশ্য হলো, দোয়ার মাধ্যমে কীভাবে আপনি মানুষের মন জয় করতে পারেন এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

এ ব্যাপারে প্রথম কাজ হলো, আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন, যেন তিনি আপনাকে উত্তম আখলাক দান করেন। রাসূল ﷺ ও এ দোয়া করতেন। তিনি বলতেন-

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ... لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ... سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ... ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ... وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِىْ... فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ... لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ... اهْدِنِىْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ... لَا يَهْدِىْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ... وَاصْرِفْ عَنِّىْ سَيِّئَهَا...اِنَّهُ لَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ... لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ.

'হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তো আপনারই। আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আমি আপনারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং আপনারই প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ! আমি নিজের ওপর অনেক অনাচার করেছি। আমি অপরাধ স্বীকার করছি। আপনি আমার পাপসমূহ ক্ষমা করে দিন। আপনি ছাড়া তো কেউ আর পাপ ক্ষমা করতে পারে না। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সচ্চরিত্র দান করুন। আপনি ছাড়া অন্য কেউ সচ্চরিত্র দান করতে পারবে না। আর আপনি আমার থেকে অসচ্চরিত্র দূর করে দিন। কেননা, আপনি ছাড়া কেউ আমার থেকে অসচ্চরিত্র দূর করতে পারবে না। হে আমার রব! আমি আপনার কাছে উপস্থিত। সমস্ত কল্যাণ তো আপনারই হাতে।

মূল আলোচনায় ফিরে আসছি। এখন আমরা জানবো, দোয়া কিভাবে মানুষের মন জয় করার কৌশল হতে পারে।

আপনার জন্য অন্য কেউ দোয়া করুক, এটা অবশ্যই আপনি পছন্দ করবেন। এমনকি সালাম দেয়ার সময় বা সাক্ষাতকালে যদি আপনার জন্য দোয়া করে তাহলে আপনি খুশি হবেন।

কেমন আছেন ভাই? আপনার খবর কী?

كَيْفَ الْحَالُ وَمَا الْأَخْبَارُ؟

এ জাতীয় সৌজন্যমূলক কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও যোগ করুন-

اَللّٰهُ يَحْرُسُكَ اللّٰهُ يَجْعَلُكَ مُبَارَكًا وَاللّٰهُ يُثَبِّتُ قَلْبَكَ

'আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। আল্লাহ আপনার সব কিছুতে বরকত দান করুন। আল্লাহ আপনাকে সব কাজে দৃঢ়তা দান করুন।'

তবে লক্ষ রাখতে হবে, আপনার দোয়ার বাক্যগুলো যেন সাধারণ ও বহুল প্রচলিত না হয়। যেমন-

'আল্লাহ আপনাকে তাওফিক দান করুন। আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করুন।' এগুলো অবশ্যই উত্তম দোয়া। তবে শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় এগুলো শ্রোতার কানে নতুন কোনো আবেদন তৈরি করে না এবং তার মনে বিশেষ কোনো প্রভাব ফেলে না।

তাই আপনি একটু ব্যতিক্রমধর্মী দোয়া করুন। যখন আপনার এমন কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো যার সঙ্গে তার ছেলে মেয়েরাও আছে, তাকে শুনিয়ে দোয়া করুন,'আল্লাহ তুমি তার সন্তানের মাধ্যমে তার চোখকে শীতল করুন। আল্লাহ আপনাদের ভালোবাসার বন্ধনকে অটুট রাখুন। আল্লাহ তাদেরকে আপনার অনুগত বানিয়ে দিন ইত্যাদি।

আমি এ কথাগুলো অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি। আমি অনেক সময় দোয়াকে এভাবে ব্যবহার করে দেখেছি। এটি মানুষের মন জয় করার এবং তাদের মাঝে ভালো প্রভাব ফেলার ক্ষেত্রে অনেক কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

Contents

দুই বছর আগে রমযানের এক রাতে একটি চ্যানেলে লাইভ সাক্ষাৎকারের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিলো। সাক্ষাৎকারটি ছিলো রমযানের ইবাদত সম্পর্কে। মক্কার হারাম শরীফ সংলগ্ন একটি হোটেলের কামরায় সাক্ষাৎকারটি নেয়া হয়েছিলো। আমরা রমযান সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। দর্শকরা আমাদের পেছনে অবস্থিত জানালা দিয়ে ওমরা আদায়কারী ও তাওয়াফকারীদের সরাসরি দেখছিল।

পরিবেশটি খুবই গাম্ভীর্যপূর্ণ ছিলো। ফলে সবার মন নরম হতে লাগলো। এমনকি এক পর্যায়ে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক আবেগে কেঁদে ফেললেন।

এটি ছিলো চমৎকার এক ঈমানদীপ্ত পরিবেশ। কিন্তু একজন ক্যামেরাম্যান আমাদের এ অনুভূতিকে নষ্ট করে দিলো।

তার এক হাতে ছিল ক্যামেরা, অপর হাতে সিগারেট। মনে হচ্ছিলো, রমযানের পবিত্র রজনীর একটি মুহূর্তও সে তার ফুসফুসকে সিগারেটের ধোঁয়া হতে বঞ্চিত রাখতে চায় না! তার এ আচরণে আমি খুব বিব্রতবোধ করছিলাম। সিগারেটের ধোঁয়ায় আমার ও সঞ্চালকের দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। কিন্তু ধৈর্য না ধরে কোনো উপায় ছিল না। সাক্ষাৎকারটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছিল। এভাবে পূর্ণ একটি ঘণ্টা শেষ হলো এবং সালামের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলো।

সিগারেট হাতে ক্যামেরাম্যান আমার সাথে দেখা করে আমাকে ধন্যবাদ জানালো। আমি তার হাত ধরে বললাম, ‘দ্বীনি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করার কাজে শরিক হওয়ায় আমিও আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে। আশা করি, আপনি তা গ্রহণ করবেন।’

সে বললো, ‘অবশ্যই, বলুন।’

আমি বললাম, ‘ধোঁয়া ও সিগা... ।’

আমি কথা শেষ না করতেই সে বলে উঠলো, ‘জনাব! আমাকে এ ব্যাপারে কিছু না বললেই ভালো। এতে কোনো লাভ হবে না।’

আমি বললাম, ‘ঠিক আছে। তারপরও শুধু আমার কথা শুনুন। আপনি জানেন, সিগারেট খাওয়া হারাম। আর আল্লাহ বলছেন,... ।’

সে আবারও আমাকে কথা শেষ করার সুযোগ না দিয়ে বললো, 'জনাব! আপনি আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না। আমি চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ধূমপান করছি। ধূমপান আমার রক্ত, মাংস, অস্থি-মজ্জা এমনকি শিরা-উপশিরার সাথে মিশে গেছে। এ ব্যাপারে কথা বলে কোনো লাভ নেই। আপনি অন্য কথা বলুন।'

আমি বললাম, 'কোন লাভ নেই?!'

সে কিছুটা বিরক্ত হয়ে বললো, 'আপনি আমার জন্য দোয়া করুন।'

আমি তার হাত ধরে বললাম, 'আমার সঙ্গে আসুন।'

সে বললো, 'কোথায়?'

আমি বললাম। 'আসুন, একটু কাবা শরিফের দিকে অবলোকন করি।'

যে জানালা দিয়ে হারাম শরীফ দেখা যায়, আমরা তার সামনে দাঁড়ালাম। মানুষের ভিড়ে তিল পারিমাণ জায়গাও খালি নেই। কেউ রুকু করছে, কেউ সেজদায় পড়ে আছে। কেউ তাওয়াফ করছে। কেউ দোয়া ও কান্নায় ডুবে আছে। বাস্তবেই দৃশ্যটি ছিলো হৃদয়ের গভীরে প্রভাব ফেলার মতো।

আমি বললাম, 'এদেরকে দেখছেন?'

সে বললো, 'হ্যাঁ'।

আমি বললাম, 'এরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছুটে এসেছে। সাদা-কালো, আরব-অনাবর, ধনী-গরীব সবাই আছে এখানে। সবার একই দোয়া, একই চাওয়া; আল্লাহ যেন তাদের কবুল করে নেন, তাদের অন্যায় অপরাধ ক্ষমা করে দেন।

সে বললো, 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন।'

আমি বললাম, 'আপনি কি চান না, আল্লাহ তাদের যা দান করবেন, তা আপনাকেও দান করুন?'

সে বললো, 'অবশ্যই'।

আমি বললাম, 'তাহলে হাত তুলুন। আমি আপনার জন্য দোয়া করবো। আমার দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমীন বলবেন।'

আমি বললাম, 'হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন।'

সে বললো, 'আমীন।'

'হে আল্লাহ! তাকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করুন। জান্নাতে তাকে তার প্রিয়জনদের সঙ্গ নসীব করুন। হে আল্লাহ ! ... হে আল্লাহ! ... ।' এভাবে আমি দোয়া করতে লাগলাম। তার মনও নরম হতে লাগলো। সে কাঁদতে লাগলো। বারবার 'আমীন। আমীন।' বলতে লাগলো।

দোয়ার একেবারে শেষে আমি বললাম, 'আল্লাহ! তার জন্য এ সব দোয়া কবুল করুন, যদি সে এ মুহূর্ত থেকে ধুমপান ছেড়ে দেয়ার দৃঢ় সংকল্প করে। অন্যথায় তাকে এসব দোয়া থেকে বঞ্চিত করুন।'

এ কথা শুনতেই সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। দু' হাতে মুখ ঢেকে রুম থেকে বেরিয়ে গেলো।

অনেক দিন পর ঐ চ্যানেলেরই কার্যালয়ে একটি সরাসরি সাক্ষাৎকারের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। আমি চ্যানেলটির ভবনে প্রবেশ করলাম। হঠাৎ স্বাস্থ্যবান একজন লোক আমার দিকে এগিয়ে এলো। খুব আন্তরিকতার সঙ্গে সালাম দিয়ে আমার কপালে চুমু খেলো। হাতেও চুমু দেয়ার জন্য মাথা ঝোঁকালো। তাকে খুব আবেগাপ্লুত মনে হচ্ছিলো।

আমি বললাম,'আল্লাহ আপনার ভালোবাসা ও উত্তম আচরণের প্রতিদান দিন। আমি আপনার এ ভালোবাসার জন্য কৃতজ্ঞ। তবে ক্ষমা করবেন, আমি আপনাকে চিনতে পারছি না।'

সে বললো, 'আপনার কি সে ক্যামেরাম্যানের কথা মনে আছে যাকে আপনি বছর দুয়েক আগে ধূমপান ছাড়ার উপদেশ দিয়ে তার জন্য দোয়া করেছিলেন?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে।'

সে বললো, 'আমিই সে ব্যক্তি। ঐ মুহূর্তের পর থেকে আমি আর সিগারেট মুখে লাগাইনি।'

প্রিয় পাঠক! স্মৃতির পাতাগুলো রোমন্থন করলে এমন অনেক স্মৃতিই আমি আপনাদের কাছে পরিবেশন করতে পারবো। অতীতের কোনো স্মৃতি যদি আনন্দঘন হয় তাহলে তা অবশ্যই মুগ্ধতা ছড়িয়ে দেয়।

তিন বছর আগে হজ্জের মৌসুমের কথা। আসর নামাযের পর আলোচনার জন্য এক বড় সমাবেশে গেলাম। আলোচনা শেষে লোকজন ভিড় করলো। আমার তখন অন্য একটি সভায় যোগ দেয়ার তাড়া ছিলো। তাই দ্রুত সেখান থেকে বের হতে চেষ্টা করছিলাম। ভিড়ের মধ্যে এক যুবকের ওপর আমার চোখ পড়লো। সে মানুষের ভিড় ঠেলে সামনে আসতে দ্বিধা করছিলো। এ অবস্থা থেকে আমি তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। সে আমার সঙ্গে মোসাফাহা করলো। প্রচণ্ড ভিড় এবং তাড়া থাকা সত্ত্বেও আ... তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি কিছু বলতে চান?'

সে বললো, 'হ্যাঁ।'

আমি তাকে টেনে কাছে নিয়ে এসে বললাম, 'বলুন'।

সে দ্রুত প্রশ্ন করলো। আমি তার উত্তর দিলাম। কথা বলার সময় আমি তার মুখ থেকে সিগারেটের গন্ধ পেলাম। তাই মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'ধূমপান করেন?'

সে বললো, 'হ্যাঁ'।

আমি বললাম, 'আমি দোয়া করছি, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন এবং আপনার হজ্জ কবুল করুন। তবে শর্ত হলো– যদি এখন থেকেই আপনি ধূমপান ছেড়ে দেন।'

যুবকটি চুপ হয়ে গেলো। তার চেহারায় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো যে, সে এ কথায় বেশ প্রভাবিত হয়েছে।

আট মাস পর।

আমি বয়ান করতে একটি শহরে গেলাম। মসজিদের দিকে এগিয়ে যেতেই দেখতে পেলাম, গম্ভীর এক যুবক মসজিদের দরজায় আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সে আমাকে দেখতেই আবেগপ্রবণ হয়ে ছুটে এলো এবং আন্তরিকতার সঙ্গে সালাম দিলো। আমি তাকে চিনতে পারলাম না। তবে সালামের জবাব দিয়ে কুশল বিনিময় করলাম।

সে বললো, 'আমাকে চিনতে পেরেছেন?'

আমি বললাম, 'আপনার আন্তরিকতা ও ভালোবাসার মূল্যায়ন করছি। তবে মাফ করবেন, আমি আপনাকে চিনতে পারছি না।'

সে বললো, 'আপনার কি ধুমপানকারী সে যুবকের কথা মনে আছে, যার সঙ্গে আপনার হজের সময় এক মাহফিল শেষে দেখা হয়েছিলো। আর আপনি তখন তাকে ধূমপান ছেড়ে দেয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। অবশ্যই।'

সে বললো, 'আমিই সে যুবক। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আপনি শুনে খুশি হবেন, ঐ দিনের পর থেকে আমি আর ধূমপান করিনি। আমি ধূমপান ছেড়ে দিয়েছি। ফলে আমার জীবনের অনেক কিছুই সুন্দর হয়ে গেছে।'

আমি তার হাত নাড়িয়ে তাকে উৎসাহ দিয়ে চলে এলাম। তখন আমার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, মানুষের সামনে তাদেরকে শুনিয়ে দোয়া করা কখনো কখনো প্রত্যক্ষ উপদেশ থেকে অনেক বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

আপনি যদি পিতার অনুগত কোনো যুবককে দেখতে পান তাহলে দোয়া করুন, 'আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আপনার সন্তানদেরকেও আপনার অনুগত বানিয়ে দিন।' নিঃসন্দেহে এ দোয়া তার জন্য অত্যন্ত কার্যকর হবে এবং সে তার পিতা-মাতার আরো বেশি অনুগত হওয়ার চেষ্টা করবে।

নবী করীম ﷺ মানুষকে দ্বীনমুখী করতে, তাদের মন জয় করতে এবং তাদেরকে প্রভাবিত করতে তিনি খুব চমৎকারভাবে দোয়ার প্রয়োগ করতেন।

তুফাইল বিন আমর ছিলেন দাওস গোত্রের একজন গণ্যমান্য সরদার। কোনো প্রয়োজনে একবার তিনি মক্কায় এলেন। কোরাইশ নেতারা তাকে মক্কায় আসতে দেখে তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কে?'

তিনি বললেন, 'তোফাইল বিন আমর। দাওস গোত্রের সরদার।'

যদি রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে তোফাইল-এর সাক্ষাৎ হয়ে যায় তাহলে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ফেলতে পারে। কুরাইশের লোকদের এ আশঙ্কা হলো।

তাই তারা বললো, 'মক্কায় একজন লোক আছে, সে নিজেকে নবী বলে দাবি করে। সাবধান! ভুলেও তার কাছে বসবেন না এবং তার কথা

শুনবেন না। তার কথায় যাদু রয়েছে। যদি আপনি শোনেন, তাহলে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি আপনি আপনার বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলবেন।'

তোফাইল বলেন, তারা আমাকে বারবার ভয় দেখাতে লাগলো। একপর্যায়ে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, তার কথা শুনবো না, তার সঙ্গে কথাও বলবো না। চলার পথে কোনোভাবে তার কোনো কথা যদি কানে ঢুকে যায় এ আশংকায় আমি কানে তুলা ভরে রাখলাম।

আমি মসজিদে গেলাম। দেখলাম, রাসূল ﷺ কাবার কাছে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন। আমি তার কাছে দাঁড়ালাম। আমি না চাইলেও আল্লাহ আমাকে তার কিছু কথা শুনিয়ে দিলেন। তার সুন্দর ও চমৎকার কিছু কথা আমি শুনে ফেললাম।

মনে মনে বললাম, আমি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি এতে কোনো সন্দেহ নেই। কোনোটা ভালো আর কোনোটা মন্দ, তা আমার কাছে অস্পষ্ট নয়। তাহলে এ ব্যক্তির কথা শুনতে সমস্যা কোথায়। যদি সে ভালো কথা বলে তাহলে গ্রহণ করবো। মন্দ বললে বর্জন করবো। ভালো মন্দের পার্থক্য তো আমি করতে পারি।

এ ভেবে তিনি নামায শেষ করা পর্যন্ত আমি সেখানেই অবস্থান করলাম। তিনি যখন বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য দাঁড়ালেন, আমি তার পিছু নিলাম। অবশেষে তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। আমিও তার ঘরে প্রবেশ করলাম। এরপর বললাম, 'হে মুহাম্মাদ! আপনার গোত্রের লোকেরা তো আমাকে অনেক কিছু বলেছে। তারা আপনার ব্যাপারে আমাকে বারবার সতর্ক করেছে। আর তাই আমি কানে তুলা দিয়ে রেখেছিলাম যেন আমার কানে আপনার কোনো কথা প্রবেশ না করে। কিন্তু আমি আপনার কাছে বেশ কিছু সুন্দর কথা শুনেছি। তাই আমার কাছে আপনার বিষয়টি উপস্থাপন করুন।'

রাসূল ﷺ খুব খুশি হলেন। তিনি তোফাইলের সামনে ইসলামের পরিচিতি তুলে ধরলেন। তাকে কুরআন পাঠ করে শোনালেন।

তোফাইল বিষয়টি নিয়ে ভাবলেন। অনুভব করলেন, প্রতিদিনই তিনি আল্লাহর থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। মনে মনে ভাবলেন, আমি পাথরের

পূজা করি যা কখনো শুনতে পায় না। আমার কাকুতি মিনতিতে পাথর কোনো সাড়া দিতে পারে না।

তোফাইলের সামনে আজ সত্য প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি ইসলাম গ্রহণের পরিণাম নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।

কীভাবে তিনি বাপ-দাদার ধর্ম পরিবর্তন করবেন?

মানুষ তাকে কী বলবে?

কী হবে তার পরিণাম?

অর্জিত সম্পদের কী হবে?

তার পরিবার?

সন্তান-সন্ততি?

প্রতিবশেী, বন্ধু-বান্ধব?

সবাইতো অস্থির হয়ে পড়বে। তার শত্রুতে পরিণত হবে।

তিনি চুপ করে ভাবতে লাগলেন। ভাবনার সাগরে তিনি ডুবে গেলেন।

বিভিন্ন রকম ভাবনা তার মনে উদয় হতে লাগলো। চিন্তার জগতে শুরু হলো পার্থিব অপার্থিক স্বার্থের নিশ্চিত দ্বন্দ্ব। হঠাৎ তিনি পার্থিক স্বার্থের সকল আকর্ষণ ঝেরে ফেলে দিলেন। পার্থিব স্বার্থকে উপেক্ষা করে তিনি সত্যকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। দুনিয়াকে বর্জন করে আখিরাতকেই গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি সংকল্প করলেন, অবশ্যই তিনি সত্যকে গ্রহণ করবেন এবং-এর ওপর অটল থাকবেন। এতে কেউ অসন্তুষ্ট হলেও তার করার কিছু নেই।

যদি আকাশের অধিপতি মহান রাব্বুল আলামিন তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে পৃথিবীর কারো অসন্তুষ্টিতে তার কোনো সমস্যা নেই।

ধন-সম্পদ তো আল্লাহর দান।

সুস্থতা–অসুস্থতাও তাঁরই হাতে।

প্রভাব–প্রতিপত্তি তাঁরই অধিকারে।

জীবন ও মৃত্যুর ফয়সালাও তো একমাত্র তিনিই করেন।

সেই আসমানওয়ালা যদি সন্তুষ্ট হন তাহলে জমিনের অন্য সব তুচ্ছ।

যদি আল্লাহর ভালোবাসা তিনি পেয়ে যান তাহলে তো তিনি সফল। এবার কেউ তাকে ঘৃণা করুক, আর অবজ্ঞা করুক এতে তার কিছু যায় আসে না। কবি বলেন-

তুমি যদি হও গো মধু, হোক এ জীবন তিক্তার আধার
তুমি যদি হও রাজি হে, হোক পৃথিবী নারাজ আমার।
তোমার আমার ভালোবাসা, হোক হে প্রভু চির আবাদ
তুমি ছাড়া রিশতা যতো হয়ে পড়ুক সব অনাবাদ।
সত্যি যদি হয় গো প্রিয় তোমার আমার ভালোবাসা
জীবন আমার ধন্য ওগো, করি না আর কোনো আশা।
মাটির পরে আছে যারা একদিন তারা মাটি হবে,
ধুলি হয়ে যাবে মিশে কেবল তুমি বাকি রবে।

তোফাইল কালিমা পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তার মধ্যে দুর্নিবার সাহস জেগে উঠলো। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর নবী! আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে মানে। আমি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে চাই।' রাসূল ﷺ তাকে নিষেধ করলেন না।

তোফাইল মক্কা ছেড়ে দ্রুত তার গোত্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। দ্বীন পৌঁছানোর অবিনাশি চেতনা নিয়ে পাহাড় পেরিয়ে উপত্যকা অতিক্রম করে আবেগে উদ্বেলিত হয়ে নিজ এলাকায় পৌঁছলেন।

নিজ এলাকার সীমানায় প্রবেশ করতেই তার অশীতিপর পিতা তার কাছে ছুটে এলেন। তিনি মূর্তি পূজা করতেন। তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য কঠোর নীতি গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, 'বাবা! আপনি আমার কাছে আসবেন না। আপনার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

তিনি বললেন, 'কেন? কী হয়েছে বাবা তোমার?!'

'আমি ইসলাম গ্রহণ করে মুহাম্মদ ﷺ-এর অনুসারী হয়েছি।'

পিতা বললেন : 'বাবা, চিন্তা করো না, তোমার ধর্মই আমার ধর্ম। তুমি যে ধর্মের অনুসারী হয়েছো আমিও সে ধর্মের অনুসরণ করব।'।

'ঠিক আছে। তাহলে গোসল করে পবিত্র কাপড় পরিধান করে আসুন। আমি যা শিখেছি, তা আপনাকে শেখাবো।'

তার পিতা গোসল করে পবিত্র কাপড় পরিধান করে এলেন। তোফায়েল তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তিনি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন।

এরপর তোফায়েল বাড়িতে প্রবেশ করলেন। তার স্ত্রী তাকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে এলো। তিনি বললেন, 'আমার কাছে এসো না। তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

স্ত্রী বললেন, কেন? কী হয়েছে? আমার সব কিছু তো কেবল আপনার জন্যই।'

'ইসলাম তোমার ও আমার মাঝে অদৃশ্য এক প্রাচীর সৃষ্টি করে দিয়েছে। আমি মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসারী হয়েছি।'

'আপনার ধর্মই আমার ধর্ম।' স্ত্রী সাথে সাথে জবাব দিল।

তোফায়েল বললেন: 'তাহলে গোসল করে পবিত্র হয়ে আসো।'

তুফাইলের কাছ গিয়ে সে চিন্তায় পড়ে গেলো। তার আশংকা হলো, পূজা ছেড়ে দিলে এ মূর্তিগুলো হয়তো তার সন্তানদের কোনো ক্ষতি করবে।

তাই সে আবার স্বামীর কাছে ফিরে এসে বললো, 'আমার বাবা-মা সব কিছু আপনার জন্য নিবেদিত। আপনি কি সন্তানদের ব্যাপারে যুশশারা দেবতার অনিষ্টের আশঙ্কা করেন না?'

তারা 'যুশশারা' প্রতিমার পূজারী ছিল। তারা বিশ্বাস করতো, যে ব্যক্তি যুশশারার পূজা ছেড়ে দেবে, যুশশারা তার বা তার সন্তানদের ক্ষতি করবে।

তুফাইল বললেন, 'যুশশারা ওদের কোনো ক্ষতি করবে না। আমি তোমাকে-এর নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

স্ত্রী গোসল সেরে এলো। তুফাইল তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তার স্ত্রী 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

এরপর তোফাইল তার সম্প্রদায়ের ঘরে ঘরে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। সভা-সমিতিতে পথে প্রান্তরে যার সঙ্গে দেখা হয়, তাকেই ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারা মূর্তিপূজা ছাড়তে কিছুতেই রাজি হলো না।

তুফাইল রাগান্বিত হয়ে মক্কায় চলে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! দাওস গোত্র অবাধ্যতা করেছে। তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। আপনি তাদের জন্য বদ দোয়া করুন।'

এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারার রঙ বদলে গেলো। তিনি দোয়া করার জন্য দুই হাত তুললেন।

তুফাইল মনে মনে বলতে লাগলেন, 'দাওস গোত্র এবার ধ্বংস হয়ে যাবে!'

মানবতার নবী রহমতের ছবি কিভাবে বদদোয়া করবেন? তিনি হাত তুলে বললেন: 'হে আল্লাহ! দাওস গোত্রকে হেদায়াত দান করুন। হে আল্লাহ! দাওস গোত্রকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।'

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোফায়েলের দিকে ফিরে বললেন, 'তোফাইল! এবার তোমার গোত্রের লোকদের কাছে যাও। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও। আর তাদের সঙ্গে নরম ব্যবহার করো।'

তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু ফিরে গেলেন। আবার দাওয়াত দিলেন। এবার তিনি অভূতপূর্ব সাড়া পেলেন। ধীরে ধীরে গোত্রের সবাই ইসলাম গ্রহণ করলো।

মহান প্রভুর দরবারে কী চমৎকার প্রার্থনা! উম্মতের জন্য কী স্নেহ আর কী মায়া! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেদায়াতের দোয়া কেবল তোফাইল ও তার সম্প্রদায়ের জন্যই করেননি, আরো অনেকের জন্য তিনি-এরূপ দোয়া করেছিলেন।

নবুয়ত পাওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবে মাত্র দাওয়াত দিতে শুরু করেছেন। মুসলমানদের সংখ্যা তখন খুবই কম। সব মিলিয়ে মাত্র আটত্রিশ জন। তখনও গোপনে গোপনে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হচ্ছিল। কেউ ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করছিল না। প্রকাশ করার অনুমতিও ছিল না। হজরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ!

আপনি আমাদেরকে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের অনুমতি দিন।' কিন্তু রাসূল ﷺ অনুমতি দিচ্ছেন না। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বারবার রাসূলের কাছে অনুমতি চাইতে লাগলেন।

রাসূল ﷺ বললেন,'আবূ বকর! আমরা সংখ্যায় অতি অল্প।' আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন খুব উৎসাহী। তিনি বারবার রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে বলে অনুমতি নিলেন। এরপর একদিন সবাই একসাথে সমবেত হলেন। রাসূল ﷺ সবার সামনে সামনে চললেন। সবাই মসজিদে হারামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। মসজিদে উপস্থিত হয়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ বংশের লোকজনের মাঝে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে পড়লেন। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সবার সামনে বক্তব্য দিলেন। তাদেরকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার জন্য আহবান জানালেন। মূর্তিপূজার অসারতা বর্ণনা করলেন।

ইসলামের কথা ও মূর্তিপূজার অসারতার কথা শুনে মুশরিকরা প্রচণ্ডভাবে ক্ষিপ্ত হলো। তারা মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। মসজিদের স্থানে স্থানে মুসলমানদেরকে খুব আঘাত করতে। কাফেররা সংখ্যায় ছিলো অনেক। তাই মুসলমানরা তাদের সাথে কুলিয়ে উঠতে না পেরে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লেন। কাফেরদের একটি দল আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে একা পেয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আঘাতে আঘাতে তাকে জর্জরিত করে ফেললো।

এক পর্যায়ে সহ্য করতে না পেরে তিনি-মরুর তপ্ত বালিতে পড়ে গেলেন। পাপি 'ওতবা বিন রাবীয়া এসে জুতা খুলে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর গালে আঘাত করতে লাগলো।-এরপর সে পাষণ্ড আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পেটের ওপর উঠে দাঁড়ালো। তার মুখ দিয়ে দরদর করে রক্ত বের হতে লাগল। তার চেহারা বিকৃত হয়ে গেলো। নাক মুখ এমনভাবে রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল যে, তাকে দেখে চেনাই যাচ্ছিলো না।

আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বংশ বনু তামীমের লোকেরা এসে তাকে উদ্ধার করলো। এরপর তাকে একটি কাপড়ে জড়িয়ে পৌঁছে দিলো। সবাই তো নিশ্চিত ছিলো যে, তিনি মারা গেছেন। এরপর বনু তামীমের লোকেরা দৌঁড়ে মসজিদে এসে মুশরিকদের মাঝে চিৎকার করে

ঘোষণা দিলো, 'আল্লাহর কমস! আবূ বকর যদি মারা যায়, অবশ্যই ওতবাকে আমরা শেষ করে দেব।'

এই বলে তারা আবার আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে ফিরে এলো। তিনি বেহুশ হয়ে পড়ে আছেন। কেউ জানে না, তিনি জীবিত না মৃত। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পিতা আবূ কোহাফা গোত্রের লোকজনসহ বসে আছেন। আবূ বকরের হুশ ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছেন। কথা বলছেন প্রাণ প্রিয় ছেলের সাথে কিন্তু কোনো সাড়া শব্দ নেই।

তার মা শিয়রে বসে কাঁদছেন।

সারাদিন পর সন্ধ্যায় আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একটু চোখ মেলে তাকালেন। হুশ ফিরে পাওয়ার পর তার প্রথম কথা ছিলো, 'আল্লাহর রাসূল কেমন আছেন?

আল্লাহ তায়ালা আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অকল্যাণ চিন্তায় তিনি বেশি উদ্বিগ্ন থাকতেন।

তার মা-বাবাসহ আত্মীয়-স্বজন যারা ছিলো, আবূ বকরের কথা শুনে সবাই প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলো। তারা রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে গালমন্দ করে সবাই চলে গেলো। যাওয়ার সময় তার মাকে বলে গেলো, 'ওকে একটু পানাহার করাও। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু—এর মা তাকে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন। কিন্তু তিনি বারবার একই কথা বলছিলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন?' মা বললেন, 'খোদার কসম! আমি তার অবস্থা জানি না।'

আবূ বকর বললেন, 'খাত্তাবের বেটি উম্মে জামীলের ঘরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা জেনে আসুন।'

উন্মে জামীল রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। তবে তিনি ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রেখেছিলেন। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মা তাড়াতাড়ি উম্মে জামীলের বাড়িতে গেলেন।

উম্মে জামীল বললেন, 'আমি আবূ বকর, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ কাউকে চিনি না। তবে আপনার ছেলের অবস্থা শুনে খুব কষ্ট লাগছে। আপনি বললে তাকে দেখে আসতে পারি।'

আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মা বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি আসো।'

উভয়ে এসে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শিয়রে বসলেন। দেখলেন, আবূ বকর নিশ্চল হয়ে পড়ে আছেন। ক্ষত-বিক্ষত দেহ, আঘাতে আঘাতে জর্জরিত চেহারা। উম্মে জামীল রাদিয়াল্লাহু আনহা তার এ করুণ অবস্থা দেখে অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। বললেন, 'কাফের, ফাসেকরা আপনার ওপর যে নির্যাতন করেছে! আল্লাহ তাআলা অবশ্যই-এর বিচার করবেন।'

আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু অতি কষ্টে চোখ মেলে তাকালেন। দেহ-শরীর ক্ষত-বিক্ষত হলেও হৃদয় তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসায় ছিল টইটম্বুর। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন?'

আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মা উম্মে জামীলের পাশেই বসা ছিলেন। উম্মে জামীল ভয় পাচ্ছিলেন, পাছে তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি প্রকাশ পেয়ে যায় কিনা? তাহলে তো তার ওপরও নির্যাতন নেমে আসবে। তাই বললেন, 'আবূ বকর! আপনার মা শুনছেন।'

আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তার পক্ষ থেকে তোমার কোনো ভয় নেই।'

উম্মে জামীল বললেন, 'আপনার জন্য সুসংবাদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালো আছেন, সুস্থ আছেন।'

'কোথায় আছেন?'

'আবূ আরকামের বাড়িতে।'

আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মা বললেন, 'বন্ধুর খবর জানলে তো। এবার ওঠো। কিছু খেয়ে নাও।'

আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আল্লাহর শপথ! নিজ চোখে আল্লাহর রাসূলকে দেখার আগ পর্যন্ত আমি কিছুই মুখে দেবো না।'

তারা অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়লো তারা দু'জন আবূ বকরকে ধরে আবূ আরকামের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। দুর্বলতার কারণে তিনি পা টেনে টেনে চলছিলেন।

আবূ আরকামের বাড়িতে পৌঁছে তারা আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত করলেন। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে গেলেন।

ক্ষত-বিক্ষত চেহারা। শরীরের জখমগুলো থেকে রক্ত ঝরছে। কাপড় চোপড় ছিন্ন ভিন্ন। প্রিয় বন্ধুকে দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কপালে চুমু দিলেন। উপস্থিত সবাই এগিয়ে এসে তার কপালে চুমু দিলেন।

আবূ বকরের অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সীমাহীন ব্যথিত হলেন। তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো।

আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আপনার ওপর আমার মাতা পিতা নিবেদিত হোক। আমার কিছুই হয়নি। শুধু আমার চেহারায় একটু বেশি আঘাত লেগেছে।'

এরপর আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'বীরপুরুষ তো সে-ই, যে দাওয়াত নিয়ে চলতে থাকে আর এর ওপর অবিচল থাকে। যত ঝড়-ঝাপটাই আসুক, সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে।'

আবূ বকরের সারা শরীর আঘাতে জর্জরিত। তিনি ক্ষুধার্ত, পিপাসিত। কিন্তু তিনি নিজের জন্য মোটেও উদ্বিগ্ন নন। তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইনি আমর মা। তিনি মাতা-পিতার সঙ্গে খুবই সদাচরণকারী। আপনি তো মোবারক মানুষ। তাকে আল্লাহর পথে একটু ডাকুন। তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। আল্লাহর নিকট আমি দৃঢ় আশাবাদী, আল্লাহ তাআলা আপনার মাধ্যমে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন এবং তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বললেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলাম কবুল করলেন।

দোয়া ছিলো তাদের দাওয়াতের অন্যতম মাধ্যম।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনা। আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তার মা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার মাকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। কিন্তু তার মা প্রত্যাখ্যান করতেন। একদিন আবূ হোরায়রা তার মাকে খুব কাকুতি মিনতি করে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তার মা দাওয়াত তো কবুল করলেনই না, উল্টো রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালমন্দ করতে লাগল।

মায়ের-এরূপ আচরণে তিনি খুব কষ্ট পেলেন। রাসূলের কাছে হাজির হয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাকে ইসলামের দাওয়াত দিতাম। তিনি আমার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করতেন। তবে

ভালো-মন্দ কিছু বলতেন না। কিন্তু আজ দাওয়াত দেয়ার পর তিনি দাওয়াত তো কবুল করেননি, উল্টো আপনাকে গালমন্দ করেছেন। আল্লাহর রাসূল! আপনি তার জন্য একটু দোয়া করুন।'

আল্লাহর রাসূল তার মায়ের হেদায়াতের জন্য দোয়া করলেন। আবূ হোরায়রা বাড়ি ফিরলেন। ঘরের দরজা বন্ধ পেয়ে কড়া নাড়লেন। তার মা এসে দরজা খুলে দিয়ে সাথে সাথে 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহ' পড়লেন।

আনন্দের আতিশয্যে কাঁদতে কাঁদতে আবূ হোরায়রা আল্লাহর রাসূলের কাছে ছুটে এলেন। বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! সুসংবাদ ! আল্লাহ আপনার দোয়া কবুল করেছেন এবং আমার মাকে হেদায়েত দিয়েছেন।'

এরপর আবূ হোরায়রা বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার জন্য এবং আমার মায়ের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে মুসলমানদের ভালোবাসার পাত্র বানান এবং মুসলমানদের ভালোবাসা দিয়ে আমাদের অন্তরকে পূর্ণ করে দেন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! আপনি মুসলমানদের অন্তরে আপনার এ বান্দা ও তার মায়ের প্রতি ভালোবাসা দান করুন এবং তাদের অন্তরকেও মুসলমানদের ভালোবাসা দিয়ে ভরে দিন।'

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'এরপর হতে পৃথিবীর প্রতিটি মুসলিম নর-নারী আমাকে ভালোবাসে। আমিও সবাইকে ভালোবাসি।' (মুসলিম:৪৫৪৬)

আলোর দিশা...

তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, 'তোমরা আমার কাছে দোয়া করো। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো।



৮৩. সান্ত্বনার প্রলেপ !!

আচরণ-দক্ষতার প্রয়োগ করতে গিয়ে অনেক সময় আমরা ব্যক্তি উপযোগী পদ্ধতি নির্ণয়ে ভুল করি কিংবা পদ্ধতিটি আমরা ভুল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে ফেলি।

উদাহরণস্বরূপ কোনো ব্যক্তি সুদর্শন একজন যুবককে দেখে তার সঙ্গে 'অন্যের প্রশংসা করুন' শিরোনামে আলোচিত পদ্ধতিটি প্রয়োগ করতে গিয়ে তাকে বললো, 'মাশাআল্লাহ! তোমার কাপড়টা তো খুব চমৎকার! আর তুমিও দেখতে হাজারে একজন।' এরপর সে বললো, 'তোমার মতো স্বামী যে মেয়ে পেয়েছে সে অনেক ভাগ্যবান! তুমি যদি মেয়ে হতে, আমি তোমাকে বিয়ে করতাম।'

এ ধরণের প্রশংসা অনেককে বিব্রত করে। এমন করা কখনোই উচিত নয়।

সহকর্মীদের একজন বললো, 'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বোকা ছাত্র ছিলো। কিন্তু আল্লাহ তাকে বুদ্ধির পরিবর্তে চেহারার সৌন্দর্য দিয়েছেন। সে সবসময় ক্লাসরুমে পেছনে বসে থাকতো এবং অভাবনীয় চিন্তায় মগ্ন থাকতো।'

আমি সবসময় তাকে ক্লাসের সম্মুখ সারিতে বসতে বলতাম, যেন সে ভালোভাবে পড়া বুঝতে পারে। কিন্তু সে পেছনে বসে থাকতো। অবশ্য আমি তাকে বিরক্তিকর কিছু বলতাম না।

একদিনের ঘটনা। আমি শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে তাকে অভ্যাস অনুযায়ী পেছনে বসা দেখলাম। আমি আমার আসন থেকে বললাম, 'আব্দুল মুহসিন সামনে এসে বসো।' সে বললো, 'স্যার! আমার এখানেই ভালো লাগছে। আমি এখানে বসেই পড়া ভালো বুঝতে পারি।'

আমি বললাম, 'কাছে এসে বসো। আমাদেরকে একটু তোমার সুন্দর গালটা দেখতে দাও!'

এ কথার পর লক্ষ করলাম, কয়েকজন ছাত্র তার দিকে তাকিয়ে কী যেন বলছে আর তার চেহারা লজ্জায় লাল হয়ে গেছে।

কথাটি বলে আমি যেন কোনো গর্তে পড়ে গেছি। সঙ্গে সঙ্গে সুর পাল্টে বললাম, যে নারী তোমার জীবনসঙ্গিনী হবে সে অনেক সৌভাগ্যবান !

কনে খুঁজে পেতে তোমার কোনো কষ্ট হবে না। কিন্তু এদের জন্য মেয়ে খুঁজে পেতে সমস্যা হবে।

এরপর আমি কাউকে চিন্তা-ভাবনার কোনো সুযোগ না দিয়ে ক্লাসের পড়া শুরু করে দিলাম। আমার কথা শুনে ছাত্রটি মুচকি হাসলো। তার খুশির ভাব প্রকাশ পেলো। এরপর সে ক্লাসের সম্মুখ সারিতে এসে বসলো।

আচরণদক্ষতার অনুশীলনের শুরুতে এ জাতীয় ভুল হলেও অতি দ্রুত তা কেটে যায়। আবার কখনো কখনো অন্যের সঙ্গে আমাদের আচরণ ভুল না হলেও তাতে সে কষ্ট পায়, বিরক্ত হয়।

দু'জন সহকর্মীর মাঝে কোনো বিষয়ে মতানৈক্য হলো। একজনকে ন্যায়ের উপর দেখে আমি তার পক্ষ অবলম্বন করলাম, অন্যজনকে তিরস্কার করলাম। পরিস্থিতিই আমাকে একজনের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেবে।

অনুরূপ দুই সন্তান, দু'জন ছাত্র বা দু'জন প্রতিবেশীর মধ্যে মতপার্থক্য হলে আপনি কী করবেন?

এসব ক্ষেত্রে আমি যদি কেবল একপক্ষের পাশে দাঁড়াই, তাহলে তো ধীরে ধীরে আমার শত্রুর সংখ্যা বাড়তে থাকবে। একে একে সবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নষ্ট হতে থাকবে। অথচ আমরা সবসময় চেষ্টা করি মানুষের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে, তাদের খুশি করতে! এ বিপরীতমুখী বিষয়দু'টির সমন্বয় সাধন কীভাবে করা সম্ভব? আর-এরকম ক্ষেত্রে আমাদের সঠিক আচরণপদ্ধতি কী হতে পারে?

উত্তর হলো, আপনি যখনই উপলব্ধি করবেন, আচরণ-দক্ষতার কোনো একটি পদ্ধতি প্রয়োগ করতে গিয়ে আপনার কোনো কথা বা কাজে কারো অন্তরে আঘাত লেগেছে, দ্রুত কার্যকরী ও উপযোগী অন্য একটি পন্থা অবলম্বন করে তার ব্যথিত হৃদয়কে আনন্দিত করে তুলবেন। খুব দ্রুত তা করবেন।

কীভাবে করবেন, একটি উদাহরণ নিতে পারেন।

মুসলমানদের বিজয়ের পূর্বে মক্কা কোরাইশ-কাফেরদের অধীনে ছিলো। তারা সেখানকার দুর্বল ঈমানদারদের কষ্ট দিতো। যেসব মুহাজির

মুসলমান নিজেদের সন্তানদের মদিনায় নিয়ে যেতে পারেননি, তাদের সন্তানরা ছিলো কোরাইশ-কাফেরদের নির্যাতনের শিকার হয়েছিল।

তখন মুলসমানদের অবস্থা ছিলো খুবই করুণ। বেদনাদায়ক।

ওমরাহ করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আগমন করলে কোরাইশরা তাকে ওমরাহ করতে দেয়নি। এর সূত্র ধরেই হুদাইবীয়ার সন্ধির ঘটনা ঘটলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তী বছর ওমরাহ করার ব্যাপারে সমঝোতা করে এ বছর ওমরা না করেই সাহাবীদের নিয়ে মদীনায় ফিরে যেতে সম্মত হলেন।

এক বছর পর সাহাবীদের নিয়ে ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পড়তে পড়তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং সেখানে চারদিন অবস্থান করে ওমরা পালন করলেন। ওহুদ যুদ্ধে শাহাদাতবরণকারী রাসূলের চাচা হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ছোট এতিম কন্যা এতদিন মক্কায়ই ছিলো। ওমরা শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় ফিরে যাচ্ছিলেন তখন সেই এতিম মেয়েটি এসে রাসূলকে জড়িয়ে ধরে 'চাচা, চাচা' বলে ডাকতে লাগলো।

রাসূলের পাশে ছিলেন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সহধর্মিনী ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা। আলী মেয়েটির হাত ধরে ফাতেমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'নাও, তোমার চাচাতো বোন।' ফাতেমা তাকে কোলে তুলে নিলেন।

এদিকে মেয়েটিকে দেখেই যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর স্মরণ হলো, হিজরতের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সঙ্গে হামযার ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করে দিয়েছিলেন। তাই তিনিও এগিয়ে এসে বললেন, 'এ তো আমার ভাতিজী! আমিই-এর দেখাশোনার বেশি হকদার।'

জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও এগিয়ে এসে বললেন, 'সে তো আমার চাচাতো বোন। আবার তার খালা আসমা বিনতে উমাইস আমার স্ত্রী। তাই তার লালন-পালনের আমিই বেশি হকদার।'

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন, 'আমিই তো তাকে প্রথমে নিয়েছি। সে আমার চাচাতো বোন।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ মতবিরোধের সমাধান দিয়ে বললেন, 'এ মেয়ে তার খালার কাছে থাকবে। কেননা, খালা মায়ের সমতুল্য।'

ফলে জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার দেখা-শোনার দায়িত্ব পেলেন।

রাসূল ﷺ আলী ও যায়েদের মনের ব্যথা উপলব্ধি করলেন। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের সান্ত্বনাদানের চেষ্টা করলেন। রাসূল আলীকে বললেন, 'তুমি তো আমার অংশ আর আমিও তোমার অংশ।' যায়েদকে বললেন, 'তুমি তো আমাদের ভাই, আমাদের ঘরের লোক।'

এরপর জাফরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চরিত্র ও বাহ্যিক আকার অবয়বে তুমি আমার সবচেয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ মানুষ।'

দেখুন, কী চমৎকার দক্ষতার সাথে রাসূল ﷺ সবাইকে বুঝ দিলেন। কাউকে নিজের থেকে দূরে সরতে দিলেন না।

আসুন আবার ফিরে যাই আমার সে বন্ধুর ঘটনায়; যে এক সুদর্শন যুবককে দেখে বলেছিল, 'ইস! তুমি যদি মেয়ে হতে, আমি তোমাকে বিয়ে করতাম'!

এ অবস্থায় তার করণীয় কী? কীভাবে সে এ ভুল সংশোধন করতে পারে? কীভাবে ক্ষত হৃদয়ে মলম লাগাতে পারে?

এ বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে তার সামনে কয়েকটি পথ রয়েছে।

যেমন তৎক্ষণাৎ সে প্রসঙ্গ পাল্টে অন্য কথায় চলে যেতে পারে। এর ফলে শ্রোতা সে বিব্রতকর মন্তব্যটি নিয়ে চিন্তা করার বা নতুন কোনো মন্তব্য করার সুযোগ পাবে না। সে বলতে পারে, 'আল্লাহ তোমাকে তোমার চেয়েও সুন্দরী রূপসী একজন হুর দান করুন' বলো, আমীন'!

অথবা অনেক দূরের ভিন্ন কোনো প্রসঙ্গের অবতারণা করতে পারে। যেমন, 'তোমার যে ভাই বিদেশ থাকে তার কী খবর?' 'তোমার নতুন গাড়িটি কেমন চলছে?'-এর ফলে সমম্বোধিত ব্যক্তি বিব্রতকর মন্তব্যটি নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ পাবে না।

অর্জিত অভিজ্ঞতা ...

ভুল করা দোষ নয়; ভুলের ওপর অটল থাকা দোষণীয়।



৮৪. দুই চোখ দিয়েই দেখুন

মানুষের ভুলক্রুটি খেয়াল করা এবং এটা নিয়ে মন্তব্য করার ক্ষেত্রে আমরা খুবই সক্রিয়। আর অন্যের ভুল সংশোধন করার ক্ষেত্রে তো আমাদের কোন আগ্রহ নেই। কিন্তু তাদের ভালো ও সঠিক কাজগুলো দেখা এবং সেগুলোর প্রশংসা করার ক্ষেত্রে আমরা খুবই উদাসীন।

উদাহরণস্বরূপ ধরুন শিক্ষক-ছাত্রের কথা। নির্বোধ, অলস, হোমওয়ার্ক করতে উদাসীন কিংবা ক্লাসে উপস্থিতির ক্ষেত্রে বিলম্বকারি ছাত্রকে সব শিক্ষকই র্ভৎসনা করে থাকেন। কিন্তু যে ছাত্র পরিশ্রমী, ক্লাসে যথাসময়ে উপস্থিত হয়, হাতেরলেখাও সুন্দর, কথাবার্তায়ও মার্জিত, খুব কম শিক্ষকই তার প্রশংসা করেন।

আমাদের সন্তানরা কোনো ভুল করলে তা ধরিয়ে দিতে আমরা কার্পণ্য করি না। কিন্তু তারা কোনো ভালো কাজ করলে, আমরা সেগুলোর প্রশংসা করার কোনো প্রয়োজন বোধ করি না।

এর ফলে এমন অনেক সুযোগ আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়, যেগুলো কাজে লাগিয়ে আমরা অন্যের হৃদয় জয় করতে পারতাম। কেননা, কথনদক্ষতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি হলো, মানুষের ভালো গুণগুলোর প্রশংসা করা।

আবূ মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত ও মুখস্থের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ও গুরুত্ব ছিলো। অধিক ও সুন্দর তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে তারা একে অন্যদেরকে অতিক্রম করেছিলেন।

কোনো এক সফরে তারা একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গী হলেন। সকালে সাহাবায়ে কিরামের উপস্থিতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আশআরী গোত্রের লোকজন রাতের বেলায় এলেও আমি তাদেরকে তাদের কুরআন তিলাওয়াত শুনেই চিনে নিতে পারি। যদিও আমি দিনের বেলায় তাদেরকে তাদের বাড়িতে অবস্থান করতে দেখিনি।' (বুখারী:৩৯০৬, মুসলিম:৪৫৫৫)

ভেবে দেখুন আশআরীদের অবস্থা। সকল সাহাবীর উপস্থিতিতে তারা নিজেদের প্রশংসা শুনছেন। এরপর তো তারা ভালো কাজের প্রতি আরো অধিক আগ্রহী হবেন এটাই স্বাভাবিক।

একদিন সকালে রাসূল ﷺ আবূ মুসা আশআরিকে সামনে পেলেন। রাসূল ﷺ তাকে বললেন, 'গত রাতে যদি তুমি আমাকে দেখতে তাহলে খুব খুশি হতে ! আমি কান পেতে তোমার তিলাওয়াত শুনছিলাম। তোমাকে তো দাউদ (আ.)-এর মতো কণ্ঠ দান করা হয়েছে।

রাসূল ﷺ-এর মুখে প্রশংসা শুনে আবূ মুসা আশআরী খুশি হলেন। আনন্দে আপ্লুত হয়ে তিনি বললেন, 'আমি যদি জানতাম আপনি আমার তিলাওয়াত শুনছেন তাহলে তো আরো সুন্দর করে পড়ার চেষ্টা করতাম।'

রাসূল ﷺ আবেগ-অনুভূতি ও ভালোলাগা গোপন রাখতেন না; বরং তা প্রকাশ করে দিতেন। কেউ খারাপ কিছু করে ফেললে যেমন বলতেন, 'কাজটা খারাপ হয়েছো'। তেমনি ভালো কাজের প্রশংসা করে বলতেন, 'কাজটা খুব ভালো হয়েছে।'

আমর বিন তাগলিব রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন সাধারণ সাহাবী। ইলম ও জ্ঞানে আবূ বকরের ন্যায়, হিম্মত ও সাহসিকতায় ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ন্যায়, মেধা ও স্মৃতিশক্তিতে আবূ হোরায়রার ন্যায় স্বকীয়তা যদিও তার ছিলো না, তবে তার হৃদয় ও মন ছিলো ঈমানী চেতনায় পরিপূর্ণ। রাসূল ﷺ তার এ বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ করেছিলেন।

একদিন রাসূল ﷺ বসে আছেন। তার কাছে কিছু হাদিয়া এলো। তিনি সেগুলো সাহাবীদের মাঝে বণ্টন করতে লাগলেন। হাদিয়া, সদকা, গণীমত ইত্যাদি সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর একটি সুস্পষ্ট নীতি ছিলো। বিষয়টি কেবল আনুমান নির্ভর ছিলো না।

তিনি কয়েকজনকে তাঁর কাছে আগত হাদিয়ার অংশ দিলেন, কয়েকজনকে দিলেন না। যাদেরকে দিলেন না তাদের অনেকের মনে কিছুটা কষ্ট হলো। কেউ কেউ বললেন, 'আমাদের দিলেন না কেন?'

রাসূল ﷺ বিষয়টি জানতে পারলেন। বিষয়টি বড় হয়ে দেখা দেয়ার আগেই তিনি তা দূর করতে চাইলেন। তিনি সবাইকে ডেকে কিছু কথা বলতে চাইলেন। তিনি প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা পাঠ করলেন। তারপর বললেন, 'আল্লাহর শপথ! অনেক সময় এমন হয় যে, আমি কোনো লোককে দিই, আবার কোনো লোককে দিই না। অথচ যাকে দিই না, সে-ই আমার কাছে বেশি প্রিয়পাত্র হয়ে থাকে। অনেককে আমি দিয়ে থাকি তাদের অন্তরের অস্থিরতা ও অধৈর্যভাব দূর করার জন্য। আর

অনেককে আমি তাদের অন্তরে গচ্ছিত আল্লাহ্ প্রদত্ত কল্যাণ তথা ঈমানের কাছে সমর্পণ করি। তাদেরই একজন 'আমর ইবনে তাগলিব'।'

সকলের সামনে রাসূল ﷺ-এর মুখে নিজের প্রশংসা শুনতে পেয়ে আমর ইবনে তাগলিব যারপরনাই আনন্দিত হলেন। (সহীহ বুখারী:৮৭১)

পরবর্তীতে যখনই তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন, রাসূল ﷺ-এর মোবারক মুখ থেকে নিঃসৃত এ প্রশংসাবাক্যের বিনিময়ে সোনালি উটও আমার পছন্দনীয় নয়।'

আরেকদিনের ঘটনা।

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু অগ্রসর হয়ে রাসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন, 'কিয়ামতের দিন কে আপনার সুপারিশ লাভ করে ধন্য হবে?'

নিঃসন্দেহে এটি একটি চমৎকার প্রশ্ন। 'কিয়ামত কবে হবে'- জাতীয় অহেতুক প্রশ্ন করে রাসূল ﷺ-কে বিরক্ত করার চেয়ে এ প্রশ্ন অনেক সুন্দর।

নবী কারীম ﷺ তাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, জ্ঞান অর্জনের প্রতি তোমার যে অনুরাগ আমি দেখেছি তাতে আমার ধারণা ছিলো যে, তোমার আগে কেউ আমাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করবে না। আজ আমার সে ধারণাই বাস্তব হলো। তাহলে শোনো, কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভে ধন্য হবে সে ব্যক্তি, যে নিষ্ঠাপূর্ণ অন্তরে বলবে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'

সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম। তিনি আরব বংশোদ্ভূত ছিলেন না। তার পিতা ছিলেন পারস্যের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তিনি তাকে খুব ভালোবাসতেন এবং সবসময় নিজের কাছে কাছে রাখতেন। কোনো ধরনের ক্ষতি হতে পারে এ আশঙ্কায় তিনি তাকে ঘরের বাইরে যেতে দিতেন না।

আল্লাহ্ তাআলা সালমানের হৃদয়কে ঈমানের আলোতে আলোকিত করলেন।

সালমান সত্যের সন্ধানে বের হয়ে শামের পথে যাত্রা করলেন। কিছু লোক প্রতারণা করে তাকে এক ইহুদীর কাছে গোলাম হিসেবে বিক্রি করে দিলো। এভাবে কয়েক হাত বদল হলো। তিনি সত্যের সন্ধানে অবিচল। সে এক দীর্ঘ কাহিনী। বহু হাত ঘুরে আর অনেক ঘাট পেরিয়ে অবশেষে তিনি আল্লাহর রাসূলের দরবারে পৌঁছলেন।

রাসূল ﷺ তার এই ত্যাগ ও তিতিক্ষার মূল্যায়ন করতেন।

একদিন রাসূল ﷺ সাহাবীদের সঙ্গে বসা ছিলেন। এ সময় সূরা জুমুআ নাযিল হলো। রাসূল ﷺ সাহাবীদের সামনে সূরাটি পাঠ করলেন। তিনি পড়লেন-

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ
يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

'তিনিই উম্মিদের মাঝে তাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের সামনে তার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন এবং তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান শিক্ষা দেবেন। যদিও তারা-এর পূর্বে সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিলো।' (সূরা জুমুআ:২)

এরপর রাসূল ﷺ পড়লেন-

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

এবং (এ রাসূলকে যাদের কাছে পাঠানো হয়েছে) তাদের মধ্যে আরো কিছু লোক আছে, যারা এখনও তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। আর তিনি (আল্লাহ) মহা পরাক্রমশালী, মহা প্রজ্ঞাময়। (সূরা জুমুআ:৩)

রাসূল ﷺ যখন তিলায়াত শেষ করলেন, জনৈক সাহাবী বলে উঠলেন, 'আল্লাহর রাসূল! এ আয়াতে আলোচিত লোকগুলো কারা?'

রাসূল ﷺ চুপ রইলেন।

সাহাবী আবারও প্রশ্ন করলেন, 'আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে, তারা কারা হে আল্লাহর রাসূল?'

রাসূল ﷺ এবারও কোনো উত্তর দিলেন না।

সাহাবী আবারও প্রশ্ন করলেন, 'তারা কারা হে আল্লাহর রাসূল?'

এবার রাসূল ﷺ এ পর্যায়ে হজরত সালমানের দিকে মুখ ফেরালেন। তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'ঈমান ও দ্বীন যদি সপ্তর্ষিমণ্ডলেও থাকত, তাহলেও এ বংশের কিছু লোক তা অর্জন করতে সক্ষম হতো।'

(সহীহ বুখারী:৪৫১৮, সহীহ মুসলিম: ৪৬১৮)

দৃষ্টিভঙ্গি ...

সবসময় অন্যের কল্যাণ কামনা করুন।
অন্যের প্রতি সুধারণা পোষণ করুন।
তাদেরকে উৎসাহ দিন।
যেন তারা হয় আরো গতিশীল।



৮৫. শ্রবণদক্ষতা

মানুষের মন জয় করার বিভিন্ন কৌশল রয়েছে। এক্ষেত্রে কিছু কাজ আছে যা করতে হয় আর কিছু কাজ পরিহার করতে হয়।

মুচকি হাসি যেমন মানুষকে মুগ্ধ করে তেমনি মুখ বিষন্ন করে না রাখার মাধ্যমেও মানুষ আকৃষ্ট হয়। সুন্দর কথা, জ্ঞানগর্ভ বাণী যেমন মানুষকে পুলকিত করে, তেমনি কিছু না বলে মনোযোগ দিয়ে অন্যের কথা শুনেও বক্তার হৃদয় জয় করা যায়।

এবার আসুন, যে নীরবতা মানুষকে আকৃষ্ট করে, তা নিয়ে কিছু আলোচনা করি।

কিছু কিছু মানুষ কথা বেশি বলেন না। সভা-সমিতিতে, আলোচনার টেবিলে তাদের আওয়াজ তেমন শোনা যায় না। গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখবেন, মাঝে মাঝে তিনি একটু মাথা নাড়াচ্ছেন। দু' চোখের পাতা একটু নড়ছে। কখনো কখনো মুচকি হেসে সম্মতি প্রকাশ করছেন। কিন্তু মুখে শব্দ করে কিছু বলছেন না। তবুও মানুষ তাকে ভালোবাসে। তার সঙ্গ পেতে, তার কাছে বসতে স্বচ্ছন্দ্য বোধ করে।

কেন?

কিছু না বলেও কীভাবে তিনি সকলের কাছে প্রিয়পাত্র?

নীরব থেকেও কীভাবে তিনি সবার হৃদয় মন জয় করেছেন?

কারণ, তিনি মানুষের নজরকাড়া নীরবতা চর্চা করেন। কিছু না বলেও তিনি মানুষকে কাছে টানতে জানেন।

শ্রবণ দক্ষতার বিভিন্ন ধরন রয়েছে। এ বিষয়ে উৎসাহী এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন, তিনি শ্রবণ দক্ষতার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বিষয়ে পনেরোটির বেশি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন।

তিনজন ব্যক্তির কর্মকাণ্ড তুলনা করে দেখুন।

কাউকে আপনি আপনার জীবনের একটি ঘটনা শোনাচ্ছেন। ঘটনাটি শুরু করতেই সে বলে উঠলো, 'কী বলেন, আমার জীবনেও তো এমন একটি ঘটনা ঘটেছিলো।'

আপনি তাকে বললেন,'আরে ভাই, আমাকে ঘটনাটি শেষ করতে দিন।'

এরপর আপনি বলতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ না যেতেই আবার আপনাকে থামিয়ে দিয়ে সে বললো, 'ঠিক। আমারও তো একবার এমন হয়েছিল...। আপনি বিরক্ত হয়ে বললেন 'আরে ভাই! একটু অপেক্ষা করে শুনুন।'

ফলে সে আবার কিছুক্ষণ নীরব থেকে শুনলো। কিছুক্ষণ পরই সে অধৈর্য হয়ে বলে উঠলো, 'ভাই! একটু তাড়াতাড়ি শেষ করুন।

এবার দ্বিতীয়জন।

আপনি যার সঙ্গে কথা বলেছেন। সে একবার ডানে তাকাচ্ছে, একবার বামে। এরপর পকেট থেকে মোবাইল বের করে ম্যাসেজ পড়ছে, লিখছে। কিংবা মোবাইলের গেমস খেলছে।

এবার তৃতীয়জনের পালা।

তার সঙ্গে আপনি যখন কথা বলছেন, তার স্থির দৃষ্টি আপনার প্রতি নিবদ্ধ হয়ে আছে। প্রয়োজন মতো মাথা নেড়ে সমর্থন জানাচ্ছে, কখনো মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠছে, কখনো বিস্ময়ে দু' ঠোঁট এক করে ফেলছে। কখনো আশ্চর্য হয়ে বলছে, 'সুবহানাল্লাহ!' মাশাআল্লাহ। সে কথা না বললেও তার অঙ্গভঙ্গিতে আপনি অনুভব করছেন, সে আপনার কথা পূর্ণ মনোযোগসহকারে শুনছে।

এবার বলুন, আপনি এ তিনজনের মধ্যে কার সঙ্গ কামনা করবেন? কার সঙ্গে কথা বলতে আপনার ভালো লাগবে? অবশ্যই তৃতীয়জনের সঙ্গে।

কেবল পছন্দের কথা বলেই মানুষের মন জয় করা যায় না। কারো মন জয় করতে হলে তার পছন্দের কথা শুনতেও হয়।

বিখ্যাত এক দাঈর কথা মনে পড়ছে। তিনি সর্বদা বক্তৃতা করতেন। জুমার মিম্বরে বয়ান করতেন। ফাতওয়ার মসনদে প্রশ্নের উত্তর দিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে লেকচার দিতেন।

মানুষ তাকে মিম্বরে, বক্তৃতা মঞ্চে, বিভিন্ন চ্যানেলে কথা বলতে দেখতো, আগ্রহভরে তার আলোচনা শুনতো, তাকে পছন্দ করতো।

একজন ছিলো ব্যতিক্রম। তার স্ত্রী। তিনি বাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গেই থাকতেন। কিন্তু কখনো স্ত্রীর কোনো কথা শুনতেন না, শুনতে চাইতেনও না। অভ্যাস অনুযায়ী ঘরে ও কেবল বসে থাকতেন।

তার স্ত্রী তার প্রতি খুব অসন্তুষ্ট ছিলো। কিন্তু তিনি-এর কারণ বুঝতে পারতেন না। সবাই তাকে সম্মান করে, তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ; কিন্তু স্ত্রী কেন ব্যতিক্রম?

একদিন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, স্ত্রীকে এক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে নিয়ে যাবেন। যাতে সে বুঝতে পারে, মানুষ তাকে কত ভালোবাসে।

তিনি স্ত্রীকে বললেন, 'আজ আমার সঙ্গে যাবে'?

স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায়?'

'একজন বিখ্যাত বক্তার বয়ান শুনতে।'

স্ত্রী রাজি হলো। স্ত্রীকে নিয়ে তিনি গাড়িতে উঠলেন। কিছুক্ষণ পর গাড়ি একটি মসজিদের কাছে এসে থামলো। সেখানে প্রচুর লোক সমাগম হয়েছে। সবাই এসেছেন অনন্য এ বক্তার বক্তৃতা শুনতে।

স্ত্রী মহিলা শ্রোতাদের জন্য সংরক্ষিত স্থানে গিয়ে বসলো। আর তিনি গিয়ে বসলেন বক্তার আসনে।

এরপর তিনি আলোচনা আরম্ভ করলেন। শ্রোতারা সবাই এমনকি তার স্ত্রীও মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে নীরবে আলোচনা শুনলো। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষ হলো। তিনি বেরিয়ে এসে গাড়িতে বসলেন। স্ত্রীও পাশে এসে বসলো।

স্ত্রীকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তিনি নিজেই প্রচুর লোক সমাগমের কথা ও মসজিদটির সৌন্দর্যের কথা বলতে লাগলেন।

এরপর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজকের বক্তৃতা তোমার কেমন লাগলো?'

খুব ভালো, হৃদয়গ্রাহী ও প্রভাব বিস্তারকারী। কিন্তু আলোচক কে ছিলেন?'

'আশ্চর্য! তুমি তার আওয়াজ চেননি?!'

'আসলে মানুষের ভিড় আর লাউড স্পিকারের আওয়াজ ক্ষীণ হওয়ার কারণে খেয়াল করতে পারিনি।'

'কি বলো তুমি! আমার কণ্ঠ তুমি ধরতে পারলে না? আমিই তো বক্তৃতা করলাম।' স্বামী আশ্চর্য হয়ে বললেন।

স্ত্রী বললো, 'ও! তাই তো এত দীর্ঘ সময় বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে বলছিলাম, লোকটা তো খুব বেশি কথা বলে ?

মানুষের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনাও একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। কিছু কিছু মানুষ ভুলেই যায় যে, আল্লাহ তাকে জিহ্বা দিয়েছেন একটি আর কান দিয়েছেন দু'টি। কেন? যেন সে বেশি শোনে, আর কম বলে। আমার তো মনে হয়, মানুষ যদি পারতো তাহলে এটা পরিবর্তন করে কান রাখতো একটি, আর জিহ্বা দু'টি! কারণ মানুষ শোনার চেয়ে বলতে বেশি আগ্রহী!

সুতরাং অন্যের কথা বলার সময় মনোযোগী শ্রোতা হওয়ার অভ্যাস তৈয়ার করুন। আপনার যদি কোনো মন্তব্য করার প্রয়োজনও হয়, তবুও তাড়াহুড়া না করে অপেক্ষা করুন।

নবী কারীম ﷺ-এর নবুওতপ্রাপ্তির কিছুদিন পরের কথা। মুসলমানরা তখন সংখ্যায় অল্প, হাতে গোণা কয়েকজন। কাফের মুশরিকরা রাসূলকে নানাভাবে কষ্ট দিতো। রাসূলকে গণক, মিথ্যুক , পাগল, যাদুকর ইত্যাদি বলে মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াতো। কেউ যেন রাসূল ﷺ-এর কাছে না আসে সে চেষ্টা করতো।

একদিনের ঘটনা। যিমাদ নামে এক লোক মক্কায় এলো। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক। তিনি পাগল ও যাদুগ্রস্ত রোগিদের চিকিৎসা করতেন।

মক্কায় এসে তিনি শুনতে পেলেন, কাফেরদের পাগলটা এসেছিলো। পাগলটাকে আজ দেখেছি।' এ জাতীয় কথা বলাবলি করছে।

তিনি মনে মনে বললেন, 'লোকটা কোথায়? আশা করি, আল্লাহ তাকে আমার চিকিৎসার মাধ্যমে আরোগ্য দান করবেন।'

লোকেরা তাকে দূর থেকে আল্লাহর রাসূলকে দেখিয়ে দিলো।

যিমাদ আল্লাহর রাসূলকে দেখে অভিভূত হয়ে পড়লেন। এমন নুরানী চেহারা তো কোনো পাগলের হতে পারে না। কিন্তু যিমাদ যে উদ্দেশ্যে এসেছে তা বললেন। যিমাদ তার চিকিৎসা পদ্ধতি ও দক্ষতার কথা বললেন।

আল্লাহর রাসূল চুপ করে শুনলেন।

যিমাদ বলেই চললেন।

আল্লাহর রাসূল নীরবে শুনতে থাকলেন।

এত মনোযোগ দিয়ে তিনি কী শুনছেন? শুনছেন একজন কাফেরের কথা! যে এসেছে তার 'চিকিৎসা' করতে।

আহ! কত বিচক্ষণ তিনি! কত ধৈর্যশীল!

যিমাদ তার কথা শেষ করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কোমল ও শান্ত স্বরে বললেন-

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ.

রাসূলের মোবারক মুখ থেকে নিঃসৃত পবিত্র কথাগুলো যিমাদকে প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দিলো। নম্রভাবে তিনি রাসূলকে বললেন, 'কথাগুলো আবার বলুন তো।'

রাসূল আবার বললেন।

যিমাদ বললেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি গণকদের কথা শুনেছি, যাদুকরদের তন্ত্র-মন্ত্র শুনেছি। বড় বড় কবিদের রচিত ছন্দমালাও শুনেছি। কিন্তু এমন সুগঠিত বাণী কখনো শুনিনি। এ কথাগুলো তো সাহিত্যের অতল তল স্পর্শ করেছে। আল্লাহর রাসূল! আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। আমি আপনার হাতে ইসলামের বাইআত গ্রহণ করবো।'

রাসূল হাত প্রসারিত করলেন। যিমাদ তার বুক থেকে অবিশ্বাসের পোশাক ছুঁড়ে ফেলে দিলেন আর বারবার পড়তে লাগলেন, 'আশহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহ।'

আল্লাহর রাসূল জানতে পারলেন, তিনি নিজ সম্প্রদায়ের একজন **সম্মানিত** ব্যক্তি। গোত্রের লোকদের ওপর তার অনেক প্রভাব আছে। **তাই** তিনি তাকে বললেন, 'আপনি আপনার সম্প্রদায়কে ইসলামের **দাওয়াত** দেবেন।'

যিমাদ বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি তাদেরকেও দাওয়াত দেবো।'

এরপর তিনি তার গোত্রের জন্য একজন পথপ্রদর্শক ও দাঈ হয়ে ফিরে **গেলেন**। (সহীহ মুসলিম:১৪৩৬, মুসনাদে আহমদ: ২৬১৩)

আপনিও একজন দক্ষ শ্রোতা হতে চেষ্টা করুন। অন্যের কথার সময় নীরব **থাকুন**। কথার সমর্থনে মাথা নাড়ুন। বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে আবেগ **অনুভূতি প্রকাশ** করুন। স্থান উপযোগী অঙ্গভঙ্গি করুন। কখনো কপাল **ভাঁজ** করে, কখনো ভ্রুজোড়া উঁচু করে, কখনো মুচকি হেসে, আবার **কখনো** বিস্ময়ে দু' ঠোঁট হালকা নাড়িয়ে আপনার আবেগ ও অনুভূতি **প্রকাশ করুন**।

শিশু-বৃদ্ধ **যারাই** আপনার সঙ্গে কথা বলে, সবাই যেন প্রভাবিত হয়। তাদের দৃষ্টি যেন আপনার দিকেই ধাবিত হয়, তাদের হৃদয় যেন আপনার হাতের মুঠোয় চলে আসে।

ফলাফল ...

অন্যের কথা মনোযোগসহ শোনার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

তাহলে তারা আপনাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসবে।



৮৬. বিতর্কদক্ষতা

একটু চিন্তা করে দেখুন, এমন কোনো ঘটনার কথা কি আপনার মনে পড়ে যে, কারো সঙ্গে আপনার কথা কাটাকাটি হয়েছিলো আর এ কারণে দীর্ঘদিন আপনার অন্তরে সে লোকটির ব্যাপারে ক্ষোভ ছিল? অথবা আপনি কোথাও দেখেছেন যে, 'দুজন লোক তুচ্ছ কোনো বিষয়ে তর্কে জড়িয়ে পড়েছে। তুচ্ছ বিষয়ের সে তর্ক এক সময় প্রচণ্ড বিতর্কের রূপ নিয়েছিলো আর ধীরে ধীরে তাদের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে গিয়েছিলো।-এরপর তারা চোখ মুখ লাল করে ঝগড়া করেছিলো। অবশেষে তারা একে অপরের প্রতি মারাত্মক ক্ষোভ আর চরম কষ্ট নিয়ে পৃথক হয়েছিল।

হয় তো এ ধরনের কোনো ঘটনা আপনার জীবনে ঘটেছে অথবা আপনি নিজে এ ধরনের কোনো ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছেন।

আমরা বিভিন্নভাবে মানুষের মন জয় করতে চেষ্টা করি। কিন্তু অনেক সময় আমরা এমন কাজ করে ফেলি যা আমাদের পূর্বের সব অর্জনকে ব্যর্থ করে দেয় এবং আমরা একে অপর থেকে দূরে সরে যাই।

কথা বলার ভঙ্গি আর বিতর্কের ক্ষেত্রে অপরিপক্কতা ও অপরিণামদর্শিতার কারণে এমন হতে পারে।

একজন তর্ককারীকে দুর্গম পর্বতে আরোহণকারীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। পবর্ত আরোহীকে একই সঙ্গে তার হাত ও পায়ের অবস্থানের প্রতি লক্ষ রাখতে হয়। পর্বত আরোহী যে পাথরটি ধরতে চাচ্ছে, সতর্ক দৃষ্টিতে সেটাকে যাচাই করে। পাথরটিতে হাত রাখার আগে সেটি কতটুকু শক্ত, কতটা ভার বহনে সক্ষম তা যাচাই করে। তারপর তাতে হাত দেয়।

তদ্রুপ পরবর্তীতে যে পাথরে পা রাখবে সেটিও ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে। পা উঠিয়ে অন্য পাথরে রাখার আগে যে পাথরে পা আছে সেটিও ভালোভাবে দেখে নেয়। সঠিকভাবে পা ওঠাতে না পারলে পাথরসহ নীচে পড়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে। এভাবে তার প্রতিটি পদক্ষেপ যথেষ্ট চিন্তা করে নিতে হয়।

আমি আলোচনা দীর্ঘ করতে চাই না। যে আলোচনা সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারগর্ভ তা-ই উত্তম।

তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়া কোনো ভালো কাজ নয়। আমাদের ৯০%-এর বেশি তর্ক-বিতর্ক হয় অপ্রয়োজনীয়। এসব তর্কের কোনো সমাধান বা কোনো অবদান নেই। আমার মনে হয় আপনি এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত হবেন। তাই যথাসম্ভব তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলতে সর্বাত্মক চেষ্টা করুন।

কেউ আপনার কোনো কথায় আপত্তি করে বসলো কিংবা আপনার পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাধাতে চাইলো, আপনি উত্তেজিত হবেন না।

আপনি বিষয়টি যথাসম্ভব সহজভাবে নিন।

আপত্তিকারীর দুরভিসন্ধি নিয়ে ভেবে অযথা নিজেকে কষ্ট দিতে যাবেন না।

সে কেন আমাকে এ কথাটি বললো? কেন সবার সামনে আমাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেললো? শুধু শুধু এসব চিন্তা করে নিজেকে শেষ করে দেবেন না। শান্তভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করুন। বাতাসের ঝড়-ঝাপটায় তো ছোট ছোট নুড়ি স্থানচ্যুত হয়। আপনি তো আর নুড়ি নন। আপনি তো বিশাল পাথর কিংবা অবিচল পাহাড়। বাতাসে আপনি কেন স্থানচ্যুত হবেন?

কোরাইশরা হোদায়বিয়ার সন্ধির চুক্তি ভঙ্গের পর রাসূল ﷺ মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন যেন কোরাইশদের অগোচরে, তারা যুদ্ধ প্রস্তুতির সুযোগ পাওয়ার আগেই মক্কা নগরীতে প্রবেশ করতে পারেন।

রাসূল ﷺ মক্কার কাছাকাছি পৌঁছে এক স্থানে সামান্য সময়ের যাত্রাবিরতি করলেন। কোরাইশরা এ অভিযানের ব্যাপারে কিছুই জানলো না। তারা অবশ্য প্রতিদিন গোপনে খোঁজ-খবর নিতো এবং নিয়মিত টহল দিতো।

রাসূল ﷺ যে রাতে যাত্রাবিরতি করলেন সে রাতেও আবূ সুফিয়ান কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে সংবাদ সংগ্রহের জন্য বের হলো। কোনো সংবাদ আসে কিনা, কোনো কিছু পাওয়া যায় কিনা সে-এর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

এদিকে রাসূল ﷺ সকালের অপেক্ষা করছেন। প্রভাত হলেই তিনি মক্কায় প্রবেশ করবেন, কোরাইশদের ওপর হামলা করবেন।

এ অবস্থা দেখে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বগতোক্তি করতে লাগলেন, 'হায়! জানি না কাল প্রভাতে কোরাইশদের জন্য কী অপেক্ষা করছে! আল্লাহর শপথ!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি শক্তিবলে মক্কায় প্রবেশ করেন, আর যদি কোরাইশরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আগেভাগেই আত্মসমর্পণ না করে, তাহলে তো কাল সকালে কোরাইশ সম্প্রদায় চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে।'

আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বাইরে বের হওয়ার অনুমতি চাইলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিলেন। তিনি রাসূলের সাদা খচ্চরের ওপর আরোহণ করে চলতে লাগলেন।

আবূ সুফিয়ান তার সঙ্গীদের নিয়ে খোঁজ–খবর নিতে নিতে মুসলিম বাহিনীর খুব কাছে চলে এলো। হঠাৎ মুসলিম বাহিনীর প্রজ্জ্বলিত আগুন তাদের নজরে পড়লো। সে বলতে লাগলো, 'আজকের রাতের মতো এতো আগুন, আর এতো বড় সেনাবাহিনী তো আর কখনো দেখিনি! কত বড় এই দল! কারা-এরা? আবূ সুফিয়ানের এক সঙ্গী বললো, 'শপথ আল্লাহর! মনে হচ্ছে-এরা খোজাআ গোত্রের। যুদ্ধের জন্য তো ওরা টগবগ করছে।'

আবূ সুফিয়ান বললো, 'না, খোযাআ গোত্র তো আরো ছোট। তাদের লোকবল তো-এরচেয়ে অনেক কম। এখানে তো অনেক মশাল! অনেক বড় বাহিনী!

আবূ সুফিয়ান ধীরে ধীরে আরো কাছে চলে এলো। একপর্যায়ে সে মুসলিম রক্ষীদের হাতে ধরা পড়লো। তারা তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়ে চললো।

এদিকে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খচ্চরে চড়ে চলতে চলতে ঠিক সেখানেই পৌঁছলেন, যেখানে মুসলিম রক্ষীরা আবূ সুফিয়ান ও তার সঙ্গীদেরকে আটক করেছে। ভীত-সন্ত্রস্ত আবূ সুফিয়ান আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখে তার কাছে ছুটে এলো এবং তার খচ্চরের পেছনের চড়ে বসলো। পেছনে পেছনে তার সঙ্গীরাও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটতে লাগলো। মুসলিম রক্ষীরা পেছন থেকে তাদের অনুসরণ করলেন।

আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আবূ সুফিয়ানকে নিয়ে দ্রুত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছুটে চললেন। যখনই তারা মুসালমানদের কোনো ছাউনি অতিক্রম করছিলেন, মুসলমানরা জিজ্ঞেস করছিলেন, 'ইনি কে?'

কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খচ্চর ও আব্বাসকে দেখে তারা বলছিলেন, 'ও! রাসূলের চাচা, রাসূলের খচ্চরে চড়ে যাচ্ছেন।'

কেউ যেন আবূ সুফিয়ানকে চিনে ফেলতে না পারে, এজন্য আব্বাস তাকে নিয়ে দ্রুত ছুটে চললেন। একসময় তারা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। ওমর জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটা কে?'-এরপর তিনি তাদের কাছে গেলেন। কাছে গিয়ে যখন তিনি খচ্চরের পেছনে বসা আবূ সুফিয়ানকে দেখতে পেলেন, সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন, 'আল্লাহর দুশমন আবূ সুফিয়ান! আলহামদুলিল্লাহ! প্রশংসা আল্লাহর, যিনি কোনো চুক্তি বা অঙ্গীকার ছাড়াই তোমাকে আমাদের হস্তগত করেছেন।'

আব্বাস তাকে কিছু করতে নিষেধ করলেন। ওমর দ্রুত তাদের পিছে পিছে চললেন। আব্বাস খচ্চরে চড়ে আরো দ্রুত চলেছেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ওমরের আগেই পৌঁছে গেলেন। তিনি বাহন থেকে নেমে রাসূলের কাছে উপস্থিত হতে না হতেই ওমরও সেখানে পৌঁছলেন। তিনি সেখানে পৌঁছেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! এ যে আবূ সুফিয়ান। আল্লাহ তাআলা একে কোনো চুক্তি বা অঙ্গীকার ছাড়াই আমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন। আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি-এর গর্দান উড়িয়ে দেই।'

এ সে আবূ সুফিয়ান ! যে মুসলমানদের অনেক ক্ষতি করেছে! ওহুদ যুদ্ধে সে-ই মুশরিক বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছে। খন্দক অভিযানে কাফের বাহিনীকে পরিচালনা করেছে। বহুবার সে মুসলমানদের সংকটে ফেলেছে। হত্যা করেছে, নির্যাতন করেছে। আজ সে মুসলমানদের হাতে বন্দী।

আব্বাস বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে নিরাপত্তা দিয়েছি।'

এরপর আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বসে কানে কানে কিছু বললেন। ওদিকে হজরত ওমর বারবার বলছিলেন, 'আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই।'

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন বারবার একই কথা বলে যাচ্ছিলেন, আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওমর! থামো। আল্লাহর শপথ! সে যদি আদি বিন কা'বের বংশের হতো তাহলে আজ তুমি এ কথা বলতে না।'

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এ কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, এমন এক বিতর্কে তারা জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছেন, যা বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের জন্য সমীচীন নয়। তাছাড়া বনু কা'বের লোক

হলে তার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তিনি আগ্রহী হতেন, অন্য বংশের বলে গুরুত্ব দিচ্ছেন না এমন একটি বিষয় নিয়ে এখন বিতর্ক করার সময় নয়।

ওমর একেবারে শান্ত স্বরে বললেন, 'থামুন, আপনি থামুন। আল্লাহর শপথ! আপনি যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেছেন সেদিন আপনার ইসলাম গ্রহণ আমার কাছে আমার পিতা খাত্তাবের ইসলাগ গ্রহণের চেয়ে বেশি কাম্য ছিলো। কারণ, আমি জানতাম, রাসূল ﷺ-এর কাছে খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণের চেয়ে আপনার ইসলাম গ্রহণ বেশি কাম্য ছিলো।'

এ কথা শুনে আব্বাস একেবারে নীরব হয় গেলেন।

সম্ভাব্য বিতর্ক এখানেই শেষ হয়ে গেলো।

অথচ ওমর চাইলে কথা দীর্ঘ করতে পারতেন। তিনি বলতে পারতেন, 'কী বলতে চাচ্ছেন আপনি?! আপনি আমার আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে চাচ্ছেন?! আমার অন্তরে কী আছে তা কি আপনি জানেন?! আপনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে চাচ্ছেন।

কিন্তু তিনি এসব কিছুই বললেন না। সাহাবায়ে কিরাম এ জাতীয় শয়তানি প্ররোচনা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে থাকতেন।

ওমর ও আব্বাস উভয়ে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

আর আবূ সুফিয়ান? রাসূল ﷺ তার ব্যাপারে কী নির্দেশ দেন, তা শোনার অপেক্ষায় সে রাসূল ﷺ-এর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

রাসূল ﷺ আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, 'আব্বাস! একে আপনার তাঁবুতে নিয়ে যান। সকালে আমার কাছে নিয়ে আসবেন।'

আব্বাস তাকে নিজের তাঁবুতে নিয়ে গেলেন। সেখানেই সে রাত কাটালো। সে রাতে আবূ সুফিয়ান ফজরের সময়ই জেগে উঠলো। সে দেখলো, সকলে নামাযের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ওজু করার জন্য এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ছে। সে হজরত আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী ব্যাপার?- এরা কী করছে?-এরা এভাবে ছুটোছুটি করছে কেন? 'মুআযযিনের আজান শুনে-এরা নামাযের প্রস্তুতি নিচ্ছে।' আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন।

নামাযের সময় হলে সাহাবীরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। রাসূল ﷺ সামনে অগ্রসর হয়ে সবাইকে নিয়ে নামায আদায় করলেন।

আবূ সুফিয়ান অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল। দশ হাজার সাহাবী রাসূল ﷺ-কে অনুসরণ করে একসঙ্গে রুকু করছে, রাসূল ﷺর সেজদার সঙ্গে সেজদা করছে। রাসূল ﷺ-এর প্রতি সাহাবীদের এ একনিষ্ঠ 'আনুগত্য তাকে মুগ্ধ করলো।

নামায শেষে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে রাসূল ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য এলেন। আবূ সুফিয়ান আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলো, 'আব্বাস! মুহাম্মাদ তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়, তারা কি তাই পালন করে?'

আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! রাসূল ﷺ যদি তাদেরকে পানাহার করতেও নিষেধ করেন তারা পানাহার করবে না।'

আবূ সুফিয়ান বললো: 'আব্বাস! আজ আমি মুহাম্মদের অনুসারীদের মধ্যে যেমন আনুগত্য দেখলাম, জীবনে কোথাও-এরূপ দেখিনি। রোম ও পারস্যবাসীকেও তাদের সম্রাটদের-এরূপ আনুগত্য করতে দেখিনি।'

আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে নিয়ে রাসূলের দরবারে উপস্থিত হলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ আবূ সুফিয়ানকে বললেন, 'ধিক হে আবূ সুফিয়ান! এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক না করার এখনো কি সময় হয়নি?'

আবূ সুফিয়ান স্পষ্টভাষায় বললো, 'আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক! আপনি অনেক ধৈর্যশীল, অনেক সম্মানি, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী। তবে এ বিষয়ে এখনো আমার মনে কিছুটা সংশয় আছে।'

আব্বাস বললেন, 'হে আবূ সুফিয়ান! তুমি কল্যাণের ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করে নাও। তুমি সাক্ষ্য দাও, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।'

আবূ সুফিয়ান চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবলো। এরপর বললো, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।'

আবূ সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইসলাম গ্রহণে রাসূল ﷺ অত্যন্ত খুশি হলেন।

এরপর আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আবূ সুফিয়ান নেতৃস্থানীয় মানুষ। তিনি মর্যাদা লাভের অভিলাসী। তাই তাকে বিশেষ কোনো মর্যাদায় অভিষিক্ত করুন।'

রাসূল বললেন, 'হ্যাঁ, আবূ সুফিয়ানের ঘরে যে আশ্রয় নেবে, সে নিরাপত্তা লাভ করবে।'

এ কথা শুনে আবূ সুফিয়ান রাসূল ﷺ-এর সামনে কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করে বিগত দিনের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

তিনি আবৃত্তি করলেন-

অর্জিত ভাবনা...

বিতর্কে জয়ী হওয়া বিচক্ষণতা নয়...
বিচক্ষণতা হলো বিতর্কে না জড়ানো।

তিনি আবৃত্তি করলেন,
ভেবেছিলাম আমি লাত মানাতের জয় হবে নিশ্চয়,
মুহাম্মদ তো মিথ্যাশ্রয়ী, নিশ্চিত তার পরাজয়।
লাত মানাতের পক্ষে যে তাই ধরেছিলাম হাতিয়ার,
ধ্বংস করিতে মুহাম্মদকে করেছি চেষ্টা দুর্নিবার।
হায়! মিথ্যার তরে করিয়া লড়াই জীবন করলাম ক্ষয়
মুহাম্মদই সত্যাশ্রয়ী, মূর্তি কিছুই নয়।
পথভোলা এক পথিক আমি, পথ দেখালেন মোরে
এড়িয়ে গিয়ে যাকে আমি ঘুরেছি অন্য দ্বারে।
তিনি আমায় করলেন ক্ষমা, জুড়লেন প্রভুর সনে।
পথের সন্ধান পেলাম আমি, দুঃখ নাই আর মনে।

বর্ণিত আছে, আবূ সুফিয়ান যখন কবিতার 'এড়িয়ে গিয়ে যাকে আমি ঘুরেছি অন্য দ্বারে।'

এ অংশটুকু আবৃত্তি করছিলেন, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তার বুকে মৃদু আঘাত করে বলেছিলেন, 'তুমিই তো আমাকে প্রতি মুহূর্তে এড়িয়ে গিয়েছিলে।'



৮৭. বিতর্কের পথ আগেই বন্ধ করে দিন

আমাদের মনে অন্যের প্রতি যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয় এগুলোর বেশির ভাগই হয়ে থাকে জিহ্বার আঘাতের কারণে।

একজন কোনো বিষয়ে কথা বলছে, কোনো কিছু না বুঝে হঠাৎ অন্য কেউ আপত্তি করে বসে। কথার মাঝে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে সৃষ্টি হয় তর্ক-বিতর্ক। আর-এর পরিণামে পরস্পরে বিদ্বেষ ও মনোমালিন্য তৈরি হয়।

আপনি পৃথিবীর সব মানুষকে সংশোধন করতে, সবাইকে শিষ্টাচারে অভ্যস্ত করতে এবং সবাইকে উন্নত ও উত্তম আচরণে অভ্যস্ত করতে পারবেন না।

আসুন আমরা আদর্শবাদী মানসিকতা ত্যাগ করি। কিছু কিছু মানুষ সারাক্ষণ কেবল বলতে থাকে, 'মনে করুন, মানুষ এমন করে। মনে করুন, মানুষ এমন করে অভ্যস্ত ইত্যাদি। আমরা এ ধরনের পরিত্যাগ করে 'উপস্থিত লাশের জানাযা আগে আদায় করে নিই'। এর দ্বারা আমি বলতে চাচ্ছি , কেউ যখন আমার সঙ্গে কোনো ভুল করবে তখন তার কী করণীয় সে চিন্তায় ব্যস্ত না হয়ে, আমার নিজের করণীয় কী তা নিয়ে চিন্তা করব।

মনে করুন, আপনি কাউকে নতুন বা আশ্চর্যজনক কোনো কিছু বলবেন। আপনার মনে হচ্ছে এটা শুনে কিছু লোক আপত্তি বা প্রশ্ন করতে পারে। তখন আপনার করণীয় হলো, সে কথাটি বলার আগেই আপনি তাদের আপত্তির পথ বন্ধ করে দেবেন। শুরুতেই আপনি ভূমিকা হিসেবে এমন কিছু কথা বলে নেবেন, যাতে সম্ভাব্য সকল আপত্তির উত্তর থাকে, তাদের মনে এসব প্রশ্ন যেন উদয়ই না হয়। বিষয়টি যেন তাদের কাছে আশ্চর্যজনক মনে না হয়।

কিছু কিছু মানুষ চমৎকারভাবে এ কাজটি করতে পারেন। আপত্তি করার আগেই তারা শ্রোতার আপত্তির পথ বন্ধ করে দেন।

এ প্রসঙ্গে জনৈক বয়স্ক ব্যক্তির একটি ঘটনা মনে পড়ছে। একটি মজলিসে তিনি তার নিজের দেখা একটি ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। ফিলিং স্টেশনে দু'জন লোকের মধ্যে অতি সাধারণ একটি বিষয়ে কথা কাটাকাটি হলো। একটু পরে তা চরম আকার ধারণ করলো এবং এক পর্যায়ে বিষয়টি থানা

পুলিশ পর্যন্ত গড়ালো। তার বলা শেষ হতে না হতেই সেখানে উপস্থিত এক বাচাল লাফিয়ে উঠলো। সে বললো, 'ঘটনাটা ঘটেছিলো। তবে আপনি যেভাবে বললেন, ঘটনাটা বাস্তবে সেভাবে ঘটেনি। ঘটনাটা বরং এভাবে ঘটেছিলো। আর মূলত ভুল করেছিলো অমুক।'

এরপর সে পুরো ঘটনার এমন বিবরণ দিতে লাগলো, যা মূলত ঘটেইনি! বৃদ্ধ তার দিকে তাকালেন। আমার মনে হচ্ছিলো, এ বুঝি তিনি ফেটে পড়বেন। কিন্তু তিনি নিজেকে সংযত রাখলেন। এরপর শান্ত স্বরে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি কি ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলে?'

: 'না'।

: 'সেখানে যারা উপস্থিত ছিলো তারা কেউ কি তোমাকে ঘটনাটি শুনিয়েছে?'

: 'না'।

: তাহলে কি কোনো সংবাদ মাধ্যম কিংবা তদন্তসংস্থার মাধ্যমে ঘটনাটি জেনেছো?'

'না'।

এবার বৃদ্ধ চিৎকার করে উঠলেন। তিনি বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার! ঘটনার ব্যাপারে তুমি কিছুই জানো না, তাহলে কীভাবে আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে!

বৃদ্ধের উপস্থাপনা কৌশল আমাকে মুগ্ধ করলো। তিনি আপত্তি করার আগে ভূমিকা পেশ করলেন। এভাবে **ভূমিকা পেশ না করে তিনি যদি** সরাসরি আপত্তি করতেন তাহলে তার **মুখ বন্ধ করতে পারতেন না**। সে তখন মিথ্যা বলে কৌশলে বেঁচে যেতো।

অনেক সময়ই আমরা এ ধরনের **পরিস্থিতির মুখোমুখি** হই। কোনো বিষয় প্রমাণ করতে চাইলে তার পূর্বে এমনভাবে ভূমিকা পেশ করবেন যেন সুযোগসন্ধানীদের আপত্তি করার কোনো সুযোগই না থাকে।

বদর যুদ্ধের ঘটনা। কোরাইশরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রওয়ানা হলো। তবে কোরাইশদের সাথে এমন কিছু ব্যক্তিও ছিলো, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আগ্রহী ছিলো। না। সামজিক চাপে তারা বদর প্রান্তরে উপস্থিত হতে বাধ্য হয়েছিলো।

রাসূল ﷺ তাদের ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন যে, তারা যুদ্ধের ময়দানে হাজির হলেও তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তরবারি ওঠাবে না। তাই বদর প্রান্তরের কাছাকাছি এসে তিনি সাহাবায়ে কেরামকে এ বিষয়ে অবগত করতে এবং তাদের কেউ মুসলমানদের সামনে পড়ে গেলে তার ওপর হামলা করতে নিষেধ করতে চাইলেন। কিন্তু রাসূল ﷺ জানতেন, এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কারো কারো মনে কিছু প্রশ্ন জাগতে পারে।

কেউ বলতে পারে: 'তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এসেছে; তবুও কেন আমরা তাদেরকে হত্যা করতে পারবো না?'

'কেন আল্লাহর রাসূল নির্দিষ্ট কয়েকজনকে বিশিষ্ট করলেন?'

এমন নানা ধরণের প্রশ্ন তাদের মনে জাগতে পারে। তাই এসব প্রশ্নের উত্তর আগেই দিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ একটি ভূমিকা পেশ করলেন। এরপর মূলকথা বললেন। তিনি কীভাবে তা বলেছিলেন?

রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কিরামের সামনে দাঁড়িয়ে ভূমিকাস্বরূপ বললেন, 'আমি জানতে পেরেছি, বনু হাশেম ও অন্যান্য গোত্রের কিছু লোক সামাজিক চাপে বাধ্য হয়ে এখানে হাজির হয়েছে। তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আগ্রহী নয়।'

ভূমিকা শেষ হলো।

এরপর বললেন, 'কেউ বনু হাশেমের কারো মুখোমুখি হলে তাকে যেন হত্যা না করে।'

'কেউ আবূল বুখতারী বিন হিশাম বিন হারিস বিন আসাদের মুখোমুখি হলে তাকে যেন হত্যা না করে।'

'আমার চাচা আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবকে দেখলেও যেন কেউ তাকে হত্যা না করে। কারণ, সে বাধ্য হয়ে এসেছে।'

সাহাবায়ে কিরাম রাসূলের কথা মেনে নিলেন। তবে নিজেদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হতে লাগলো। আবূ হুযায়ফা বিন ওতবা বিন রাবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আগ পর না ভেবে বলে বসলেন,'আমরা আমাদের পিতা, পুত্র ও ভাইদেরকে হত্যা করবো আর আব্বাসকে ছেড়ে দেবো! আল্লাহর কসম! আমি যদি তার দেখা পাই, তাহলে আমার তরবারি তাকে দেখে নিবে।'

তার এ কথাগুলো রাসূল ﷺ-এর কানে পৌঁছলো।

আল্লাহর রাসূল ﷺ এ কথা শুনে ওমরের দিকে তাকিয়ে 'আবূ হাফস!' বলে তাকে ডাকলেন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আল্লাহর কমস! সেদিনই প্রথম রাসূল ﷺ আমাকে 'আবূ হাফস' উপনামে সম্বোধন করলেন।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'আবূ হাফস! আল্লাহর রাসূলের চাচার চেহারায় তরবারি দিয়ে আঘাত করা হবে?!'

রাসূল ﷺ-এর এ মন্তব্যটি ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিলো। তার কাছে কথাটি খুব খারাপ লাগলো। কত বড় দুঃসাহস! আবূ হুযাইফা রাসূল ﷺ-এর নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করলো! সে কি মুসলমান নয়! নাকি সে মুনাফিক হয়ে গেছে?

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। আল্লাহর কসম! সে তো মুনাফিক হয়ে গেছে।'

আবূ হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু সাদা মনের মানুষ ছিলেন। আকস্মিক উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে তিনি কথাটি বলে ফেলেছিলেন। পরক্ষণেই তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন। পরবর্তীতে তিনি বলতেন, 'আমি সেদিন যে কথা বলেছিলাম, তার কারণে আজও আমার আশঙ্কা হয়। আজও আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করি না। আর আমি ততদিন ভীত-সন্ত্রস্তই থাকবো, যতদিন না শাহাদাত লাভের মাধ্যমে আমার এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে।'

পরবর্তীতে তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

একটি উপদেশ ...

বিচক্ষণ হোন ...

অন্যরা আপনাকে রাতের খাবার বানাতে চায়?!

আপনি তাদেরকে দুপুরেই খেয়ে ফেলুন!



৮৮. আপত্তি করার আগে একটু ভাবুন

জনৈক আলোচক বিতর্কদক্ষতা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আলোচনার **এক পর্যায়ে তিনি** ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনার কিছু অংশ তুলে ধরলেন। এ **প্রসঙ্গে তিনি** তিলাওয়াত করলেন-

وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ؕ قَالَ اَحَدُهُمَاۤ اِنِّیۡۤ اَرٰىنِیۡۤ اَعۡصِرُ خَمۡرًا ۚ وَ قَالَ الۡاٰخَرُ اِنِّیۡۤ اَرٰىنِیۡۤ اَحۡمِلُ فَوۡقَ رَاۡسِیۡ خُبۡزًا تَاۡكُلُ الطَّیۡرُ مِنۡهُ ؕ نَبِّئۡنَا بِتَاۡوِیۡلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الۡمُحۡسِنِیۡنَ.

অর্থঃ ইউসুফের সঙ্গে আরও দু'জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করলো। **তাদের একজন** বললো, আমি স্বপ্নে দেখলাম, মদ বানাতে আঙুর **নিংড়াচ্ছি**। আর অপরজন বললো, আমি স্বপ্নে দেখলাম, মাথায় করে রুটি **বহন করে চলছি**। আর পাখিরা তা থেকে ঠোকর মেরে খাচ্ছে।

(সূরা ইউসুফ:৩৬)

সম্মানিত **আলোচক** কিছুক্ষণ চুপ থেকে উপস্থিত সকলের ওপর দৃষ্টি ফেরালেন।

এরপর **তাদেরকে প্রশ্ন** করলেন: বলুন তো কে আগে প্রবেশ করেছিল? **ইউসুফ (আ.)** না দুই যুবক?

শ্রোতাদের একজন উচ্চস্বরে বলে উঠলো, 'ইউসুফ'।

তার উত্তরের প্রতিবাদ করে জোর গলায় আরেকজন বললো, 'না, না। বরং **দুই যুবক** আগে প্রবেশ করেছে।'

তৃতীয় আরেকজন বললো, 'না, না। ইউসুফ। ইউসুফই আগে প্রবেশ করছে।' চতুর্থ জন বুদ্ধি খাটিয়ে বললো, 'তারা সবাই একসঙ্গে প্রবেশ করেছে।'

পঞ্চম একজন কিছু বলার জন্য চিৎকার করে উঠলো। শুরু হয়ে গেল শোরগোল। এমনকি আলোচনার মূল বিষয়বস্তু সবাই ভুলে গেলো।

আলোচক মহোদয় উপস্থিত শ্রোতাদের ওপর দৃষ্টি ফেরাতে লাগলেন। সময় কেটে যাচ্ছে।

এবার তিনি সবার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে ইশারায় সবাইকে নীরব হতে বললেন। এরপর বললেন, 'যুবকদ্বয় হয়তো আগে প্রবেশ করেছে অথবা ইউসুফ আগে প্রবেশ করেছে। এতে সমস্যা কী হলো? এ বিষয়টি কি এভাবে বিবাদ বিতর্কে জড়ানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ?'

আসলে আমাদের বাস্তব জীবনে তাকালে আমরা দেখবো, আমরা অন্যদের কথার মাঝে অনর্থক অভিযোগ আপত্তি করে পরিণামে আমরা অনর্থক বিবাদে জড়িয়ে পড়ি। কখনো দেখা যায়, কেউ আগ্রহ নিয়ে একটি ঘটনা বলছে। কিন্তু কথা শুরু করতেই আরেকজন এমন এক আপত্তি করে বসে, যার সঙ্গে ঘটনার তেমন কোনো সম্পর্ক নেই।

তাই অন্যের কথায় হস্তক্ষেপ করে অন্যের কাছে বোঝা হবেন না। আলোচনার মাঝে আপত্তি করে অন্যের বিরক্তির কারণ হবেন না।

আমার ভাই সাউদের একটি ঘটনা। সে তখন ছোট, সাত বছরের বালক। একদিন এশার নামায পড়তে সে মসজিদে গেলো। সে একটু আগেই গিয়েছিলো আর ইমাম সাহেব আসতে একটু বিলম্ব করেছিলেন।

এ বিলম্বের কারণে সে বিরক্ত হয়ে গেল। সে মসজিদের মুয়াজ্জিন ছিলেন বয়োবৃদ্ধ এবং তিনি কানে একটু কম শুনতেন। সাউদ মুআজ্জিন সাহেবের কাছে পেছনে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে নিজের নাক চেপে ধরে কণ্ঠস্বর একটু পরিবর্তন করে বললো, 'কাতার সোজা করুন!-এরপর দৌড় দিয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল।! এ দিকে মুআজ্জিন সাহেব 'কাতার সোজা করুন! আওয়াজ শুনতেই ইমাম সাহেব এসেছেন মনে করে ইকামত দিতে উদ্যত হলেন। তখন কয়েকজন মুক্তাদী তাকে প্রকৃত বিষয়টি অবগত করলো। এবার তিনি বসে পড়লেন। রাগে কটমট করতে করতে তিনি এদিক সেদিক তাকাচ্ছিলেন আর ভাবছিলেন, দুষ্ট ছেলেটাকে যদি হাতের কাছে পেতাম ...!'

ঘটনাটিতে হাসির খোরাক আছে।

কিন্তু পাঠককে হাসানোর জন্য আমি ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করিনি। আমার উদ্দেশ্য হলো এ ঘটনার পরবর্তী ঘটনা!

কিছুদিন পর এক মজলিসে আমার উপস্থিতিতেই জনৈক ব্যক্তি এ ঘটনাটি উপস্থিত সবাইকে শোনালো। ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে একপর্যায়ে সে বললো, 'সাউদের বেশ তাড়া ছিলো। কারণ নামাযের পরই সে তার বাবার সঙ্গে সমুদ্রতীরে বেড়াতে যাবে।'

তার কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমাদের রিয়াদে তো কোনো সমুদ্রই নেই! রিয়াদ শহর গড়ে উঠেছে-এরুভূমির মাঝে, সমুদ্র উপকূলে নয়। আমি মনে মনে ভাবছিলাম, ভুল ধরিয়ে দিয়ে তার বলার আনন্দটাকে নষ্ট করে দেবো, নাকি চুপ থাকবো? অনর্থক আপত্তি করে বক্তার মনে বিরক্তি ও ক্ষোভ তৈরি না করার উদ্দেশ্যে আমি দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিয়ে চুপ থাকলাম।

অনেক সময় আমরা না বুঝেই কোনো বিষয়ে আপত্তি করে বসি। অথচ হতে পারে, তার কোনো ওজর আছে। শেষে দেখা যাবে, বিনা কারণে আমরা তাকে তিরস্কার করলাম।

যিয়াদ ছিলো খুব ভালো একজন লোক। সে সবসময় মানুষকে সুদপদেশ দিতে চেষ্টা করতো। গাড়ি চালানোর সময় একদিন সে ট্রাফিক সিগন্যাল আটকা পড়লো। হঠাৎ তার কানে ভেসে এলো উচ্চ গ্রামের পশ্চিমা সঙ্গীতের আওয়াজ! সে এ আওয়াজের উৎস খুঁজতে লাগল?

হঠাৎ দেখলো, তার পাশের গাড়ি থেকেই এ আওয়াজ আসছে। এরই মধ্যে ভলিয়ম আরো বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। দূরের কাছের সবাই শুনতে পাচ্ছে এ বিকট আওয়াজ।

যিয়াদ বারবার হর্ণ বাজিয়ে পাশের গাড়ির চালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করলো যেন সে ভলিয়ম কমিয়ে দেয়। কিন্তু লোকটি ফিরেও তাকালো না, ভলিয়মও কমালো না। মনে হলো, গানের মাঝে সে এমনভাবে ডুবে আছে যে, আশপাশের কোনো কিছুর খবরই তার নেই।

যিয়াদ তার গাড়ি এগিয়ে ড্রাইভারের চেহারা দেখার চেষ্টা করলো। ড্রাইভার তার চেহারার দু'পাশে রুমাল ফেলে রেখেছিলো। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর সে ড্রাইভারের চেহারা দেখতে সক্ষম হলো। এ কী! দাড়িবিশিষ্ট নুরানি চেহারা!

তার রাগ আরো বেড়ে গেল। এমন দাড়িশোভিত নুরানি চেহারার একজন মানুষ কুরআন তিলাওয়াতের পরিবর্তে শুনছে পশ্চিমা গান! তাও আবার এমন উচ্চ আওয়াজে!

ইতোমধ্যে সবুজ বাতি জ্বলে উঠলো। সবাই চলতে শুরু করলো।

যিয়াদ সংকল্প করলো, যেভাবেই হোক লোকটিকে সদুপদেশ দিতে হবে। তাই সেও গাড়িটির অনুসরণ করতে লাগলো। কিছুদূর যাওয়ার পর সামনের গাড়িটি একটি দোকানের সামনে থামলো। ড্রাইভার নেমে এসে কিছু কেনার জন্য এক দোকানে ঢুকলো।

যিয়াদও তার গাড়ির পেছনে গাড়ি দাঁড় করালো। যিয়াদের মনে বিভিন্ন চিন্তা উঁকি দিচ্ছিলো। মনে হয়, লোকটি দোকানে ঢুকেছে সিগারেট কিনতে।

একটু পর লোকটি দোকান থেকে বেরিয়ে এলো। তার হাতে একটি ইসলামি ম্যাগাজিন!

যিয়াদের আর সহ্য হলো না। সে কোমল স্বরে ডাকতে লাগলো, 'এই যে ভাই! অনুগ্রহ করে একটু শুনুন।'

লোকটা কোনো উত্তর দিলো না, ফিরেও তাকালো না।

যিয়াদ এবার উচ্চ কণ্ঠে ডাকলো, 'এ যে! এ যে! ভাই ! অনুগ্রহ করে একটু দাঁড়ান, একটা কথা শুনুন।'

লোকটি তার গাড়ির কাছে চলে এলো এবং গাড়িতে উঠে ড্রাইভিং সিটে বসলো। সে যিয়াদের দিকে ফিরেও তাকালো না।

উত্তেজিত যিয়াদ এবার গাড়ি থেকে নেমে এলো। সে তার কাছে গিয়ে বললো, 'ভাই! আল্লাহ আপনাকে হেদায়েত দান করুন। এতবার ডাকছি! আপনি শুনতে পাচ্ছেন না?'

এতক্ষণে লোকটি তার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসলো। এরপর সে গাড়ি স্টার্ট দিলো!

আর গাড়ি স্টার্ট দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার শুরু হলো সেই উচ্চ গ্রামের বিরক্তিকর সঙ্গীত!

যিয়াদ প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে গেলো। সে বললো, 'ভাই! আপনি হারাম কাজ করছেন। মানুষকে কষ্ট দিচ্ছেন।' লোকটি বারবার মুচকি হেসে চললো। আর ওদিকে উচ্চ গ্রামের সঙ্গীত বাজছে। যিয়াদ আরো উত্তেজিত হয়ে গেলো। রাগে ক্রোধে তার চেহারা লাল হয়ে গেলো। লোকটি যেন তার কথা শুনতে পায়, এজন্য সে আরো উচ্চ স্বরে পূর্বের কথাগুলো বললো। এবার সে যুবক হাত দিয়ে কানের দিকে ইশারা করে হাত নেড়ে কিছু বোঝাতে চাইলো। এরপর সে পকেট থেকে ছোট্ট একটি খাতা বের করলো। খাতাটির প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা,

আমি একজন বধির ব্যক্তি। আমি শুনতে পাই না।

আমাকে যা বলতে চান, অনুগ্রহ করে এ খাতায় লিখে দিন।

শিক্ষণীয় ...

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,
বস্তুত মানুষ খুব ত্বরাপ্রবণ! (সূরা বনী ইসরাইল:১১)
তাই সতর্ক হোন, আপনার এ ত্বরাপ্রবণতা যেন
আপনার ধীরস্থিরতার গুণকে অতিক্রম না করে।



৮৯. দাবির আগে ভূমিকা সাজিয়ে নিন

বড় কোনো দরখাস্ত পেশ করার আগে যার কাছে দরখাস্ত দেয়া হবে, তার মন মানসিকতা ও পারিপার্শ্বিকতা অনুযায়ী ভূমিকা সাজাতে হয়। এর ফলে দরখাস্ত পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যাত হয় না। মৌখিক বা লিখিত উভয় ধরনের দরখাস্তের ক্ষেত্রেই এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য। আপনি কোনো ধনী ব্যক্তির কাছে আপনার প্রয়োজনের কথা লিখে জানাতে চান। তখন প্রয়োজনের কথা লেখার আগেই আপনি তার মহানুভবতা, উদারতা ও সমাজসেবার প্রশংসা করবেন। এরপর আপনি আপনার প্রয়োজনের কথা লিখবেন।

একই পদ্ধতি অবলম্বন করুন, যদি আপনি আপনার পিতা বা ভাইয়ের কাছে কিংবা স্ত্রীর কাছে আপনার কোনো প্রয়োজনের কথা বলতে চান। প্রয়োজনের কথা বলার আগে পরিবেশ উপযোগী ভূমিকা তৈরি করুন। তার মন ও মানসিকতাকে বুঝতে চেষ্টা করুন।

মনে করুন, আপনার কয়েকজন বন্ধুকে খাবারের দাওয়াত দিয়েছেন। আপনি চাচ্ছেন, আপনার স্ত্রী তাদের জন্য খাবার তৈরি করুক। ঘর-বাড়ি সুন্দর করে গুছিয়ে রাখুক। তাহলে তাকে এ কথা জানানোর আগে বলুন, 'তোমার রান্না তো খুব ভালো হয়। আমার বন্ধুদের অনেকে তোমার রান্নার তারিফ করে। আমি তাদেরকে দাওয়াত করতে চাই। তুমি রান্না করে খাওয়ালে তারা খুশি হবে।'

অথবা বলতে পারেন, 'বিশ্বাস করো, আমি উন্নতমানের অনেক হোটেলে খাবার খেয়েছি। কিন্তু তোমার রান্না করা খাবারের মতো স্বাদ কোথাও পাইনি। গতকাল সফর থেকে ফিরে আসা একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো। সৌজন্যতার খাতিরে আমি তাকে খাবারের দাওয়াত দিলাম। সেও সাথে সাথে সম্মত হয়ে গেলো। তার সঙ্গে আরো কয়েকজনকে দাওয়াত দিলাম। তুমি যদি তাদের জন্য খাবার তৈরি করতে, তাহলে খুব ভালো হতো।'

এভাবে না বলে আপনি ঘরে ঢুকে প্রথমেই সজোরে ডাক দিয়ে বলতে পারেন, 'ওই কই গেলা তুমি?' জবাবে আপনার স্ত্রী হয়তো বলবে, 'এই

তো আমি।' সে হয়তো ভাবছে, আপনি তাকে আগামীকাল কোথাও ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলবেন!

আপনি বললেন, 'তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে যাও। আমার কয়েকজন বন্ধু বেড়াতে আসছে। রান্নায় যেন দেরি না হয়। আর সাবধানে রান্না করো।'

এখন বলুন, দ্বিতীয় পদ্ধতিটির চেয়ে প্রথম পদ্ধতিটি কি সুন্দর নয়?

অফিসের বসের কাছ থেকে ছুটি মঞ্জুর করাতে চাচ্ছেন কিংবা মা-বাবাকে কোনো সুসংবাদ দিতে চাচ্ছেন। এসব ক্ষেত্রে সুন্দর পদ্ধতি অবলম্বন করুন।

সিরাতে রাসূল ﷺ অধ্যয়ন করলে আপনি এজাতীয় অনেক উদাহরণ পাবেন।

রাসূল ﷺ তায়েফের পাশেই হাওয়াযিন গোত্রে শৈশব কাটিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দুধ পান করেছেন। তাই তিনি মনে প্রাণে তাদের ইসলাম গ্রহণ কামনা করতেন। একবার রাসূল সংবাদ পেলেন যে, হাওয়াযিন গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই তিনি ﷺ অগ্রসর হয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সাহায্য করলেন। তিনি বিজয়ী হলেন এবং গনিমত হিসেবে তাদের ধন-সম্পদ ও বন্দীদের সঙ্গে নিয়ে এলেন। তিনি তখন 'যিইররানা' নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করেছিলেন। হাওয়াযিন গোত্রের বন্দী মহিলা ও শিশুদেরকে একস্থানে রাখা হয়েছিল। হাওয়াযিন গোত্রের অনেকে যুদ্ধে নিহত হয়েছে। মুসলমানদেরও কয়েকজন শহীদ হয়েছেন। যুদ্ধের ময়দানে এমন হওয়া-ই তো স্বাভাবিক! হাওয়াযিন গোত্রের নেতৃস্থানীয় ও বুদ্ধিমান কিছু লোক বন্দী মহিলা ও শিশুদেরকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে কথা বলতে রাসূলের কাছে এলো। তারা এজন্য বাকপটু একজন লোককে নির্বাচন করলো। লোকটি কথা বলার চমৎকার ভঙ্গি জানত। পরিবেশ উপযোগী শব্দচয়নের ক্ষেত্রেও তার বিশেষ দক্ষতা ছিল।

যুহাইর বিন সারদ নামের সে বাকপটু লোকটি রাসূলের সামনে দাঁড়িয়ে মূল বক্তব্য পেশ করার আগে প্রথমেই পরিবেশ উপযোগী ভূমিক উপস্থাপন করলো।

কবিতার ছন্দে সে বললো,

করুণাসিন্ধু দুখীর বন্ধু,
হে আল্লাহর রসূল!
এখানে যারা হয়েছে বন্দী,
তারা আপনারই মাতৃকুল।
তাদেরে দিয়ে মুক্তি ওহে,
ক্ষমা করে দিন মোদের ভুল।
ইবনে শামার কিংবা নোমান হতো যদি এ স্থানে,
আশা করি সে, ভালো আচরণ করতো মোদের সনে।
আপনি হলেন শ্রে'মানব, খোদার পরে যার আসন,
আপনার দ্বারে আশা করি তাই, মোরা অনন্য আচরণ।

তার আবেগপূর্ণ কবিতা শুনে আল্লাহর রাসূলের হৃদয়-মন বিগলিত হলো। তিনি নারী ও শিশুদের মুক্তি দিলেন।

প্রিয় পাঠক! যুহাইর বিন সারদ তার বক্তব্য শুরু করার আগে কতো চমৎকার ভাষায় ভূমিকা সাজিয়ে ছিলো। সে রাসূলকে হাওয়াযিন গোত্রের সঙ্গে তার গভীর সম্পর্কের কথা এভাবে স্মরণ করিয়ে দিলো যে, 'হাওয়াযিন গোত্রের কাছেই বনু সা'দ গোত্রে আল্লাহর রাসূল শৈশবে দুধপান করেছিলেন।'

এরপর সে আল্লাহর রাসূলের মাঝে আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করলো। সে বললো: 'আমরা যদি আপনার পরিবর্তে অন্য কোনো বাদশাহর সঙ্গে এমন আচরণ করে ফেলতাম আর সেও তার শৈশবের দিনগুলো আমাদের সঙ্গে, আমাদের লালন-ছোঁয়ায় কাটাতো তাহলে সেও আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হতো। অথচ আপনি সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে দয়ালু ও অনুগ্রহশীল। আপনার দয়া ও অনুগ্রহ তো আরো ব্যাপক।'

যুহাইর বিন সারদ-এর ভূমিকার বয়ান ছিল খুবই চমৎকার।

কুরআন শরিফে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে এ আদব শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি-এরশাদ করেছেন-

إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً.

অর্থঃ তোমরা রাসূলের সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাইলে-এর আগে সদকা প্রদান করবে। (সূরা মুজাদালাহ:১২)

আরবদের অভ্যাস ছিলো, তারা কারো কাছে সাহায্য চাইতে হলে প্রথমে সুন্দর সুন্দর কথা ও কবিতার ছন্দমালার অবতারণা করতো। তেমনই কাউকে অপমান করতে চাইলে কিংবা যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাইলে নিন্দা ও তুচ্ছতা প্রকাশক বিভিন্ন ছন্দমালা আবৃত্তি করতো।-এর ফলে তা শত্রুর অন্তরে তরবারির চেয়েও বেশি আঘাত হানতো।

এ বিষয়ক আরেকটি ঘটনা।

রাসূল ﷺ ওমরা করার জন্য মক্কায় গেলেন। ভয় পেয়ে কোরাইশরা বাধা দিলো। পরে উভয়পক্ষের সমঝোতায় দশ বছরের জন্য সন্ধিচুক্তি হলো। হুদায়বিয়ার সে সন্ধিতে একটি ধারা ছিলো, আরবের যে কোনো গোত্র মুসলমান বা কোরাইশদের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে উক্ত সন্ধিচুক্তির অন্তর্ভূক্ত হতে পারবে।

হুদায়বিয়ার চুক্তির পরপরই খোযাআ গোত্র মুসলমানদের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হলো, আর বনু বকর কোরাইশদের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিতে যুক্ত হলো। এর ফলে বনু খোযাআ মুসলমানদের এবং বনু বকর কোরাইশদের মিত্রে পরিণত হলো।

বনু বকর এবং খোযাআ এ দু গোত্রের মাঝে দীর্ঘদিন যাবৎ লড়াই ও দ্বন্দ্ব চলে আসছিলো। সুযোগ পেলেই একে অন্যের ওপর আক্রমণ করতো। বনু বকরের সঙ্গে কোরাইশদের ছিলো সুসম্পর্ক ও গোপন বন্ধুত্ব। সেই সুবাদে আক্রমণ ও প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোরাইশরাও বনু বকরের সঙ্গে শরিক হতো। আর খোযাআ গোত্র যখন রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলো তখন তাদের প্রতি কোরাইশদের ক্ষোভ ও বিদ্বেষ আরো বেড়ে গেলো। কিন্তু সন্ধির কারণে তারা কিছু করারও সাহস পাচ্ছিল না। কারণ তাদের ভয় ছিলো, তারা যদি খোযাআ গোত্রের ওপর

আক্রমণ করে তাহলে সন্ধিচুক্তির ধারা ভঙ্গ করার কথা বলে মুসলমানরা যুদ্ধে খোযাআ গোত্রকে সাহায্য করতে পারে।

এভাবেই প্রায় সতের বা আঠারো মাস কেটে গেলো। হঠাৎ একরাতে বনু বকর মক্কার সন্নিকটে 'ওয়াতির' নামক স্থানে খোযাআ গোত্রের ওপর আক্রমন করে কোরাইশদের কাছে সাহায্য চাইলো। কোরাইশরা ভাবলো, আমরা যদি এ অন্ধকার রাতে বনু বকরকে সাহায্য করি তাহলে মুহম্মাদ তা কিছুতেই জানতে পারবে না। কারণ রাতের আঁধারে কেউ আমাদের চিনবে না। এরপর কোরাইশরা জনবল, অস্ত্রশস্ত্র সবকিছু দিয়ে বনু বকরকে সাহায্য করলো এবং বনু বকরের সঙ্গী হয়ে নির্মমভাবে বনু খোযাআর লোকদের হত্যা করলো।

খোযাআ গোত্রের এক ব্যক্তির নাম ছিলো আমর বিন সালিম। সে কোরাইশদের ঘেরাও থেকে পালিয়ে মদীনায় রাসূলে করীম ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলো। ভীত-সন্ত্রস্ত, ক্লান্ত-শ্রান্ত ও বিধ্বস্ত চেহারায় সে মসজিদের দিকে এগিয়ে গেল। তার শরীর জুড়ে দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি আর ধুলোবালির ছাপ। উসকো খুসকো চুল।

সে রাসূল ﷺ-এর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছন্দে ছন্দে জানালো তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা।

এরপর সে পূর্বের চেয়ে উচ্চৈঃস্বরে বললো-

তার এ মর্মবিদারী কবিতা ও আহ্বান শুনে রাসূল ﷺ খুব আগোপ্লুত হলেন। কোরাইশদের প্রতি হলেন প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। এরপর বললেন, 'হে আমার বিন সালিম! অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করা হবে।' এরপর রাসূল দ্রুত বের হয়ে গেলেন এবং সবাইকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বললেন।

সাহাবায়ে কিরাম দ্রুত প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। 'আসন্ন যুদ্ধ কোথায়, কাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত হবে? এটা কারো জানা নেই।

মুসলমানদের প্রস্তুতির কথা কোরাইশরা জেনে ফেলতে পারে এ আশঙ্কায় আল্লাহর রাসূল যুদ্ধক্ষেত্র ও প্রতিদ্বন্দ্বীর পরিচয় গোপন রাখলেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন যেন আল্লাহ তাআলা

কোরাইশদের এ সম্পর্কে উদাসীন রাখেন আর তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালানো যায়।

কোরাইশদের এ বিশ্বাসঘাতকতার কারণে আল্লাহর রাসূল প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকলেন এবং বললেন, তোমরা কিছুদিনের মধ্যেই আবূ সুফিয়ানকে দেখবে। সে চুক্তি আরো দৃঢ় করতে এবং মেয়াদ বাড়িয়ে নিতে আসবে।'

এরপর বুদাইল বিন ওয়ারাকাসহ খোযাআ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলের কাছে এলো। তারা রাসূলকে পুরো ঘটনার বিবরণ শোনালো। রাসূল ﷺ তাদেরকেও সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং বললেন, তোমরা এখন চলে যাও এবং বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করো।'

রাসূল আশঙ্কা করছিলেন যে, রাসূলের সঙ্গে তাদের সাক্ষাতের খবর মক্কার লোকদের কাছে পৌঁছে যাবে। তাহলে তারা মুসলমানদের পৌঁছার আগেই খোযাআ গোত্রের ওপর আবার আক্রমণ করে বসবে।

প্রতিনিধি দল নিজেদের এলাকায় ফিরে গেলো। মক্কা-মদীনার মাঝামাঝি 'উসফান' নামক স্থানে আবূ সুফিয়ানের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হলো। কোরাইশরা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে আরো দৃঢ় করতে এবং চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করতে আবূ সুফিয়ানকে রাসূলের কাছে পাঠিয়েছিলো। তারা আশঙ্কা করছিলো যে, তাদের অপকর্ম ও সন্ধিভঙ্গের অপরাধের কথা রাসূল হয়েতো জেনে গেছেন।'

বুদাইল বিন ওয়ারাকাকে দেখেই আবূ সুফিয়ানের মনে সন্দেহ জাগলো যে, সে রাসূলের কাছ থেকেই ফিরে এসেছে এবং কোরাইশরা যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তা রাসূলকে জানিয়ে দিয়েছে।

তাই সে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথা থেকে ফিরলে, বুদাইল?'

বুদাইল উত্তরে বললো, 'এই উপত্যকায় বেড়াতে এসেছিলাম।'

তার কথা শুনে আবূ সুফিয়ান চুপ হয়ে গেলো। বুদাইল তাকে অতিক্রম করে কিছু দূর চলে যাওয়ার পরই বুদাইলের উট যেখানে অবতরণ করেছিলো, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো। এরপর উটের মল হাতে নিয়ে তা চূর্ণ

করে দেখতে পেলো, তাতে খেজুরের বীচি রয়েছে। সে বুঝতে পারলো, এ উট মদীনা থেকে এসেছে। কারণ মদীনাবাসীরাই তাদের গবাদি পশুকে খেজুরের বীচি খাওয়ায়।

এরপর আবূ সুফিয়ান বললো, 'আল্লাহর কসম! সে মুহাম্মাদের কাছ থেকেই ফিরেছে।'

মদীনায় পৌঁছে প্রথমে সে তার মেয়ে উম্মে হাবীবার ঘরে গেলো। উম্মে হাবীবা ছিলেন আল্লাহর রাসূলের সহধর্মিণী। আবূ সুফিয়ান ঘরে ঢুকে আল্লাহর রাসূলের বিছানায় বসতে যাবে এটা দেখে উম্মে হাবীবা বিছানা ভাঁজ করে সরিয়ে ফেললেন।

আবূ সুফিয়ান বললো, 'মেয়ে আমার! কী হলো, তুমি কি আমাকে-এরচেয়ে ভালো বিছানা দিতে চাও নাকি আমি এ বিছানায়ও বসার উপযুক্ত নই?'

উম্মে হাবিবা বললেন, 'এটি আল্লাহর রাসূলের বিছানা। আর আপনি তো মুশরিক ও অপবিত্র। তাই আপনি এটাতে বসেন তা আমার কাছে পছন্দনীয় নয়।'

আবূ সুফিয়ান হতবাক হয়ে গেলো। সে বললো, 'মেয়ে! আমার কাছ থেকে চলে আসার পর তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!'

এরপর আবূ সুফিয়ান রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বললো, 'হে মুহাম্মাদ! আপনার সঙ্গে আমাদের কৃত চুক্তি আরো দৃঢ় করে নিন এবং মেয়াদ আরো বাড়িয়ে দিন।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'আপনি কেবল এ জন্যই এসেছেন? নাকি আর কোনো ঘটনা ঘটেছে?

আল্লাহর রাসূল শুধু এতটুকুই বললেন। কোরাইশদের চুক্তিভঙ্গ এবং খোযাআ গোত্রে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালানোর সংবাদ যে তিনি জানেন তা তিনি আবূ সুফিয়ানের সামনে প্রকাশ করলেন না। তিনি যেন আবূ সুফিয়ানকে ইঙ্গিতে বলে দিলেন, 'নতুন করে চুক্তি নবায়ন ও মেয়াদ বৃদ্ধি চাচ্ছেন কেন? তাহলে কি আগের চুক্তি বহাল নেই? পূর্বের চুক্তি বহাল থাকলে নবায়ন কিংবা মেয়াদ বৃদ্ধির কি দরকার?

আবূ সুফিয়ান বললো, 'না, আমরা এখনো পূর্বের অঙ্গীকার ও চুক্তিতে পুরোপুরি অটল আছি। আমরা চুক্তিতে কোনো পরিবর্তন ঘটাবো না এবং চুক্তির শর্ত থেকে একটুও সরে যাবো না।'

রাসূল ﷺ তার এ কথা শুনে একেবারে নীরব হয়ে গেলেন। আবূ সুফিয়ান আরো কয়েকবার তার প্রস্তাব পেশ করলো কিন্তু আল্লাহর রাসূল কোনো জবাব দিলেন না।

আবূ সুফিয়ান সেখান থেকে বেরিয়ে আবূ বকরের কাছে এসে বললো, 'মুহাম্মাদের কাছে আপনি আমার জন্য সুপারিশ করুন। তিনি যেন চুক্তি নবায়ন করেন, মেয়াদ বৃদ্ধি করেন কিংবা অন্তত যেন আমাকে এবং আমার সম্প্রদায়কে রক্ষা করেন ও নিরাপত্তা দেন।'

আবূ বকর বললেন, 'আল্লাহর রাসূল যাকে নিরাপত্তা দেবেন আমিও তাকে নিরাপত্তা দেবো। আর আমার অবস্থা তো এ যে, আল্লাহর কসম, ক্ষুদ্র পিপীলিকাকেও আমি যদি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়তে দেখি তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে আমি তাকে সাহায্য করবো।'

আবূ সুফিয়ান ভাঙ্গা মনে আবূ বকরের কাছ থেকে বেরিয়ে ওমরের কাছে গেলো। সব শুনে ওমর বললেন, 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের কাছে সুপারিশ করবো আমি?'

'আমি তো বরং চাই তোমাদের সঙ্গে যে চুক্তি বহাল আছে আল্লাহ সেটাকেও ছিন্ন করে দেন। আর যে চুক্তি ছিন্ন হয়ে গেছে আল্লাহ তাআলা তা আর কোনো দিন ফিরিয়ে না আনেন।'

ওমরের কথা শুনে আবূ সুফিয়ানের আশার শেষ কেন্দ্রটিও ভেঙ্গে গেলো। ওমর যেন তার গালে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করেছে। ওমরের কাছ থেকে বেরিয়ে আসার সময় আবূ সুফিয়ান বলতে লাগলো, 'আপনজন ও আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে আমি এ আচরণ পেলাম!'

আবূ বকর ও ওমরের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে আবূ সুফিয়ান আলীর কাছে গিয়ে বললো, 'আলী! তুমি তো বংশগত দিক থেকে আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ। তুমি আল্লাহর রাসূলের কাছে আমার জন্য সুপারিশ করো।'

আলী বললেন, 'আবূ সুফিয়ান! আল্লাহর রাসূল কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কিংবা শাস্তি দিতে চাইলে কেউ তাতে বাধা দেবে না। কারণ, আল্লাহর

রাসূল নিজ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নেন না। তিনি যা বলেন, আল্লাহর হুকুমেই বলেন।'

'আপনি তো কোরাইশদের সরদার, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তাই আপনি আপনার আত্মীয়-স্বজনের কাছে নিরাপত্তা চান এবং নিজেকে নিরাপদ রাখুন।'

'আপনি আত্মীয়-স্বজনের মাঝে এ ঘোষণা করে দিন যে, আমি নিজেকে সব ধরনের যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বিরত রাখলাম। এ কথা বলে আপনি মক্কায় ফিরে যান।'

আবূ সুফিয়ান বললো, 'তোমার কি মনে হয় এ ধরনের কোনো ঘোষণা কাজে আসবে?' আলী বললেন,'না, তা মনে হয় না। তবে আমি আমার খেয়াল বললাম। আবূ সুফিয়ান মদিনার খোলা ময়দানে এসে চিৎকার করে বললো, 'সবাই শুনুন, আমি সবার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আমার ধারণা, কেউ আমার এ আশ্রয় প্রার্থনাকে প্রত্যাখ্যান করবেন না।' এরপর সে মক্কায় ফিরে গেলো।

মক্কায় পৌঁছলে কোরাইশরা তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী সংবাদ নিয়ে এলে? মুহাম্মাদের কাছ থেকে কোনো নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নিয়ে এসেছো কি?'

আবূ সুফিয়ান বললো, 'না! আল্লাহর কসম, তিনি তো আমাকে এড়িয়ে গেছেন। আমি তার সঙ্গীদের কাছেও গিয়েছি কিন্তু মুহাম্মদের সঙ্গীরা তার যেমন অনুগত, দুনিয়ার কোনো বাদশাহর অনুচররা বাদশাহর ততটা অনুগত নয়।'

'আমি মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে কথা বললাম। সে আমার কথায় কোনো উত্তরই দিল না।'

'এরপর আবূ বকরের কাছে গেলাম। তার কাছে থেকেও কিছু পেলাম না।'

'তারপর ওমরের কাছে গেলাম। তাকে তো আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে পেলাম।'

'সবশেষে গেলাম আলীর কাছে। আমাদের ব্যাপারে তাকেই সবচেয়ে সহনশীল মনে হলো। সে আমাকে একটি কাজ করতে পরামর্শ

দিয়েছিলো। আমি সেটা করেছি। আল্লাহর কসম! জানি না, তাতে আমাদের কোনো উপকার হবে কি না।'

কোরাইশরা জিজ্ঞেস করলো, 'সে তোমাকে কী করতে বলেছিলো?'

'আলী আমাকে বলেছিলো, আমি যেন নিজের ব্যাপারে মদীনার লোকদের কাছে নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি সেটা করেছি।'

'মুহাম্মদ কি তার বৈধতা দিয়েছেন?'

'তুমি যে তোমার নিজের জন্য নিরাপত্তা চেয়েছো মুহাম্মদ কি নিজে সেটা গ্রহণ করেছেন কিংবা তার সঙ্গীদের গ্রহণ করতে বলেছেন?'

আবূ সুফিয়ান বললো, 'না!'

এ জবাব শুনে কোরাইশরা একযোগে বলে উঠলো, 'ধিক! শত ধিক তোমাকে! এ কথা বলে তো সে তোমাকে উপহাসের পাত্র বানিয়েছে। তুমি যা বলেছো, তাতে আমাদের কোনো লাভই হবে না।'

আবূ সুফিয়ান বললো, 'এছাড়া আমার আর কিছু করার ছিলো না।'

ভগ্ন হৃদয়ে আবূ সুফিয়ান বাড়ি ফিরলো এবং স্ত্রীকে পুরো ঘটনা খুলে বললো। সব শুনে তার স্ত্রী বললো, 'তোমার এ আগমন কোনো কল্যাণ নিয়ে আসেনি।'

এর অল্প কিছুদিন পরই আল্লাহর রাসূল বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন।

ইঙ্গিত ...

বড় লোকমা গিলার আগে ভালো করে চিবিয়ে নিতে হয়।



৯০. সবসময়ই কি সফল হওয়া যায়?

ফাহাদ তার বন্ধুর সঙ্গে হাঁটছিল। বন্ধুটি ছিল অনেক জেদি আর গোঁয়ার প্রকৃতির। তারা বিস্তৃত বালুময় প্রান্তর অতিক্রম করছিল। হঠাৎ তারা দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে কালো রঙের কিছু একটা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখলো। বাতাসে একবার তা দৃষ্টির আড়াল হয়ে যাচ্ছে, কিছুক্ষণ পর আবার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

ফাহাদ তার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলো, 'জিনিসটা কী?'

তার বন্ধু বললো, 'আমি নিশ্চিত, ওটা কালো রঙের একটা ছাগল।'

ফাহাদ বললো, 'না, ওটা তো একটা কাক।'

'আমি বললাম তো, ওটা ছাগল। ওটা কালো রঙের একটা ছাগল।'

'ঠিক আছে। চলো আমরা কাছে যাই। তাহলেই আমরা নিশ্চিত হতে পারবো।'

তারা আরো কাছে গেলো এবং খুব তীক্ষ্ণ নজরে বস্তুটি দেখতে লাগলো। স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছিলো, এটি একটি কাক।

ফাহাদ বললো, 'ভাই! দেখো, কাকই তো।'

তার বন্ধু দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বললো, 'না, এটি একটি ছাগল!'

উত্তরে ফাহাদ কিছুই বললো না। তারা বস্তুটির আরো কাছে গেলো। তাদের কাছে আসতে দেখে কাকটি উড়ে গেলো।

ফাহাদ তখন চিৎকার করে বললো, 'আল্লাহু আকবার! কাকই তো। দেখলে, কাকটি উড়ে গেলো।'

তখন তার বন্ধুটি বললো, 'উড়ে গেলেও আসলে ওটা ছাগলই ছিল'!

প্রিয় পাঠক! আপনাদের এ ঘটনাটি কেন শোনালাম, জানেন?

এ ঘটনাটি আমি একটি বিষয় বোঝানোর জন্য বর্ণনা করেছি। বিষয়টি হলো, পূর্বের পৃষ্ঠাগুলোতে আমি যে সব যোগ্যতা এবং দক্ষতা কাজে লাগানোর কথা বারবার বলে এসেছি, সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে কার্যকর হলেও জীবনে চলার পথে এমন কিছু মানুষ আপনি অবশ্যই পাবেন, তাদের সঙ্গে আপনি যত ভালো ব্যবহার করবেন, যত সুন্দর আচরণ করবেন তারা কিছুতেই প্রভাবিত হবে না।

মনে করুন, তাদের সঙ্গে আপনি 'অন্যের প্রশংসা করার' দক্ষতা প্রয়োগ করলেন। হয়তো কাউকে বললেন, 'মাশাআল্লাহ! আপনার পোশাকটা তো

বেশ সুন্দর। আপনাকে তো দেখতে নতুন বরের মত লাগছে।' আপনি আশা করলেন, সে মুচকি হেসে আপনার সায় দেবে এবং তার চেহারায় আনন্দের ভাব ফুটে ওঠবে। কিন্তু সে এমনটি করলো না। উল্টো আপনার দিকে বাঁকা নজরে তাকিয়ে বললো: 'প্রশংসা করে আমাকে ফুলাতে হবে না।'

অথবা এমন কিছু বলবে, যার দ্বারা বোঝা যায় সে মানুষের সঙ্গে কিভাবে আচরণ করতে হয় সে তা জানে না।

মনে করুন, কোনো স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গে বিভিন্ন রকমের দক্ষতাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা প্রয়োগ করে। সর্বদা হাসি-খুশি থাকার চেষ্টা করে। আবেগ প্রকাশ করে। মাঝেমধ্যে হাসির কোনো কৌতুক বলে। স্বামীর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে। কিন্তু তার স্বামী তার এ আচরণের ভিন্ন ব্যাখ্যা করে বলে বসে, 'জোর করে কৃত্রিম হাসি হাসতে হবে না'!

আপনি নিজেই যখন এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হবেন তখন কী করবেন? তখন আপনি নিজেকে এ বলে প্রবোধ দেবেন যে, এ ধরনের মানুষগুলো সমাজের ভালো মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে না।

আমি নিজে এসব দক্ষতা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মাঝে প্রয়োগ করেছি। আল্লাহর শপথ ! ছোট-বড়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বিভিন্ন শ্রেণি ও বিভিন্ন পেশার উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ ব্যক্তিবর্গ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্র ও অন্যান্যদের সঙ্গেও এসব আচরণ কৌশল প্রয়োগ করেছি, এমনকি আমি আমার সন্তানদের সঙ্গেও এ সব কৌশল প্রয়োগ করে দেখেছি। আমি-এর অবিশ্বাস্য ফলাফল পেয়েছি।

বরং আমি ভিন্ন জাতির নানা দেশের মানুষের সঙ্গেও এ সব কৌশল প্রয়োগ করে দেখেছি। সেখানেও আমি চমৎকার ফল পেয়েছি।

আর তাই প্রিয় পাঠক আপনাকে বলছি, আপনিও এ ধরনের কৌশল প্রয়োগ করে দেখুন। আপনি নিজেও অবিস্মরণীয় ফল পাবেন। আল্লাহর নামে কসম করে বলছি! আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী।

সংক্ষেপে ...

আপনি কি আসলেই বদলে যেতে চান? তাহলে এখনি শুরু করুন।



৯১. সাহস করে এখনই শুরু করুন

একবার আমি 'মানুষের সঙ্গে আচরণ কৌশল পরিচিতি ও প্রয়োগ পদ্ধতি' শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেছিলাম। আবদুল আজিজ নামের একজন সে কর্মশালায় ছিলো। কর্মশালাটিকে সে খুব উপভোগ করেছিল। আমি দেখেছি, ছোট-খাটো সব কথাই সে লিখে রাখতো। কর্মশালাটি তিনদিনব্যাপী ছিল। তিনদিন পর প্রত্যেকে যার যার গন্তব্যে চলে গেলো।

এক মাস পর আমি একই বিষয়ে আবারও কর্মশালার আয়োজন করলাম। প্রথমদিন উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের দিকে লক্ষ করতেই দেখলাম একেবারে প্রথম সারিতে বসে আছে গতবারের সে আবদুল আজিজ!

আমি খুব অবাক হলাম। সে তো জানে যে, গত কর্মশালায় আমি যা বলেছি, এবারও হুবহু তাই বলবো। তারপরও সে কেন উপস্থিত হলো?

নামাযের বিরতিতে সবাই হল থেকে বের হয়ে গেলো। আমি আবদুল আজিজের হাত ধরে বললাম: 'আবদুল আজিজ! তুমি আবার কেন এলে? তুমি তো জানো, গত কর্মশালার কথাগুলোই আমি আবার বলবো। তোমার হাতেও তো গতবারের নোটবুকটা দেখছি। গত কর্মশালা থেকে তুমি যে সদন পেয়েছিলে, এবারও সে সনদই পাবে। এ কর্মশালায় তো তোমার কোনো লাভ হবে না।'

সে আমাকে বললো, আপনি ঠিকই বলেছেন। গত একমাস আমার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী-সবাই আমাকে বলেছে, 'আবদুল আজিজ! আমাদের সঙ্গে তোমার আচরণ অনেক বদলে গেছে'!

আমি গত কর্মশালায় যে সকল যোগ্যতা ও আচরণ কৌশল শিখেছিলাম, সেগুলো আমার আচার-আচরণে বাস্তবায়িত করতে পেরেছি বলেই আশেপাশের সবাই এ কথা বলছে।

তাই গতবারের শেখা যোগ্যতা ও কৌশলগুলো যেন আরো ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি এবং আমি যেন এ ক্ষেত্রে আরো উন্নতি করতে পারি এ উদ্দেশ্যেই আমি আবার এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করতে এসেছি।'

সুতরাং ...

আপনি যদি আন্তরিকভাবে নিজেকে বদলাতে চান, তাহলে
সাহসী হোন। আর এখন থেকেই শুরু করুন।



Peace

রাসূল (ﷺ) এর আদর্শের আলোকে

Enjoy Your Life

জীবনকে উপভোগ করুন

ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান আল-আরিফী

